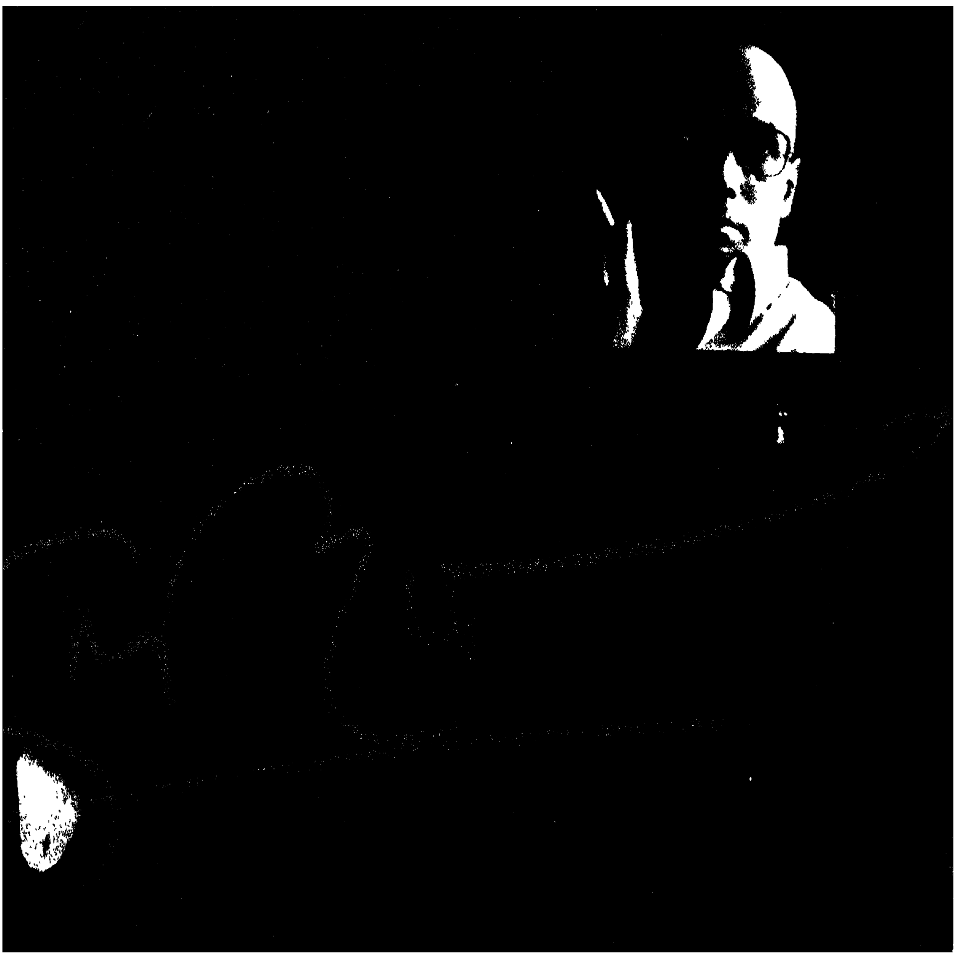
# সৈয়দ শামসুল হক
# উপন্যাস সমগ্র ১



# উপন্যাস সমগ্র
১

# উপন্যাস সমগ্র
# ১

সৈয়দ শামসুল হক



অন্যপ্রকাশ

প্রথম প্রকাশ | ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ ইং

প্রচ্ছদ | ধ্রুব এষ

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোনঃ ৯৬৬৪২৬০, ৯৬৬৪৬৮০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১

কম্পিউটার কম্পোজ | পজিট্রন কম্পিউটার্স
৬৯/এফ গ্রীন রোড, পান্থপথ, ঢাকা

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীন রোড, পান্থপথ, ঢাকা
ফোন: ৫০৪২২৬, ৯৬৬৪৬৮০

মূল্য | ২৫০ টাকা

Upanyash Samagra | By Syed Shamsul Hoq
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design : Dhrub Esh



## সূচিপত্র

# সবিনয় নিবেদন

যেমন অনেকেরই ; শুরু করেছিলাম কবিতা দিয়ে ;– তারপর গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক এলো কলমে ; এখন একসঙ্গে সবই। এখন, কখনো, কবিতায় গল্প এসে যায়, গল্পে কবিতা এমনকি প্রবন্ধও করি, নাটকে তো আমার প্রধান অবলম্বন কবিতার অস্থি।

আমার পরিচয় কেউ দেন– কবি ; কেউ– কথাশিল্পী ; কেউ– নাট্যকার। ব্যাপারটা অন্ধের হাতি দেখার মতো হয়ে যায় ; তবে, ক্ষতিটা হাতির নয়, অন্ধসকলের।

সাহিত্যের যে মাধ্যমেই কাজ করি না কেন– কাজ একটাই : সময় ও অনুভবের একটি প্রতিস্পন্দন অক্ষরে অক্ষরে আঁকা। এই আঁকা শব্দটিও আকস্মিক নয় ; আমি রেখা রঙে তুলিতে ক্যানভাসে ও কাগজে কখনো কখনো আঁকিও বটে অনেকদিন থেকে।

সবটা মিলিয়েই আমি।

বারো বছর বয়সে কবিতার টানে বেরিয়ে পড়েছিলাম ; এখনো হাঁটছি। চৌদ্দ বছর বয়সে একটা ধাক্কা খেলাম ; সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রত্যক্ষ দেখলাম সেই প্রথম ; দেখলাম, ঢাকা থেকে অকস্মাৎ অনেক মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি তখন জগন্নাথ কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র ; বিজ্ঞান, কিন্তু করোটির ভেতরে শিল্প ; পঞ্চাশ সালের সেই অভিজ্ঞতা অক্ষরে ধরবার জন্যে কবিতা নয়, উপন্যাসের দিকে হাত বাড়ালাম তখন।

সেই প্রথম।

মনে পড়ে, তখন, রাতের পর রাত জেগে, আমাদের লক্ষ্মীবাজারের বাড়িতে, বারান্দার ঘরে, একটি উপন্যাস লিখে ফেলেছিলাম– 'রুচিরার বোন স্বপ্না' ; সে খাতাটি অনেকদিন আগেই হারিয়ে গেছে– কেবল মনে আছে রাজা নামের খয়েরি কলম, তার খুব সরু নিব ; কালো কালি, আর ছোট ছোট অক্ষরে ঠাসা শ'দুয়েক পাতার বেগ্‌নি মলাটের খাতা।

বছর তিনেক পরে, আমার জন্ম যেখানে সেই কুড়িগ্রামের একটি স্মৃতি– আমাদের বাড়ির পাশেই থানার এক বড় দারোগার কথা মনের ভেতরে দুলে ওঠে খুব ;– খুব কাছে থেকেই দেখেছিলাম সব– সেই স্মৃতিটিকে উপন্যাসের আকারে ফিরে আনতে থাকি একটু একটু করে। বেশ ক' বছর মেতে থাকি ওই নিয়ে ; হয়ে ওঠে 'অচেনা' উপন্যাসটি– এ সংগ্রহের প্রথম উপন্যাস। 'অচেনা' ছাপা হয়েছিল পত্রিকায়, ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ; বই হয়ে কখনো বেরোয়নি ; এতদিন পরে এই বইয়ে এলো।

বই হয়ে প্রথম উপন্যাস বেরুলো পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে– 'দেয়ালের দেশ' ; প্রকাশক সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ আমার এই কৈশোরক রচনাটিকে– আজ বুঝি– বিক্রির দিকে চোখ রেখেই গ্রন্থরূপ দেন ; তাঁকে হতাশ হতে হয়েছিলো। আমার বাবাকে নিয়ে লেখা 'অচিন্ত্য পূর্ণিমা' তখনি ছিলো তৈরি– সেটিও এ বইয়ের আগে কখনো বই হয়নি– পত্রিকায় বেরিয়েছিলো একবার।

ওই পঞ্চাশের দশকেরই শেষ দিকে মীজানুর রহমানের তাগিদে লেখা এবং বই হয় 'এক মহিলার ছবি'– এখন আমি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, বিষয় দৃষ্টি বক্তব্য পরেও

আঙ্গিকের একটা আবিষ্কার ছিলো ওতে ; এই আবিষ্কারটি পরে অনেকগুলো উপন্যাসে আমি কাজে লাগিয়েছি ; এখনো তা কাজে লাগছে।

এ সংগ্রহের অন্য দু'টি উপন্যাস– কয়েকটি মানুষের সোনালি যৌবন, অনুপম দিন— লেখা ষাটের দশকের প্রথম ছ'বছরের ভেতরে ; বইও তখনি।

উপন্যাসকে আমি বলি, সৃষ্টিশীল এক ধরনের সাংবাদিকতা ; আবার, আকারে যত ছোটই হোক– উপন্যাস আমি তাকেই বলি যার ভেতরে চরিত্রের এমন এক অভিজ্ঞতা-স্নান থাকে, যার পরে সে অন্য বা নতুন মানুষ হয়ে যায়, বদলে যায়, অন্য-সে অন্য জীবনে প্রবেশ করে ; বিপরীতে, ছোটগল্পে মুহূর্তের থাকে একটি অভিঘাত– তাতে আমরা বদলে যেতেও পারি, নাও পারি; একটি ঢেউ চিহ্ন কেবল।

সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা আমাকে বলেন, রচনার যে কোনো সংগ্রহে প্রথম প্রকাশের সন তারিখ ইত্যাদি তথ্য থাকা জরুরি।

হয়তো। কিন্তু আমার ভেতরে বাস করে এক উড়নচণ্ডী ; নিজের লেখা বই সংগ্রহ করে রাখবার মতো গেরস্থালি কখনোই আমাকে দিয়ে হয়নি– এখনো হয় না।

অতএব, উপন্যাসগুলোর প্রকাশ বিষয়ক তথ্য দেয়া সম্ভব হলো না। কাজটা বরং কঠিন করেই রাখা গেলো কারো কারো জন্যে।

পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই সেই যে লিখে চলেছি– কেবল নিজের জন্যে নয়, এই বাংলার সাহিত্য-শিল্পের জন্যেও বটে– এবং অধিক করেই বটে– একটা জমি তৈরি করে চলেছি, শস্যের জন্যে জমি, স্বাস্থ্যের জন্যে শস্য, মানব হয়ে ওঠার জন্যে স্বাস্থ্য। তাই আমি, অন্তত আমি, পঞ্চাশের সন্তান আমি, কেবল বিষয় বা বক্তব্য নয়, আঙ্গিকের দিকেও সমান সবল উৎসাহ ধরেছি– এখনো ধরি ; এ কাজটি এখনো আমার শেষ নয় বলেই জানি। এ সবের একটা আদি ইতিহাস– উপন্যাসে– হয়তো এ সংগ্রহের রচনাগুলোতে লক্ষ করা যাবে।

সৈয়দ হক



# অচেনা

সারারাত যেন ঘুম আসে না আনুর। ট্রেন কখন মহিমপুর পৌছুবে সেই ভাবনা তার। হুট করে স্টেশন আসে, ঘুরঘুট্টি অন্ধকাবের মধ্যে প্ল্যাটফরমে ভূতের মতো মানুষগুলোকে ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। একটা টেমি হাতে কে ডাকতে ডাকতে চলে যায়— চাচা, চাচাগো, কোথা থেকে যেন খট্ খট্ ঘটাং ঘটাং শব্দ উঠতে থাকে, আনু জিগ্যেস করে— হ্যাঁ বাবা এসে গেছি আমরা?

আরে না। তোর ঘুম নেই লক্ষ্মীছাড়া। ঘুমো।

কিন্তু আনু ভয় পায় না। বাবা অমন ধমক দিলেও সে শুয়ে পড়ে না। জানে বাবা ঐ রকমই, তাকে কিস্‌সু বলবেন না। সান্তাহারে তিনঘণ্টা বসে থাকবার পর যখন গাড়ি এলো, বাবা বলেছিলেন, এইবাব আমরা এসে গেছি। সেই কথাটা শুনে অবধি আনুর ঘুম গেছে। নইলে তার আগে চমৎকার ঘুমোচ্ছিল সে মা॥ব পাশে ওয়েটিং রুমের বেঞ্চিতে। শোবার আগে বাবা মিষ্টি কিনে এনেছিলেন এক হাঁড়ি। দু'টোর বেশি খেতে পারে নি।

'ট্রেনে কিস্‌সু খেতে পারে না আনু। বাবাব সঙ্গে কত জায়গায় ঘুরেছে সে। বাবার শুধু বদলির চাকরি। বদলিটা খুব পছন্দ আনুর, কেবল চাকরিটা একেবারেই ভালো লাগে না। কত ছেলের বাবা ডাক্তার, উকিল, সার্কল অফিসার, কত কী!— আর কেবল তার বাবাই কোথা থেকে বেছে বেছে দারোগা হয়েছেন। ছেলেরা ঠাট্টা করে; বলে– দারোগার ব্যাটা, পালা পালা, ধরে হাজতে নিয়ে যাবে। আনুব তখন জেদ হয় খুব। এককেবার ছেলেগুলোকে ধাওয়া করে; যেন সত্যি সত্যি ধরবে। কিন্তু একি; সবাই ভয় পাওয়া দূরে থাক, একটু দৌড়ে গিয়েই খিলখিল করে হাসতে থাকে। তখন আনু বুঝতে পারে, তার কোনো জোর নেই, কিছু নেই। সে একা।

একেকদিন বাড়িতে এসে ধুপধাপ কবে এটা ফেলে, ওটা সরায়, পরে মা—র কাছে গিয়ে বলে মা, তুমি বাবাকে আর থানায় যেতে দিও না।

কেন রে?

মা অবাক হয়ে জিগ্যেস করেন কাঁধ থেকে ধোয়া ভিজে কাপড়গুলো তারে মেলে দিতে দিতে। একটা কাক খা-খা করতে থাকে বান্নাঘরেব চালে বসে। পর মুহূর্তেই মা ভ্রূকুটি করে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন কাকটা। তিনি বোধহয় আনুর অবাক-করা কথাটা ভুলেই যান। আনু তখন হাতের কঞ্চিটা দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বলে, হ্যাঁ মা দিও না। ডাক্তার সাহেবের বৌ বলে, দারোগার ছেলে খাবাপ ' লাট্টুকে আমার সঙ্গে মিশতে না করে দিয়েছে।

মা-র হাতটা থেমে যায়। একটু চুপ করে থাকেন তিনি। আনুর দিকে তাকিয়ে দেখেন। তারপর হেসে ফেলেন। তখন আনুর রাগ হয় খুব। বলে, না আমি শুনবো না। লাট্টুর মা বলে কেন?

বলুক গে' তুই আর যাসনে। নে, কাপড়টা ধর।

আনু একগাদা কাপড় কোলে করে দাঁড়িয়ে থাকে। তখনও ঘ্যানঘ্যান করে, তুমি বাবাকে বলো কিন্তু মা। কত ছেলের বাবা কত ভালো চাকরি করে।

কিন্তু বদলিটা পছন্দ। কত দেশ দেখা যায়। ইস্, কত জায়গায় গেছে আনু। একেকদিন ছেলেদের মধ্যে তার খাতির হয়ে যায় ভারী। তাদের সে গল্প শোনায়। নিজেকে বড় বাহাদুর [illegible]। রেললাইনের পাশ দিয়ে আসবার সময় [illegible] ভয়ে ভয়ে বলেছে— এই

জঙ্গলে ভাই বাঘ থাকতে পারে। তখন আনু সগর্বে ঘোষণা করে, বাঘ এলে রেললাইন দিয়ে আমি দৌড়ুবো। একেবারে চলে যাবো নাটোর; আবার দৌড়ুবো, আবার রাজশাহী, আবার দৌড়ে দৌড়ে আদমদিঘী চলে আসবো— বাঘ আমাকে ধরতেই পারবে না।

ছেলেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এক দৌড়ে যে এখান থেকে রাজশাহী যাওয়া যায় না, এখান থেকে অনেক দূর— তা কারো খেয়াল হয় না। যেন সত্যি সত্যি আনু তা পারবে। তাদের চোখের সামনে ছায়াবাজির মতো অস্পষ্ট একেকটা শহরের ছবি ভেসে ওঠে। জলজলে রোদ, ঝিমঝিম দুপুর তারা কল্পনায় দেখতে পায়। বুনো পাখি ডাকছে কর্‌র্‌ ঠক্‌ কর্‌র্‌ ঠক্‌, গরুর গাড়ি যাচ্ছে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করতে করতে, কাচামিঠে আম ধরেছে বড় বড়— আনুকে তাদের অন্যজগতের মানুষ মনে হয়।

আবার আরেকদিন হয়ত বিকেলে ঝিমিয়ে থাকা রেলস্টেশনে ওরা খেলতে আসে। সারা স্টেশন ফাঁকা। মিষ্টির দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ। গাড়ি একটা আসবে সেই রাত দশটায়। গুদামের পাশে কয়েকটা মালগাড়ি দাঁড়ানো। গুদামে পাটের বস্তা পাহাড়ের মতো উঁচু। ওজন করবার কলটা দেখতে যেন বিরাট বিদঘুটে একটা সেলাইয়ের মেশিন। দাঁড়ানো দুটো একটা এই রকম মালগাড়ি যেন পেটে কত দেশবিদেশের রহস্য পুরে চুপ করে আছে। আনু তাদের গায়ে খুব সন্তর্পণে হাত রাখে— এত আস্তে, যেন ওগুলো একেকটা মানুষ; আদর করে। বানান করে করে পড়ে গায়ের লেখাগুলো— ই, বি, আর। রেলের গাড়িটার গায়ে লেখা 'নট টু বি লুজ শান্টেড।' মানে বুঝতে পারে না। একটা মালগাড়ির গায়ে সাদা একটা চাকা বসানো— যেমন মোটর গাড়িতে দেখা যায়। কেউ ওতে হাত দিতে গেছে হয়ত, লাফ দিয়ে তার হাত সরিয়ে দেয় আনু। উত্তেজনায় তার শরীর কাঁপতে থাকে। সে ছাড়া আর কেউ তো জানে না, ওটা হচ্ছে ব্রেকের চাকা। ঘোরালেই ব্রেক খুলে যাবে, গাড়ি তখন ছাড়া পেয়ে হুস্‌ হুস্‌ করে ছুটতে থাকবে, সান্তাহার পার্বতীপুর কোথায় চলে যাবে, কেউ থামাতে পারবে না।

ছেলেরা অবাক হয়ে সাদা চাকাটা দেখে। কেউ বলে— যাঃ, ইঞ্জিন না হলে যাবে কী করে?

আনু জবাব দেয় গম্ভীর হয়ে, ইঞ্জিনই সব নাকি? বাবার সঙ্গে ইঞ্জিন ছাড়াও গাড়ি দেখেছি কত।

হবেও বা। আনু কত জায়গায় ঘুরেছে, কত দেখেছে, ওরা তো আর কোথাও যায়নি! আনুর তখন গর্ব হয় খুব। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা নিস্পৃহতা জাগে তার ভিতরে। পরম উদাস কণ্ঠে সে বলে, জানিস আমরা এখান থেকেও চলে যাবো। বাবা খুব শীগগীর বদলি হবে।

কোথায় রে?

চট্‌ করে কোনো জায়গার নাম মনে পড়ে না আনুর। তার পানু ভাই থাকে ঢাকায়। ঢাকায় থেকে পড়ে। আনু এক মুহূর্ত ইতস্তত করে অবলীলাক্রমে বলে, ঢাকায়।

ইস্‌। ঢাকা যাবি ভাই?

হ্যাঁ, না তো কী? দেখিস।

এবার আনুর বাবা বদলি হলো মহিমপুরে। বাঁধাছাঁদা করবার সময় বাবা মাকে বলেছিলেন, ছেলেমেয়েগুলোর কিছু লেখাপড়া হলো না। বছরের শেষে বদলি। না এখানে পরীক্ষা দিতে পারল, না ওখানে গিয়ে নতুন ক্লাশে ভর্তি হতে পারবে।

তিনি। বড় বড় ছালার মধ্যে হাড়ি বাসন রুটি বেলবার বেলন, ভাঙা একটা বেতের বাক্স, আধমণ পেঁয়াজ ভরে চলেছেন। তাঁর হাতের আর কামাই নেই। বড় আপা সাহায্য করছে মা-কে। আর কারো দেখা নেই। না মেজ আপা, সালু আপা, ডালু আপা— কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আর ওরা সব ওদের বন্ধুদের কাছে গেছে। চলে যাচ্ছে কিনা! গলা ধরে ধরে গল্প করছে।

বাবা লেখাপড়া নিয়ে দুঃখ করেছিলেন। কিন্তু আনু ভেবেই পায় না দুঃখ করবার কী আছে ! খামকা তার মন খারাপ করে দিতে পারেন বাবা! কেন, পানু ভাই ঢাকায় পড়ছে। সে এবার ক্লাশ ফোরে পড়ছে। গত বছর সেকেণ্ড হয়েছিল না সে? মাস্টার মশাই বলছিলেন প্রাইজ দেবে আনুকে। তা এখান থেকে চলে গেলে, আর কে আসবে প্রাইজ নিতে? এতে যা একটু মন খারাপ হয় আনুর। আর বড় আপার তো পড়া শেষ হয়ে গেছে। তার বিয়ে হয়ে যাবে। বিয়ের জন্য বাবা কত চেষ্টা করছেন। হ্যাঁ, লেখাপড়া একেবারে করে না মেজ আপা। এত ফাজিল হয়েছে। খালি গল্প, গান আর পাড়া বেড়ানো। মাকে পর্যন্ত একটু কাজ করে দেয় না।

বাবা বলেন, আনু, হোল্ডলটার ওপর চেপে বসতো বাবু।

লাফিয়ে চড়ে বসে আনু। খুব করে জাততে থাকে। বাবা কষে টান লাগান চামড়ার স্ট্যাম্প ধরে। ঘামে তাঁর মুখটা ভিজে ওঠে। বলেন, ভেতরে কটা বালিশ দিয়েছিস, অ্যাঁ?

সেই মহিমপুরে আসা।

ভোর বেলায় গাড়িতে উঠেছিল। কারু সঙ্গে দেখা হয়নি আনুর। ছেলেদের বলে দিয়েছিল ইস্টিশানে আসিস ভাই। কিন্তু স্টেশনে এসে তাদের মনে পড়ে নি। স্টেশনে এলেই আনু যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়। সব কিছু ভুলে যায়। বুকের মধ্যে কেমন শিরশির দুপদুপ করতে থাকে। কোথাও যাবার জন্যে আনুর মনটা হুহু করে ওঠে। যেন এক মুহূর্ত বসে থাকা যাবে না, থাকলে পৃথিবীর কত কী যেন সে আর দেখতে পাবে না; যেন পৃথিবী কোথাও একটা বিরাট মজাদার মেলা খুলে তাকে ডাকছে।

ধড়মড় করে উঠে বসলো আনু। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে গাড়িটা থেমে আছে। একটা ইস্টিশান। ভোরের আবছা আলোয় কেমন বৃষ্টি ধোয়া মনে হচ্ছে। দূরে একফালি ঘন বনের মাথায় জমেছে মিহি কুয়াশা। প্ল্যাটফরমে পোড়া কয়লা দেখাচ্ছে ভিজে ভিজে।

ওঠ, ওঠ, মহিমপুর এসে গেছে দ্যাখ।

বাবা তাকে একটানে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দেন। তারপর গলা বাড়িয়ে চিৎকার করে কুলি ডাকেন। কিন্তু তার আগেই দু'জন সেপাই এসে দাঁড়ায়। সালাম করে। আর একটু পরেই আসে আরেকজন। আনু তার পোশাক দেখে, মাথার টাক দেখে, গোঁফ দেখে, কেমন করে যেন বুঝতে পারে, এ হচ্ছে বড় জমাদার।

মেজ আপা আনুকে ডেকে ফিসফিস করে বলে, আমার আরেক জোড়া স্যাণ্ডেল কোন্ ট্রাঙ্কে আছে, জানিস ভাই?

আনু অবাক হয়ে তাকায়। বুঝতে পারে না। বলে, কেন?

দেখ না, এটার ফিতে ছিঁড়ে গেছে।

মা বুঝি শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি ঝামটা দিয়ে উঠলেন, এখন কে তোর স্যাণ্ডেল বার করবে?

বারে আমি যাবো কী করে?

খালি পায়ে যাবি। কে দেখতে আসছে তোকে?

কাঁদো কাঁদো হয়ে যায় যেন মেজ আপা।

বাবা নিচে নেমে গেছেন। সেখান থেকে দরোজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে কী বলতে এসেছিলেন, মার কথা শুনে বললেন, আহা, আবার কি হলো?

মা তাঁর জবাব না দিয়ে ঘোমটা টেনে দিলেন ভালো করে। এখন তাকে নামতে হবে। সবার আগে লাফ দিয়ে নামে আনু। সবাই যখন নেমে আসে আনু দেখে মেজ আপা সালু আপার স্যান্ডেল জোড়া পায়ে দিয়েছে। আর সালু আপার পা খালি।

একটা গরুর গাড়ি এসেছে। ওতে সব মালপত্র যাবে। আর এই টুকুন তো পথ। রেল লাইনের ধারে ধারে হেঁটে গেলে আধমাইলও নয়। হেঁটে যাবে সবাই। জমাদার সাহেব বললেন, নাকি স্যার, আরেকটা গাড়ি ডাকব? মেয়েরা রয়েছে।

না, না, তার দরকার হবে না। বরং দিব্যি একখানা মর্নিং ওয়াক হয়ে যাবে। কী বলিস?

বলতে বলতে সবার উপরে স্মিত মুখ ঘুরিয়ে আনলেন বাবা। তারপর জমাদার সাহেবকে বললেন, তাহলে আমি বরং এখানেই ফজরের নামাজটা পড়ে নেই।

ঠিক তখন বেজে উঠলো গার্ডের বাঁশি। হুস্ হুস্ করে চলতে শুরু করল ট্রেন। ঝকঝক করে আঁধারের মধ্যে গাড়িটা দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। প্ল্যাটফরমে পড়ে রইলো ছড়ানো বাক্স প্যাটরা, সুপুরির বস্তা, পোস্টাফিসের ব্যাগ, মাছের বাক্স। আনু একেবারে প্ল্যাটফরমের শেষ মাথা পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে গেল বড় আপার সঙ্গে।

আনুর সবচেয়ে ভালো লাগে বড় আপাকে। সারাক্ষণ যেন কী ভাবে বড় আপা, যেন কত দুঃখ ওর মুখটা একেবারে কালো আর এইটুকু করে রাখে। আনুকে কোনদিন বকে না, মারে না, আনুর জিনিস নিয়ে কাড়াকাড়ি করে না। সারাক্ষণ বড় আপার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করে আনুর। আনু যখন বড় হবে, যখন তার নিজের বিরাট বাড়ি হবে, যখন তার অনেক টাকা হবে তখন বড় আপাকে সে অনেক কিছু বানিয়ে দেবে, তার সঙ্গে রাখবে। কতদিন ক্লাশে যখন পড়া ভালো লাগেনি, তখন মনে পড়ে গেছে বড় আপার কথা। বসে বসে আনু তখন স্বপ্ন দেখেছে বড় আপাকে নিয়ে। দেখেছে, আনু বড় হয়ে গেছে। বড় আপার মুখখানা হাসিতে খুশিতে ফর্সা লাল দেখাচ্ছে। কোনো কিছুর অভাব নেই। সবাই ওদের দিকে দেখিয়ে বলছে– ওরা কত সুন্দর!

ফিরে এসে দেখে নামাজ শেষে মোনাজাত করছেন বাবা। ভোরের আলোয় তাঁর মুখ এত শান্ত দেখাচ্ছে যেন একটা ছবি দেখছে আনু। বাবা মোনাজাত শেষ করেই দেখতে পেলেন আনুকে। উঠে আনুর মাথায় মুখে সেই হাত দুটো মাখিয়ে দিয়ে বললেন, চল।

ওরা স্টেশন ঘরের ভেতর দিয়ে বেরুলো না। ট্রেনটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকের লাইন ধরে হাঁটতে লাগল সবাই। বাবা গল্প করতে লাগলেন জমাদার সাহেবের সঙ্গে। পেছনে মা বড় আপা মেজ আপা সালু আপা ডালু আপা। আর একেবারে শেষে আনু। আনু এর মধ্যে ভাব করে ফেলেছে সেপাইয়ের সঙ্গে। একজন গেছে মালের সঙ্গে গরুর গাড়িতে। আরেকজন তাদের পেছনে চলেছে। আনু জিগ্যেস করে গম্ভীর গলায়, হাঁ সেপাই, তুমি এই থানায় কাজ করো?

জি খোকা বাব।

কী নাম তোমার?
ইয়াসিন আছে।
তুমি বেহারি?
ভ্রু কুঁচকে আনু জিগ্যেস করে। কিন্তু ভারী মজা লাগে তার কথা বলবার ঢং। আর কী মোটা গোঁফ, দুটো আমপাতার মতো বড় বড়। ইয়াসিন হেসে ফেলে। আবার তেমন জোরে হাসে না, সামনে হুজুর যাচ্ছেন যে! গলা নামিয়ে বলে, হাঁ বেহারি তো আছি খোকাবাবু। ফিন বেহারি নাই। এখন বাঙ্গালি আছি আমি। এহি হামার মুলুক আছে।
তুমি ছাতু খাও?
ও ভি খাই তো। এখন তো মাছ খায় খোকাবাবু। আমি একরোজ পকায়ে দিব, আপনি খাবেন, মা ভি খাবেন, বোলবেন কী রকম কে কভি খায় নাই। হাঁ।
শুনে ডালু আপা খিলখিল করে হেসে উঠে। মার আঁচল টেনে বলে, মা দ্যাখো আনু সেপাইটার রান্না খাবে।
ওর তো খালি ঐ সব।
চলতে চলতে মা তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করেন। আনু তখন খুব গম্ভীর হয়ে চলতে থাকে। পথ থেকে একটা কঞ্চি কুড়িয়ে নেয়। সেটা দিয়ে ভোরের শিশিরে ভিজে থাকা লজ্জাবতীর দল ছোঁয়। কেমন আস্তে বুঁজে আসে ওরা। আনু পিছিয়ে পড়ে সবার থেকে।
রেল লাইনের পাশে এত লজ্জাবতী যে বিস্ময়ে আনু সব কিছু ভুলে যায়। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে। একটাকে বোঁজায়, আবার আরেকটা অমনি রেখে দেয়। আর থানকুনি গাছ কত! পয়সার মতো গোল গোল পাতাগুলো থিরথির করে কাঁপছে ভোরের বাতাসে। এত থানকুনি গাছও একসঙ্গে আগে আর দেখেনি আনু। এখন ভাবনা কী? মা যদি ফোঁড়ার ওষুধ করতে চান তো আনু একদৌড়ে এক কোচড় থানকুনি এনে দিতে পারবে।
আনু, ও আনু।
বাবা সামনে থেকে ডাক দেন। অনেক পিছিয়ে পড়েছে সে। আনু দৌড়ে এসে বাবার হাত ধরে। বলে, কী বাবা?
জমাদার সাহেব বলেন, এই বুঝি আপনার ছোট ছেলে?
হ্যাঁ। ক্লাশ ফোরে পড়ছে। ভেরি শার্প অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্ট।
আনু বুঝতে পারে তার প্রশংসা করছেন বাবা। সে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। জমাদার সাহেব অকারণে নিঃশব্দে হাসতে থাকেন। বাবা বলেন, আর আমার ছোট মেয়ে মিনু, সে সঙ্গে নেই। ওদের মামা এসেছিল নিয়ে গেছে।
হাঁটতে হাঁটতে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের কাছে এসে পড়েছে ওরা। সিগন্যালের পাশ দিয়ে ডানে রাস্তা নেবে গেছে। সেই রাস্তা ধরলো ওরা। রাস্তার দু'পাশে পাতলা বাঁশ-বন। একটুখানি হাঁটতেই বড় রাস্তা এসে গেল। বড় রাস্তার ওপরেই থানা।
হালকা লাল রং। আবার ছাদের কাছে শাড়ির পাড়ের মতো নীল রেখা। তাইতে খেলনা বাড়ির মতো দেখাচ্ছে। সামনে শান বাঁধানো বিরাট বারান্দা। বারান্দার নিচে মাঠ। থানার বামে কোয়ার্টারগুলো। ওরা এসে দেখল গরুর গাড়িটা তখনো এসে পৌছয়নি।
থানা থেকে ছোট দারোগা সাহেব বেরিয়ে এলেন। এসে বাবাকে আদাব করলেন। তারপর সবাইকে নিয়ে গেলেন নিজের বাসায়।

আমার এখানেই ছেলেমেয়েরা নাশ্‌তা করে নিক স্যার। একটু আরাম করুক।

বাবা তার সঙ্গে চলে গেলেন থানা দেখতে।

কোনো নতুন বাড়ির ভেতরে এলে আনু একেবারে চুপসে যায়। দারোগার বৌ সবাইকে বসতে দিলেন ঘরে। আনু চুপ করে এককোণে মায়ের পাশে চোখ নামিয়ে বসে রইলো। মা বললেন, মেয়েরা হাতমুখ ধোবে ভাই।

যাক না, কুয়োতলায় পানি তোলাই আছে। যাও তোমরা।

ছোট দারোগার বৌ আঙ্গুল তুলে পথ দেখিয়ে দিলেন। মা বললেন, আনু, যা না সঙ্গে।

আনু যেন বেঁচে গেল। একলাফে বাইরে এসে দাঁড়ালো সে। তার পরে এলো বড় আপা ওরা।

কুয়োতলায় উবু হয়ে বসে দাঁত মাজতে মাজতে মেজ আপা হিহি করে হাসতে হাসতে সেজ আপাকে বলল, ছোট দারোগার বৌ এত গয়না পরেছে কেন রে?

সেজ আপা গলা নিচু করে বলে, তবু আনু শুনতে পায়।

ঠিক বেশ্যাদের মতো দেখতে। ম্যাগো!

বড় আপা ঘুরে তাকাতেই চুপ হয়ে যায় ওরা। বড় আপা এবার আনুকে দেখেন। আনু জানে, ওটা খারাপ কথা, শুনতে নেই। সে যেন আদৌ শোনেনি এ রকম মুখ করে একটা ডাল দিয়ে কষে দাঁতন করে চলে। কানে তার আবার ভেসে আসে মেজ আপার হি-হি। কি যে, খালি হাসতে পারে মেয়েটা! যখন ছোট দারোগার বৌ আসেন তাদের নাশ্‌তার জন্যে ডাকতে, সবাই পেটে হাসি চেপে মুখ কাঠ করে রাখে।

তা গয়না গায়ে একটু তার বেশিই। বোধ হয় ওদের অনেক টাকা, মনে মনে ভাবল আনু। তার বাবার মতো যে সবাই নয়, এটা অনেক দিন আগেই সে বুঝেছে। কিন্তু তার জন্যে একটুও রাগ হয় না বাবার ওপর, বরং কেমন মায়া করে। মনে হয়, সে যখন অনেক বড় হবে, অনেক টাকা রোজগার করবে, তখন বাবাকে এনে দেবে। বাবা সবাইকে গয়না বানিয়ে দেবেন, গাড়ি কিনবে আনু, আর নতুন জুতো। ট্রেনে করে কত দূরে দূরে যাবে আনু। জংশনে গিয়ে ছবি দেখে আসবে। একবার পানু ভাইয়ের সঙ্গে ছবি দেখতে গিয়েছিল সে। তার মতো একটা ছোট ছেলে ছিল ছবিতে। কী চমৎকার ঘোড়ার পিঠে চড়ে সে কাঁহা কাঁহা যাচ্ছিল!

নাশ্‌তা শেষে বাবা এসে নিয়ে গেলেন ওদের কোয়ার্টারে। গেটের সামনে গরুর গাড়ি উপুড় হয়ে আছে ল্যাজ তুলে। গরু দুটো ঘাস খাচ্ছে। আর সেপাইরা ট্রাঙ্ক বিছানা বাক্স টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভেতরে।

বাড়ির গন্ধটা ভারী পছন্দ হয় আনুর। ভেতরে ঢুকতেই মনটা ভুরভুর করে ওঠে তার। একটা নিম গাছ বড় হয়ে উঠেছে রান্না ঘরের পেছনে, আর বাড়িতে ঢুকবার মুখেই লেবুগাছ। গন্ধটা বুঝি লেবু পাতার। আনু নাক তুলে ঠাহর করবার চেষ্টা করে। বাবা বলেন, আনু শীগগির যা ভেতরে। তোর জায়গা পছন্দ করে নে। নইলে ওরা সব ভালো জায়গা নিয়ে নেবে দেখিস।

আরে তাই তো! বাবা হাসতে হাসতে ওকে নিয়ে আসেন ভেতরে। হাঁক পেড়ে বলেন, কিরে ডালুসালু তোরা আনুকে কোথায় জায়গা দিলি? ও যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তখন কি একটা কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। আপারা এঘর ওঘর ছুটোছুটি করতে থাকে। সালু আপা একটা জানালার শিক ধরে চেঁচিয়ে ওঠে নাচতে নাচতে।

আমি এইখানে থাকব। এখানে থাকব।

বাসাটা ছোট। একটা বড় ঘর, রান্নাঘর আর বাইরে ছোট্ট একটা ঘর— এই। উঠোনটা খুব বড়। রান্নাঘরের সামনে আগে যারা ছিল তারা গাঁদা ফুল লাগিয়েছিল। কদিনের অযত্নে মলিন হয়ে গেছে। টুকরো কাগজ, ন্যাকড়া, দেশলাইয়ের কাঠিতে গাছের তলা নোংরা হয়ে আছে। জালি বেড়ায় ভাংগন ধরেছে এর মধ্যেই। লেবুগাছটায় লেবু নেই একটাও। পাড়ার বখাটে ছেলেরা হয়ত পেড়ে নিয়ে গেছে। মিষ্টি একটা ঘ্রাণ শুধু পাতা থেকে পাওয়া যাচ্ছে– ভেতরে ঢুকেই আনু যা প্রথমে টের পেয়েছিল।

গাছপালার ঘ্রাণ ওর ভারী ভালো লাগে। এর আগে যেখানে ছিল, জায়গাটা এত শুকনো আর বালু বালু যেখানে কোন গাছ হতে চায় না। আর যে দু'একটা গাছ ছিল তাও এত নিরস আর ধুলো মলিন যে মনটা খারাপ হয়ে যায়। সারাদিন কেবল রোদ আর রোদের হলকা। সে হলকায় দশ হাত দূরের জিনিস সুম সুম করে কাঁপতে থাকে, যেন আয়নার মধ্যে একটা ছবি অবিরাম কাঁপছে। সে জায়গায় শুধু তরমুজ, ফুটি আর খরমুজ কাকুড় হতো। গাঁয়ের মানুষেরা একেক দিন এনে দিয়ে যেত এই এত এত। কচকচ করে চিবোতো সে লম্বা কাকুড়গুলো। তরমুজগুলো কুয়োর মধ্যে ফেলে রাখত ঠাণ্ডা হবে বলে। ঠাণ্ডা হলে দুপুর বেলায় বালতি দিয়ে তুলে এনে কাটা হতো।

বড় ঘরটার একদিকে বেড়ার পার্টিশন। ওপাশে ছোট্ট জায়গাটায় চৌকি পড়ল বাবার জন্যে আর আনুর জন্যে। আর এ পাশে থাকবে মা আর আপারা।

আনু তার ছোট্ট সুটকেশটা খুলে ফেলেছে। বইগুলো বার করে খবর কাগজ বিছিয়ে সাজিয়ে ফেলল টেবিলে। একটা বড় পোস্টার ছিল– তাতে 'অধিক খাদ্য ফলান' লেখা, আর একদিকে ধান ভর্তি মাঠ, মাঠের পাশে গোলাঘর আর এক চাষী তার বৌ আর ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকা— সারা ছবি চকচকে হলুদ রং-এ ভারী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। সেই পোস্টারটা খুলে বেড়ার পার্টিশনের গায়ে লাগালো আনু। শুলে পর ঠিক তার চোখের সামনে থাকবে। এই ছবিটা এত ভালো লাগে তার! চাষীর বৌ আর ছেলেমেয়েদের সাদা হাসিগুলো দেখতে দেখতে তার মনটাও খুশি হয়ে ওঠে, যখনই সে তাকায়। লাগিয়ে, চৌকির ওপর বসে, ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলো আনু।

বড় আপা কী বলতে এসেছিলেন, হঠাৎ থেমে, খুশি হয়ে উঠলেন।

বাহ্, তুই সব সাজিয়ে ফেলেছিস আনু!

## ।।২।।

সকাল বেলা উঠেই আজ গোসল করে নিয়েছে আনু। আজ তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবেন বাবা! বাবা ভোরে উঠেই থানায় গেছেন, মফস্বল থেকে নাকি খুনের আসামি ধরে এনেছে সেপাইরা, সেই কাজে। বলে গেছেন, দশটার সময় এসে আনুকে নিয়ে যাবেন, সে যেন তৈরি থাকে।

আনুর খুব খুশি লাগছে। এখানে এসে অবধি একটা বন্ধুও তার হয়নি। ছোট দারোগার কোনো ছেলেপুলে নেই; আর জমাদার সাহেব তার বৌ ছেলেমেয়েকে আগেই দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বড় একা দিন কাটছিল আনুর— পড়ার জন্যে যতটা নয়, তারচেয়ে বেশি বন্ধু

পাবার লোভে স্কুলে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সে।

ভোরে গোসল করে উঠেই মাকে বারবার তাগাদা দিচ্ছে ভাতের জন্যে।

মা, শীগগীর ভাত দাও। দশটা বেজে গেছে।

কোথায় তোর দশটা?

মা বিরক্ত হয়ে ডালের পাতিলে ঘুটনি ঘোরাতে ঘোরাতে বলেন।

হ্যাঁ, তুমি জানো? কত দেরি হয়ে গেল!

আনু অভিমান করে রান্নাঘরের দরোজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। বড় আপা তরকারি কুটছিলেন। তিনি মুখ তুলে বলেন, এখন তো মোটে সাড়ে আটটা রে! ইস্কুলে যাবার এত সখ!

বলে হাসেন আর ঘ্যাসঘ্যাস করে তরকারি কোটেন। আনু যে কেন অস্থির হয়েছে স্কুলে যাবার জন্যে, সেইটে কাউকে বলা যাবে না। সেইটে লুকোবার জন্যে খুব মেজাজ করে আনু। বলে, তোমার মতো নাকি। খালি বাড়িতে বসে থাকব? লেখাপড়া করতে হবে না?

এবার হেসে ফেলেন মা। মেয়েকে বলেন, আনুর আজকাল খুব মন হয়েছে লেখাপড়ায়।

হবে না? বড় আপা আবার হাসেন। জানো মা, আনু আমাকে বলেছে ও নাকি রেলের গার্ড হবে। তাই বোধ হয় এত ধুম পড়ার।

বলেছে তোমাকে। না মা মিথ্যে কথা। আমি বলিনি।

বলেই দৌড়ে পালিয়ে যায় আনু। রাগ হয় তার বড় আপার ওপর। কী যে, সব কথা মাকে বলতে হয় নাকি? এই জন্যে সে রাতে চুপচুপ করে তাকে বলেছে? আর স্কুলে যাবার জন্যে যদি তাড়া করেই থাকে, তাতে এত হাসবার কী আছে?

এইজন্যে একেক সময় দেখতে ইচ্ছে করে না বড় আপাকে। বেশ, আমি গার্ড হবো তাতে ওর কি? গার্ডের চাকরি সবাইকে দেয় বুঝি রেলের লোক? গার্ড হতে হলে কত বুদ্ধি, আর লেখাপড়া লাগে তার কী জানে বড় আপা?

সত্যি, মন্দ হয় না গার্ড হলে। কত দেশ ঘোরা যেত। আর কী সুন্দর চাকরি। বাবার মতো থানায় গিয়ে চোর-ডাকাতকে হাতকড়া লাগানো নয়, সাইকেল নিয়ে মফস্বলে যাওয়া নয়, ও-রকম বিশ্রী ঘরে কাগজপত্রে উপুড় হয়ে পড়ে লেখা নয়!— গার্ডের চাকরি কত মজার! হাতে লাল আর সবুজ নিশান, মুখে বাঁশি, সাদা ধবধবে প্যান্ট, কোট, পেতলের বোতাম লাগানো, পকেটে ঢাকনা, মাথায় চকচকে বারান্দাওয়ালা টুপি। ফুরুর্‌র্ করে বাঁশিতে ফুঁ না দিলে ড্রাইভারের কোন ক্ষমতাই নেই গাড়ি চালায়– তার কাছে ইঞ্জিন থাকলে কী হবে! সারাদিন তাকে ইস্টিশানে ঠায় বসিয়ে রাখতে পারে গার্ড। আবার চলতে চলতে যদি লাল নিশান দেখায় তো থামাতে হবে গাড়ি। গার্ডের চাকরি কী সোজা! বড় আপা খালি হাসতেই পারে। গার্ড হয়ে তাক লাগিয়ে দেবে যেদিন আনু, সেদিন বুঝতে পারবে। বড় আপা, মেজ আপা, সালু আপা, মিনু আপা, ছোটআপা, মা, বাবা, পানু ভাই সবার সামনে আনু গম্ভীর হয়ে বাঁশি বাজিয়ে নিশান দেখিয়ে চলন্ত গাড়িতে লাফিয়ে উঠবে। ওরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। আনু তাদের দেখবেই না। আনুর কত কাজ। আনু তখন শেষবারের মতো নিশানটা দুলিয়ে ভেতরে গিয়ে খাতা খুলে বসবে। আনু দেখেছে গার্ডেরা খাতা খুলে লেখে গাড়ির মধ্যে।

হঠাৎ মন খারাপ হয়ে যায় আনুর। তার বড় হতে এখনো কত দেরি। গার্ড হতে তার দশ বিশ বছর লেগে যাবে। ততদিন তো আর কিছু করার উপায় নেই। ততদিন চুপ করেই

থাকতে হবে আর সহ্য করতে হবে ওদের ঠাট্টা, হাসি।

পানু ভাই যদি গার্ড হতো, তাহলেও বেশ হতো। তাহলে আনু পানু ভাইর সঙ্গেই ঘুরে বেড়াতে পারতো। গার্ড না হোক, অন্তত গার্ডের ভাই বলে বাহাদুরি নিতে পারতো। আনু শুনেছে পানু ভাই নাকি আর লেখাপড়া করবে না, চাকুরি খুঁজছে। এবার আনু ঢাকায় পানু ভাইকে চিঠি লিখে দেবে— ভাইয়া, তুমি গার্ডের চাকরি নিও।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আনু রাস্তায় দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে থেকে মানুষ দেখে। দেখে, গরুর গাড়ি ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর করতে করতে বাজারের দিকে চলেছে। আবার উল্টো দিকে ট্রেন ধরবার জন্যে উলিপুরের বাসটা বুর বুর করে ছুটে চলেছে স্টেশনের দিকে। তাহলে তো এখন ন'টা বাজে! নটার সময় রোজ উলিপুরের বাসটা তাদের বাসার সামনে দিয়ে যায়।

তাড়াতাড়ি বাসার ভেতরে আসে আনু। কিন্তু আর রান্নাঘরে গিয়ে মাকে তাগাদা করতে সাহস হয় না। কেমন লজ্জাও করে। অথচ তার ইচ্ছা করছে এখুনি সে ছুটে ইস্কুলে গিয়ে বসে।

নিজের ছোট্ট সুটকেশটা খুলে ধোয়া প্যান্ট আর নতুন জামাটা বার করে আনু। জামাটা গেল হপ্তায় কিনে দিয়েছিলেন বাবা। নীল সরু ডোরা কাটা, টেনিস কফ শার্ট। কলারে এখনো কাগজের লেবেল সুতো দিয়ে আটকানো। লেবেলটা ছিঁড়ে ফেলে আনু গায়ে দিল শার্টটা। কাপড়ের নতুন গন্ধ ভুরভুর করে বেরুচ্ছে। ভারী মিষ্টি লাগছে। আর ইস্ত্রী করায় এত মসৃণ লাগছে যে হাতের তেলো পিছলে যায়। প্যান্টটা খুলে দেখে একটা বোতাম ভাঙা। পাশের ঘরে সালু আপা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। রুমালের ফুল আঁকছিল। তাকে গিয়ে ধরলো আনু। দেনা আপা বোতামটা লাগিয়ে।

যা, পারবো না।

সালু আপা তার দিকে না তাকিয়েই ধমক দিয়ে ওঠে। আনু আবার অনুনয় করে, একটা মোটে। দিবি না?

যা, ভাগ, গোলমাল করিস না।

বারে, আজ আমি ইস্কুলে যাবো, তুই জানিস না?

তবু সালু আপা শোনে না। গুন গুন করে আপন মনে সে পেন্সিল দিয়ে রুমালে ফুলের নক্‌শা আঁকতে থাকে। আনু হঠাৎ তার হাত থেকে কাপড়টা টেনে ছুড়ে দেয় উঠোনে। বলে, দিবি না তো, দিবি না।

তার ডুকরে ওঠা কান্না শুনে বড় আপা ছুটে আসেন।

কিরে, কি হয়েছে?

সালু আপা আরো জোরে কেঁদে উঠলো তখন। যা মুখে এলো তাই মিথ্যে করে বলল, আনু আমার রুমাল ছিঁড়ে ফেলেছে, আমাকে মেরেছে।

আনু অবাক হয়ে গেল মিথ্যেটা শুনে। প্রতিবাদ করবার মতো বুদ্ধিও তার মাথায় জোগাল না। সে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো বোতাম-ভাঙা প্যান্টটা হাতে নিয়ে। বড় আপা একবার তাকে দেখলেন, একবার সালুকে দেখলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ছিঃ সালু, আনু আজ ইস্কুলে যাবে। এখন কাঁদাকাটি করতে নেই।

আনু তখন সাহস পেয়ে বলল, আমার বোতামটা লাগিয়ে দিতে বলেছি—

দে আমাকে, আমি দিচ্ছি।

বড় আপা আলমারি থেকে কৌটো বার করে তক্ষুণি সুঁচে সুতো পরাতে লাগলেন। লাগিয়ে দিলেন নতুন একটা বোতাম। বোতাম লাগানো শেষ হলে দাঁত দিয়ে সুতো কাটতে কাটতে বললেন, যা আনু, ভাত খেয়ে নে। ভাত হয়ে গেছে।

মা আজ ফেনা-ফেনা ভাত রেঁধেছেন। আনুর জন্যে বার করেছেন ফুল তোলা কাচের প্লেট। আনুর আজ খাতির আলাদা। আজ সে স্কুলে যাবে ভর্তি হতে। প্লেটে ভাত বেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভাতের মিষ্টি গন্ধে আর ধোঁয়ায় ভরে গেল আনুর মুখ। বড় আপা চামচে করে ঘি এনে ছড়িয়ে দিলেন ভাতের ওপর। মা শিল-আলুর ভর্তা করেছেন, এক দলা পাতে দিলেন তার। গরমে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। মা এক হাতে আঁচল দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। আনু ফুঁ দিয়ে দিয়ে মাখাতে লাগল। ভাতের সঙ্গে আলু। এক গ্রাস মুখে তুলল। মধুর মতো লাগল। বড আপা বললেন, আস্তে খা আনু, এখনো দেরি আছে। পেট ভরে খাবি।

দূর।

আনু আস্তে বলে। খেতে বসে দেখে তার বিশেষ খিদে নেই। আর গলাব কাছে কেমন সব আটকে যাচ্ছে।

পেট ভরে না খেলে দেখবি হেড মাস্টারের সামনে গিয়ে সব হজম হয়ে গেছে ভয়ে।

যাঃ। আমার ভয় করে না।

পড়া ধরবে যে। পারবি?

ধরুক না। যা ইচ্ছা ধরুক, আমি সব উত্তর দিয়ে দেব।

মা খুশি হয়ে একবার আনুর দিকে একবার মেয়ের দিকে তাকান। বলেন, না। আনু পড়ায় কত ভালো।

বড় আপা পাবদা মাছের ঝোল বেড়ে দিলেন কাঁসার বাটিতে। নিজের হাতে তুলে দিলেন আনুর পাতে। কুচি কুচি করে কাটা পেঁয়াজ দিয়ে রাঁধা। সোনার মতো হলুদ রং হয়েছে। ঝাল ঝাল গন্ধ বেরুচ্ছে। জিভে পানি এসে যাচ্ছে। আনু ঢকঢক করে এক গ্লাশ পানি খেল। এমন সময় বাইরে বাবার গলা শোনা গেল।

আনু, ও আনু।

বড় আপা তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে বললেন, খেতে বসেছে বাবা।

তাড়াতাড়ি করতে বল। ওকে ইস্কুলে দিয়ে আমি আবার মফস্বলে যাবো।

বাবার গলা শুনে আনুর যেন আর এক মুঠো ভাতও গলা দিয়ে নামতে চায় না। বুকটা ধুকধুক করে ওঠে। কি এক অজানা আশঙ্কায় অস্থির লাগে। মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। মা প্রায় চিৎকার করে ওঠেন, ও কি, তোর খাওয়া হয়ে গেল?

আর খাবো না।

বলতে বলতে হাত ধুয়ে উঠে পড়ে আনু। উঠোনে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন, সাইকেলটা বের করে নিয়েছেন।

আনু এক দৌড়ে ঘরের ভেতর গিয়ে মুখ মোছে, খাতা আর ইংরেজি বাংলা বই নেয়, চট

করে একবার আয়নায় মুখ দেখে, তারপর বেরিয়ে আসে। বাবা বলেন, বাহ, জামাটা আনুর গায়ে খুব মানিয়েছে তো ? ভাত খেয়েছিস ?

হ্যাঁ

মাকে সালাম করলি না ?

আনুর লজ্জা লাগে তখন। ধুৎ সে পারবে না। স্কুলে ভর্তি হতে গেলেই বুঝি মাকে সালাম করতে হবে! মহাসংকটে পড়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আওয়াজ শুনে মিনু আপাও এসে দাঁড়িয়েছেন বারান্দায়, সে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

লজ্জা থেকে মা আনুকে বাঁচিয়ে দেন। ঘোমটা টেনে কাছে এসে আনুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, ভালো করে লেখাপড়া করিস। কারো সঙ্গে মারামারি করবি না, কেমন?

আনু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বাবার পেছনে বেরিয়ে আসে। সাইকেলের সামনে উঠে বসে এক লাফে। বাবা সাইকেল চালাতে থাকেন। আনু একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে দরোজা ধরে মা বড় আপা মিনু আপা দাঁড়িয়ে আছেন।

দু'টো টানা লম্বা ঘর— ব্যাস, এই হচ্ছে ইস্কুল। সামনে সবুজ ঘাসে ভরা বিরাট মাঠ, তার দুদিকে দুটো গোল পোস্ট রোদে বৃষ্টিতে ভিজে পুড়ে কেমন কালো আর এবড়ো-থেবড়ো হয়ে গেছে? স্কুল ঘরের মাথার ওপর জামরুল আমলকি আর লিচু গাছের বড় বড় ডালগুলো নেমে এসেছে রাশি রাশি পাতা-পত্তর নিয়ে। ছাদ একেবারে ছেয়ে গেছে, টিনগুলোয় সবুজ স্যাঁতলা পরে গেছে। আনু হ্যাঁ করে তাকিয়ে দেখে— এই স্কুল! ক্লাশ বসে গেছে, বড় বড় জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছেলেদের সার সার মাথা। কেউ নিচু হয়ে বই দেখছে, লিখছে, কেউ সামনে তাকিয়ে আছে, আবার কেউ ফিসফিস করে কথা বলছে লুকিয়ে। সবাই ক্লাশে, তাই খাঁখাঁ করছে যেন ইস্কুলের মাঠ, রাস্তা, বারান্দা। মাঠের মাঝখানে বাবা নেমে পড়লেন সাইকেল থেকে। আনুও নামলো। বাবা বললেন, অঙ্ক সব ভালো করে মনে করে এসেছিস তো ?

আনুর বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করে ওঠে। ঘাড় কাৎ করে জানায়– হ্যাঁ। বাবা সাইকেলটা বারান্দায় ঠেস দিয়ে রাখেন।

বাবা আগে ঢোকেন হেড মাস্টারের কামরায়। আনু মাথা নিচু করে তাঁর পেছনে পেছনে আসে। দরোজার ভেতরে পা দিয়েই এক হাত তুলে সালাম করে সে ভীত-চোখ তুলে, তারপর কাঠের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

মাথায় টাক, গাল থোবড়ানো, জ্বলজ্বলে এক জোড়া চোখ আর গায়ে গেরুয়া রংয়ের চাপকান এ ছাড়া হেড মাস্টারের আর কিছুই চোখে পড়েনি আনুর। দেখেই কেমন ভয় করে। মনে হয়, এখুনি বুঝি ধমক লাগাবেন। কেমন গম্ভীর আর রেগে টং হয়ে আছেন যেন।

বাবা হেড মাস্টারকে কি বলতে লাগলেন তার একবর্ণ কানে গেল না আনুর। তার কান গরম হয়ে উঠেছে, ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছে, পা কাঁপছে, প্রস্রাব পাচ্ছে খুব। এখন যদি এক দৌড়ে সে বাসায় চলে যেতে পারত আপাদের কাছে তাহলে যা মজা হতো।

আনু ভয়ে ভয়ে আবার চোখ তোলে। দেয়ালে পৃথিবীর ম্যাপ ঝোলানো। আলমারিতে খাতাপত্র বই সার সার সাজানো।— ময়লা কাচের ভেতর দিয়েও দেখা যাচ্ছে। আলমারির দুটো কাচ ভাঙা সেখানে পিচবোর্ড কেটে লাগিয়ে দেওয়া। একদিকে একটা লম্বা টেবিলের চারদিকে

কয়েকটা হাতাওলা চেয়ার। টেবিলের ওপর চক ন্যাকড়া আর একগোছা বেত রাখা। আমলকির ডাল ভেঙে একটা বেত করা হয়েছে। লিকলিক করছে। ইস্, এইটে দিয়ে মারে নাকি! যা লাগবে!

হেড মাস্টারের ভারী গলার আওয়াজ শুনে চমকেই উঠেছিল আনু।

কাম হিয়ার, মাই বয়।

এক পা এক পা করে কাছে এসে টেবিল ঘেঁষে দাঁড়াল আনু। এক পলক তাকিয়ে দেখল বাবা হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন তার দিকে! আনু ঘামতে লাগল, ইংরেজিতে পড়া ধরবে নাকি? হেড মাস্টার আস্তে আস্তে থেমে থেমে জিগ্যেস করলেন, হোয়াট ইজ ইওর নেম?

মাই নেম ইজ আনোয়ার হোসেন।

হোয়াট ইজ ইওর ফাদারস্ নেম?

মাই ফাদারস নেম ইজ মৌলবি গোলাম হোসেন।

ভেরি গুড।

আনুর ভেতরটা যেন হঠাৎ হালকা হয়ে গেল। না, সে একটিও ভুল করেনি। বাবা বললেন, ওকে আমি নিজে পড়াই দু'বেলা। হঠাৎ ট্রান্সফার হয়ে আসতে হলো। এখন ভর্তি না হলে স্কুলে যাবার অভ্যেসটাই ছুটে যাবে। ওখানে ফোরে পড়ত। এখানে ফোরেই অ্যাডমিশন নিক— বইপত্র হয়ত মিলবে না, কিন্তু একটা বছর নষ্ট হয়ে যায় তাহলে।

হেড মাস্টার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, একমণ চালের দাম ৩৫ টাকা হলে আট সেরের দাম কত?

আনু বিড়বিড় করে হিসেব করতে লাগল মনে মনে। কি যেন আর্যাটা ছিল, কিছুতেই এখন মনে পড়তে চাইছে না তার। ঠকঠক করে পা কাঁপতে লাগল, পিপাসা পেল, তবু মনে হলো না। মাথা নিচু করে সে দাঁড়িয়ে রইলো। বাবার দিকে একবার তাকালো। বাবা তার দিকে তাকিয়ে আছেন। পারল না সে।

হেডমাস্টার আবাব জিজ্ঞেস করলেন, একমণ চালের দাম ৩৫ টাকা হলে আট সেরের দাম কত হয়?

পা দিয়ে মেঝে খুঁটতে লাগল আনু।

বাবা হেসে বললেন,

অঙ্কে ও বরাবরই একটু কাঁচা। কিরে আনু? ৩৫ টাকা মণ। এক সেরের দাম কত?

তাকে আট দিয়ে গুণ দিলেই বেরিয়ে আসবে।

এক সেবের দাম?

হ্যাঁ।

আচ্ছা থাক।

হেডমাস্টার বাঁচিয়ে দিলেন তাকে। বললেন, এই কবিতাটা পড় দেখি।

আনুকে একটা বই খুলে দিলেন। আনু অঙ্কের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে, অঙ্ক না পারার লজ্জা ঢাকবার জন্যে, খুব মন দিয়ে পড়তে লাগল জোরে জোরে—

ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।
ও সে স্বপ্ন দিয়ে গড়া সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি॥
চন্দ্র— সূর্য— গ্রহ— তারা
কোথায় উজল এমন ধারা
কোথায় এমন খেলে তড়িত এমন কালো মেঘে।
ও তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখির ডাকে জেগে॥
এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার
কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎ-ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে॥
থাক, থাক।

হেডমাস্টার হাত তুললেন। আনু তাকিয়ে দেখে বাবা খুব খুশি হয়েছেন। আনু অবাক হয়ে দেখে বাবার চোখে পানি এসে গিয়েছে। চকচক করছে। বড় দেখাচ্ছে তাঁর চোখের কালো তারা। আনু তখন বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে বইটা মুড়ে বুকের কাছে ধরে।

হেডমাস্টার জিগ্যেস করলেন, হরিৎ-ক্ষেত্র মানে কি?

হরিৎ-ক্ষেত্র?

আনু আবার অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। হরিৎ-ক্ষেত্র মানে তাহলে কি? হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় পরের লাইনে ধানের কথা আছে। সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, হরিৎ-ক্ষেত্র মানে ধানের ক্ষেত।

বাবার মুখের হাসিটা নিভে যায়। আনু বুঝতে পারে সে নিশ্চয়ই ভুল করেছে। পরক্ষণে বলে, আমি জানি না।

তুমি খানিকটা ঠিক বলেছ। হেডমাস্টার আশ্বাস দেন তাকে। হরিৎ মানে সবুজ শ্যাম। ধানের ক্ষেতও সবুজ। তবে হরিৎ-ক্ষেত্র মানে সবুজ মাঠ। যখনই নতুন শব্দ পাবে, দেখবে তার মানে জানো না, বাবাকে বা স্কুলে মাস্টার সাহেবকে জিগ্যেস কর। জিগ্যেস করে মানেটা বারবার মুখস্ত করে রাখবে। বুঝলে?

জি।

আর বানানটা খাতায় দশবার লিখে শিখে রাখবে।

আনু ঘাড় কাৎ করে সায় দেয়। হেডমাস্টার বইটা ফেরৎ নেন। বাবাকে বলেন, আচ্ছা। আপনার ছেলে এখন ফোরেই ক্লাশ করতে থাকুক। পরে দেখা যাবে কী হয়। এমনিতে বেশ স্মার্ট বলে মনে হচ্ছে।

আনু বুঝতে পারে তার প্রশংসা হচ্ছে। তার লজ্জা হয় অঙ্কটা তার পারা উচিত ছিল। এখন

হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় আর্যাটা। মনে পড়ে যায় পঁয়ত্রিশ টাকা মণ হলে এক সেরের দাম হয় চৌদ্দ আনা– আট সেরের দাম সাত টাকা। কিন্তু বলতে পারে না। ঘনঘন চারদিকে তাকায়। বলবে? না, থাক। ইস্, তখন মনেই পড়ছিল না। বাবা খামকাই বলেন, অঙ্কে কাঁচা। বাসায় গিয়ে বলবে বাবাকে, আট সেরের দাম সাত টাকা।

হঠাৎ হেডমাস্টার চিৎকার করে ডাক দেন, বিল্‌টু, বিল্‌টু।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্কুলের দারোয়ান এসে দাঁড়ায়!

একে ক্লাশ ফোরে নিয়ে বসিয়ে দাওগে।

বাবা পেছন থেকে বলেন, ছুটির পরে একা আসতে পারবি বাসায়? না ইয়াসিনকে পাঠিয়ে দেব?

আনু বলে, নাহ্।

বিল্‌টুর পেছনে ক্লাশের দিকে যেতে থাকে আনু।




টিফিন পিরিয়ডে একটা ছেলে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে চীনেবাদাম খাচ্ছিল। বাদাম দেখে জিভেয় পানি এসে যায় আনুর। সকালে স্কুলে আসবে বলে দু'আনা পয়সা আদায় করেছিল। ভাবলো, দু'পয়সার বাদাম কিনলে মন্দ হয় না।

উঠতে যাবে, তার আগেই ছেলেটা তাকে বলে, বাদাম খাবে?

বলেই একমুঠো বাদাম তুলে দেয় তাকে। আনুর লজ্জা করতে থাকে। সে তো নিজেই কিনতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার কোনো কথাই শোনে না ছেলেটা। তাকে বাদাম দিয়ে বলে, খাও না। আমার মেলা আছে।

অল্পক্ষণের মধ্যে ভাব হয়ে যায় তার সঙ্গে। বেশ নাম— পিন্টু। তার সঙ্গেই পড়ে। আনু জিগ্যেস করে, তোমার বাবা কি করে?

জুট মার্চেন্ট।

মানে?

বাবার বিরাট পাটগুদাম আছে। কত দূর দূর দেশে বাবা পাট পাঠায়। অস্ট্রেলিয়া, বিলাত, কলকাতা, ঢাকা। তিনটে চারটে মালগাড়ি ভর্তি।

আনুর খুব মজা লাগে। দূর দেশের কথা শুনে সারা গায়ে রোমাঞ্চ কাঁচা হয়ে ফুটে ওঠে। ঘন হয়ে বসে আনু। পিন্টুর হাতে হাত রেখে শুধোয়, তোমার বাবা যায় বিলাতে?

নাহ্।

তখন মনটা নিভে যায় আনুর।

কেন?

বাবা যাবে কেন? রেলগাড়িতে পাট নিয়ে যায়, সেখান থেকে জাহাজে করে চলে যায়। বাবার এখানে কত কাজ।

তবু খুশি হয় না আনু। পিন্টুর বাবা পাট পাঠায় আর নিজে যেতে পারে না? আনু যদি ও-

রকম হতো তাহলে নিজেই যেত জাহাজে চড়ে। চুপ করে বসে থাকে সে। বসে বসে ভাবতে থাকে। ছবির বইতে দেখেছিল সমুদ্রের জাহাজ, সেই জাহাজ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। হঠাৎ বলে, আবার জলদস্যুরা জাহাজ আক্রমণ করে, না পিন্টু?

পিন্টু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, দূর, ওসব খালি গল্পের বইয়ে লেখে। সায়েবরা কামান দিয়ে কবে সব জলদস্যুদের মেরে ফেলেছে।

স-ব মেরে ফেলেছে?

আনুর যে বিশ্বাসই হতে চায় না।

হ্যাঁ, সব। পিন্টু সবজান্তার মতো উত্তর দেয়। বাদামের খোসাগুলো কোল থেকে ঝেড়ে ফেলে। তারপর আচমকা বলে, তোমার চেহারাটা ঠিক মেয়েদের মতো।

যাহ্।

কান পর্যন্ত লাল হয়ে যায় আনুর। কি যে বলে পিন্টু! তার চেহারা মেয়েদের মতো কে বলেছে? আয়নায় সে বুঝি দেখে নি? পিন্টু ওর কাঁধে হাত রেখে বলে, তুমি আর আমি বন্ধু, কেমন?

আচ্ছা।

আর কারু বন্ধু হতে পারবে না কিন্তু।

আনু কিছু বলে না। তার কাঁধে ধাক্কা দেয় পিন্টু, কি?

আচ্ছা।

তোমার ক ভাই বোন?

আমরা দু'ভাই পাঁচ বোন। ভাই বোন সব আমার বড়।

পাঁ-চ বোন!

পিন্টু তার কথার প্রতিধ্বনি করে। বলে, বিয়ে হয় নি?

না।

তাহলে খুব মজা তোমার বোনের, না?

বলে ফ্যাচফ্যাচ করে হাসতে থাকে পিন্টু। হঠাৎ গা জ্বালা করে আনুর। পিন্টু আবার বলে, ভালোবাসে না তোমার বোনেরা? চিঠি লেখে না?

আনুর ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে পিন্টু।

দূর লজ্জা কি? আমার বোনের চিঠি কত নিয়ে যাই। মাসুদ ভাই আছে, বাবার গদিতে কাজ করে, আমাকে আট আনা করে পয়সা দেয়।

দিক্ গে।

বারে, মেয়েরা তো ঐ জন্যেই সাজে, গালে পাউডার মাখে, ফিতে বাঁধে। দূর বোকা!

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় আনু। তারপর কেউ কিছু ঠাহর করবার আগেই ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয় পিন্টুকে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে, শয়তান। অসভ্য।

মাটিতে পড়েই পিন্টু বোকা হয়ে যায়। একমুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আনুর দিকে। তারপর উঠে গা ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, যা, আজ কিছু বললাম না। এর শোধ নেবো দেখিস। তোর বোনেরা কত সাধু আমি খুব জানি।

অবাক হয়ে যায় আনু। এ একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা তার। কখনো কখনো দারোগার ছেলে বলে তাকে ছেলেরা খ্যাপাতো, তার সঙ্গে মিশতে বারণ করে দিত অনেকে, কিন্তু বোনের কথা তুলে এরকম বিচ্ছিরি কথা কেউ বলেনি। মহিমপুরে এসে অবধি স্কুলে ভর্তি হবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল সে, ভেবেছিল নতুন বন্ধু করবে, মনটা আনন্দে ভরে ছিল। এই নাকি এখানকার ছেলেরা!

আনুর কান্না পায় ভীষণ। সে ক্লাশে গিয়ে পেছনের বেঞ্চে চুপ করে বসে থাকে। সারাটা ক্লাশ খালি। টিফিনে গেছে সবাই। বুকের মধ্যে হু-হু করতে থাকে তার। আবার ভয় করতে থাকে, পিন্টু যদি তাকে হঠাৎ মার দেয়, লাল খাতায় যদি নাম উঠে যায় আনুর।

ঢং ঢং করে টিফিন শেষের ঘন্টা পড়ে। হুড়মুড় করে ছেলেরা ঢুকতে থাকে ক্লাশে। আনু নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসে। চোখ রাখে একেবারে সোজা ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে! কোনোদিকে তাকাবে না সে। আবছা দেখতে পায়, পিন্টু এসে সেকেণ্ড বেঞ্চে বসলো। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে আরো দু'জন ছেলে ঘুরে দেখলো আনুকে। আনু বইয়ের পাতায় চোখ নামালো তাড়াতাড়ি। ওরা কি বলাবলি করছে কে জানে। ভূগোলের স্যার এসে ঢুকলেন। সবাই উঠে দাঁড়াল।

ভূগোল পড়তে এত ভালো লাগে আনুর! সালু আপার ভূগোল বই নিয়ে সে পড়ে ফেলেছে। সেখানে আফ্রিকার কথা, এশিয়ার কথা, অগ্নিগিরির নাম কত কি আছে। এখানে খালি রংপুর জেলার ভূগোল। একটুও মজা লাগে না আনুর। পাশের ছেলের বইটা ভাগ করে দেখতে থাকে আনু।

স্যার একটা ছেলেকে বলেন এই তুমি। রিডিং পড়ো। আজ কোথা থেকে পড়াবার কথা ছিল?

খসখস করে সারা ক্লাশে পাতা উল্টানোর শব্দ ওঠে। আরেকটা ছেলে বলে, এখান থেকে স্যার। 'মহিমপুরের পাশ দিয়া ধরলা নদী প্রবাহিত হইয়াছে।'

হ্যাঁ পড়ো।

ছেলেটা দাঁড়িয়েই ছিল। সে তখন আবৃত্তির ঢং-এ গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে পড়তে থাকে।

'মহিমপুরের পাশ দিয়া ধরলা নদী প্রবাহিত হইতেছে। এঁ-এঁ-এঁ ধরলা নদী তিস্তা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এঁ-এঁ-এঁ-'

আনু পাশের ছেলেটার বইয়ে চোখ রেখে মনে মনে পড়ে যায়। পড়তে পড়তে এগিয়ে যায় অনেকদূর। হঠাৎ তার চোখে পড়ে এক জায়গায় লেখা রয়েছে, 'শীতকালে যখন বাতাস স্বচ্ছ থাকে তখন প্রত্যুষে ধরলা নদীর পাড় হইতে উত্তরে হিমালয় পর্বত ও পূর্বে গারো পাহাড় দেখা যায়। হিমালয় পর্বতের বিখ্যাত গিরিশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা মহিপুর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়।'

বইয়ের পাতায় নিবিড় হতে থাকে আনুর মন। কাঞ্চনজঙ্ঘা! এতদিন সে নামই শুনে এসেছে; এখান থেকে দেখা যায় নাকি কাঞ্চনজঙ্ঘা? মনে মনে হিসাব করে দেখে শীত আসতে এখনো দু'মাস বাকি। দু'মাস তাকে বুক বাঁধতে হবে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবার জন্যে। বাবাকে গিয়ে আজই এই খবরটা দেবে আনু।

পড়া একবর্ণ আর তার মাথায় যায় না। পাহাড় সে কখনো দেখেনি। পাহাড়ের কল্পনা তার

রকম হতো তাহলে নিজেই যেত জাহাজে চড়ে। চুপ করে বসে থাকে সে। বসে বসে ভাবতে থাকে। ছবির বইতে দেখেছিল সমুদ্রের জাহাজ, সেই জাহাজ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। হঠাৎ বলে, আবার জলদস্যুরা জাহাজ আক্রমণ করে, না পিন্টু?

পিন্টু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, দূর, ওসব খালি গল্পের বইয়ে লেখে। সায়েবরা কামান দিয়ে কবে সব জলদস্যুদের মেরে ফেলেছে।

স-ব মেরে ফেলেছে?

আনুর যে বিশ্বাসই হতে চায় না।

হ্যাঁ, সব। পিন্টু সবজান্তার মতো উত্তর দেয়। বাদামের খোসাগুলো কোল থেকে ঝেড়ে ফেলে। তারপর আচমকা বলে, তোমার চেহারাটা ঠিক মেয়েদের মতো।

যাহ্।

কান পর্যন্ত লাল হয়ে যায় আনুর। কি যে বলে পিন্টু! তার চেহারা মেয়েদের মতো কে বলেছে? আয়নায় সে বুঝি দেখে নি? পিন্টু ওর কাঁধে হাত রেখে বলে, তুমি আর আমি বন্ধু, কেমন?

আচ্ছা।

আর কারু বন্ধু হতে পারবে না কিন্তু।

আনু কিছু বলে না। তার কাঁধে ধাক্কা দেয় পিন্টু, কি?

আচ্ছা।

তোমার ক ভাই বোন?

আমরা দু'ভাই পাঁচ বোন। ভাই বোন সব আমার বড়।

পাঁ-চ বোন!

পিন্টু তার কথার প্রতিধ্বনি করে। বলে, বিয়ে হয় নি?

না।

তাহলে খুব মজা তোমার বোনের, না?

বলে ফ্যাচফ্যাচ করে হাসতে থাকে পিন্টু। হঠাৎ গা জ্বালা করে আনুর। পিন্টু আবার বলে, ভালোবাসে না তোমার বোনেরা? চিঠি লেখে না?

আনুর ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে পিন্টু।

দূর লজ্জা কি? আমার বোনের চিঠি কত নিয়ে যাই। মাসুদ ভাই আছে, বাবার গদিতে কাজ করে, আমাকে আট আনা করে পয়সা দেয়।

দিক্ গে।

বারে, মেয়েরা তো ঐ জন্যেই সাজে, গালে পাউডার মাখে, ফিতে বাঁধে। দূর বোকা!

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় আনু। তারপর কেউ কিছু ঠাহর করবার আগেই ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয় পিন্টুকে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে, শয়তান। অসভ্য।

মাটিতে পড়েই পিন্টু বোকা হয়ে যায়। একমুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আনুর দিকে। তারপর উঠে গা ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, যা, আজ কিছু বললাম না। এর শোধ নেবো দেখিস। তোর বোনেরা কত সাধু আমি খুব জানি।

অবাক হয়ে যায় আনু। এ একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা তার। কখনো কখনো দারোগার ছেলে বলে তাকে ছেলেরা খ্যাপাতো, তার সঙ্গে মিশতে বারণ করে দিত অনেকে, কিন্তু বোনের কথা তুলে এরকম বিচ্ছিরি কথা কেউ বলেনি। মহিমপুরে এসে অবধি স্কুলে ভর্তি হবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল সে, ভেবেছিল নতুন বন্ধু করবে, মনটা আনন্দে ভরে ছিল। এই নাকি এখানকার ছেলেরা!

আনুর কান্না পায় ভীষণ। সে ক্লাশে গিয়ে পেছনের বেঞ্চে চুপ করে বসে থাকে। সারাটা ক্লাশ খালি। টিফিনে গেছে সবাই। বুকের মধ্যে হু-হু করতে থাকে তার। আবার ভয় করতে থাকে, পিন্টু যদি তাকে হঠাৎ মার দেয়, লাল খাতায় যদি নাম উঠে যায় আনুর।

ঢং ঢং করে টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়ে। হুড়মুড় করে ছেলেরা ঢুকতে থাকে ক্লাশে। আনু নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসে। চোখ রাখে একেবারে সোজা ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে! কোনোদিকে তাকাবে না সে। আবছা দেখতে পায়, পিন্টু এসে সেকেণ্ড বেঞ্চে বসলো। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে আরো দু'জন ছেলে ঘুরে দেখলো আনুকে। আনু বইয়ের পাতায় চোখ নামালো তাড়াতাড়ি। ওরা কি বলাবলি করছে কে জানে। ভূগোলের স্যার এসে ঢুকলেন। সবাই উঠে দাঁড়াল।

ভূগোল পড়তে এত ভালো লাগে আনুর! সালু আপার ভূগোল বই নিয়ে সে পড়ে ফেলেছে। সেখানে আফ্রিকার কথা, এশিয়ার কথা, অগ্নিগিরির নাম কত কি আছে। এখানে খালি রংপুর জেলার ভূগোল। একটুও মজা লাগে না আনুর। পাশের ছেলের বইটা ভাগ করে দেখতে থাকে আনু।

স্যার একটা ছেলেকে বলেন, এই তুমি। রিডিং পড়ো। আজ কোথা থেকে পড়াবার কথা ছিল?

খসখস করে সারা ক্লাশে পাতা উল্টানোর শব্দ ওঠে। আরেকটা ছেলে বলে, এখান থেকে স্যার। 'মহিমপুরের পাশ দিয়া ধরলা নদী প্রবাহিত হইয়াছে।'

হ্যাঁ পড়ো।

ছেলেটা দাঁড়িয়েই ছিল। সে তখন আবৃত্তির ঢং-এ গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে পড়তে থাকে।

'মহিমপুরের পাশ দিয়া ধরলা নদী প্রবাহিত হইতেছে। এঁ-এঁ-এঁ ধরলা নদী তিস্তা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এঁ-এঁ-এঁ-'

আনু পাশের ছেলেটার বইয়ে চোখ রেখে মনে মনে পড়ে যায়। পড়তে পড়তে এগিয়ে যায় অনেকদূর। হঠাৎ তার চোখে পড়ে এক জায়গায় লেখা রয়েছে, 'শীতকালে যখন বাতাস স্বচ্ছ থাকে তখন প্রত্যুষে ধরলা নদীর পাড় হইতে উত্তরে হিমালয় পর্বত ও পূর্বে গারো পাহাড় দেখা যায়। হিমালয় পর্বতের বিখ্যাত গিরিশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা মহিপুর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়।' বইয়ের পাতায় নিবিড় হতে থাকে আনুর মন। কাঞ্চনজঙ্ঘা! এতদিন সে নামই শুনে এসেছে; এখান থেকে দেখা যায় নাকি কাঞ্চনজঙ্ঘা? মনে মনে হিসাব করে দেখে শীত আসতে এখনো দু'মাস বাকি। দু'মাস তাকে বুক বাঁধতে হবে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবার জন্যে। বাবাকে গিয়ে আজই এই খবরটা দেবে আনু।

পড়া একবর্ণ আর তার মাথায় যায় না। পাহাড় সে কখনো দেখেনি। পাহাড়ের কল্পনা তার

সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করে রাখে

এক সময়ে ভূগোলের ক্লাশ শেষ হয়ে যায়। তারপরে আসে স্বাস্থ্যের স্যার। স্বাস্থ্য পড়তে একেবারে ভালো লাগে না আনুর। তার হাই ওঠে। হাই তুলতে গিয়ে ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকায়। আর পাশের ছেলেটা তখন বলছিল, এখানে নাকি খুব শাস্তি দেয়। আনু নিজেও হেডমাস্টারের রুমে এক গোছা বেত দেখে এসেছে। সোজা হয়ে শিষ্ট চেহারা করে আনু বসে।

স্বাস্থ্যের স্যার দেখতে রোগা পাতলা, একেবারে একটা কাঠির মতো। মনে হয় বাতাসে হেলে পড়েছেন সামনে। দাঁতগুলো বড় বড় আর বিশ্রী ফাঁক মাঝে মাঝে। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। নাম শুনলো, সুরেন বাবু।

স্যার ক্লাশে ঢুকেই 'ঃ' করে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করলেন। তারপর চেয়ারে বসে দু'পা টেবিলে তুলে এপকেট ওপকেট হাতড়াতে লাগলেন। বেরুলো একটা নস্যির কৌটা আর নাকের ময়লা ভর্তি লালচে ভিজে জবজবে এক ফালি ন্যাকড়া। ফস্ করে নাকে নস্যি দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে নাক টিপে ধরে প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন সুরেন স্যার।

কাণ্ড দেখে প্রায় হেসেই ফেলেছিল আনু। পাশের ছেলেটা বলল, স্যার কিন্তু খুব রাগী। শুনে তাড়াতাড়ি মুখ শুকিয়ে ফেলল আনু। সুরেন স্যার হুংকার দিয়ে ডাকলেন, এইও। ইদিক আয়।

পয়লা বেঞ্চের পয়লা ছেলেটা ঠোঁট কান পর্যন্ত ফাঁক করে দাঁত দেখাল। চশমার ভেতর দিয়ে পিটপিট করে দেখলেন তিনি। তারপর বেত দুলিয়ে আবার হুকুম করলেন, জিহ্বা। আনুর আবার হাসি পাচ্ছিল 'জিউভা' উচ্চারণ শুনে, কিন্তু জোর সামলে নিয়েছে সে।

জিভ দেখে কোনো খুঁত পেলেন না স্যার। বললেন, যা। নেক্স্ট। পরের ছেলেটা উঠে গেল। আনু ফিসফিস করে জিগ্যেস করলো, সবার দাঁত জিভ দেখবে নাকি ভাই?

হ্যাঁ

রোজ দেখে?

না। প্রত্যেক বিষুৎবারে।

ভাগ্যিস আনু আজ নতুন স্কুলে আসবে বলে নিমডাল দিয়ে কষে দাঁতন করেছিল! জিভেটায় না জানি কত ময়লা পড়ে আছে। জিভ কোনদিন সাফ করেনি আনু। পানু ভাইকে দেখতো সে পিতলের একটা ছুলুনি দিয়ে এককে দিন সকালে ময়লা কেটে ফেলতে। আনুর পা কাঁপতে লাগল ভয়ে। পয়লা দিনই মার খাবে নাকি স্যারের হাতে।

এতক্ষণে সেই পিন্টুর পালা এসেছে।

দাঁত।

দাঁত বার করলো পিন্টু। সপাং করে বেত পড়ল তার পাছায়।

হারামজাদা, কচুবনে কচু খাও গিয়ে? মায়ে ভাত দেয় না? দাঁত এত হলদে কেন? কেন?

একবার করে 'কেন' বলেন আর একটা করে বেত লাগান সুরেন স্যার। সঙ্গে সঙ্গে তিড়তিড় করে ওঠে পিন্টু। আড়চোখে সে আনুকে দেখে। আনুর কেন যেন কষ্ট হয়। টিফিনে ঝগড়া হয়েছে, তবু। চট করে চোখ নামিয়ে নেয় সে। পিন্টুর আর জিভ দেখা হয় না। শেষ একটা

বেত লাগিয়ে সুরেন স্যার বলেন, গো ব্যাক। নেক্স্ট।

এক এক করে এক সময়ে আনুর ডাক পড়ে। সে মাথা নিচু করে গিয়ে দাঁড়ায়। কিছু বলবার আগেই দাঁত বার করে। সুরেন স্যার বেত দুলিয়ে বলেন, মুখ না তুললে কি পিঁড়ি পেতে তোমার দাঁত দেখব?

চট্ করে মুখ তোলে আনু। চোখটা আপনা থেকেই বুঁজে আসে তার। গম্ভীর একটা আওয়াজ শুনতে পায়, হুঁ। জিভ। বেত লাগাবার সুযোগ না পেয়ে মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে বুঝি স্যারের। জিভ দেখি।

দেখাল আনু।

হঠাৎ সুরেন স্যার চোখ পিটপিট করলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, এটা কে র‍্যা?

ক্লাশের মনিটর দাঁড়িয়ে বলল, নতুন ভর্তি হয়েছে স্যার।

তোমাকে জিগ্যেস করিনি স্যার। সিট ডাউন।

ম্যাজিকের মতো বসে পড়ল মনিটর ছেলেটা। আনুর পিলেও চমকে গিয়েছিল স্যারের 'সিট ডাউন' চিৎকার শুনে। দরদর করে ঘামতে লাগল সে।

নাম কী?

আনোয়ার হোসেন।

বাবা কী করে?

বড় দারোগা।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন সুরেন স্যার। দারোগার ছেলে, ঘোড়ার মত স্বাস্থ্য হবে এরকম লাউডগাটি হয়েছেন কেন? লেখাপড়ায় কেমন?

কী বলবে আনু। চোখ তুলে স্যারকে একবার দেখে আবার মাথা নিচু করে থাকে। সুরেন স্যার হঠাৎ জিগ্যেস করেন, আচ্ছা শুনি, বিশুদ্ধ জল কেমন?

বিশুদ্ধ জল? ঢোঁক গেলে আনু।

আজ্ঞে হাঁ। বলুন।

আনু ভারী অস্বস্তিবোধ করতে থাকে তাকে এই ঠাট্টা করে আপনি বলায়। কেন যেন রাগ হয় তার। উত্তরটা জানাই ছিল। চালাকি নাকি? চট করে সে জবাব দেয়, বিশুদ্ধ জলের কোনো বর্ণ নাই, স্বাদ নাই।

কিন্তু তাতেও খুশি হলেন না স্যার। এমনিতেই রোগা মানুষ, তার ওপর যখন দাঁত খিঁচোন মনে হয় দাঁত সর্বস্ব শরীর। আর সবচে মুশকিল ইল্‌শেগুঁড়ির মতো থুতু ছিটোতে থাকে। থুতু ছিটিয়ে স্যার বলেন, আর গন্ধ! বিশুদ্ধ জলে পচা ভাগাড়ের গন্ধ থাকবে বুঝি?

আনু তাড়াতাড়ি যোগ করে, গন্ধও নাই।

বেতের ইশারায় তাকে ফিরে যেতে বললেন স্যার। আবার হাঁক পাড়লেন, নেক্স্ট।

এমনি করে পিরিয়ড শেষ হলো। পাশের ছেলেটা বলল, এই স্যার কিছু পড়ায় না ভাই। খালি এই রকম করে।

সুরেন স্যার চলে যেতেই হি-হি করে হাসতে লাগল আনু। এতক্ষণের সব হাসি ফিনিক দিয়ে ছুটছে তার। উল্‌টো বুঝলো পিন্টু। সে পেছনে ঘুরে তাকিয়ে ঘোষণা করল, তোর পাছায়

যেদিন বেত লাগাবে স্যার আমিও দাঁত বার করে হাসবো। হ্যাঁ।

শেষ পিরিয়ড। ড্রয়িং স্যার এসে ঢুকলেন। ফর্সা চৌকো চেহারা। সরু করে ছাঁটা গোঁফ। ধবধবে সাদা শার্ট গায়ে। হাসি হাসি মুখ। আনুর খুব ভালো লাগল।

স্যার বসতে বললেন সবাইকে। তারপর বোর্ডে অনেকক্ষণ ধরে একটা বিরাট আমপাতা আঁকলেন– মাঝখানে ভাঁজ করা, পাতাটা দেখতে হয়েছে ইংরেজি ভি-এর মতো। সুন্দর হলো দেখতে, যেন সত্যি আমপাতা। একবারও মুছলেন না, ভুল হলো না– একটানে এঁকে ফেললেন। তাঁর হাতের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো আনু।

আঁকা শেষ হলে ছেলেদের তিনি বললেন, আমপাতা। চিনতে পারছো?

সমস্বরে সবাই বলে উঠল, হ্যাঁ।

এবার দেখে দেখে আঁকো। যার আগে হবে তার আগে ছুটি।

সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই খাতার পাতায়। স্যার চেয়ারে বসে একটা বই খুলে পড়তে লাগলেন।

দু'মিনিটে আঁকা হয়ে গেল আনুর। তখনো কারো হয়নি, তাই খাতাটা প্রথমে সে স্যারের কাছে নিয়ে যাবে, কেমন সংকোচ করল তার। সে চুপ করে বসে রইলো। তারপর দু'তিন জন যখন খাতা দেখিয়ে বাড়ি চলে গেল তখন আনু উঠে দাঁড়াল।

স্যার তার খাতা দেখেই মুখ উজ্জ্বল করে বললেন, বাহ্ তোমার আঁকবার হাত ভারী সুন্দর। নতুন ভর্তি হয়েছ?

প্রশংসা শুনে লাল হয়ে ওঠে আনু। স্যার কি জানবে, আনু আরো কত কি আঁকে। সালু আপা মিনু আপা সবাইকেও ফুল পাতা নক্সা কত কী এঁকে দেয় এম্ব্রয়ডারী করবার জন্যে। তার নক্সার ওপর ডি-এম-সি সুতো দিয়ে ওরা যখন নক্সাগুলো বিচিত্র বর্ণে ফুটিয়ে তোলে, এত চমৎকার লাগে দেখতে। মনেই হয় না তার নিজের আঁকা।

দশের মধ্যে সাত নম্বর দিলেন স্যার। তার খাতাটা ক্লাশের সবাইকে দেখালেন। বললেন, তুমি আঁকবে আনু, রং দিয়ে এরপর থেকে আঁকবে। আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব।

আচ্ছা।

আনু আজই গিয়ে বাবার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে রং-এর বাকস কিনে আনবে। তার ভারী উৎসাহ লাগে। স্কুল থেকে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু তাকে ছুটি দিয়ে দেন ড্রয়িং স্যার।

ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এসে দেখে, দারোয়ান বিল্টু বারান্দায় ঘন্টার নিচে বসে বসে ঝিমুচ্ছে, কয়েকটা ক্লাশ ছুটি হয়ে গেছে আগেই, বেঞ্চগুলো খাঁ খাঁ করছে, টিউবওয়েল থেকে একটা ধুলোমাখা বুড়ো লোক পানি টিপে খাচ্ছে। আনু দেখে জামরুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে ইয়াসিন সেপাই, তাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

বারে, বাবাকে বললাম না, আমি একাই যেতে পারবো। ইয়াসিনকে দেখে আনু বলে ওঠে। তার হাত থেকে বই-খাতা নিয়ে ইয়াসিন হেসে বলে, হাঁ, হাঁ হামি মনে করলাম কে বড়সাবকে নিয়ে আসি।

আনুর ভারী মজা লাগে। বলে, তুমি আমাকে বড় সাব বলো কেন, ইয়াসিন?

আপনি যে বড় সাব আছেন, খোকাবাবু।

যাঃ!

হাঁ হাঁ, আপনি ভি বড় সাব হবেন। থানা মে বসবেন। হামি আপনার ঘোড়া দেখব, হাঁ।

লাল কাঁকর বিছানো টানা সড়ক দিয়ে হাঁটতে থাকে আনু। দু'ধারে প্রকাণ্ড গেটের মতো আড় হয়ে গাছের মাথাগুলো জড়াজড়ি করে আছে। যতদূর দেখা যায়, ভারী সুন্দর লাগছে। একেবারে শেষ মাথায় কার যেন একটা সাদা বাড়ি ছবির মতো দেখা যাচ্ছে। একটা টমটম চলে গেল টকাটক টকাটক করতে করতে। আনু বলে, ইয়াসিন, তুমি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছ? ইয়াসিন বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে আনুর দিকে।

দূর, তুমি কিছু জানো না।

আপশোস করে ইয়াসিন বলে, আপনার মতো লেখাপড়া করলে তো জানবো খোকাবাবু। হামি তো জাহেল আছি।

হঠাৎ মনে পড়ে যায় আনুর। জিগ্যেস করে, ইয়াসিন, বাবা মফস্বলে চলে গেছে?

হাঁ, দুপুরে তো গেলেন।

মনটা ম্লান হয়ে যায় আনুর। এতক্ষণ এই কথাটা তার মনেই ছিল না। ভাবছিল বাবাকে গিয়ে ইস্কুলের গল্প বলবে! হয়ত আজ রাতে আর ফিরবেন না বাবা।

পিন্টুর কথা মনে হয়। তাকে যদি রাস্তায় ধরে মারে? একটা বুদ্ধি আসে মাথায়। ইয়াসিনকে সে জিগ্যেস করে, তুমি কুস্তি করো?

বাপরে বাপ! হাঁ, করে। কিউ?

আমাকে শিখিয়ে দেবে? আমি কুস্তি লড়বো। গায়ে জোর করবো। শেখাবে তুমি?

হাঁ, খুব। লেকিন খোকাবাবু, খুব ফজরে উঠতে হবে, ফের কাচ্চা চানা খাইয়ে লড়তে হবে। ইয়াসিন খুব খুশি হয়ে যায়। সে ভাবে, আনু দারোগা হবে, বড় সাহেব হবে, থানায় বসবে। তাই কুস্তি শিখতে চায়। সে বলে, ফের খোকাবাবু, আপনাকে ঘোড়ায় সোওয়ারি ভি শিখিয়ে দেব। এহি তো মরদ কা মাফিক কাম আছে। কেতাব ভি পড়বেন ই সব ভি শিখে লিবেন। হাঁ।

বলতে বলতে বাসার কাছে এসে যায় তাবা। বাসার কাছে এসে হঠাৎ একটা দৌড় দেয় আনু। এক দৌড়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখে বড় আপা বারান্দায় বসে চুল আঁচড়াচ্ছে। তাকে দেখেই চিরুনি নামিয়ে উজ্জ্বল চোখ করে বললেন, এলি?

মা কোথায়?

বেড়াতে গেছে। তোর জন্যে দুধ-লাউ রেখেছি। মুখ ধুয়ে আয়। ইস্কুল কেমন রে?

আনু তার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুলে-ওঠা গলায় বলে, এখানকার ছেলেরা এত খারাপ বড় আপা!

কেন, কী করেছে তারা ?

খুব খারাপ। আমি কারো সঙ্গে মিশবো না।

আচ্ছা, আচ্ছা।

বড় আপা কোল থেকে ওকে নামিয়ে ওর রাঙা ক্লান্ত মুখখানা দেখেন।

এত সুন্দর দোতলা বাড়ি তার চাচার, যেন আনুর বিশ্বাসই হতে চায় না। আর কী চওড়া তকতকে সিঁড়ি। সারাদিন দৌড়ে দৌড়ে উঠেও ক্লান্তি হয় না আনুর। চাচাতো ভাই মনির তার বয়সী, তার সঙ্গে ভাব হয়ে যায় এক মিনিটে। মনিরের সঙ্গে ছাদে উঠে সে ঘুরে ঘুরে শহর দেখে।

বাবার সঙ্গে আনু বেড়াতে এসেছে তার চাচার বাড়িতে, সিরাজগঞ্জে। তার আপন চাচা নয়, বাবার চাচাতো ভাই। বাবা নাকি ছোটবেলায় মানুষ হয়েছে এই চাচার মায়ের কাছে।

এসব কিছুই জানতো না আনু। মহিমপুর থেকে রওয়ানা দেবার ক'দিন আগে শুনেছে। কদিন থেকেই মা বাবাকে বারবার বলছিলেন এখানে আসতে। বলছিলেন, যাও না একবার ছোট মিয়ার কাছে। হাজার হোক নিজের মানুষ, তার কাছে শরম কিসের?

বাবা প্রতিবাদ করেন, শরমের কথা না। সে বড়লোক মানুষ, আমি কোনদিনই তার সাথে বেশি ওঠ-বোস রাখিনি। পছন্দই করিনি এসব। আজ কোন্ মুখে যাই! আর গেলেই বা কি ভাববে বলো?

সন্ধ্যায় বাতি জেলে আনু পড়ছিল। বারান্দায় বসে গলা নিচু করে আলাপ করছিলেন বাবা আর মা। বাবা নামাজ পড়ে জলচৌকি থেকে আর ওঠেননি। মা থাম ধরে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আনু উৎকর্ণ হয়ে ওঠে তাঁদের চাপা গলায় আলোচনা শুনে।

ভাবাভাবি আর কি? মেয়েগুলো কত বড় হলো একেকজন? তুমি তো বাসায় থাকো না, থাকি আমি। জ্বালা হয়েছে আমার।

মার গলা বুঝি ধরে এসেছিল। বাবা বিব্রত হয়ে বললেন, আহা, সে তো বুঝলাম।

অনেকক্ষণ পরে মা বলেন, আনুকে নিয়ে তুমি একবার সিরাজগঞ্জে যাও। ভিক্ষে তো আর আমরা চাই না। আস্তে আস্তে শোধ করে দেব, বলবে।

আচ্ছা, দেখি।

বাবার দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা যায়। অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন ধ্বনি ওঠে। আনু বুঝতে পারে বাবা দরুদ পড়তে শুরু করেছেন।

পড়ায় আর মন বসে না আনুর। জোর করে সে তাকিয়ে থাকে বইয়ের পাতার দিকে। অক্ষরগুলো যেন তার চোখ পোড়াতে থাকে। চোখে পানি এসে যায় তার। সে সচকিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকায়।

ছোট দারোগার বউয়ের কথা মনে পড়ে যায় তার। সেদিন বেড়াতে এসেছিলেন। তেমনি সারা গা গয়নায় মোড়া, মুখে পাউডার, ঠোঁটে পানের পাতলা লাল রং, পায়ে হিলতোলা সোনালি স্যাণ্ডেল। আনু উঠোনে গাঁদা ফুলের গাছগুলো বাঁশের চিকন বাতা দিয়ে ঘিরে দিচ্ছিল তখন।

বারান্দায় বসে বসে মা-র সঙ্গে গাল ঠেসে ঠেসে পান খেলেন ছোট দারোগার বউ। বললেন, বুবু, একটা কথা কই। মেয়েদের বিয়ে দেন নাই যে, শেষে মুখে না কালি দেয়। শুনে অপ্রতিভ হয়ে যান মা। আমতা আমতা করেন। কিছুই বলতে পারেন না। ছোট দারোগার বউ পিচ্ করে পানের পিক ফেলে আনুকে একবার আড়চোখে দেখে গলা নামিয়ে

বলেন, কিশোরগঞ্জে দেখেছি, এক ডাক্তার, তার যোয়ান মেয়ে, আপনার বড় মেয়ের মতো, বাপ মা খায়দায়, মনে করে মেয়ে আমার এখনো বাচ্চা। সে সর্বনাশী বাড়ির চাকরের সাথে, বুবু, ঘর ছাড়লো একদিন, আমার চক্ষের সামনে।

আনু তখন ভারী অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কী একটা ছুতো খুঁজে সে বেরিয়ে যায়। সে বুঝতে পারে, এ কথা শোনা তার ঠিক হচ্ছে না। ভীষণ রাগ হয় ছোট দারোগার বউয়ের ওপর। তার এত মাথাব্যথা কেন? সে বুঝতেই পারে না বড় আপা মেজ আপা এদের বিয়ে দেবার জন্যে সবাই এত ভাবনা করে কেন? এমন কি তার বাবা-মাও বাদ যান না। তবু তাদের কথা শুনে খারাপ লাগে না আনুর, যতটা খারাপ লাগলো ছোট দারোগার বউয়ের কথা শুনে। আর পিন্টুর কথাও মনে পড়ে।

মনটা কালো হয়ে যায় আনুর। সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাতের বেতটা দিয়ে ঝোপঝাড়গুলো পেটাতে থাকে। কচি কচি বুনো গাছগুলো ভেঙে গিয়ে ঝাঁপালো একটা গন্ধ উঠতে থাকে। গন্ধটা ভারী ভালো লাগে আনুর। সে আরো পেটাতে থাকে। নেশার মতো তাকে পেয়ে বসে গন্ধটা।

ইয়াসিন কোথা থেকে এসে বলে, খোকাবাবু, হুঁশিয়ার থাকবেন, ই সব জঙ্গলে সাপ ভি থাকতে পারে।

আরে বাপ্।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় আনুর খ্যাপা হাতটা। মুখে বলে, যাঃ।

কিন্তু চোখ তার সন্ধানী আলোর মতো দ্রুত ঘুরতে থাকে, কী জানি সত্যি সত্যি যদি সাপ-টাপ বেরিয়ে পড়ে।

একটু পরেই আনু দেখতে পায় ছোট দারোগার বউ বেরিয়ে গেলেন তাদের বাসা থেকে। তার মুখটা গম্ভীর, আঁধার। অ ক হয়ে যায় আনু। একটু আগেই তো কী ডগমগে দেখাচ্ছিল বউটার মুখ।

ইয়াসিন বলে, কি খোকাবাবু। কুস্তি শিখবেন নাই?

ভুলেই গিয়েছিল আনু। সোৎসাহে সে বলে ওঠে, হ্যাঁ, শিখবো। কালকে। কাল তুমি ভোরে আমাকে ডেকে নিয়ে যেও ইয়াসিন।

রাতে রান্নার ছিল দেরি। আপাদের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছিল আনু। ঘুম নয়, জাগরণ আর তন্দ্রা মেশানো একটা কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল আনু। এমন সময় ভারী মিষ্টি একটা ঘ্রাণ আর নরোম একটা স্পর্শে সে আবিষ্ট হয়ে যায়। চোখ খুলে দেখে, বড় আপা তার পাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়েছেন। তার পায়ের কাছে সেজ আপা বালিশে ওয়াড় পরাচ্ছেন। চোখ বুঁজে পড়ে থাকে আনু। তার এত ভালো লাগে, মনে হয় শূন্যে মেঘের ভেতরে ভেসে আছে সে। ভেসে ভেসে কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলে যাচ্ছে। তার কান্না পায়। বড় আপা, মেজ আপা কত ভালো। কিন্তু সবাই মুখ আঁধার করে থাকে, ফিসফিস করে কথা বলে। আনু ছাড়া কেউ ভালোবাসে না তাদের। আনু সারাজীবন এভাবে শুয়ে থাকতে পারে। কোথাও যাবে না সে, কিচ্ছু করবে না।

মেজ আপা তার পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে বলেন, ভাত খাবি না?

উঁ। না। খাবো না।

মেজ আপা তখন তাকে আদর করতে থাকেন খুব।

ওঠ না মনি, তোকে আজ একটা সুন্দর গল্প বলবো। ওঠ। ভাত খেতে খেতে বলব।

আদরটা এত মিষ্টি লাগছিল! আনু ইচ্ছে করেই জেদ করে, অনেকক্ষণ ধরে করে। বড় আপা তাকে কাঁধ ধরে উঠিয়ে দেন। বলেন, বাব্বাঃ, কি ভার হয়েছিস তুই আনু। আমি তুলতেই পারি না।

সে রাতে মেজ আপা ভাত মেখে দিল, ডিমের মতো মুঠো পাকিয়ে দিল, মুখে তুলে দিল, তবে খেল আনু।

রাতে শুয়ে শুয়ে আনু ভাবে তার চাচার কথা যাকে সে কখনো দেখেনি। সন্ধ্যের সময় বাবা আর মা-র কথাগুলো, মা তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে বলছিলেন, সেই সব ঘুরে ঘুরে ধূসর প্রজাপতির মতো মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। ও পাশের চৌকিতে বাবা শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। বাবার জন্যে ভারী মায়া করে আনুর। বালিশে মুখ গুঁজে সে পড়ে থাকে।

অন্যদিন হলে কোথাও যাবার নাম শুনে লাফিয়ে উঠতো আনু। আজ তার কী হয়েছে, বুকের মধ্যে কেমন টিপটিপ করছে, এখান থেকে, এ বাসা থেকে, কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না তার। বড় আপার ফর্সা চেহারাটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মাথায় একটি ছোট্ট টিপ। চিবুকের কাছে একটুখানি ভাঁজ। আনু আয়নায় দেখেছে তার চিবুকেও ওরকম ভাঁজ আছে। তার মায়েরও আছে। বড় আপা যখন হাসেন ভাঁজটা ছড়িয়ে যায়, কী সুন্দর লাগে! ইয়াসিনের কাছে কাল থেকে সে কুস্তি শিখবে। পিন্টু যদি তাকে মারতে আসে, এবার এমন একটা ঘুসি দেবে তাকে যে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে শয়তানটা।

বাবার যদি অনেক টাকা থাকতো, তাহলে ভাবনা ছিল না। আনু স্পষ্ট বুঝতে পারে, তার বাবার টাকা নেই, মা তাই চাচার কাছে যেতে বলছেন। চাচার কাছ থেকে টাকা আনবে বাবা? চাচা বোধহয় খুব রাগী। নইলে বাবা যেতে চাইলেন না কেন? মা অনেক করে বলতে তবে রাজি হলেন তিনি। আনু যেন বাবার সঙ্গে মিশে যায়। আনু বুঝতে পারে, বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে। বাবার যেতে ইচ্ছে করছে না। আনু যদি একলাফে বড় হয়ে যেতে পারতো, তো অনেক টাকা রোজগার করে ফেলত সে। পানু ভাই একটা চাকরি পেলেও হতো। তাহলে আর কোনো ভাবনা থাকত না। আনু বারবার পাশ বদলাতে থাকে বিছানায়, কুণ্ডলি পাকিয়ে শোয়, আবার পরক্ষণেই সোজা হয়।

বাবা ডাকেন, আনু, ও আনু।

তখন ঘোরটা কেটে যায় আনুর। বাবা পাশে এসে দাঁড়ান। মা ও ঘর থেকে বলেন, কি হলো?

কিছু না, ছেলেটা কেমন কাতরাচ্ছে।

কপালে হাত দিয়ে দেখেন বাবা। না, জ্বর আসে নি। বাবা আবার ডাকেন, আনু, আনু রে।

আনু ঘুমজড়িত গলায় বলে, কী?

ও রকম করছিস কেন?

চুপ করে থাকে আনু।

আয় আমার সঙ্গে শুবি।

আনুকে প্রায় কোলে করে বাবা তাঁর নিজের বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দেন। বলেন, খারাপ স্বপ্ন দেখেছিস? ভয় কিরে, এই তো আমি এ ঘরেই আছি।

একটু একটু হাসেন বাবা। আনুর তখন ভীষণ ঘুম পায়। বাবার হাতটা ধরে সে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। একেবারে সেই ভোরবেলায় ঘুম ভাঙে তার। সালু আপা বলে, আনু, আজ তোকে নিয়ে বাবা সিরাজগঞ্জে যাবে, চাচার কাছে।

আজ?

আনুর যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। বিছানা ছেড়ে ওঠে না। সালু আপা তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলে, আমি মিথ্যে বলছি? যা মাকে জিগ্যেস কর। আমার বয়েই গেছে। গটগট করে বেরিয়ে যায় সালু আপা। তখন যেন বিশ্বাস হয় আনুর।

সেই আসা। আসবার উত্তেজনায় আনু ভুলেই গিয়েছিল বাবা কেন চাচার ওখানে যাচ্ছেন, কেন যেতে চাননি, তার যেতে ইচ্ছে করেনি।

সিরাজগঞ্জ বাজারে এসে ট্রেন থামলো। নামলো ওরা। মা এক বোয়াম মোরব্বা বানিয়ে দিয়েছিলেন চাচাদের জন্যে, আনুর হাতে সেটা। বাবা বললেন, সাবধানে আনু। বাড়ির কাছে এসে দেখিস ভাঙে না যেন।

আত্মীয়স্বজন বলতে কাউকে চেনে না আনু। বাবা কোনদিন কারো কথা বলেন না। এক মামা আছেন, তাও মা-র সৎ-ভাই। আনু শুনেছে, সৎ-ভাই নাকি খুব শয়তান আর হিংসুটে হয়। তাই তার বড় একটা টান নেই মামার ওপর। মিনু আপাকে সেদিন মামা নিয়ে গেল। ঘরে এসে মিনু আপা চোখ বড় বড় করে কত গল্প করল মামা বাড়ির. আশ্চর্য সব গল্প— আনুর বিশ্বাস হতে চায় না।

এ চাচাও যে এতদিন কোথায় ছিলেন কে জানে। এই সেদিনই আনু প্রথম শুনলো, ওর এক চাচা আছেন, বাবার চাচাত ভাই; বাবার কোনো আপন ভাই নেই। একজন ছিল, বসন্তে মারা গেছে সেই ছোটবেলায়। বাবা তাকে নিয়ে যখন ছোটবেলায় স্কুলে যেতেন, বাবা একবার গল্প করেছিলেন, পথে একটা খাল পড়ত, সেই খালটা ভাইকে কাঁধে করে পার হতেন। বাবা বলতেন, আমি দুঃখ কষ্ট করে একাই মানুষ হয়েছি। কেউ তো আর আমাকে দেখেনি। এখন আমার কি দরকার সেধে সেধে তাদের সাথে আত্মীয়তা করবার?

চাচার কাছেও আসতে চাননি বাবা। মা বারবার করে বলাতে এসেছেন। তাদের রিকশাটা দু'পাশে লাইব্রেরী, স্টেশনারী, ওষুধের দোকান, ছাপাখানা, চায়ের স্টল পেরিয়ে চলেছে। সকাল বেলা বড় বড় মাছ উঠেছে বাজারে। বাজারের কাছে এসে রিকশা থামাতে বলল বাবা। আনুকে বললেন, বোস আমি আসছি।

পাঁচ মিনিট পরে বাবা একটা প্রকাণ্ড রুই মাছ নিয়ে ফিরলেন। দড়ি দিয়ে তার কান্‌কোর ভেতরে ফোঁড় করে বাঁধা। কান্‌কো দেখাচ্ছে লাল টকটকে। আনু অবাক হয়ে যায়। বাবা বলেন, কারো বাড়িতে খালি হাতে যেতে নেই! মাছটা বেশ বড় না?

হ্যাঁ।

রিকশা আবার চলতে লাগল। বাবাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। আনু চুপ করে দুধারের অচেনা বাড়িঘর দেখতে থাকে। একটা উঁচু ব্রীজের নিচে এসে পৌঁছলো ওরা। ব্রীজটার ওপরে রিকশা টেনে টেনে পার করতে হবে। বাবা নেমে গেলেন। আনু রইলো রিকশায়।

বাবা পাশে পাশে হেঁটে এলেন। তারপর ও-মাথায় গিয়ে আবার রিকশায় ওঠে বসলেন তিনি। এ ব্রীজটার নাম এলিয়ট ব্রীজ। এইটুকু হেঁটেই যেন হাঁফিয়ে গেছেন বাবা। মুখ ঘামে ভিজে গেছে। চকচক করছে তাঁর সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি। বাবা দু'হাতে মুখ মুছলেন অনেকক্ষণ ধরে।

বাসায় এসে চাচাকে পাওয়া গেল না। চাচা ঢাকায় গেছেন কাজে, কাল ফিরবেন। চাচি বিরাট ঘোমটা টেনে বাবার সামনে এসে সালাম করতে গেলেন, বাবা বললেন, থাক, থাক। মনির এক লাফে কোথা থেকে এসে মোরব্বার বোয়ামটা কেড়ে নিয়ে গেল আনুর হাত থেকে। বাবা হেসে বললেন, ও তোর ভাই। মনির।

সিঁড়ির পাশে ছোট্ট ঘরটায় থাকবার ব্যবস্থা হলো তাদের। আনুর ভারী ইচ্ছে করছিল, দোতলায় যদি থাকতে পারতো। দোতলায় কোনোদিন থাকেনি সে। না জানি, কেমন ভালো লাগে দোতলায় ঘুমোতে। মনির থাকে দোতলায়।

ভারী ভাব হয়ে গেল মনিরের সঙ্গে। আনু তার সব বই উলটে পাল্‌টে দেখল, সেও তাঁর মতো ফোরে পড়ে। তার খেলার বন্দুকটা নিয়ে শিখে নিল কেমন করে ছুঁড়তে হয়। বলল, আমার বাবার সত্যিকার রাইফেল আছে, পিস্তল আছে। আমাকে গুলি মারতে শেখাবে বলেছে।

তারপর মনিরের সঙ্গে বেরিয়ে গেল টাউন দেখতে। এলিয়ট ব্রীজের ওপর হেঁটে হেঁটে পার হতে ভারী মজা লাগল আনুর। আহা, এরকম একটা ব্রীজ মহিমপুরে যদি থাকতো!

বিকেলে ফুটবল খেলতে নিয়ে গেল মনির। সেনবাবুদের মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলে। চরদীঘির রাজা নাকি সেনবাবু। এখন কলকাতায় চলে গেছে। বিরাট বাড়িটা, মাঠটা, পুকুরটা পড়ে আছে। কেমন ফাঁকা ফাঁকা, ভুতুড়ে বাড়ির মতো। ছেলেরা তাকে দেখে ঘিরে দাঁড়াল। সে তো নতুন, তার কেমন লজ্জা করতে লাগল তখন। ফুটবলের মাঠে একটা বলও সে কিক করতে পারল না। বল তার সামনে দিয়ে চলে যায়, ভাবে ওরাই কেউ কিক করুক, আনুর সংকোচ আর কাটে না। মনির দমাদম দু'টো গোল করে। তারপর খেলা শেষে সবাই একসঙ্গে চিৎ হয়ে শুয়ে গল্প করতে থাকে। আনু পাশে বসে ঘাস ছেঁড়ে একটা একটা করে। ওদের একটা কথাও সে বুঝতে পারে না। কাকে যেন জব্দ করবে সেই বুদ্ধি আঁটছে ওরা। কাল স্কুলে গেলে যে ছেলেটা জব্দ হবে তার কথা ভেবে আনুর বড় মায়া করে। রাতে বাবার পাশে শুয়ে আর ঘুম আসে না। অচেনা সব শব্দ উঠতে থাকে দূর দূরান্তর থেকে, অন্ধকারের ভেতর শেয়াল ডাকে, ঝিঁ ঝিঁ পা ঘষে ঘষে কান অবশ করে ফেলে, কোথায় কে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গায়, সিঁড়ি দিয়ে পায়ের শব্দ নামে, ওঠে, আবার নামে; মা-বড় আপা-মেজ আপা-সালু আপা। ছোট আপা-মিনু আপা কি করছে এখন? এখন ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে না, গল্প করছে। আনুর কথা বলছে। আনু বেড়াতে গেছে সেই কথা বলছে। কদিন আগে বাবা একটা কলেজ পড়া ছেলেকে জায়গীর রেখেছেন— সেই মাস্টার সাহেব বোধহয় ল্যাম্প জ্বেলে মোটা মোটা বই পড়ছেন। মাস্টার সাহেবের জন্যে ভাত ঢাকা দেওয়া থাকে, অনেক রাতে খান। আনুকে একটা ছবির বই এনে দিয়েছিলেন মাস্টার সাহেব। আবার একসঙ্গে অনেকগুলো শেয়াল ডেকে ওঠে। তন্দ্রার ভেতর থেকে চমকে ওঠে আনু। এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর তলিয়ে যায় ঘুমে।

চাচা ভোরবেলায় এসে পৌঁছুলেন। বাবাকে দেখে ভারী খুশি হলেন তিনি। না, আনু যেমন ভেবেছিল, খুব রাগী হবেন চাচা, তেমন একটুও না। গোলগাল মুখ, ফর্সা, ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরনে আর লাল পাম্পশু পায়ে, হাতে মস্ত বড় একটা আংটি। ট্রেন থেকে নেমে এসে আর কাপড় বদলালেন না, হাত মুখ ধুলেন না, বাবার সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে গল্প করতে লেগে গেলেন। ডেকে বললেন, এই কি আনু? শোনো বাবা, দেখি, দেখি।

আনু এসে সামনে দাঁড়াল। বাবা বললেন, সালাম কর।

করলো সে। চাচা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ভারী সুন্দর হয়েছে। বাপের মতো বড় হওয়া চাই, বুঝলে আনু? খালি সুন্দর চেহারায় কিছু হয় না।

লাল হয়ে যায় আনু। বাবা বলেন, আমি আর কী? আমার চেয়েও বড় হোক সেই দোয়াই করি। পুলিশের চাকরি আবার চাকরি? লোকে মনে করে পয়সাই পয়সা। দারোগারা লাল হয়ে গেল। এদিকে খবর নিয়ে দেখ, আমার একদিক দেখতে আরেকদিক কানা হয়ে যায়।

এইরকম আক্ষেপ করে চলেন বাবা। একা একা। চাচা চুপ করে শোনেন। পরে বলেন,

কী যে বলেন মিয়াভাই। আপনাদের অভাব? এই তো সেদিন সিরাজগঞ্জে এক বাচ্চা দারোগা এলো, তার...।

তাঁকে শেষ করতে দিলেন না বাবা। বাধা দিয়া বললেন, সবাই কি আর একরকম? ধর্ম যদি পানিতে ফেলা যায়, তাহলে আলাদা কথা।

রাখেন আপনার ধর্ম! আপনি সেই পুরনো কালের ধ্যান নিয়ে আছেন। যুগ এখন অন্য রকম। এখন ও-সব চলে না।

প্রায় তর্ক লেগে যায় বাবা আব চাচার। ভয়ে ভয়ে সেখান থেকে সরে আসে আনু। বাবার মুখটা কেমন কঠিন হয়ে উঠেছে একমুহূর্তে, চেনাই যাচ্ছে না আর। আর চাচার ফর্সা চেহারা লাল হয়ে গেছে উত্তেজনায়। আনু চুপ করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। নামলে রান্নাঘর দেখা যায়। দু'জন কাজের মেয়ে রান্নার জোগাড় করছে। চাচি একটা মোড়ায় বসে পাখা হাতে তদারক করছেন। আনুকে দেখে ডাকলেন তিনি। বললেন, এই ছেলে, শোন।

কাছে এলো আনু। আনুর খুব খারাপ লাগলো তখন। তার মা আর বড় আপা রোজ নিজ হাতে রান্না করেন। গরমে, কালিতে, ধোঁয়ায় কী বিচ্ছিরি দেখায় তাদের। এরকম কাজের মেয়ে যদি থাকতো, তাহলে আর কষ্ট হতো না। চাচিকে কী সুন্দর ছিমছাম দেখাচ্ছে! মাকে বলবে।

চাচি তাকে কাছে ডেকে তার মায়ের তার বোনদের গল্প শুনতে লাগলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করলেন কত কথা। কে দেখতে কেমন, কে কত বড়, কোথা থেকে বিয়ের কথা আসছে। আনু তাব অত কি জানে সে ভাল করে কিছুই বলতে পারল না। বলতে ইচ্ছে করল না। আনু খুব বিব্রত বোধ করল, লজ্জা করল তার। সে তো জানে বাবা তার আপার বিয়ে দেবেন বলে টাকা চাইতে এসেছেন চাচার কাছে।

সেরাতে অনেক্ষণ ধরে আবার আলাপ করলেন বাবা আর চাচা। ভাত খাবার পর আনু দোতলায় মনিরের পড়ার টেবিলের পাশে বসে রইলো। মনিরকে একটা ফুলের তোড়া এঁকে দিল আনু। মনির অবাক হয়ে আঁকাটা দেখল, তারপর আরো এঁকে দেবার জন্যে বায়না ধরলো। তখন পাতা, লাটিম, কলম এঁকে দিল আনু। সবশেষে একটা ছবি আঁকলো সে—

একটা বাড়ি, পাশে নদী বয়ে যাচ্ছে, তালগাছ কাৎ হয়ে পড়েছে, আকাশে মেঘ, মেঘের মধ্যে সূর্য।

বলল, রং নেই তোর?

না।

রং থাকলে কী সুন্দর রং করে দিতাম।

না হোক। এমনিই ভালো।

মনিরের একটা মজার খেলা ছিল। চোং-এর মধ্যে ভাঙা চুড়ির অনেকগলো টুকরো আর একটা ঘষা কাচ বসানো। একদিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে চোংটা ঘোরালে নতুন নতুন নক্‌শা তৈরি হয়! এমন অদ্ভুত খেলা জীবনে দেখেনি আনু। সেইটে অবলীলাক্রমে মনির দিয়ে দিল তাকে।

ঠকঠক করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন চাচা। তাকে ভারী গম্ভীর দেখাচ্ছে। আনু ভয় পেয়ে খেলাটা মনিরকে ফিরিয়ে দিল, বলল, কাল নেবো ভাই।

তারপর নেমে এলো নিচে। এসে দেখে বাবা এশার নামাজ পড়তে বসেছেন। চোখ বোঁজা, ঘরে আলোটা ছোট করে রাখা। নিবিড় একটা ছায়ার মতো মনে হচ্ছে বাবাকে। নিঃশব্দে আনু গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

পরদিন সকালে ফিরে যেতে চাইলেন বাবা। চাচা বললেন আরো একদিন থেকে যেতে। আরো একদিন থেকে গেল ওরা। তারপর দুপুর এগারোটার গাড়িতে উঠল।

গাড়িতে উঠে আনু জিগ্যেস করল, টাকা দেয়নি বাবা?

বাবা অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন। তুই শুনলি কোত্থেকে?

আনু চোখ নাবিয়ে নিল। থতমত খেয়ে গেল সে। তার জিগ্যেস করাই উচিত হয়নি। বাবা টের পেয়ে গেলেন, সেদিন সন্ধ্যেয় মার সঙ্গে বাবার কথাগুলো সব সে শুনেছে।

বাবা কিছু বললেন না আর। তার দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে রইলেন তিনি। আনুর মনে হলো, সে মাটিতে মিশে যায়। বাবাকে ক্লান্ত, বিষণ্ন দেখাচ্ছে। আনুর কেন যেন মনে হলো, টাকা দেয় নি চাচা। কিন্তু বাবার মুখের দিকে আর তাকাতে সাহস পেল না সে। ট্রেন ছুটে চলেছে চাকায় চাকায় ছড়া কাটতে কাটতে। আনু সেইটে কান পেতে শুনতে লাগল— ঢাকা যাবো, টাকা পাবো— ঢাকা যাবো, টাকা পাবো— ঢাকা যাবো, টাকা পাবো।

।। ৫ ।।

সকালবেলার লাল আলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। মহিমপুরের নির্জন পথে এখনও এখানে ওখানে লেগে রয়েছে অন্ধকার।

আনু ঘুমিয়েছিল। সালু আপা তার চোখে ফোঁটা ফোঁটা পানি দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিল। বিরক্ত হয়ে চোখ মেলে আনু জিগ্যেস করল, কী?

কিন্তু তার বিরক্তি চোখেই পড়ল না সালু আপার। বরং খুশিতে ডগমগ হয়ে সে বলল, ফুল কুড়োতে যাবিনে? দেখ তো বেলা কত হয়েছে?

আরে তাই তো! ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে আনু জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। নিম গাছটার নিচে, রান্নাঘরের পেছনে বিরাট লাল সূর্য আস্তে আস্তে ভেসে উঠছে আকাশে। তার অভিমান হলো সালু আপার ওপর। বলল, তুমিই তো বেলা করলে! আমাকে আরো আগে ডাকলে না কেন? ঠিক ও বাড়ির খোকা এসে সব ফুল এতক্ষণে নিয়ে গেছে।

তবু ঘর থেকে বেরোয় আনু। মনটা কেমন খুঁতখুঁত করে তার। আর একটু সকালে উঠলেই কেমন তাজা শিউলি পাওয়া যেত। শিশির ভেজা ঘাসে পা ডুবিয়ে ফুল কুড়োতে যা মজা! এত বেলা করে গিয়ে শুধু শুধু বাসি ফুল কুড়োনো বইত আর কিছু নয়।

পথে বেরিয়ে আনুর ভারী ভালো লাগল শীতসকালের আমেজ ভরা শহরটিকে। মাত্র কয়েকমাস হলো ওরা এসেছে মহিমপুরে। এটা নাকি মহকুমা সদর। কিন্তু হলে হবে কী, শুনতেই যা। বর্ষাকালে কাদায় যদি ঘর থেকে এক পা বেরুনো যায়। যেদিকে তাকাও শুধু পানি আর কাদা। আবার যখন গরম পড়ে তখন পথে এত ধুলো ওঠে যে, আনুদের কোয়ার্টার থেকে থানা এক মিনিটের পথ, এইটুকু হেঁটে যেতেই হাঁটুভর্তি ধুলো হয়ে যায়। আনুর শুধু ভালো লেগেছে এই শীতকালটা। লেপ মুড়ি দিয়ে মিটমিট করে চোখ খুলে জানালা দিয়ে পথটাকে দেখতে ভারী সুন্দর লাগে। কেমন পাথরগুলো ভিজে গিয়েছে শিশিরে। লালমাটি বিছিয়ে রয়েছে পুরু কাঁথার মতো। আর থানার পেছনে বড় শিউলি গাছটা অ্যাতোগুলো ফুল ছড়িয়ে রেখেছে ঘাসের ওপর। সালু আপার সাথে রোজ ফুল কুড়োতে আসে আনু। এসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে গাছটার দিকে। ডালগুলো বুড়ো হয়ে গেছে, পাক ধরেছে, বাকল উঠে গেছে. তবু তারি গায়ে চিকন চিকন ডাল বেরিয়েছে, সেই ডালে ফুল। সালু আপা ধমক দেয় একেকদিন, হাঁ করে গাছ দেখলে কি আর ফুল কুড়োনো যায়? নিশ্চয় পোকা এখুনি এসে পড়বে। তখন নিসর্গে ফুল।

আবার তখন দু'হাতে ফুল কুড়োতে শুরু করে আনু। ও আবার বলে, আনু গাছে উঠতে পারবি?

একবার গাছটায় চোখ বুলিয়ে নেয় আনু। পরে বলে, হুঁ।

তবে ওঠ। উঠে ডানদিকের বড় ডাল ধবে ঝাঁকালে কিন্তু মেলা ফুল ঝরবে। তুই ওঠ।

তারপর ঝুরঝুর করে, ডাল থেকে নাড়া পেয়ে, আরো কত শিউলি যে ছড়িয়ে পড়ত তার আর হিসেব নেই।

একেকদিন বাবা আসতেন আনুদের সাথে। আনুরা ফুল কুড়িয়ে তখন জমা করত তাঁর কাছে। তারপর তিনজন একসঙ্গে ফিরে আসতো বাসায়। বাসায় এসে চা-মুড়ি খেতে খেতে মালা গাথতো সালু আপা, আনু একটা একটা করে ফুল তুলে দিত তার হাতে। বাবা কিন্তু আনুদের আসবার অনেক আগেই শিউলি গাছের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেখানে গিয়ে পায়চারি করতেন আর আনতস্বরে সুর করে সুরা পড়তেন। ভারী মিষ্টি গলা ছিল বাবার। কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করত আনুর। আকাশ থেকে আসা অশরীরি গানের মতো মনে হতো তার।

কোনো কোনো ভোরসকালে ঘুমের ঘোরে আনু শুনতে পেত, বাবা নামাজ পড়ছেন। দীর্ঘ কোন এক সুরা করুণ সুরে আবৃত্তি করে যেতেন তিনি। আনু তন্ময় হয়ে যেত শুনতে শুনতে।

কেন যেন তার পানি এসে যেত চোখে। বালিশে মুখ গুঁজে নিস্পন্দ পড়ে থাকত সে।

আজ তাড়াতাড়ি শিউলি তলায় আনু সালু আপাকে নিয়ে গিয়ে দেখে, বাবা সেই কখন থেকে সেখানে পায়চারি করছেন। পথের দু'ধারে নিবিড় গাছপালা আর বড় বড় আমগাছ। আর তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাবা সুরা পড়ছেন। চোখ দু'টো তাঁর প্রায় বুঁজে এসেছে। ওদের দেখে তিনি আনমনে একটু হাসলেন। তারপর আরো কিছুক্ষণ সুরা পড়ে কাছে এসে বললেন, কিরে, এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গলো তোদের? আরো সকাল করে উঠবি। খুব সকালে উঠবি। শুধু ফুল কুড়োনোর জন্যেই কি এত ভোরে ওঠা?– তারপর বিশেষ করে আনুকেই যেন তিনি বলেন– বড় বড় লোক, তাঁরা সব খুব ভোরে উঠতেন। এক্কেবারে ভোরে। কাকপাখির নামগন্ধ নেই পর্যন্ত তখন।

সালু আপা আনুর হাত ধরে টানে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে। ক্রমেই থালার মতো সূর্য জেগে উঠছে আকাশে। আর তারই লাল আলোয় বাবার মুখখানা রাঙা দেখাচ্ছে। তিনি বলে চলেছেন, আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ, মেকস ম্যান হ্যাপি অ্যান্ড ওয়াইজ।

আনু ঠিক বুঝতে পারল না কথা কটির অর্থ। বাবা তাকে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর হেসে বললেন, যাও ফুল কুড়োওগে তাড়াতাড়ি। নইলে বাসায় আবার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ফুল কুড়োতে কুড়োতে আনু ভাবে, বাবা কত ভোরে ওঠেন। নিশ্চয়ই বাবা অনেক বড়। বাবার মতো বড় কেউ নেই।

বাসায় ফিরে এসে দেখে বড় আপা আর মেজ আপা তখন চায়ের জোগাড় করেছেন। সেজ আপা রাতের বিছানাগুলো ঝাড়ছেন। লেপগুলো ভাঁজ করে তুলে রাখছেন। মেজ আপাকে তার নাম ধরে একেকসময় আনু ডালু আপাও বলে ডাকে। ডালু আপা বলতে ভারী মিষ্টি লাগে আনুর।

আর মিনু আপার শুধু শুধু শয়তানি মতলব। কাজকর্ম কিছু করবে না, কিন্তু ভাব করে যেন কত কী রাজকার্যে ব্যস্ত। আনু গিয়ে রান্নাঘরে বড় আপার আঁচল ঘেঁষে বসে পড়লো। তিনি ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, এঃ দেখেছ আনু এখনো মুখ ধোয়নি, চা খেতে এসেছো। যা শীগগীর করে মুখ ধুয়ে আয়।

কী আর করে আনু। বাবা শুনলে খুব রাগ করবেন। শীতকালে মুখ ধুতে যা কষ্ট! গাল-মুখ-চোখ ঠাণ্ডা পানিতে যেন কেটে যেতে চায়। গুটি গুটি পায়ে কুযোর পাড়ে আসে আনু। এসে দেখে, মা কাপড়ে সাবান দিয়ে রাখছেন। এতে দুপুরবেলায় যখন ধোওয়া হবে, ময়লা কাটবে ভালো। মাকে অত সকালে কাপড়ের স্তূপ নিয়ে কুয়োর পাড়ে বসতে দেখে কেমন মায়া করলো আনুর। মনিরের মা-র কথা মনে পড়ল। তাদের মতো ঝি থাকলে মার আর কোন কষ্ট ছিল না।

মনিরের কথায় সেই অবাক করা খেলনাটার কথা মনে পড়ে গেল। চোং-এর ভেতরে চোখ রেখে ঘুরোলেই ভাঙা চুড়ির টুকরোগুলো নতুন নতুন নক্‌শা হয়ে ওঠে। বড় আপার খুব পছন্দ হয়েছিল ওটা। বড় আপা একেকদিন আনুর হাত থেকে খেলনাটা নিয়ে বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ ধরে নক্‌শার খেলা দেখতেন। তখন তাঁর মুখে ফুটে উঠত আবছা একটা হাসি, যে হাসিটা কোনদিন ভুলতে পারবে না আনু। অস্পষ্ট এক চিলতে একটা হাসি, ঈদের চাঁদের মতো, দেখা যায় কিনা, আনু একটু চোখ বুঝলেই একেবারে স্পষ্ট দেখতে পায়। হাসিটা তার

মনকেও অজান্তে কখন প্রসন্ন করে তোলে।

মুখ ধোবার জন্যে পানি তুলে দিলেন মা। বললেন, ফুল কুড়োনো হয়ে গেল এরই মধ্যে? ধন্যি ছেলে, নিত্যি নিত্যি ফুল কুড়োনো চাইই চাই। কী হয় বাপু এত শিউলি এনে?

অভিমান হয় আনুর। বলে, কেন, সালু আপাই তো বলেছে শিউলির বোঁটা দিয়ে রঙ হয়। সেই রং-এ তুমি নাকি জরদা করবে।

মা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর তাড়াতাড়ি বললেন, আচ্ছা যা, তুই চা খেয়ে পড়তে বোস। খালি বেড়ানো!

আনু বুঝতেই পারে না, মার মেজাজ আজকাল এত তেতো হয়ে যাচ্ছে কেন। সে আস্তে আস্তে উঠে আসে।

বড় ঘরের বারান্দায় সবাই গোল হয়ে বসেছে চা খেতে। হঠাৎ আনুর নজরে পড়ায় চিৎকার করে ওঠে, দেখেছ বাবা, মিনু আপা কতগুলো দুধ ঢাললো ওর কাপে। দেখেছ ?

আহা নিক। তুইও নে।

এত মিষ্টি করে বললেন বাবা যে আনুর মনটা ঝিরঝির করে উঠল। সেও ভাবলো, নিক না। মিনু আপা সারাক্ষণ তার সঙ্গে দুষ্টুমি করে, জ্বালাতন করে মারে, সে সব কিছুই এখন মনে পড়ল না আনুর। সে এক মুঠো মুড়ি তার কাপে ঢেলে সুড়ৎ সুড়ৎ করে খেতে লাগল। চায়ের সঙ্গে ভারী স্বাদ হয়েছে। ও-রকম চায়ে মুড়ি ঢেলে সালু আপা মিনু আপাও খাচ্ছে। মেজ আপা সঙ্গে বসেননি। তিনি একটা থামে ঠেস দিয়ে খাচ্ছেন। ছবির মতো লাগছে।

চা খেতে খেতে বাবা মাকে বললেন, আমার সুটকেশ গোছানো হয়েছে?

কেন?

উদ্বিগ্ন হয়ে আনু জিগ্যেস করে। উত্তর দেন মেজ আপা, বাবা আজ মফস্বলে যাবে আনু।

সত্যি?

আনুর যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

হ্যাঁ।— বাবা বললেন।

তাহলে কবে তুমি আসবে ?

তার কি ঠিক আছে ? কাজ যদ্দিনে হয়। এই দিন তিনেকের মধ্যেই ফিরব আমি।

শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায় আনুর। আনমনে চায়ের কাপে চুমুক দেয় সে। নতুন করে মুড়ি নিতে ভুলে যায়। একেবারে কিছুই আর ভালো লাগে না তার।

কেন যে বাবা বেছে বেছে এই থানার চাকরিটা নিয়েছেন, ভেবেই পায় না আনু। খালি অভাব আর অভাব। তার ওপর একদিনের জন্যে সুস্থির নেই। আজ এখানে কাল সেখানে এই করে মাসের অর্ধেকটাই বাবা বাইরে বাইরে কাটান। আব যখন তিনি থানার অফিসে এক গাদা কাগজপত্র নিয়ে বসে থাকেন তখন কেমন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে আনুর মন। মনে হয় তিনি বুঝি আনুর বাবা নন। কেমন গম্ভীর আর দৃঢ় মুখখানা। দেখে ভয় করে আনুর। পালিয়ে আসতে ইচ্ছে করে। তাই পারতপক্ষে আনু কোনদিন থানার পথ মাড়াতো না। কত ছেলের বাবা কত কী কাজ করে। তার এক বন্ধু ছিল ডাক্তারের ছেলে। তার বাবা কানে স্টেথিসকোপ লাগিয়ে বুক দেখতেন, ইঞ্জেকশন দিতেন, আবার ঘোড়ায় চড়ে রুগী দেখতে যেতেন দূর দূর

গাঁয়ে। মাথায় শোলার হ্যাট, প্যান্ট পায়ের কাছে জড়িয়ে ক্লিপ দিয়ে আটকানো, একপাশে ঝোলানো ওষুধের কালো ব্যাগটা— ঘোড়া চলতো আস্তে আস্তে, বেশ লাগতো আনুর। দু'পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে ফিরতেন তিনি— আর আনতেন আম, লিচু, না হলে পাকা পেপে। পিন্টুর বাবাও বেশ। পিন্টুর বাবা বকশীবাবু অস্ট্রেলিয়া বিলাত কত জায়গায় পাট পাঠান, ইচ্ছা করলে নিজেও যেতে পারেন, যান না। মনিরের বাবার কাজও কত সুন্দর। মাসের মধ্যে চারবার ঢাকা যাচ্ছেন। ওদের মিল বসছে সিরাজগঞ্জে, কাপড়ের মিল। মনিরের বাবা কত বড় লোক। দোতলা বাড়ি। মনির রোজ ছাদে উঠতে পায়। ছাদে উঠতে এত মজা লাগে আনুর!

খুব ভোরে যাঁরা ওঠেন তাঁরা নাকি বড় লোক। বাবাও তো বড় লোক। বাবা তবে কেন অমন বিশ্রী একটা চাকরি করেন? চোর ঠ্যাঙ্গায় বলে ছেলেরা তাকে ঠাট্টা করে। আবার কেউ কেউ বলে দারোগার ছেলে পাজি হয়, মিশতে চায় না ত[redacted]ঙ্গে।

সেজ আপা একদিন তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, যারা বলে আনু, তাদের বলবি, দারোগা না থাকলে তোদের বাড়িতে চুরি হলে কি করবি? একেবারে ফকির হয়ে যাবি।

মুখে মুখে কথার জবাব আনু কোনদিন দিতে পারে না। সেজ আপা শিখিয়ে দিলেও তা আর বলা হয় না।

মাস্টার সাহেবের কাছে পড়ছিল আনু। তিনি বললেন, আজ তোমার কী হয়েছে?

কিছু না।

তো পড়ছ না কেন?

বারে, পড়ছি তো।

বলে আনু মন দেয় বইয়ের পৃষ্ঠায়। এবার সত্যি সত্যি মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকে সে। আর মাস্টার সাহেব তার কলেজের বই খুলে নিজেও পড়ছেন। আনুর খুব ভালো লাগে মাস্টার সাহেবকে। রোজ সকালে সাড়ে ন'টার ট্রেনে রংপুর যান কলেজ করতে। আবার ফিরে আসেন সন্ধ্যায়। বাবার কাছে সে শুনেছে, মাস্টার সাহেব নাকি খুব গরিব, কষ্ট করে যারা লেখাপড়া করে তারা অনেক বড় হয়। আনু খুব খুশি হবে, যেদিন মাস্টার সাহেব পাশ করে খুব বড় চাকরি করবেন।

আনুকে একটুও বকেন না মাস্টার সাহেব। বাড়িতে থাকলেও মনে হয় বাড়িতে নেই। একটুও সাড়া পাওয়া যায় না। বাইরের ঘরে চুপচাপ পড়ে থাকেন। আনুকে কত অদ্ভুত সব ছবি এনে দেন, বিলিতি ছবি, কাগজ থেকে কাটা ছবি। আনুকে একটা খাতা করে দিয়েছেন; সেই খাতায় ছবিগুলো সেঁটে রাখে আনু। অবসর সময়ে বসে বসে দেখে। কত দেশের ছবি, গম ক্ষেতের ছবি, হ্রদের ছবি, পাহাড়-পর্বতের ছবি। পাহাড় দেখতে এত ভালো লাগে আনুর প্রথম যেদিন ধরলার পাড়ে ভোর বেলায় বাবার সঙ্গে সে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখল, রোদে এক মুহূর্তের জন্যে ঝলমল করে উঠেই আবার নীল হয় চূড়াটা, আনুর মনে হলো জেগে জেগে এক অপূর্ব রঙিন স্বপ্ন দেখছে সে।

বড় আপা ভেতর থেকে দরোজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আনুকে ফিসফিস ক'রে জিগ্যেস করলেন, মাস্টার সাহেবকে ভাত দেব নাকি জিগ্যেস কর।

মাস্টার সাহেব হঠাৎ কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, আজ ছুটি। ঈদে

মিলাদুন্নবী। কলেজ নেই আমার।

তাই তো! আনুরও মনে ছিল না, আজ তার স্কুলও বন্ধ। বড় আপা আরো এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলেন তখন। মাস্টার সাহেব এতক্ষণ বইয়ের পাতায় মনোযোগ রেখেছিলেন, চোখ তুলে খুব ঝরঝরে গলায় বললেন, পড়ো আনু পড়ো। সময় নষ্ট করতে নেই।

বাবা চলে গেলেন বেলা দশটা নাগাদ। যাবার সময় আজ আনুকে ডেকে আস্ত একটা সিকি দিয়ে গেছেন। সিকি! অন্যদিন হলে বাসার সবাইকে একবার করে না দেখিয়ে ছাড়ত না। আজ তার সেই যে মনটা ম্লান হয়ে গেছে সকাল বেলায় আর কিছু ভালো লাগছে না। আজ সে সিকিটা পেয়ে চকোলেটের দোকান থেকে দুটো চকোলেট কিনে ফিরে এলো।

বাসায় এসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চুষতে লাগল চকোলেট। ভাবল, তাকে অবহেলায় শুয়ে থাকতে দেখে সবাই এসে আদর করবে। কিন্তু কেউ তাকে তাকিয়েও দেখল না। তখন অভিমান হলো আরো। তার চোখের সামনে দেয়ালটা শাদা– বাঁশ ছেঁচে তার ওপর সিমেন্টের পলাস্তরা করে চুনকাম করে দিয়েছে। একেক জায়গায় ভেঙে বাঁশ বেরিয়ে পড়েছে। ভারী বিশ্রী লাগছে; আনু উঠে দাঁড়াল। পেন্সিল নিয়ে দেয়ালে, তার পড়ার টেবিলের ওপরে একটা হাঁস আঁকলো। তারপর পাশে বড় বড় করে লিখল 'আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ, মেক্স ম্যান হ্যাপি অ্যান্ড ওয়াইজ।' লিখতে লিখতে ক্ষয়ে গেল পেন্সিলটা। তাতে কী? আনুর এখনো তিন আনা আছে, সে নতুন একটা পেন্সিল কিনে নেবে।

বড় আপা এ ঘরে এলেন। আনু বলল, একটা জিনিস খাবি আপা?

কিরে?

মুঠোয় করে চকোলেটটা তার হাতে গুঁজে দেয় আনু। কেমন লজ্জা করে। বড় আপার মুখটা হাসিতে রাঙা হয়ে ওঠে। নিয়ে চলে যেতে চান তিনি। আনু তাঁর আচল ধরে টানে।

বাইরে গেলে ওরা সবাই দেখবে। আমার কাছে যে আর নেই।

আচ্ছা, আচ্ছা।

চৌকির কোনায় বসে বড় আপা মোড়কটা খুলে মুখে পুরে দেন। চুষতে গিয়ে বুড়িদের মতো গাল বসে যায় তাঁর। আনু হাসে। বড় আপা বলেন, খুব মিষ্টিরে। তুই খেয়েছিস?

ভাই বোনদের ভেতরে আনু সবচে ভালোবাসে বড় আপাকে। ওর মনে হয়, ওর মতো তাকে কেউ এত ভালোবাসে নি। আনু শুনেছে, ও যখন কোলে, তখনই বড় আপার স্কুলের লেখাপড়া শেষ হয়ে গেছে। তারপর কত জায়গা থেকে বিয়ে এসেছে বড় আপার, কিন্তু কোনটাই বাবার পছন্দ হয় নি। মনের মতো কাউকেই খুঁজে পাননি তিনি। আর যাদের পছন্দ হয়, তাদের সাথে বিয়ে দিতে অনেক টাকা লাগে। অত টাকা কোথায় পাবেন বাবা? তার বাবার যে টাকা নেই— এই কথাটা আনু সেই ছোটবেলা থেকে উঠতে বসতে শুনে এসেছে। সেই ছোটবেলা থেকে টাকার প্রতি এক দুর্বোধ্য রহস্যবোধ শেকড় গেড়ে বসেছে আনুর মনে। আলীবাবার গল্পে যখন গুহার দরোজা খুলে যায় আর ঝলমল করে লক্ষ লক্ষ হীরে মণি মুক্তো চুণী পান্না, শুনতে শুনতে আনুর চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যেত। তার মনে হতো, সে নিজেই যেন সেই গরিব কাঠুরে আলীবাবা। মনে হতো, সে যদি ও-রকম একটা গুহার সন্ধান পেয়ে যেত কোনদিন! তাহলে কী মজাটাই হতো। কার কাছে যেন শুনেছিল, অনেক সময় গাছের কোটরে বুড়ো বুড়ো বটগাছের শেকড়ের ফাঁকে গর্তের মধ্যেও মণি

মুক্তো লুকোনো থাকে। কতদিন সে কত গাছের কোটরে উঁকি দিয়ে দেখেছে। একদিন হয়ত পেয়েই যাবে আনু। সেদিন মা আর মুখ কালো করে থাকবেন না, বাবার আর থানায় চাকরি করতে হবে না, তাদের আর কোনো কষ্টই থাকবে না। একরাতে আনু স্বপ্ন দেখেছিল উঠোন ভর্তি ছড়ানো রাশি রাশি নতুন টাকা, আর তার ওপরে মজা করে লাফাচ্ছে আনু, টাকাগুলো মুঠো ভরে তুলছে, ঢেলে ফেলছে, টুং টুং শব্দ উঠছে মিষ্টি বাজনার মতো।

আনু বুঝতেই পারে না বাবা মা কেন এত অস্থির হয়ে উঠেছেন বড় আপা মেজ আপা সেজ আপার বিয়ে দেবার জন্যে। সবার কাছে সে শোনে, ছোট দারোগার বউ বলে, পিন্টু বলে, কোর্ট দারোগার বুড়ি ফুপু বলে। এত বড় বড় সব মেয়ে।— এদের ঘরে রাখে নাকি? ঘরে রাখলে মুখে কালি দেবে একদিন। আনু ভাবতে পারে না, মুখে কালি দেবে কী করে তার আপারা? তার বিশ্বাসই হয় না, না বলে না কয়ে তার বড় আপা কারো সাথে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবে। গা শিরশির করে ওঠে আনুর। সেদিন ছোট দারোগাদের বাড়িতে তার ব্যাট বল গিয়ে পড়েছিল। সেইটে আনতে গেছে, তাকে ধরে ফেললেন ছোট দারোগার বৌ। আদর করে বসালেন। আনু উসখুস করছিল, তার খেলা দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া বৌটাকে তার একেবারে পছন্দ না। মাকে সারাক্ষণ কী সব বলে আর মা-র মুখ আঁধার হয়ে যায়। আনুকে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মাস্টার সাহেবের কথা জিগ্যেস করলেন। তারপর হাতে একটা কাউনের মিষ্টি মোয়া দিয়ে শুধোলেন, তার বড় আপার সঙ্গে মাস্টার সাহেব হেসে হেসে কথা বলে কিনা, একলা ঘরে দেখা হয় নাকি, মাস্টার সাহেব সারাদিন বাড়ি ছেড়ে একদণ্ড বাইরে যায় না কেন? এই সব। আনু প্রত্যেকটা কথার বিরুদ্ধে সজোরে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করে। তখন ছোট দারোগার বৌ তার গালে ঠোনা দিয়ে বলেন, আরে, সেদিন আমি দেখলাম মাস্টার তোর আপার হাত ধরে আছে। তুই না ভাই? তুই ধরতে পারিস না?

আনু অবাক হয়ে যায়। সত্যি দেখেছে নাকি বৌটা? সত্যি বড় আপার হাত ধরে ছিল মাস্টার সাহেব? আনুর চোখ ছলছল করে ওঠে। ফাঁদে পড়া পাখির মতো ছটফট করে সে। মাথা নেড়ে বলে, যাঃ। মাস্টার সাহেব কত ভালো।

সেইজন্যেই তো তোর বাবা নিজে খেতে পায় না, আবার বাড়িতে পর পুরুষ যোয়ান ছেলে এনে পুষছে।

তারপর তার হাতে আরো দুটো মোয়া গুঁজে দিয়ে সাবধান করে দেন ছোট দারোগার বউ, খবরদার, কাউকে বলবি না, আমি কী বললাম। বুঝলি? তোর মাকেও না। আমি বাবা তোদের সাতে-পাঁচে থাকতে চাই না। আমার মন পরিষ্কার। তাই পেটের কথা বলে ফেলি। আর বলব না বাবা, তওবা, তওবা। যাহ্।

এক দৌড়ে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে আনু। কিন্তু খেলায় আর মন বসে না। তার দেরি দেখে ছেলেরা খুব ক্ষেপে গেছে। তাদের হাতে বল-ব্যাট সব ছেড়ে দিয়ে সে চুপ করে পথের ধারে কালভার্টের ওপর বসে থাকে। আজ হাটবার। হাটের দিকে লোক যাচ্ছে, বাঁকে করে আলু-পটল চালের বস্তা নিয়ে, কুমড়ো কাঁধে ঝুলিয়ে, মুরগিগুলো ঠ্যাং জড়ো করে বেঁধে। আবার সরষের তেল যাচ্ছে ভাঁড়ে করে। থানার কাছে অফিসার জলচৌকি পেতে বসেছে। সেখানে সব তেলওলা এসে ভাঁড় রাখছে আর তাদের তেল খাঁটি কিনা পরখ করে দেখছে অফিসারটা। একেকজনের কাছ থেকে এক পো আধসের তেল আবার তুলে রাখছে আলাদা একটা টিনে। হাত জোড় করে মাফ চাইছে একজন।

আনুর মনে পড়ে যায়, পয়লা দিন দেখেই মেজ আপা না সেজ আপা বলেছিল— বেশ্যার মতো। হোক খারাপ কথা, ঠিক বলেছে। ছোট দারোগার বউ তাছাড়া কি? কী বিচ্ছিরি কথা বলে আর পিচ্ পিচ্ করে হাসে। আবার রাতে একেকদিন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গায়। চেরা গলা, একটুও মিষ্টি লাগে না শুনতে, তার কত ঢং। একটা কথাই বারবার করে ঘুরে ফিরে গায়– 'প্রিয়, মধুরাতে সাজিল মন।' গানের আওয়াজ পেলেই বাবা কেমন অস্থির হয়ে ওঠেন। আনুকে বলেন, ঘুমো, ঘুমোসনি কেন?

আনু ভাবে, দূর ছাই, তারচে বিয়ে হয়ে যাক তার আপাদের। তাহলে খুব শিক্ষা হয় সবার। কেউ আর কিছু বলতে পারবে না তখন আনুকে। তখন আনু সবার সামনে বুক ফুলিয়ে যাবে। তখন কেউ কিছু বললে আর ছেড়ে দেবে না আনু। ইয়াসিনের কাছে চমৎকার কুস্তি সে শিখে নিয়েছে। তখন আর কেউ কিছু বলতেই সাহস পাবে না আনুকে।

কিন্তু বিয়ে দিতে গেলে যে অনেক টাকা লাগে। এত টাকা কোথায় পাবেন বাবা? চাচার কাছে গিয়েছিলেন, চাচাও ফিরিয়ে দিলেন খালি হাতে। ফিরে এসে বাবা কী রাগ করলেন মা-র ওপর! তারপর নিজেই বললেন, নাহ্, তোমার আর দোষ কি!

সেদিন আপারা ভয়ে লজ্জায় কেউ আর বাবার সামনে আসেননি।

কদিন আগে মহিমপুর থেকেই দু'টো বিয়ের কথা এলো বড় আপা মেজ আপার জন্যে। একজনের একটা সাইকেলের দোকান আছে। আনু ইস্টিশানের কাছে ভাব দোকানটা দেখেছে, আর একজন টাউন ক্লাবের লাইব্রেরিয়ান, বাড়িতে নাকি বিস্তর ধানের জমি আছে। মেজ আপা আই. এ. পরীক্ষা দেবে প্রাইভেটে সামনের বছর, পড়াশোনার খুব শখ ওর। বিয়ের কথা শুনে কেঁদে সারা হলো। বড় আপার কিন্তু কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। আগের মতোই রান্না নিয়ে ব্যস্ত, উঠোন ঝাড় দিচ্ছেন, বিছানা পাতছেন বিকেল বেলায়। যেন তার নয়, অন্য কারো বিয়ের কথা চলছে।

সাইকেলের দোকানটা দেখেছে আনু। ঝকঝকে দুটো নতুন সাইকেল রাখা, শো-কেসে পার্টস সাজানো আর সামনে মেরামতি হয়। লোকটা ভারী ফুলবাবু। ফিনফিনে জামা গায়ে সারাক্ষণ আশেপাশের দোকানে বসে আড্ডা মারছে। আবার ট্রেন এলে খামকা প্ল্যাটফরমে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। কী যেন খোঁজে, চারদিকে পাতিপাতি করে দেখে ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট ঝুলিয়ে। আবার ফিরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোকানে গেলাশে চা খায়। আবার লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোকটি রোজ বিকেলে টাউনক্লাবের দরোজা খোলেন কোথা থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসে। দারোয়ান ঘর ঝাড় দেয়। হ্যাজাকটা বার করেন তিনি। তেল ভরে দিলে নিজ হাতে জ্বালান। রেডিওটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গান ধরেন। আনু মাঝে মাঝে রেডিওর গান শুনতে আসে এখানে। লোকটা যা কালো আর মোটা। মুখটা সেই আন্দাজে কচি, একেবারে দশবারো বছরের ছেলের মতো। হাসি পায় দেখলে। এদের সঙ্গে বিয়ে হবে নাকি আপাদের? মা-র কিন্তু একটু পছন্দই হয়েছে।

সেদিন অনেক রাতে কি করে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় আনুর। চারদিকে অন্ধকার থইথই করছে। প্রথমে ভয় পেয়ে আতকে উঠেছিল আনু, কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল। তারপরেই ফিরে এসেছে সাহসটা। বাবার গলা শোনা যাচ্ছে। বাবার বিছানার পাশে এসে বসেছেন মা। পান খাচ্ছেন বুঝি। কুটকুট করে সুপুরি ভাঙার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বাবা মাকে বলছেন, না তা

হয় না। ঐ অপদার্থ দুটোর সাথে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেয়ে পানিতে ফেলে দেওয়া ঢের ভালো। বুঝেছ?

মা আহত স্বরে বললেন, কত তুমি জামাই আনছো রোজ! এক পয়সা দাবি নাই, বাড়ির অবস্থা ভালো, আর কি চাও ? এক সাথে দুই কাজ হতো, ঝামেলা কত কম।

বাবা সে সব কিছুই শুনলেন না। বললেন,তার চে' মেয়েদের গলা টিপে মারবো। কী বংশ কী লেখাপড়া– সবদিক থেকে দেখবে না তুমি?

বাবার এমন কঠিন কণ্ঠস্বর আনু কোনদিন শুনেছে বলে মনে পড়ল না। অন্ধকারে তার গাও ছমছম করে উঠল। পাত্র দুটো যে বাবার পছন্দ হয়নি, এত খুশি হয়েছে আনু— কিন্তু সে খুশিটাও কেমন যেন ভয়ের মতো দলা পাকিয়ে শক্ত হয়ে রইলো তার বুকের ভেতরে। মা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর এক সময়ে বললেন, এতগুলো টাকা ঢালতে পারবে না, কোন্ জজ ম্যাজিস্টার এসে তোমার জামাই হবে তুমিই জানো।

আহা, ওদের ভালো ঘরে বিয়ে দিতে হবে তো? তোমার বড় ছেলে সে তো লেখাপড়াই করলো না। অন্তত জামাই নিয়ে যদি দশজনের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারো, তাও তো বংশের নাম থাকে।

বাবার কণ্ঠস্বর অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। একটু যেন বিষণ্ণও শোনাচ্ছে। যেন নিজেকেই কথাগুলো বলছেন বাবা। বললেন, টাকারই যুগ পড়েছে এখন। আমাদের ছোটবেলায় দেখতাম লোকে অমুক বাড়ির ছেলে বলে পরিচয় দিলে আর কিছু লাগত না। তা আমি কি আর ম্যাজিক জানি যে তুড়ি দিলেই টাকা আসবে? অধর্ম করবো না বলেই তো— নইলে তুড়ি দিলেও টাকা আসে। একেকটা এমনও কেস আসে, সুযোগ তো কত হয়েছিল, পাঁচ দশ হাজার হাতে গুঁজে দিয়ে যায়। নিলেই হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে জবাব দেব কী? আল্লাহ্ যখন হাশরের মাঠে ডেকে জিগ্যেস করবেন— গোলাম হোসেন, তোমাকে দিলাম জুলুম আর অন্যায় থেকে মানুষকে রক্ষা করতে, তুমি তারই গোলাম হয়ে গেলে? কী জবাব দেব তখন বলো? এও আল্লাহ্‌র এক পরীক্ষা আনুর মা।

মা হঠাৎ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে কেঁদে ফেললেন। তাঁর কান্নাবিকৃত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তুমি তো আর বাসায় থাকো না। তুমি পেটেও ধরো নি। দিন রাত্তির পাড়াপড়শির কথা শুনতে কেমন লাগে তা তুমি বুঝবে কী করে?

শুনে আনুর মনটা হু-হু করে উঠল। কান্না পেল। চলচ্ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠল আপাদের চেহারা, ছোট দারোগার বৌয়ের পিচপিচে হাসি, চাচার মুখ, সাইকেলের দোকান, টাউনক্লাবের রেডিওটা। টাকা তো দিতে চায় লোকে, কেন নিতে চায় না বাবা? কী হয় নিলে? বাবার ওপর ভীষণ আক্রোশ হতে থাকে তার। আল্লাহ্ যখন জিগ্যেস করবে তখন আল্লাহ্ কী বুঝবে না দরকার ছিল খুব তাই নিয়েছে বাবা। আল্লাহ্ সব জানে। তবু বাবা কেন জেদ করে থাকে? বাবা কি! ধর্ম আর অধর্ম কথা দু'টো কতবার বাবার মুখে শুনেছে সে; ভালো করে প্রসঙ্গ বোঝেনি, অর্থ স্পষ্ট হয়নি, কিন্তু এতটুকু বুঝতে পেরেছে আনু, যে একটা শক্ত দড়িতে তারা অসহায়ের মতো বাঁধা পড়ে গেছে। বালিশে মুখ গুঁজে আনু ভাবে– আমি যখন বড় হব, আমি কিচ্ছু মানবো না, কিচ্ছু শুনবো না।

ঘুম থেকে উঠে দেখে বেলা অনেক হয়ে গেছে। ফুল কুড়োবার জন্যে সালু আপা তাকে ডেকে

ডেকে একাই চলে গেছে কখন। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আনু দেখতে পেল একে একে সবাইকে– মা, বাবা, বড় আপা, মেজ আপা, সেজ আপা, মিনু আপা, ছোট আপা। তবু সবাইকে কেমন নতুন আর অচেনা মনে হলো আনুর। মনে হলো, কাউকে সে কোনদিনই চিনতো না। মনে হলো, যেন সবাই অন্য বাড়ি থেকে বেড়াতে এসেছে।

বাবা নেই, বাসাটা তাই বড্ড খালি খালি ঠেকছে। 'দুধ নেবে গো' সেই কখন হেঁকে গেছে, আকাশে গড়িয়ে পড়েছে দুপুর, বড় বড় গাছের ছায়াগুলো ক্রমেই লম্বা হয়ে আসছে আর আনুদের বাসাটা যেন আরো একেলা হয়ে যাচ্ছে। বাসার কাছেই থানা বলে প্রায় দুপুরবেলাতেই বাবা আসতেন একটু চোখ বুঁজতে। কিন্তু আজ তো বাবা নেই। বাবা গেছেন মফস্বলে। মা আপারা শোবার ঘরে কেউ শুয়ে কেউ মেঝেয় বসে গল্প করছেন, উল বুনছেন। আনু হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিল ইস্টিশানে। একা একা বসে ছিল গোডাউন শেডে পাটের বেলের ওপর। সেখানেও ভালো লাগল না তার। তখন আবার ফিরে এলো বাসায়।

বাইরের ঘরে এসে ঢুকতেই মাস্টার সাহেব বিছানা ছেড়ে উঠে বসে বললেন, আনু, তোমাদের একটা চিঠি এসেছে এইমাত্র। ওই তো টেবিলের ওপর দ্যাখো।

আনু চিঠিখানা হাতে নিয়ে জিগ্যেস করে, কার চিঠি মাস্টার সাহেব?

কী জানি।

আনু তাকিয়ে দেখে খামের ওপরে লেখা 'ফ্রম পানু, ঢাকা।'

পানু, পানু ভাই! ঢাকা থেকে লিখেছেন! একদৌড়ে চিঠিখানা নিয়ে আনু ভেতরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, মা, মা, বড় আপা, পানু ভাইয়ের চিঠি এসেছে।

বড় আপা তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করলেন। আর সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে গোল হয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলো। তিনি দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার, তারপর হেসে ফেললেন। তখন সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল বড় আপার নিঃশব্দ হাসিটা। বললেন, মা, ভাইয়া চাকরি পেয়েছেন।

চাকরি!

সবাই সমস্বরে বলে উঠল।

হ্যাঁ, রেলের। অ্যাসিসট্যান্ট স্টেশন মাস্টার।

ধক করে উঠলো আনুর বুকের ভেতর। রেলের চাকরি: স্টেশন মাস্টার! আনু কি স্বপ্ন দেখছে! খপ্ করে সে চিঠিটা কেড়ে নিতে গেল, আমি আগে দেখি।

তুই কী দেখবি? ভাগ্।

সেজ আপা থাপ্পড় দিয়ে তার উদ্যত হাতটা ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু আজ রাগ করলো না আনু। বরং সে গোড়ালির ওপর খুশিতে এক পুরো চক্কর কেটে চেঁচিয়ে উঠল, হিপ্ হিপ্ হুররে।

সবাইকে চিঠিটা পড়ে শোনালেন বড় আপা। মাইনে ভালো। এবার ঈদের ছুটিতে বাড়ি আসবেন। কার কী চাই যেন আগে থেকেই লিস্টি করে পাঠিয়ে দেয়। মা বাবাকে সালাম আর সবাইকে স্নেহাশীষ। ছোট্ট এতটুকুন। তবু কী খুশি একেকজন। বারবার পড়েও যেন

ফুরুচ্ছে না। মা তো দু'বার পড়েও যেন কোনো অর্থ উদ্ধার করতেই পারলেন না, এত খুশি হয়েছেন তিনি। বারবার বলছেন,

আমি কিছু দেখতে পারছি নারে। পানুকে বলব এবার আমাকে একটা চশমা করে দেয় যেন। একবর্ণ পড়তে পারি না।

পড়বেন কী করে? আনু দেখেনি বুঝি? মার চোখে পানি এসে গিয়েছে।

সালু আপা বলল, আমি এক বাক্স ডি-এম-সি সুতো আর এক ডজন সোনামুখি সুঁই।

মেজ আপা বড় আপাকে ঠেলা দিয়ে বললেন, তুই কী নিবিরে?

উত্তরে কিছুই বললেন না বড় আপা। শুধু ম্লান হাসলেন। আনুর এত খারাপ লাগে, বড় আপার একটুও শখ নেই। সারাদিন শুধু কাজ করবে, ছাই মাখাবে হাতে, মাথায় খড়ি পড়ে যাবে। যাক্‌গে, তার কী? আনু নিজেই একটা চিঠি লিখবে। বলবে, আমার জন্যে একটা সত্যিকারের গার্ডের বাতি এনো পানু ভাই। আর তারপর হঠাৎ উদার হয়ে গেল মনটা। সে আরো লিখে দেবে, বড় আপার জন্যে একটা খুব ভালো শাড়ি আনে যেন পানু ভাই।

'ঘরে ঝোলানো একটা ছবি ছিল পানু ভাইর। মা সেদিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। তাঁকে একেবারে নতুন দেখালো তখন। তখন যেন মনে পড়ল সবার। তখন সবাই ছবিটার দিকে তাকাল।

বাবা মফস্বল থেকে ফিরে এসে চিঠিখানা পড়লেন। চিঠিখানা আনু এ কদিন নিজের হেফাজতে রেখেছিল বাবাকে দেবে বলে। পকেটে করে ক্লাশেও নিয়ে গেছে। মুন্সেফের ছেলে দেবুর সঙ্গে খুব ভাব। দেবুকে দেখিয়েছে চিঠিটা। আর বলেছে, পানু ভাই তার জন্যে গার্ডের বাতি নিয়ে আসবে। দেবু তাকে এখন থেকেই চীনেবাদাম খাইয়ে রাখছে, বাতিটা এলে একদিনের জন্যে সে খেলতে নেবে।

পড়া শেষ করে বাবা বললেন, যাক, পানুর তবে একটা হিল্লে হলো এবার, কি বলিস? আনু, তুমিও লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে আরো বড় চাকরি করবে। অনেক মাইনের। কেমন?

শুনে বোকার মতো হাসতে থাকে আনু। বাবা মনে করেন আনুর বিশ্বাস হচ্ছে না। তাই তিনি আবার বললেন, হ্যাঁ তাই তো। মিছে কথা কি বলছি? আনু তখন ম-স্ত বড়লোক, কত টাকা কত কী। ঢুকতে দারোয়ানের কাছে নাম লেখাতে হবে। বলতে হবে— আমি সিভিল সার্জনের কাছে যাবো।

বাবার বড় শখ আনু সিভিল সার্জন হয়।— আনুকে বাবা একটানে নিজের হাঁটুর ওপর তুলে বসিয়ে দেন। পা দোলাতে থাকেন। আনুর ভারী লজ্জা করে। সে কি ছোট এখনো?

বড় আপাকে দেখে আরো লজ্জা করে তার। বড় আপা বলেন, বাবা তুমি হাতমুখ ধোবে না? নামাজের বেলা যায়।

ওরে তাই তো। নাম তো বাবা। যাঃ।

আনুর পাছায় চটাস্‌ করে একটা মিষ্টি থাপড় লাগিয়ে দেন বাবা। তারপর কাপড় ছেড়ে ওজু করতে বসেন। মফস্বল থেকে পাকা পেপে এনেছেন বাবা। সেইগুলো কাটা হচ্ছে রান্নাঘরে। আনু একদৌড়ে সেখানে গিয়ে উবু হয়ে বসে। যেন একাই সে আজ সবগুলো খেয়ে ফেলবে।

ট্রেনটা হুস-হুস ঝক-ঝক করতে করতে অবশেষে স্টেশনে থামলো। মাঝখানে আবার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ডিস্‌ট্যান্ট সিগন্যালের পারে। ডাউন দেয়নি। সিগন্যালটা থানার একেবারে কাছে। আগে জানলে, ইস্‌ আনু গিয়ে ওখানেই দাঁড়াত। কে আসত এতদূর কষ্ট করে স্টেশন পর্যন্ত বয়ে।

ট্রেন দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লোকে লোকে থইথই হয়ে গেল প্ল্যাটফরম। আনু কাছে যেতে পারছে না, কিছু দেখতে পারছে না। বাবা তাকে স্টেশনে পাঠিয়েছেন পানু ভাইকে আনবার জন্যে। সঙ্গে ইয়াসিন আছে। ইয়াসিন বলল, খোকাবাবু ইরকম কি দেখতে পাবেন? আপনাকে হামার কাঁধে লিয়ে লি।

ইয়াসিন নিচু হয়ে কাঁধ পেতে দিল তার। একলাফে আনু সওয়ার হলো তার ওপর। যাঃ ভারী খারাপ দেখাচ্ছে। আগে ভাবেনি, কাঁধে উঠে খারাপ লাগছে খুব। হাসি পাচ্ছে। ক্লাশের কেউ দেখে ফেললে যা খেপাবে। আরে ঐতো'

পানু ভাই হাত নেড়ে নেড়ে ডাকছেন, আনু আনু।

সেকেণ্ড ক্লাশে এসেছেন পানু ভাই। রেলের লোক তো। চাট্টিখানি কথা নয়। আনু খুশির তোড়ে পা ছুড়তে থাকে। ইয়াসিন ঊর্ধ্বমুখ হয়ে শুধোয়, ভাইয়া?

আরে আমাকে নামাও না।

একদৌড়ে আনু ভিড় ঠেলে পানু ভাইর কাছে গিয়ে হাজির হয়। তিনি তার হাত দু হাতে ধরে ফেলেন।

এসেছিস?

ইয়াসিন এসে লম্বা সালাম ঠেকে। দাঁত বার করে জানায়, হামি ইয়াসিন সেপাহি, বড় খোকাবাবু। আপনার সামনে কী আ্যে?

পানু ভাই আনুকে জিগ্যেস করেন, বাসা কদ্দুর রে?

আনন্দে এতক্ষণ একটা কথা বলতে পারেনি আনু। এবারে সে মহা উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, এই তো, এখানে। ঘোড়াগাড়ি নেবে? টমটম? আট আনা নেবে। হ্যাঁ চলো টমটমে যাই।

টমটম ওঠার ভারী শখ ছিল আনুর। প্রথম যেদিন এসেছিল ওরা মহিমপুর, হেঁটেই গিয়েছিল বাসায়। সারা মহিমপুরে টমটম মাত্র তিনটে। তাও আগে থেকে ভাড়া হয়ে থাকে; দূরের গাঁয়ে ভাড়া করে প্যাসেঞ্জারেরা নিয়ে যায়। আজ আনু দেখে এসেছে, দু'টো টমটম দাঁড়ানো। টকাটক টকাটক শব্দ তুলে টমটম চলতে লাগল লাল সুরকির রাস্তা দিয়ে। কোচোয়ান আবার পথ থেকে লোক সরাবার জন্যে হাতের ছড়িটা ঘুরন্ত চাকায় ছোঁয়াচ্ছে, শব্দ উঠছে কররররঠক। অবাক হয়ে আনু দেখছে পানু ভাইকে।

কতকাল সে দেখেনি। মনেই পড়ে না শেষ কবে দেখেছে। শেষবার যখন তাঁকে দেখেছিল আনু, তখন কী রোগা আর ফ্যাকাশে ছিলেন পানু ভাই। চুলগুলো ছিল বাঁয়ে সিঁথি করা, বালিশের নিচে রেখে ইস্ত্রি করা জামা পরতেন তখন। এখন একেবারে অন্য মানুষের মতো মনে হচ্ছে সেই পানু ভাইকে। ধরতে গেলে যেন চেনাই যায় না। মাথার চুল পেছন দিকে উল্টিয়ে সিঁথি করেছেন, ধোবাবাড়ির ধোয়া শার্ট পরেছেন, গা থেকে আবছা একটা মিষ্টি

গন্ধ বেরুচ্ছে। ট্রেনে আসবার ক্লান্তি এতটুকু লেখা নেই কোথাও। সেকেণ্ড ক্লাশ তো বাড়ির মতো। শুয়ে বসে যেমন খুশি আসো। ভিড় নেই, কী মজা! আনু এবার পানু ভাইকে বলে সেকেণ্ড ক্লাশে চাপবে, রাজশাহী-টাজশাহী যাবে। আবার সিগারেট খেতে শিখেছেন পানু ভাই। গুনগুন করে গান গাইছেন।

হঠাৎ চোখে চোখ পড়ে গেল। লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল আনু। পানু ভাই গান থামিয়ে হেসে জিগ্যেস করলেন, কিরে? লেখাপড়া করছিস, না, খালি টো-টো?

ধেৎ। আমাকে ফোরে নিতেই চায় না, হেডমাস্টার আমাকে নিজে পরীক্ষা করে তবে ফোরে নিয়েছে।

তাই নাকি?

কেমন অদ্ভুত একরকম চোখ করে পানু ভাই কথা বলেন, যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছেন, তার চোখটা সেইসব স্বপ্নের ছবি দেখে ফিকফিক করে হাসছে। আনু প্রতিবাদ করে ওঠে, বাবাকে জিগ্যেস কোরো না তুমি? এখানে সব নতুন বই। তাই আমি বলে সব পড়ে ফেলেছি।

বাহ্। আর চাই কী?

পানু ভাই আবার গুনগুন করেন খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ শুধোন, হ্যাঁরে, বাবা আমার চাকরির কথা শুনে কী বলল?

কী খুশি সকলে। বাবা মিলাদ পড়ালো সেদিন। আমি ইস্টিশনের দোকান থেকে জিলিপি কিনে এনেছিলাম তিন সের।

হাঃ হাঃ হাঃ।

গলা খুলে হাসতে থাকেন পানু ভাই। তার হাসির শব্দ চাকার শব্দ একাকার হয়ে এক তালে বাজতে থাকে। আনু ভেবেই পায় না এতে হাসবার কি আছে? কিন্তু সেও হেসে ওঠে। বলে, কত লোক হয়েছিল।

চারদিকে দেখতে থাকেন পানু ভাই তার হাসি-হাসি চঞ্চল চোখ মেলে।

মহিমপুর তো বেশ শহর।

আবার নদী আছে পানু ভাই। নদীর পাড় থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। কাল সকালে তোমাকে নিয়ে যাবো।

কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার নামে বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না পানু ভাইর। বরং তিনি আনুকে অবাক করে দিয়ে জিগ্যেস করলেন,

মাছ কেমন নদীতে? জানিস?

আনু হঠাৎ প্রসঙ্গটা বুঝতে পারে না। তার মনে পড়ে যায়, তাড়াতাড়িতে খেয়াল করেনি, পানু ভাই যখন বাক্স নামিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন তিনটে বড় বড় হুইল লাগানো ছিপ দেখেছিল। ছিপগুলো ইয়াসিনের হাতে দিয়ে পানু ভাই বলেছিলেন, হুঁশিয়ারি সে লে জানা। বহুৎ নাজুক হয়।

মুঝে মালুম হ্যায় বড়া খোকাবাবু।

আনু বিস্মিত গলায় বলে টমটমের দুলুনিতে দুলতে দুলতে, তুমি ছিপ দিয়ে মাছ ধরো?

দূর বোকা! ছিপ দিয়ে মাছ ধরবো না তো কি বাঘ মারবো?

তা পানু ভাই যদি বলতেন যে ছিপ দিয়ে বাঘও তিনি মারেন তাহলেও অবিশ্বাস করতো না আনু। কারণ, তার ভাই জগতের সবচে অসম্ভব অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর কাজ করেন— রেলের স্টেশন মাস্টার তিনি। কেমন অজানা এক রহস্যের ঘ্রাণ তাঁর চারপাশে। আনু যেন একেবারে সম্মোহিত হয়ে যায়। তার বিশ্বাসই হয় না, এই লোকটা, এই পানু ভাই, তার বড় ভাই।

টমটমওলা ঘাড় বাঁকিয়ে জিগ্যেস করে, কোন্‌টে খাড়া করিম? বাসার গেটৎ?

বাসার সামনে এসে গেছে টমটম। আনু আধো উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক্কেবারে গেটে লাগাও।

গাড়ির আওয়াজ পেয়ে আপারা সব ছুটে এসেছেন দরোজায়। তাদের একপাশে মা মাথায় ঘোমটা তুলে দিতে দিতে এসে দাঁড়ালেন। মুখখানা তার থিরথির করে কাঁপছে, যেন পানিতে ছায়া পড়েছে। আনু লাফ দিয়ে নামবার সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন করে উঠল সবাই। সে গুঞ্জনের কোনো অর্থ নেই, একটা সুরের মতো।

পানু ভাই সবার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। খামোকা মাথার চুলে হাত ঘষলেন, তারপর বড় আপা মেজ আপাকে জিগ্যেস করলেন, কেমন আছিস?

কাছে আসতেই, আনু দেখে, মা-র চোখে পানি। সে পানি ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে। মুছবার চেষ্টা করছেন না। পানু ভাই কাছে আসতেই তার গায়ে হাত রেখে মা এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। আনুর বড় অদ্ভুত লাগলো। আপারা সবাই হাসছেন, তাদের হাসি হাসি মুখগুলো ছবির মতো জ্বলজ্বল করছে, পানু ভাইকে লজ্জিত বিব্রত দেখাচ্ছে, মা কাঁদছেন অথচ তার মুখেও হাসি। আনু একেবারে অবাক হয়ে গেল।

হঠাৎ পানু ভাই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আনুকে জিগ্যেস করলেন, ভাড়া কতরে?

আট আনা।

টমটমওলা একগাল হেসে বলল, না মুই আট আনা নিবার নই। এক টাকা দেন তোমরা।

আনু ধমকে ওঠে, কিসের এক টাকা?

কেনে? হামার খুশি নাগে না? বড় খোকা বাড়িতে আইচ্চেন, হামাকে তোমরা এক টাকা দিবেন না কেনে?

পানু ভাই তাকে আস্ত একটা টাকাই দিয়ে দিলেন।

বাবা উঠোনে একটা মোড়ায় বসে মুরগির বাচ্চাগুলোকে খুদ দিচ্ছিলেন। চোখ তুলে তিনি বললেন, এলি?

পানু ভাই তাঁর কাছে এসে কদমবুসি করল। বাবা তখন আরো মুঠো মুঠো খুদ দিলেন ছড়িয়ে। দিয়ে হাতটা একেবারে খালি করে ফেললেন। তারপর হঠাৎ গরম হয়ে বললেন, এদ্দিন গেল একটা চিঠি নাই পত্র নাই, এই তোমার আক্কেল, অ্যাঁ? এখানে কেউ তোমার কিছু না? চাকরি পেয়ে চিঠি দিলে, আর আমি উদ্ধার হয়ে গেলাম? এই স্বাস্থ্য হয়েছে?

আনু বুঝতে পারে, বাবা একটুও রাগ করেননি, যদিও গম্ভীর গলায় কথা বলছিলেন। পানু ভাই দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোচ্ছিলেন, আমতা আমতা করছিলেন, হাসি পাচ্ছিল আনুর। তার এখন কত কাজ। পানু ভাইর সুটকেশ দু'টো নতুন আর কী বড়। আনু যতক্ষণ না সেই

সুটকেশ দুটো খুলতে পারছে, ভেতরটা ছটফট করছে। পানু ভাইর হাত ধরে সে টান দেয়। বলে, ঘরে এসো না মা ডাকছে।

বাবা আবার মুরগির বাচ্চাগুলোকে টি-টি আয় আয় বলে ডাকতে থাকেন।

সুটকেশে চাবি লাগাতেই আনু জিগ্যেস করে উঠল, আমার গার্ডের বাতি পানু ভাই?

ডালাটা লাফিয়ে উঠল সুটকেশের। পানু ভাই মুখ তুলে বললেন, দূর পাগল। গার্ডের বাতি দিয়ে তুই কী করবি?

বারে, তোমাকে বললাম যে!

চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছেন আপারা। সেজ আপা বলেন, আনুর যে কী কথা। জানো পানু ভাই, আনু না গার্ড হবে। আপাকে বলেছে।

যাহ্। আমি মারবো কিন্তু?

মেজ আপা ধমকে ওঠেন, ছিঃ আনু।

পানু ভাই তখন বলেন, গার্ডের বাতি পাবি কোথায়? তুই যখন গার্ড হবি, তখন রেল থেকে দেবে। তোর জন্যে অন্য একটা জিনিস এনেছি।

সঙ্গে সঙ্গে আনুর নাকের ভেতরে সুটকেশের খোলা ডালা থেকে উঠে এসে চামড়া আর ন্যাপথলিনের পাকানো ঝাঁঝালো ঘ্রাণ লাগে। মাথার ভেতরটা রিমঝিম করতে থাকে। বুকটা টিপটিপ করে ওঠে। পানু ভাই একেবারে তলায় হাত ঢুকিয়ে একটা চৌকো বাক্স বার করে আনেন। আনুর সামনে তুলে ধরে বলেন, বলত কি?

আনু প্রায় লাফিয়ে কেড়ে নেয় বাকসটা। চেঁচিয়ে ওঠে, আমার আমার— বলে। আপারা তাকে ছেঁকে ধরেন, দেখি দেখি— করে। আনু একটানে বাক্সটা খুলে দেখে ছোট্ট একটা টেবিল ঘড়ি। ঘড়ির ওপরে একটা প্যাচার ছবি। সেকেণ্ডের কাঁটা টিকটিক করছে, তালে তালে প্যাঁচার চোখ দুটো একবার ডানে একবার বামে তাকাচ্ছে। আনু ঘড়িটা মাথার ওপর তুলে 'বাঃ কী মজার' বলে নাচতে লাগল এক পায়ে। খিলখিল করে হেসে উঠল সালু আপা মিনু আপা।

পানু ভাই জিগ্যেস করলেন, কি পছন্দ? আবার অ্যালার্ম আছে। দেখিস, কী সুন্দর বাজে।

আনু ঘড়িটা নিয়ে একদৌড়ে বাবার কাছে চলে যায়। বাবা ঘড়িটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন উজ্জ্বল চোখে। প্যাঁচাটার কাণ্ড দেখে হো-হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, মানুষের কী বুদ্ধি দ্যাখ, আনু।

একেবারে সত্যির প্যাচা যেন, না বাবা?

বাবা যেন কত হাল্‌কা হয়ে গেছেন, বয়স তাঁর কমে গেছে এক মুহূর্তে। ঝরঝরে গলায় তিনি বলতে থাকেন, কত দাম হবে? পানুটা চিরকাল খরুচে। তোর জন্যে এনেছে, এবার থেকে ঘড়ি ধরে পড়তে হবে। অ্যালার্ম দিয়ে রাখবি, টুন্‌টুন্ করে বাজবে ভোর পাঁচটায়, ঘুম থেকে উঠবি তখন।

আরে, প্যাঁচাটা সত্যি ভারী সুন্দর এঁকেছে তো!

বাবার হাত থেকে ঘড়িটা কেড়ে নিয়ে মা-কে দেখাতে যায় আনু। মা রান্নাঘরে। গিয়ে দেখে বড় আপা পরোটা বেলছেন আর মা খুন্তি দিয়ে মোহনভোগ নাড়ছেন। ভারী মিষ্টি একটা ঘ্রাণ

উঠেছে। জিভেয় পানি এসে যাচ্ছে। আনু ঘড়িটা মেঝের ওপর বসিয়ে বলে,

বড় আপা, দ্যাখ।

আরে, এটা কী?

বড় আপা বেলন থামিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন।

তোকে দিল পানু ভাই?

হ্যাঁ, আমাকে। আর কাউকে না।

তখন পানু ভাইর গলা শোনা গেল বাইরে, ডাকছেন, তুই কোথায় গেলি ফতেমা? ফতেমা।

বড় আপা মুখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি আবার পরোটা বেলতে লাগলেন। মা বললেন, যা না, ডাকে তোকে।

বড় আপা মাথা আরো নামিয়ে নেন। ডাকতে ডাকতে পানু ভাই এসে হাজির হন রান্নাঘরের দরজায়। বলেন, তুই এখানে? দ্যাখ তো পছন্দ কিনা।

বলে একটা নীল ঝলমলে শাড়ি বড় আপার কোলে ছুঁড়ে দিলেন পানু ভাই।

ওর সঙ্গে ব্লাউজ পিসও আছে। বাব্বাঃ, আমি কি মেয়েদের জিনিস কিছু বুঝি না পছন্দ করতে পারি? আর যেমন কপাল, সবগুলোই মেয়ে এ বাড়িতে। কিরে, কেমন?

আনু, ওকে একটা টুল দে।

মার কথায় চৈতন্য হয় আনুর। সে একটা টুল এনে মুছে দেয় বসবার জন্যে। পানু ভাই বসেন। তাকিয়ে থাকেন বড় আপার দিকে। বড় আপা তেমনি মুখ নিচু করে আড়-চোখে কাপড়টা একবার দেখে। নীল জমিন, পূর্ণিমা রাতের আকাশের মতো জ্বলজ্বল করছে। চওড়া রূপোলি জরির কাজ করা পাড়। আনুর খুব ভালো লাগে। বড় আপা কোনোদিন একটা ভালো কাপড় পরেন না। ভালো কাপড় পরলে ওকে কী সুন্দর লাগে, দেখতে! সেদিন থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল মা-র পুরনো সবুজ শাড়িটা পরে, একেবারে জমিদার বাড়ির মেয়ের মতো লাগছিল বড় আপাকে। মা ঝংকার দিয়ে ওঠেন, এ কেমন মেয়ে? ভাই একটা জিনিস দিলে মানুষ কত খুশি হয়, বলে, আর একটা কী হয়েছে? মনিষ্যির জাত না?

পানু ভাই বলেন, না, ও যা লাজুক। চিঠি দেখেই বুঝেছি। সবার জন্যে সব লিস্টিতে আছে, ফতেমার কোন নামই নেই।

বলতে বলতে পানু ভাই কোলের কাছ থেকে দুটো মোড়ক তুলে ধরেন। আনু উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, আরে, এটা আবার কি?

মোড়ক খুলতে দেখা গেল, একটা রূপোর পানের বাটা আর এক জোড়া নরম কালো কুচকুচে চটি। মা-র সামনে রেখে পানু ভাই বললেন, মা, তোমার জন্যে।

কড়াইটা উনোন থেকে নামিয়ে মা জিনিস দুটো হাতে নিয়ে কী খুশি হয়ে ওঠেন। গনগনে আগুনে ঘাম ছুটতে থাকে তাঁর। হাসিতে আলো হয়ে ওঠে মুখটা। বলেন, তুই আবার আমার জন্যে খরচ করতে গেলি কেন?

খরচ আর কি?

মা অনেকক্ষণ ধরে নেড়ে চেড়ে দেখলেন। পানের বাটাটা খুলে ছোট ছোট বাটিগুলো তুলে দেখলেন আর হাসলেন। তারপর পানু ভাইর দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন থেকে মাসে

মাসে টাকা জমাস পানু। পাঁচ টাকা দশ টাকা করে জমালেই বছরান্তে কত টাকা হয়।— আনু, যাতো জিনিসগুলো ঘরে রেখে আয়।

মার জিনিস, বড় আপার শাড়ি, নিজের ঘড়ি নিয়ে আনু এ ঘরে এসে দেখে এক মহা হুলস্থুল কাণ্ড— ছড়ানো জিনিসপত্র, শাড়ি, ক্রুশকাটা, উল, ডিএমসি সুতো, স্নো, পাউডার, ফিতে, সাবান নিয়ে আপার বিছানা জুড়ে বসেছেন। এ ওর জিনিস মিলিয়ে দেখছে, গালে ঠোনা দিচ্ছেন, হেসে উঠছেন, কাপড়গুলো বুকে লাগিয়ে লাগিয়ে পরখ করছেন। বাবার জন্যে কার্পেটের জায়নামাজ আর পাঞ্জাবির কাপড় এনেছেন পানু ভাই। জায়নামাজটা জলচৌকির ওপর এরি মধ্যে কে বিছিয়ে দিয়েছে। ঘরটা একেবারে নতুন লাগছে। আনুর টেবিল ঘড়িতে বিকেল পাঁচটা বাজে।

বাবা তাকে ডেকে নিলেন।

চলতো, বাজার থেকে আসি। থলেটা নিয়ে আয়।

বাবা বাসার সামনে খুব আস্তে আস্তে পায়চারি করছেন আর কথা বলছেন বড় জমাদার সাহেবের সঙ্গে।

বাজারে গিয়ে দেখে সবে বাজার বসেছে। বড় বড় মাছ ধপাস্ ধপাস্ করে এনে ফেলছে শান বাঁধানো চত্বরের ওপর। ওপাশে বুড়ো বেহারি খাসির রানগুলো ঝুলিয়ে রাখছে। বাজারের পেছনে মজা পুকুরটা কচুরি পানায় সবুজ হয়ে আছে।

কিরে, মাছ নিবি না মাংস?

আনু কিছু বলে না। সে কী বলবে? বাবা তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই মাছগুলার কাছে এগুলেন। বললেন, বীরেন, আজ একটা রুইয়ের মাথা দিতে হয়।

মাঝি হেসে বলে, কর্তা, আইজ কেনে তোমরা আইচ্চেন। মোক্ খবর দিলে, মুই দিয়া আনু হয়।

আচ্ছা, হয়েছে। বড় ছেলে বাড়ি এসেছে মাঝি। ভালো দেখে দিও। কেমন?

ঝপাং করে আনুর থলেতে আস্ত একটা প্রকাণ্ড রুইয়ের মাথা তুলে দেয় মাঝি। কান্‌কো কি লাল! ফুলের মতো। টপটপ করে রক্ত পড়ছে। কিছুতেই দাম নেবে না সে। বাবা জোর করে দু'টো টাকা গুঁজে দিলেন তার হাতে। তারপর ভালো শিলআলু নিলেন দু'সের। নতুন টম্যাটো উঠেছে।

কত করে হে?

পাঁচসিকা সের।

পাঁচসিকে! —আচ্ছা দাও, আধসের।

বাইরে বেরিয়ে আনুকে বললেন, ভাল লাগছে খুব?

নাহ্।

আনু একহাতে থলেটা ধরে জোরে জোরে হাঁটতে থাকে বাসার দিকে। ওজন ছিল সত্যি। কিন্তু ওজনটাকে কিছুই মনে হয় না তার। কদিন পরে রুইয়ের মুড়ো কিনলেন বাবা। স্বাদটা ভুলেই গিয়েছিল আনু। এত ভালো লাগে তার। রাতে কখন খেতে বসবে সেই ছবিটা আনুর জিভে সরস করে তোলে।

বাসায় এসে দেখে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে পানু ভাই হাত নেড়ে নেড়ে গল্প বলছেন আর সিগারেট খাচ্ছেন। আপারা ঘন হয়ে বসেছে। মা বসে বসে সরু চাল বাছছেন। থলেটা বারান্দায় নামিয়ে দিয়ে আনু বলল, পানু ভাই! মার সামনে তুমি সিগারেট খাও?

হা-হা করে হেসে উঠলেন পানু ভাই। আপারা গড়িয়ে পড়ল এ ওর গায়ে। পানু ভাই তার পাছায় একটা চাপড় মেরে বললেন, মার সামনে খেলে কিছু হয় না। মা তো মা।

আনুও তখন হাসতে হাসতে তাঁর হাঁটু ঘেঁষে বসলো। সে এখন ইস্টিশানের গল্প শুনবে। সবাইকে সে থামিয়ে দিয়ে পানু ভাইর হাত ধরে জিগ্যেস করে, তুমি ফোনে কথা বলো, না পানু ভাই? আর ঘটাং-ঘটাং করলে একটা বল বেরিয়ে আসে না?

নদী এইখানে বাঁক নিয়েছে। পানু ভাই মাঝিকে বললেন নৌকা বাঁধতে। ছিপগুলো ধরে ছিল আনু, সেগুলো নিলেন তিনি। বললেন, নেমে আয়। সাবধানে নামবি।

লাফ দিয়ে নৌকো থেকে নামলো তাবা। তারপর ফাঁকা ঝাউবনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। মহিমপুর থেকে কতদূর চলে এসেছে তারা। পানু ভাই মাছ ধরবে। মাথার ওপরে বেলা দুপুরের রোদ গনগন করছে। ধুধু নদী চর, প্রান্তর, পানি দেখাচ্ছে বিশাল একটা ছবির মতো। আবার পানিটা আয়নার মতো জ্বলছে, চোখ রাখা যায় না।

পানু ভাই চলছেন আগে আগে। তাঁর কাঁধে ছিপ তিনটে। আর পেছনে আনু। তাঁর হাতে ঝোলানো দুটো বার্লির কৌটা। ওর মধ্যে আধার আছে। আজ সারা সকাল ধরে মেথি হিং দিয়ে, বোলতার চাক ভেঙে, চাল ভেজে বানিয়েছেন পানু ভাই। মার কি বকা! পানুভাই শুনে হাসেন। মা খালি বলছিলেন, তুই কোথা থেকে শিখলি এসব? ভদ্দরলোকের ছেলেরা ধরে? যতো সব আলসে, অকম্মার বদনেশা। পানু ভাই একটুও প্রতিবাদ করেন নি। একমনে তিনি আধার বানিয়ে চলেছেন। আবার আনুকে দিয়ে বাজার থেকে এক আনার পোনামাছ আনিয়েছিলেন, একটা কৌটোয় পানি দিয়ে পোনাগুলো তাজা করে রেখেছেন। আনু অবাক হয়ে গিয়েছিল, এই ছোট মাছগুলোকে বড় মাছ খেতে আসে। মাছ, মাছ খায। কী অবাক কাণ্ড! আনুর খুব আসতে ইচ্ছে করছিল, মাছ ধরা দেখবে সে। কিন্তু বলতে সাহস হয়নি। পানু ভাই যেন মনের কথা পড়তে পারেন। আধার বানাতে বানাতে তিনি বলছিলেন, আজ তো তোর ছুটি, চল তুই আমার সঙ্গে।

ঈদের জন্যে বন্ধ দিয়েছে স্কুল।

ঝাউবনের ভেতর দিয়ে চারদিকে সন্ধানী চোখ ফেলে ফেলে হাঁটেন পানু ভাই। তারপর একটা জায়গায় এসে বলে, খুব চিন্তিত আর আনমনা গলায়, এ জায়গাটা মন্দ না।

বলেই তিনি খাড়া পাড় বেয়ে নামতে থাকেন তরতর করে। আনুর খুব কষ্ট হয় নামতে। দু'একবার সে পড়ে যায়, গায়ে বালি লাগে, কিন্তু পানু ভাই ফিরেও তাকান না। একেবারে পানির কাছে এসে তিনি বলেন, বুঝলি, এইসব জায়গায় মাছ থাকে। নদী বাঁক নিয়েছে কিনা, পানির খুব তোড়, তাই মাছগুলো এদিকে এসে সব জড়ো হয়ে থাকে।

আনু হাঁ হয়ে যায় শুনে। এইসব কাণ্ড নাকি? একটা জায়গা বেছে নিয়ে পানু ভাই ছিপ ফেলে বসেন। তিন তিনটে ছিপ। আনু চোয়াল ঝুলিয়ে তাঁর কাণ্ডগুলো দেখে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ভেসে থাকা ফাৎনা তিনটের দিকে। পানু ভাই তাকে একটা ফাৎনার দিকে নজর

রাখতে বলেন, তাতে সে বড় খুশি হয়ে যায়। একমুহূর্ত চোখ এদিক ওদিক সরায় না। একটা স্বপ্নের মতো লাগে আনুর।

এই বেলা তিনটের রোদ, ঝিকমিক করতে থাকা নদী, আকাশে কালো বিন্দুর মতো একটা দু'টো পাখি, স্রোতের মুখে ভেসে চলা বড় বড় নৌকার মন্থর চলে যাওয়া, পাশে নিবিষ্ট মনে বসে থাকা পানু ভাই, পাড়ে ঝাউবনে বাতাসের সরসর আর কোথা থেকে উঠে আসা নিবিষ্ট সব শব্দ— বাতাসে মানুষের বহুদূর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠ, নদীর ছলছল সব মিলিয়ে এক অপরূপ মায়ার সৃষ্টি হয় আনুর মনে। সে যেন এখানে নেই, কোথাও নেই, পৃথিবী ছাড়িয়ে এক রহস্যময় জগতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবা, মা, আপারা, ইয়াসিন সেপাই, সুরেন স্যার, ড্রয়িং স্যার, মহিমপুর ইস্টিশান, পোস্টাফিসে চিঠি আনতে যাওয়া সব কতদূর ফেলে এসেছে আনু। সেখানে আর ফিরে যাবার কথা মনেও হচ্ছে না তার। মনে হচ্ছে, এখানে এইভাবে সে পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত বসে থাকবে পানু ভাইর পাশে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান পানু ভাই। চমক ভাংগে আনুর। তাকিয়ে দেখে, তিনি একহাতে ছিপটা ধরে আছেন শক্ত করে, সরসর করে হুইল থেকে সুতো খুলে, নদীর অতলে চলে যাচ্ছে। আনুও উঠে দাঁড়ায়। চঞ্চল হয়ে একবার পানু ভাইর দিকে একবার নদীর দিকে তাকায়। দ্রুত কণ্ঠে জিগ্যেস করে, কি? মাছ?

কোন জবাব দেন না পানু ভাই। তাঁর কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠেছে। নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছেন তিনি। মাথার ফিনফিনে চুলগুলো বাতাসে ঝিরঝির করে উড়ছে। সুতো নাড়া বন্ধ করে আস্তে আস্তে বায়ে কয়েক পা হেঁটে গেলেন পানু ভাই। চোখ তাঁর নদীর পানিতে। আনু কিছু বুঝতেই পারে না, কি ব্যাপার। তার ভারী গর্ব হয। মুগ্ধ চোখে পানু ভাইকে সে দেখতে থাকে।

আস্তে আস্তে সুতো গুটোতে থাকেন পানু ভাই। তারপর একসময় থেমে যান। নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকেন। পানিতেও কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। হঠাৎ আবার টান পড়ে সুতোয়, সরসর করে খুলে যেতে থাকে, ট্রিং ট্রিং শব্দ করতে থাকে হুইল, পানু ভাই বলেন, জোর গোত্তা মারছে রে। সের পাঁচেক হবে।

কী?

মাছটা।

সুতোর টানেই ওজন বুঝতে পারেন পানু ভাই? অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এক স্বপ্নরাজ্যের মানুষ মনে হয় তাঁকে আনুর। মিনিট দশেক এরকম খেলা চলে পানির অতলে মাছটার সঙ্গে ডাঙায় দাঁড়ানো পানু ভাইয়ের। একসময়ে হঠাৎ এক ঝট্‌কায় ছিপটা তুলে ফেললেন তিনি। গোড়ালির ওপর ঘুরে একেবারে উল্‌টে মুখ হয়ে যান। শূন্যে ধনুকের মতো লেজ বানাতে থাকে। আনু দৌড়ে যায় ধরবার জন্যে।

রিঠা মাছ! কেমন নীলচে ধূসর রং, আবার গোঁফ আছে দ্যাখো। বর্শীটা গিয়ে গেঁথেছে নিচের ঠোঁটে একেবারে এ ফোঁড় ও ফোঁড় হয়ে। আনু সন্তর্পনে হাত রাখে মাছটার গায়ে। কী ঠাণ্ডা, একেবারে বরফের মতো। মাথার ওপরে খসখসে, পাখনা নড়ছে এখনো, মসৃণ। আনুর খুব ইচ্ছে হয়, সে যদি এরকম মাছ ধরতে পারতো, অবাক হয়ে যেত সবাই। পানু ভাইকে বলে, বাবা রিঠামাছ যা ভালবাসে।

তাই নাকি রে?

দেখো তুমি।

পানু ভাই পকেট থেকে ছুরি বের করে মাছের পেটটা চিরে ফেলেন। বের করে দেন আতুরিটা। তারপর খালুইয়ের ভেতরে রেখে দিয়ে আবার ছিপ নিয়ে বসেন। আনু জিগ্যেস করে, কেন?

তাহলে আর পচবে না। এসব মাছ আবার তাড়াতাড়ি নরোম হয়ে যায়, বুঝলি? কিরে তোর ছিপে এখনো কিছু পড়ল না যে!

ছোট ছিপটা আনুকে দেখতে দিয়েছিলেন। তার ফাৎনা এখনো স্থির। একটু একটু দুলছে কেবল স্রোতের দোলায়। পানু ভাইর ফাৎনাটা আবার ঝাঁকুনি দিয়ে তলিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। ফেরবার পথে পানু ভাই চা খাবার জন্যে বসেছিলেন ইস্টিশানের দোকানে।

ওহে, আমাকে একটা কড়া চা দিও। আর একে মিষ্টি, কি আছে?

অমিরতি দেই?

দাও, দুটো দিও। কিরে দু'টো খেতে পারবি না আনু?

দোকানে যারা বসেছিল তারা শুধোলো মাছের কথা। কেউ কেউ বলল, বাহ্, ছিপে আপনার গুণ আছে যাহোক! বাজারে সাত আট টাকার মাছ হবে। তাও তাজা পাবেন কোথায়?

আপশোষ করতে কবতে তারা মাছগুলো দেখল আঙুল দিয়ে নেড়ে চেড়ে। আনুর খুব বাহাদুর মনে হচ্ছে নিজেকে। সেও তো ছিল পানু ভাইর সঙ্গে।

মা দেখেই বলে উঠলেন, সারাদিন চরে-চরে ঘুরে চেহারা কী করেছে দু'জন। এ বদ নেশা তোর কোত্থেকে এলো পানু? ওখানে এই করে বেড়াস নাকি?

হ্যাঁ, তাহলেই হয়েছে। রেল কোম্পানির জামাই কিনা আমি।

আনু যেন চুপসে যায়। মা যে কী একটা! মা তাকে ধমকে ওঠেন, এখন পড়তে বসো গে'। আর ঝিমিয়ে কাজ নেই।

উঃ, আনুর সারা গা এমন মটমট করছে, একটু শুতে পেলে ভারী ভালো হতো। তার কি উপায় আছে? রান্নাঘর থেকে তার পড়বার টেবিল যে দেখা যায়। আনু গিয়ে বই নিয়ে বসে। মন বসে না বইয়ের পাতায়। চোখের সামনে বারবার ফিরে ফিরে আসে দুপুরের রোদে জ্বলা নদীটার ছবি। যেন জীবনে আর কখনো সে যেতে পারবে না সেখানে। আস্তে আস্তে বইয়ের ওপর কখন ঘুমিয়ে পড়ে আনু তা নিজেও জানতে পারে না। প্যাঁচা-মুখ ঘড়িটা তার চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে টিক-টিক-টিক করে চলে অবিরাম।

যাবার দিন সকালে আনুকে ডেকে ছোট ছিপটা দিয়ে দিলেন পানু ভাই। আর দু'টো বর্শী, দু' রকম। বললেন, মা-কে বলিস না কিন্তু। আর শোন, ছুটির দিন ছাড়া খবরদার যাবি না। যেতে হলে ইয়াসিনকে সাথে নিয়ে যাস।

আচ্ছা।

যা বলবে, তাতেই রাজি আনু। এত খুশি হয়েছে সে ছিপটা পেয়ে। পানু ভাই যে কেন একটা

আস্ত ছিপ তাকে দান করে দিলেন, ভেবে কিসসু কুলকিনারা করতে পারে না। ভারী অবাক লাগে তার। বিশ্বাসই হতে চায় না। ছিপটা সে লুকিয়ে তুলে রাখবে ঘরের চালে, কেউ দেখতে পাবে না। মাঝে মাঝে বার করে দেখবে। আবার তুলে রাখবে।

মা-বাবাকে সালাম করে বাড়ি থেকে বেরুলেন পানু ভাই। মা দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে যতদূর দেখা যায় তাকিয়ে রইলেন। আপারা বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেই টমটমটা এসেছে আজ। ইয়াসিন মাল তুলে দিয়ে জোর-পায়ে চলল ইস্টিশানের দিকে। আনুও উঠে বসলো টমটমে। বাবা ভেজা গলায় বললেন, পৌঁছে চিঠি দিস পানু।

তারপর মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন, খোদা হাফেজ। আল্লাহু গফুরুর রহিম।

আপাদের দিকে তাকিয়ে পানু ভাই ছবির মতো হাসলেন।

আসিরে।

টমটম চলতে লাগল। সারা রাস্তায় একটা কথা হলো না দু'জনের। পানু ভাই যদি দেখে ফেলেন আনুর চোখে পানি টলটল করছে। সে বসে বসে ছিটের নক্‌শী খুঁটতে থাকে; মনটাকে জোর করে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু আর বুঝি পারা যাবে না। বুকের মধ্যে হু-হু করছে আনুর।

গাড়িতে উঠে একটা টাকা দিলেন তাকে পানু ভাই। তারপর ছাড়বার সময় হলে ইয়াসিনের সঙ্গে নেমে এলো সে। ইয়াসিন হাত তুলে বলল, সালাম খোকাবাবু, সালাম।

বাঁশি বাজল। হুইসিল পড়ল। শেষবারের মতো ঢং ঢং করে উঠল ঘণ্টা। হিস্-হিস্ করে উঠল ইঞ্জিন। সরে যেতে লাগল পানু ভাইয়ের গলা বাড়ানো জানালাটা। আনু হাঁটতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। তারপরে দৌড়লো। তারপর হঠাৎ থেমে গেল প্ল্যাটফরমের শেষপ্রান্তে। গাড়িটা ঝক ঝক করতে করতে বেরিয়ে গেল। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরের বাঁকে। আনু চোখ ফিরিয়ে দেখে তার চোখ বরাবর ইস্টিশানের খাড়া সাইনবোর্ড 'মহিমপুর।' বাংলা, উর্দু আর ইংরেজিতে লেখা। লেখাটাই যেন কিছু পড়তে পারছে না সে। ইয়াসিন তার হাত ধরে বলল, চলিয়ে ছোটা খোকাবাবু। আপনি ভি এরকম কেতো যাইবেন নৌকরি লিয়ে। হাঁ, সাচ বোলছি। হাঁ, হাঁ।

।। ৭ ।।

ছিপটা নিয়ে সহজে বেরোনো হয় না আনুর। মা যা রাগ করেন! প্রথমদিন যখন ছিপটা দেখলেন একেবারে খেপে উঠলেন, ও কি! ও আবার কি! পানুর এই আক্কেল। নিজে গোল্লায় গেছে, আবার ছোটটাকে ধরিয়ে দিয়ে গেছে।

আরেকটু হলেই ছিপটা নিয়ে মা দু'খানা করে ফেলতেন। আনু ধাঁ করে হাতে নিয়ে দে ছুট।

ডাকবাংলোর পুকুরে ছিপ ফেলে বসেছিল আনু। মা-র জন্যে মনটা অশান্তি লাগে। সেদিন পানু ভাইয়ের সঙ্গে যেমন, তেমন একটুও মনে হয় না। শুধু সারাক্ষণ কেমন ভয় ভয়। একটা মাছ ধরতে পারল না আনু। যাঃ, মনটাই খারাপ হয়ে গেছে আনুর।

তারপর থেকে একেকদিন বিকেলে আনু ছিপটা বের করে যেত না কোথাও। বাইরের ঘরে

মাস্টার সাহেবের বিছানায় বসে সারাক্ষণ হাত বুলোত, দেখত নাড়াচাড়া করত। তার চোখের ভেতরে ফিরে আসত সেদিন দুপুরের নদীটা, খাঁ খাঁ করা পাড়, নীলচে ধূসর রং রিঠা মাছটা। যা মজা হয়েছিল খেতে। আনুও ধরবে ও রকম। একদিন সে নদীতে যাবে।

মাস্টার সাহেব বলেন, ছিপের ইংরেজি কি বলোত?

আনু জানে না, এতো জানাই কথা। মিষ্টি মিষ্টি হাসেন মাস্টার সাহেব। শেষে বলেন, ফিশিং রড। দিস ইজ এ ফিশিং রড।

একটা রুমাল দেখে চমকে ওঠে আনু। সেদিন না সে দেখল এই রকম একটা রুমালে ফুল তুলতে বড় আপাকে। মাস্টার সাহেব তাড়াতাড়ি পকেটে ঢুকিয়ে অপ্রস্তুত গলায় বলে ওঠেন. ইস্, কী গরম পড়েছে!

তা সত্যি। পানু ভাই চলে যাওয়ার পর কয়েকমাস কেটে গেছে। শীত আর নেই। জোর গরম পড়তে শুরু করেছে। শীগগীরই হয়ত কালবোশেখী শুরু হয়ে যাবে। এদিকে নাকি একবার ঝড় তুফান উঠলে আর থামতে চায় না।

আনুর এখন ফুটবল খেলায় ভারী নেশা পেয়ে গেছে। সেই মনিরদের ওখান থেকে এসে বিকেলে সে যেত ইস্কুলের মাঠে। প্রথমে খেলা দেখত ছেলেদের তারপর আস্তে আস্তে করে সে নিজেই একজন ভারী খেলোয়াড় হয়ে উঠল। এখন তাকে না হলে চলে না। এ দল ও দল টানাটানি করে। খুব ভালো গোল দিতে পারে আনু। একটা এমন ঝেড়ে কিক দিতে পারে গোলির বাবা পর্যন্ত টের পায় না কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়। আর ইস্কুলের খেলা তো! নিয়ম কানুন কিছু নেই। যার পায়ের কাছে বল সেই রাজা। পিন্টু পর্যন্ত তাকে আজকাল সমীহ করে চলে। তার সাথে আজকাল খাতির হয়ে গেছে আনুর। পুরনো কথা ভুলে গেছে সে। পিন্টুর সঙ্গে গলা ধরে একেকদিন যায় ওদের বাড়িতে। ওর মা কত কী খেতে দেন। গল্প করেন। একেবারে ঠিক তার মার মতো। তার মতোই পাঁচ বোন পিন্টুর। বড়জন ঠিক বড় আপার মতো বড়। বাসায় এসে পিন্টুদের কত গল্প করে আনু। মেজ আপা তার সঙ্গে ঠোনা দিয়ে বলেন, তো যানা, বকশীদের বাড়িতে গিয়েই থাক তুই।

তখন রেগে যায় আনু।

যাঃ আমি বুঝি তাই বলছি। যা, আমি আর কিছু বলবো না কোনদিন।

সেদিন পিন্টু খেলাশেষে ওদের বাসায় যেতে টানছিল। আনু বলল, না ভাই, রাত হয়ে যাবে, মা বকবে।

সত্যি বেলা একেবারে পড়ে এসেছে। আশটা কেমন লাল দেখাচ্ছে। পথের ধারে কেরোসিনের বাতিগুলো দৌড়ে দৌড়ে মই লাগিয়ে সাফ করছে চৌকিদার। পথ দিয়ে ফিরতে ফিরতে হঠাৎ কেমন গা ছমছম করে উঠল আনুর। বারবার পেছনে তাকাল, ডানে তাকাল, বামে তাকাল। কে যেন পাশে পাশে আসছে তার। পায়ের আবছা শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন, অথচ চারদিকে কেউ নেই। আনু প্রায় দৌড়ুতে থাকে। বাসার কাছে এসে যখন পৌঁছায় তখন ভরসন্ধ্যে। দূরের মসজিদ থেকে আজানের ক্ষীণ করুণ ধ্বনি থেমে থেমে ভেসে আসছে। ঝোপঝাড়গুলো একেবারে আঁধার হয়ে গেছে। এরি মধ্যে জোনাকি বেরিয়েছে একটা দু'টো।

বাসার ভেতরে পা দিয়েই যেন বোকা হয়ে গেল আনু। এখনো বাতি জ্বালেনি কেন কেউ?

কি হয়েছে? ও কি! মাথা ঘুরছে আনুর। বুকটা খালি লাগছে। আঁধার বারান্দায় ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে মা, আপারা ডুকরে কাঁদছেন। এত কাঁদছেন যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, কাটা কবুতরের মতো ছটফট করছে রুদ্ধ আওয়াজ। এমনকি বাবা পর্যন্ত অন্ধকার ঘরে চেয়ারের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে ছেলেমানুষের মতো ডেকে ডেকে কাঁদছেন। আনুর গলা যেন বুঁজে এলো। সেও যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছে না আর। তার হাত-পা সব পাথর হয়ে গেছে। স্থানুর মতো সে দাঁড়িয়ে রইলো উঠোনে। তখন বড় আপা ছুটে এসে তাকে বুকে চেপে ধরলেন।

টেলিগ্রাম এসেছে, পানু ভাই রেলের নিচে কাটা পড়েছেন।

পানু ভাই!

চিৎকার করে উঠল আনু। সে চিৎকার বাইরে কেউ শুনতে পেল না। এক নিঃশব্দ, অন্ধ, তাড়িত পাখির মতো চিৎকারটা তার বুকের মধ্যে ফেটে পড়ল, ঘুরতে লাগল মা তার মাথার ওপরে গাল রেখে আবার ফুঁপিয়ে উঠলেন। অনেকক্ষণ পরে যখন চেতনা হলো আনুর, দেখল তার সারা মুখ অশ্রুতে ভারী হয়ে ফুলে উঠেছে। বাবা চেয়ারে বসে কেবল মাথাটা এপাশ ওপাশ করছেন আর 'আঃ আঃ' ধ্বনি উঠছে অস্পষ্ট।

পরদিন রাতের ট্রেনে কাঠের বাক্সে সিল করা লাশ এলো পানু ভাইর। একটা কোলের বাচ্চা রেলের ওপর পড়ে গিয়েছিল, আর তখন ট্রেন আসছিল হু-হু করে, বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পেরেছিলেন কিন্তু তাঁর জীবন নিয়ে গেল ট্রেন।

ডাকবাংলোর পেছনে, ভোরে, ফজরের নামাজের পর দাফন করা হলো। আনু মাটি দিল দু'মুঠো— ইয়াসিন তার হাতে মাটি তুলে দিয়েছিল। বাবার হাত শক্ত করে ধরে হাফেজ সাহেবের পেছনে পায়ে পায়ে ফিরে এলো আনু। পেছনে পড়ে রইলো সদ্য ঢাকা কবরটা। তার ওপরে বড়ই গাছের একটা ডাল পোতা। ঝুরঝুরে ধূসর মাটিগুলো ভিজে ভিজে। পাশে বাঁধানো ঘেরা কবর থেকে মিষ্টি ফুলের ভারী একটা সুঘ্রাণ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। ডাকবাংলোর পাশে ঘুমটি ঘরে বুড়োটা বাঁশের মাচায় বসে হুঁকো টানছে। মুড়ি মুড়কির দোকানে ঝাঁপ উঠলো এইমাত্র। একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছে খলিলগঞ্জের দিকে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করতে করতে। পিড়িং পিড়িং করে শালিখগুলো উড়ে যাচ্ছে, বসছে, আবার উড়ছে। আর পানু ভাইকে দেখতে পাবে না আনু। শরীরটা একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল তাই ওরা বাক্সে সিল করে দিয়েছে। না হলে বাবা-মা-ভাই-বোনেরা যে দেখে কষ্ট পাবে! আনু আর কোনদিন দেখতে পারবে না।

মাস্টার সাহেব আনুর কাঁধে হাত রাখলেন। বাবা গিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। দু'দিনে যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে তাঁর। শাদা চুলে মাথাটা ছেয়ে গেছে, খিলাল করেননি, এলোমেলো হয়ে গেছে সুন্দর একমুঠো চাঁপ দাড়ি, চোখে কালি পড়ে গেছে, হাতের কবজি কত চিকন মনে হচ্ছে।

আনুকে মাস্টার সাহেব কোলের কাছে টেনে মুখটা মুছিয়ে দিলেন। তারপর তাকে বিছানার পাশে বসিয়ে চুপ করে রইলেন। যেন কিসের অপেক্ষা করছে দু'জন।

তারপর থেকে গোটা বাসাটাই কেমন যেন বদলে গেল। কথা বলতে ভয় করে, হাসতে টান পড়ে বুকের মধ্যে। আনু যেন কেমন একেলা হয়ে যায়। রোজ সকালে উঠে পড়তে বসে,

ইস্কুলে যায়, ফিরে আসে, রাতে বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে জেগে থাকে— এ বাড়ির কারো সাথে যেন তার কোনো সম্পর্ক নেই। সে একটা ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায়। এখন একেকদিন ছিপ নিয়ে বেরোয় মাছ ধরতে, কেউ আর তাকে কিছু বলে না। এখন আনু ভালো মাছ ধরতে শিখে গেছে। মাছগুলো সে বাসায় আনে না; ফেরার পথে যদি রাস্তায় ভিখিরি ছেলেমেয়েরা ভিড় করে তাদের দিয়ে দেয়। নইলে সেপাই ব্যারাকে গিয়ে ইয়াসিনকে। আনু যখন ছিপ নিয়ে বসে পানির মধ্যে পানু ভাইয়ের চেহারাটা ভেসে ওঠে। মাথার চুল উল্‌টিয়ে সিঁথি করা, হা-হা করে হাসছেন।

একেকদিন ভোরে বাবা তাকে নিয়ে যান পানু ভাইর কবর জেয়ারত করতে। বাবা তাকে আগাছাগুলো তুলে ফেলতে বলেন। আনু উপুড় হয়ে পড়ে, দু'হাতে বাজে গাছগুলো তুলে ফেলে। মাটি আর মৃতের একটা মেলানো ঘ্রাণ তার সমস্ত বোধ আচ্ছন্ন করে ফেলে। আনুর যেন কোনো জ্ঞান থাকে না আর।

মাঝে মাঝে মা এক কোণে বসে অঝোরে কাঁদেন। সেজ আপা সেলাই করতে গিয়ে কাঁদেন। হাতের সুঁই, সুতো নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন। বড় আপাকে যেন আর দিনের আলোতে দেখা যায় না। সারাদিন সবার আড়ালে আড়ালে তিনি ঘুরে বেড়ান।

বাবাকে আর কোনদিন আনু দেখেনি, ভোরে সেই হাসিভরা উজ্জ্বল মুখ নিয়ে শিউলি তলায় পায়চারি করতে। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে আর আনুকে ডাকেন না বাবা। আনু আর কুস্তি শিখতে যায় না ইয়াসিনের কাছে।

পুরো এক বছর হতে চলল আনুরা মহিমপুরে এসেছে। আবার শীত পড়ছে মন্থর গতিতে। গভীর রাতে গায়ে কাঁথা না দিলে গা কেমন শিন্‌-শিন্‌ করে ওঠে। হালকা কুয়াশা চাদরের মতো জড়িয়ে ধরে গাছগুলো। আর নিম গাছের ফাঁক দিয়ে একটু পরে যেটুকু রোদ এসে ছিটিয়ে পড়ে তাতে বসে থাকতে বেশ ভালো লাগে। গাছে গাছে পাতা ঝরছে। পাতা পড়ছে। কেমন যেন উদাসীন মনে হয় এবারের শীত।

এক সকালে বাবা আনুকে বললেন, ভাবছি, আনু তোকে সামনের বছর বড় স্কুলে ভর্তি করে দেব। বোর্ডিং-এ থাকবি।

কথাটা শুনেই মা প্রতিবাদ করে ওঠেন, হ্যাঁ, অতটুকুন ছেলে বাপ-মা ছেড়ে বিদেশ বিভূঁয়ে থাকবে।

কেন তাতে হয়েছে কী? বারবার স্কুল বদলাতে হয় আমার সাথে সাথে, তাতে লেখাপড়া কিসসু হয় না। তার চেয়ে বোর্ডিং-এ দেওয়া ঢের ভালো; মানুষ হবে।

বোর্ডিং-এ থাকা সে তো ঢের খরচ। আনু তো জানে, বাবা কত গরিব। তবু বাবা কেন তাকে বোর্ডিং-এ রেখে পড়াতে চান? বুক ঠেলে নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো আনুর। মাথা নিচু করে সে নাশতা করতে লাগল। বাবা একবার আনুর মুখের দিকে তাকালেন। মা বললেন তাঁকে, তোমার চায়ে একটু দুধ দেব?

হ্যাঁ, দাও।

আনমনে উত্তর করলেন বাবা। তারপর আস্তে আস্তে চাটুকু খেয়ে বেরিয়ে গেলেন আর একটা কথাও না বলে। আনুর চুলে হাত রাখলেন মা। বুলিয়ে দিতে দিতে মিষ্টি করে জিগ্যেস

করলেন, তুই বোর্ডিং-এ থাকবি আনু?

আনু বুঝতে পারে, মা তাকে যেতে দিতে চান না। তখন মার জন্যে খুব মায়া করে আনুর। উত্তরে কিছুই বলতে পারে না সে। ম্লান একটুখানি হাসে শুধু। মা তাকে আরো আদর করতে থাকেন।

শীতকালের আকাশ আয়নার মতো পরিষ্কার। কখনো সখনো এক আধ টুকরো সাদা মেঘ খেয়ালির মতো ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। আর মাঝে মাঝে উত্তরে মেঘের ঝাপটে ধোঁয়াটে মেঘ আকাশ ভরে তোলে। শুকনো হিম-হিম বাতাস হু-হু করে বয়।

পড়তি বিকেলে বাইরের ঘরে বসে একটা কাগজ থেকে ছবি কাটছিল আনু। এমন সময় দমকা এক হাওয়া ঘরের ভেতরে ঢুকে আনুর হাত থেকে কাটা ছবিটা উড়িয়ে নিয়ে গেল আচমকা। ছবিটার পেছনে ধাওয়া করে বাইরে এসে আনু দেখে আকাশ জুড়ে কালো মেঘ, মেঘের ওপর মেঘ জমেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে দিনের আলো, রাস্তায় লোকেরা দৌড়ুচ্ছে, বাতাস বইছে এলোমেলো। এক্ষুণি বোধ হয় ঝড় উঠবে।

ঝড় উঠবে কি, ঝড় উঠে গেছে ততক্ষণে। আকাশ চিরে ঝলক দিয়ে উঠল বিদ্যুৎ-এর আগুন। একবার, দু'বার, বারবার খোলা দরজাটা আছড়ে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল আনুর হৃদস্পন্দন। দৌড়ে গিয়ে যখন দরজাটা বন্ধ করল সে. তখন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

শোবার ঘরে মা একেলা রয়েছেন। ভাবতেই ভেতরটা হিম হয়ে গেল আনুর। ঝড় বৃষ্টিকে মা-র যা ভয়। সামান্য একটু বৃষ্টি নামলেই সারাটা শরীর তাঁর থরথর করে কাঁপতে থাকে। সবাইকে বুকের কাছে নিয়ে ঘরের এককোণ ঘেঁষে বসে থাকেন। আর বিড়বিড় করে আল্লাকে ডাকেন আল্লা, বৃষ্টি থামিয়ে দাও। ভয়, এখুনি হয়ত ঘরদোর সব ভেঙে পড়বে মাথার ওপর। সয়লাব হয়ে যাবে দুনিয়া। আর আজ যা ঝড় বৃষ্টি নেমেছে, না জানি একেলা অন্ধকার ঘরে বসে মা কী করছেন।

প্রবল বাতাসের মধ্যে একবার যেন আনু শুনতেও পেল, আনু, বাবা আনু।

এত ক্ষীণ সে ডাক যে আনু ভালো করে বুঝতেও পারল না, তার আগেই মিলিয়ে গেল ডাকটা। কান পাতলো আনু, আবার ডাকছেন বুঝি। আনু এখন বাতাস ভরে কেবল মা-র কণ্ঠই শুনতে পাচ্ছে।

আনু, ও আনু।

মা ডাকছেন। বাতাসে একটা অনবরত হুইলের মতো আওয়াজ। আর তারই ভেতর থেকে উঠে আসছে ডাকটা। আনু চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিছুই সে বুঝতে পারে না কী করবে। তার ভীষণ প্রস্রাব পায়।

এমন সময় শোবার ঘরে ভারী কী যেন একটা ঝনঝন করে পড়ে গেল। আর সেই সঙ্গে রক্ত জমানো চিৎকার। বৃষ্টির মধ্যে একলাফে বেরুলো আনু। বেরিয়ে ছুটে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। এই টুকুতেই সারা গা তার ভিজে গেছে। কিন্তু সেদিকে চোখ নেই তার। তাকিয়ে দেখে মা চৌকির এককোণে বসে গোঙাচ্ছেন, নিঃশ্বাস ফেলছেন জোরে জোরে। এক মুহূর্ত আনু বোকার মতো তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। তারপর চিৎকার করে ডাকে, মা, ও মা, মা। মা কোনো কথাই বলছেন না। হাঁপাচ্ছেন। কাঁদছেন। আনুর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না।

আনু পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখে, মেঝের ওপর একরাশ ছোটবড় ভাঙা কাচের টুকরো ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে সেই বড় ছবিটা, সব্বাইয়ের গ্রুপ ফটো, আনু তখন কোলে, মিনু আপা তখন হাফপ্যান্ট পরে। আর দেয়ালের যে জায়গাটায় ছবিটা ঝোলানো ছিল সে জায়গাটা বিশ্রী রকমে ফাঁকা। দু'একটা ছেঁড়া মাকড়শার জাল হাওয়ায় কাঁপছে। আনু চোখ ফিরিয়ে আনে। দু'হাতে মাকে ধরে আবার ডাকে, মা, মাগো।

তখন আনুর হঠাৎ ভয় হলো। ভীষণ ভয় হলো। মা চোখ বড় বড় করে হাঁপাচ্ছেন। আনুর মনে হলো, মা এক্ষুনি পড়ে যাবেন।

কী করবে ভেবে না পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল আনু। তারপর নিঃশ্বাস নিয়ে বৃষ্টি মাথায় করে প্রাণপণে ছুটে চলল থানায়, বাবার কাছে। তীরের মতো বৃষ্টির ফলা বিঁধছে শরীরে, মাথায় মুখে। জামাটা বুকে পিঠে লেপটে গেছে। চোখ আবছা হয়ে আসছে পানির ঝাপটায়। আনু তবু পাগলের মতো দৌড়ুচ্ছে। যখন থানার কাছে গিয়ে সে পৌঁছুলো তখন যেন তার মধ্যে সে আর নেই।

বাবা একটা অচেনা লোকের সঙ্গে নিচু গলায় কথা কইছিলেন। আনুকে হঠাৎ এসময়ে এভাবে দেখে চমকে উঠলেন যেন।

আনু!

শীগ্‌গীর বাসায় চলো, মা কেমন করছে।

কেন, কী হয়েছে?

বাবা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। কিন্তু আনু কি বলবে? কি জবাব দেবে এর? মা-র কী হয়েছে কি করে বোঝাবে সে? কিছুই বলতে পারল না সে। অচেনা লোকটার জন্যে আরো লজ্জা করল। লোকটা কেমন ছুরির মতো চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। আনুর বিশ্রী লাগছে। কথা জড়িয়ে এলো তার। কোনোরকমে সে বলল, বৃষ্টিতে মা ভয় পেয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বাবা চিৎকার করে উঠলেন, আর তুমি তাই বাসা ছেড়ে এসেছ? বৃষ্টিতে ভিজেছ?

চমকে উঠল আনু। যেন উনি তার বাবা নন। বাবাকে এরকম চিৎকার করতে, বকতে, কোনদিন শোনেনি আনু। এ কি হয়েছে তার বাবার? ভয়ে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল আনু। ঠকঠক করে বৃষ্টি ভেজা ঠাণ্ডায় সে কাঁপতে লাগল। বাবার চোখের দিকে তাকাতে তার প্রবৃত্তি হলো না।

ভারী রাগ হলো তার। এত রাগ হলো যে কোনো কথা না বলে সে বাবার কামরা থেকে বেরিয়ে এলো। এতো রাগ হলো, ইচ্ছে হ'ল, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে একটা অনর্থ করে বসে আনু।

পেছনে কার পায়ের আওয়াজ পেল সে। তাকিয়ে দেখে, বাবা। তিনি খপ করে তার হাত ধরে টান দিয়ে বললেন, বৃষ্টিতে আবার ভিজে চলেছ কোথায়? দিন দিন বখাটে হয়ে যাচ্ছ, না? একদিন ধরলে মেরে লাশ বানাবো।

বাঁ পায়ের ওপর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল চাপিয়ে খুঁটতে থাকে আনু। বিস্ময় তার বাঁধ মানছে না। এ কী হয়ে গেছেন তার বাবা? আজ এরকম করছেন কেন? বাবা আবার চাপা গলায় ধমকে উঠলেন, এক গা পানি কাদা নিয়ে দৌড়ে আপিসে ঢোকা এই তোমার আক্কেল।

বৃষ্টিতে ভয় পেলে আমি কি করব। *আমি কি করতে পারি?*

ইয়াসিন!

ডাক শুনে ইয়াসিন দৌড়ে এসে হাজির হয়।

যাও, একে ছাতা করে দিয়ে এসো।

আনু বাসায় ফিরে এসেছে পাঁচ মিনিটও হবে না, বাবা এসে উপস্থিত। বারান্দায় চুপ করে বসে ছিল আনু। তাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকলেন বাবা। বৃষ্টি এখন অনেকটা কমে গেছে। পাশের বাড়িতে আপারা আটকে ছিলেন, ওরাও এসে গেলেন একটু পরেই।

ছবিটা, ছবিটা ভেঙেছে কে?

বাবা প্রশ্ন করেন অবাক হয়ে। মা-র গলা শোনা যায়, বাতাসে ছিঁড়ে পড়ে গেছে।

বাতাস? ও।

বাবা আর কোনো কথা বললেন না। বারান্দা থেকে আনু দেখতে পেল, বাবা ভাঙা ছবিটা তুলে আলমারির তাকে উঠিয়ে রাখলেন। বাইরে আকাশ শান্ত। আর ঘরের ভেতরটা চুপচাপ। কারো কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না।

একটু আগেই বাবার ওপর খুব রাগ হয়েছিল আনুর, এখন যেন তা আর নেই। বদলে, কেমন লজ্জা করছে, অনুশোচনায় ভরে আসছে মন। সত্যি ওভাবে দৌড়ে যাওয়া ঠিক হয়নি তার। কতরকম লোক আসে বাবার কাছে, বাবা হয়ত জরুরি আলাপ করছিলেন। লোকটার চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে আনুর। কালো, চাপদাড়ি, গায়ে পাঞ্জাবি, হাতে আংটি। ছুরির মতো চোখ তার। লোকটার আঙুল দশটা সারাক্ষণ অস্থির হয়ে টেবিলে এটা নাড়ছিল, ওটা ঠেলে রাখছিল; লোকটা আনুর দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। আনুর মনে হলো, তারই ভুল হয়েছে। বাবা রাগ করেছেন। নইলে কখনো বাবা তাকে বকেন না। আনুর কেমন ইচ্ছে হলো এখন বাবাকে একটু দেখতে। দরোজার কাছাকাছি সরে এসে চোর-চোখে আনু তাকাল ভেতরে। দেখল, বাবা একমনে বসে জুতোর ফিতে খুলছেন।

আনু জানে না রাত এখন কত। ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেছে তার। আজকাল রাতে এরকম হঠাৎ চমকে ঘুম থেকে জেগে যায় আনু। বুকের মধ্যে ভয় করতে থাকে। পানু ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। চোখের সামনে যেন দেখতে পায় রক্তাক্ত দু' খণ্ড দেহটা। কাঠ হয়ে পড়ে থাকে আনু। ভারী তিয়াস পেল তার। চোখ মেলে দেখে পায়ের কাছে চৌকির নিচে হারিকেন জ্বলছে ছোট হয়ে। আনু বিছানা হাতড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘুম জড়ানো চোখে দু'এক পা এগিয়েছে সে, এমন সময় কী যেন চোখে পড়ল তার। ঘরের ও পাশটায় খানিকটা জায়গা নিকষ অন্ধকার। একটা কুকুর অবিকল মানুষের মতো কেঁদে উঠল বাইরে। শুকনো গলায় আনু জিগ্যেস করল, *কে?*

অন্ধকারটা নড়ে চড়ে উঠল।

আমি আনু, আমি।

বাবা। বাবা কথা কয়ে উঠলেন। যেন কী একটা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছেন তিনি। গলাটা তাই কেমন জড়ানো। আনু এক পা এগিয়ে এসে বলল, পানি খাব।

হুঁ।

পানি খেয়ে এসে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল আনু। বাবা তো এত রাত অবধি কোনদিন

জাগেন না। নির্জন অন্ধকার ঘরে চেয়ারে বসে বাবা কি ভাবছেন? সারাটা শরীর কেন যেন কাঁটা দিয়ে উঠল আনুর। বুকের ভেতরটা পাথরের মতো ভার হয়ে এলো।

বেশ খানিক্ষণ পরে আনু টের পেল বাবা উঠে দাঁড়ালেন। হারিকেনটা হাতে নিয়ে বড় করলেন তিনি। তারপর আনুর বিছানার পাশে এলেন। আনু চোখ বুঁজে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলো।

অনেক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন আনুর পাশে। তারপর তার গায়ের কাঁথাটা ভালো করে টেনে দিলেন। মশারিটা গুঁজে দিলেন আবার।

ঘুমে জড়ানো গলায় মা ও ঘর থেকে বললেন, তুমি শোওনি এখনো?

বলতে বলতে মা এলেন এ ঘরে। বাবা গিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। মা তাঁর পায়ের কাছে বসলেন। বাবা বললেন, ছেলেটাকে হঠাৎ তখন বকেছি. মেজাজ ভালো ছিল না। ভারী রাগ করেছে দেখছি।

মা কোনো কথা বলেন না। বাবা আবার বলেন. সন্ধ্যে থেকে মুখ ভার করে আছে। খারাপ লাগছে এখন নিজেরই। অমন করে না বকলেই হতো।

আনুর তখন ইচ্ছে হলো, উঠে গিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলে আমি একটুও রাগ করিনি। মা হঠাৎ বললেন. তুমি কদিন হলো অমন ছটফট করছো কেন?

কোথায়?

তুমি না বললে কি হবে, আমার চোখ নেই?

বাবা তখন হাসলেন। ঢেউ ভাংগার মতো শব্দ হলো যেন; বললেন, ও তোমার চোখের ভুল।

রোজ এত রাত জেগে থাকলে, এত ভাবলে, কি থাকবে তোমার শরীরে? কি ভাবো এত?

অনেক্ষণ চুপ করে থাকার পর বাবা উত্তর করলেন. ভাবি. হাশরের মাঠে আল্লাহ, যখন ডাকবেন, গোলাম হোসেন। আমি তাঁকে মুখ দেখাবো কী করে?— এবার আর ভাববো না পানুর মা। হাশরের মাঠে বলব. আমারে তুমি কি বাকি রেখেছিলে যে আমি তোমার রশি শক্ত করে ধরে থাকব। জীবনে পাপ করি নাই সজ্ঞানে. পানুর মা, তাই ঘুম হয় না।

আনু বুঝতেই পারে না, বাবা এ সব কী বলছেন? সব চেনা শব্দ. অথচ একসঙ্গে তাদের কোনো অর্থই স্পষ্ট হচ্ছে না তার কাছে। একটা ধাঁধার মতো লাগছে। কেবল এটুকু বোঝা যাচ্ছে, কী একটা ভাবনায় বাবা কদিন থেকে দিন রাত ডুবে আছেন। বাবা একটু পর বললেন, আবার বৃষ্টি আসবে বোধ হয় বাতাস বইছে।

মা তখন আস্তে আস্তে উঠে গেলেন।

পরদিন বাবা মফস্বল গেলেন। আনু স্কুল থেকে সবে ফিরেছে তখন। দেখে কাপড় চোপড় সব গোছানো হয়ে গেছে। ইয়াসিন সাইকেল পাম্প করছে।

বাবা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাইকেল হাতে নিলেন। পেছনে মা দাঁড়িয়েছিলেন। একবার তাকালেন শুধু। তারপর ধীরে ধীরে রাস্তায় গিয়ে উঠলেন। আনু তাঁর পেছনে পেছনে চলল। খানিকটা পথ যাবার পর বাবা সাইকেল থেকে নেমে ডাকলেন. আনু।

একদৌড়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াল আনু। তড়বড় করে ভাঙা গলায় তিনি বললেন, আমার

হাতঘড়িটা ফেলে এসেছি টেবিলের ওপর। শীগগীর যা।

বাবার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। ঠোঁট দুটো যেন কাঁপছে। আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন শুধু শুধু। বাসা থেকে দৌড়ে ঘড়িটা এনে তাঁর হাতে দিল আনু। ঘড়িটা হাতে বাঁধতে বাঁধতে বাবা বললেন, বাসায় থেকো। বাইরে যেও না খেলতে। কেমন?

আনু ঘাড় কাৎ করে সায় দেয়। তার চোখ পানিতে ভরে আসে। যতদিন বাবা মফস্বলে যান, আনুর খুব খারাপ লাগে। আজ যেন আরো। কদিন থেকে বাবা কেমন অস্থির, সেদিন তাকে বকেছিলেন, রাতে মার সঙ্গে কথা— এসব আলাদা মনে করে নেই; সব মিলিয়ে একটা অবোধ মমত্ব শুধু, সেটাই তাকে আজ অভিভূত করে ফেলে। সে যতদূর দেখা যায় তাকিয়ে রইলো। বাবা একবারও তাকালেন না ফিরে। সঙ্গে ইয়াসিন। দু'টো সাইকেল দেখতে দেখতে নদীর দিকে বাঁক নিয়ে মিলিয়ে গেল।

তখন ছিপ নিয়ে বেরুলো আনু। একটু আগেই বাবা বারণ করে গেলেন, তবু। জানে এখন বিকেল ফুরিয়ে আসছে, এখন আর কোথায় মাছ ধরতে যাবে, তবু। তবু সে ছিপ নিয়ে বেরুলো। বেরিয়ে গেল না কোথাও। কালভাটের পাশে ছিপটা হাতে করে ঠায় বসে রইলো। একটা গানের মতো কোথা থেকে সুর উঠছে। আনু ভালো করে কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করে। ছোট দারোগার বউ আবার হারমোনিয়ম টিপছে। একটা ঝিমোনো সুর বেরুচ্ছে। সেই সুর লতিয়ে চিনচিনে গলা শোনা যাচ্ছে–'আমি যাবো না, যাবো না সই।' সেই গানটা তার মনের মধ্যে রাগ এনে দিল। হঠাৎ সে টান অনুভব করল বাড়ির জন্যে। বড় বড় পা ফেলে বাড়িতে এসে সে ছিপটাকে তেল খাওয়াতে লাগল।

পরদিন মাস্টার সাহেব কোথা থেকে ছুটে এসে চড়া গলায় ডাকতে লাগলেন। ডাকতে ডাকতে আজ প্রায় বাসার মধ্যেই ঢুকে পড়েছেন তিনি।

আনু, আনু।

কী?

তোমার মা-কে ডেকে দাও তো শীগগীর।

কেন?

আনুর সারাটা শরীর শির শির করে উঠল শুনে। মাস্টার সাহেব এরকম গলায় কথা কইছেন কেন?

দরকারি কথা আছে।

মা এসে দরোজার পাশে দাঁড়ালেন। মাস্টার সাহেব একবার তাঁকে দেখলেন, একবার আনুকে, তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, আম্মা, থানায় খবর এসেছে দারোগা সাহেব অ্যারেস্ট হয়েছেন।

চকিতে মুখ তুলে তাকালেন মা। কথাটা যেন তার বিশ্বাস হচ্ছে না। আর আনু অবাক হয়ে গেছে। অ্যারেস্ট! মানে হাতকড়া লাগিয়েছে? তার বাবাকে? যেন এরচেয়ে অসম্ভব আর কিছু হতে পারে না। আনু আর দু'কানে কিস্‌সু শুনতে পায় না। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। মাস্টার সাহেব রীতিমত হাঁপাচ্ছেন, যেন এক দু' মাইল দৌড়ে এসেছেন তিনি। কথাটা শুনে মা-র চোখ ছলছল করে উঠল, মুখখানা বিষ হয়ে গেল, কিন্তু শান্ত কণ্ঠেই জিগ্যেস করলেন, কার

কাছে শুনেছ?

ছোট দারোগা সাহেবের কাছে।

ক্রমে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা। বড় দারোগা সাহেব এক খুনের মামলায় চার হাজার টাকা ঘুস নিয়েছিলেন। কিন্তু ধরা পড়ে যান। আনুর কেন যেন মনে হয়, সেদিন বৃষ্টিতে দৌড়ে থানায় গিয়ে যে দাড়িওলা পাঞ্জাবি পরা লোকটার সঙ্গে বাবাকে কথা বলতে দেখেছিল, সেই ঘুস দিয়েছিল। কিন্তু কথাটা কাউকে জিগ্যেস করতে পারে না। ছোট দারোগার বউ গায়ে পড়ে এসে মিষ্টি কথা বলে যায় আর মুখ টিপে টিপে হাসে। আবার বলে, বাবা, আমার সাহেবের এ সব নাই। নামাজ রোজা করে না ঠিক, কিন্তু দিল সাফ।

আবার কেউ কেউ যাচ্ছে তাই বলে। মুখের ওপর কথা শোনায়।

ছি,ছি, অমন দাড়িওলা পরহেজগার মানুষ। তার এই কাণ্ড?

টিটকিরি দেয় কেউ— ঘরে সেয়ানা মেয়ের হাট। তা বুড়ো করবেই বা কী? জন্ম দেবার সময় হুঁশ ছিল না যে।

আশ্চর্য, কারো ওপরে একটু রাগ হয় না আনুর। বাবার ঘুস নেবার কথা শুনে একটুও ঘৃণা হয় না তাঁর জন্যে। বরং মনটা খারাপ করে। বাবার সঙ্গে যেন এক হয়ে যায় আনু। বাবা তো গরিব। বাবার টাকার দরকার। মনিরের বাবার কাছে টাকা চাইলেন, দিল না। বাবা কী করবেন? আনু যেন বুঝতে পারে, বাবা কত অসহায়। বাবার জন্যে তার আরো মায়া করে তখন। সে আপন মনে হাঁটতে থাকে। বক্‌শিদের মেয়েরা সব সেজে গুজে রাস্তায় বেড়াচ্ছে। সেখান থেকে সে পালিয়ে যায়। এত একা লাগে নিজেকে। মনে হয়, বাবাকে যদি ওরা ছেড়ে দিত, তাহলে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ত আনু।

আর বাসায় পানু ভাইয়ের এতকালে সকলে যা না কেঁদেছে, এবার একেকজনে তাই কাঁদল। মা রাঁধতে গিয়ে কাঁদেন। খাওয়াতে গিয়ে কাঁদেন। আনুর মনে হয়, ঘুমের ঘোরেও কাঁদেন তিনি। বড় আপা কেঁদেছেন সবচেয়ে বেশি। কেঁদে কেঁদে তিনি দরিয়া করে ফেলেছেন। তখন আনুও আর থাকতে পারেনি। তার বুকের ভেতরে একতাল জমাট কান্না বড় আপার কোলে এক সময় ঝরঝর করে গলে পড়ে।

কোনো রাতে আর ভালো ঘুম হয় না আনুর। ছবির মতো মনে পড়ে সেই রাতে তার গায়ে বাবার কাঁথা টেনে দেয়া। পানু ভাইয়ের লাশ এলো। ভোর সকালে বাবার সঙ্গে গোরস্তানে গিয়ে কবর থেকে আগাছা তুলে ফেলা। পথের ওপর দাঁড়িয়ে বাবা হাতঘড়ি বাঁধছেন। মাস্টার সাহেবের পকেট থেকে চেনা রুমালটা বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। সকাল বেলা ঘুম থেকে আধো জেগে উঠে কতদিন কান পেতে দেখেছে আনু, যেন এখুনি সে শুনতে পাবে বাবা সুরা পড়তে পড়তে পায়চারি করছেন। পর মুহূর্তেই ভুল ভেঙেছে তার, আর বুক ঠেলে উঠেছে কান্না।

থানার হুকুমে একদিন এ বাসা ছাড়তে হলো। পানু ভাইয়ের কবর আছে বলে মা কিছুতেই মহিমপুর ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না। মাস্টার সাহেব আর আনু গিয়ে বাসা ঠিক করে এলো— একটা বড় ঘর আর রান্নাঘর, বাইরে শনের একটা ছোট্ট ঘর, ভাড়া আঠারো টাকা। কেমন নোংরা আর নির্জন। আনুর মনটা খারাপ হয়ে যায় বাসা দেখে। কিন্তু এরচেয়ে বেশি ভাড়া দেবার সাধ্য যে তাদের নেই। থানার কোয়ার্টার ছেড়ে আসবার সময় মা আরেকবার কেঁদে উঠেছিলেন। দেয়ালে একদিন পেন্সিল দিয়ে আনু বড় বড় করে লিখে রেখেছিল, বাবার

সেই কথা আর্লি টু বেড, আর্লি টু রাইজ, মেক্‌স ম্যান হ্যাপি অ্যাণ্ড ওয়াইজ— আসবার সময় ঘষে ঘষে মুছে দিয়ে এসেছে।

সকালে বাসা বদল হলো। বিকেলে মাস্টার সাহেব আনুকে বললেন, আনু, চলো নদীর পাড়ে বেড়িয়ে আসি।

তার সঙ্গে বেড়াতে গেল আনু। বিকেল পড়ে এসেছে। আকাশটা দেখাচ্ছে কেমন কোমল। নদীর ওপারে নীল হয়ে এসেছে গাছপালা, গ্রাম। একটা নৌকা পাল তুলে ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে। ঝাউবনে সরসর করছে বাতাস। এক জায়গায় মারকোল আর গুড়ের নৌকাগুলো গলাগলি ধরে ঢেউয়ের তালে তালে নাচছে যেন। মাঝিরা কেউ ছইয়ে বসে, কেউ নিচে নেমে গল্প করছে, মশলা পিষছে, হুঁকা টানছে। হাঁটতে হাঁটতে কতদূর চলে এসেছে ওরা।

একটা ফাঁকা জায়গায় বসলো মাস্টার সাহেব। আনুও বসলো। দু'জনে চুপ করে দেখতে লাগল নদী। নদীটা কেমন নীল আর লাল মেশানো রং নিচ্ছে— আয়নায় আঁকা ছবির মতো মনে হচ্ছে। সেদিকে চোখ রেখেই মাস্টার সাহেব ডাকলেন, আনু।

জি।

আনু তাকালো তাঁর দিকে। কিন্তু তিনি ফিরে তাকালেন না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আস্তে আস্তে বললেন, আনু, তুমি এখনো ছোট। তোমাকে এই কথাগুলো বলা এখন ঠিক হবে না। তবু যদি না বলি, তাহলে বড় হয়ে অনেক প্রশ্ন তোমার মনে আসবে, তুমি উত্তর পাবে না। বড় হলে বুঝবে, আজ আমি এ সব তোমাকে বলে ভালোই করেছি।

অবাক হয়ে যায় আনু। কিন্তু চমকে ওঠে না। মনে হয়, স্বপ্নের ভেতর থেকে কথা বলছে মাস্টার সাহেব। মনে হয়, এই তো আনু বড় হয়ে গেছে। বন্ধুর মতো দু'জনে পাশাপাশি বসে আছে। কথা বলছে। সে অপেক্ষা করে। সে যেন জানেই কী বলবেন উনি।

আনু, আমি বড় গরিব। মাস্টার সাহেব বলতে থাকেন, 'বড় কষ্ট করে লেখাপড়া করছি। তোমার বাবা জায়গির না রাখলে হয়ত বি.এ. পড়াই হতো না আমার। দ্যাখো না, কতদূর রংপুর, রোজ ট্রেনে যাই কলেজে। তোমার কাছে লজ্জা কি? বিনা টিকিটে যাই। হাতে বই খাতা দেখে, আমার মুখের দিকে দেখে, চেকাররা কিছু বলে না। বুঝলে?

হ্যাঁ।

আবার চুপচাপ হয়ে যায় দু'জন। আবার মাস্টার সাহেব বলেন, আনু, তোমার বড় আপাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম মনে মনে। শুধু আমি আর তোমার বড় আপা জানি। আর কেউ জানে না। তোমার বাবার বিপদ, আমি আর ভার হয়ে থাকতে চাই না।

কেন?

অবাক হয়ে আনু জিগ্যেস করে। বড় আপাকে বিয়ে করতে চান মাস্টার সাহেব, সেটা তাকে একটুও লজ্জিত করে না। বরং সে উদ্বিগ্ন হয়ে আবার শুধোয়, আপনি চলে যাবেন?

হ্যাঁ আমার যাওয়াই ভালো। জানো আনু, তুমি যখন বড় হবে তখন বুঝবে আমি যা করছি, রূঢ় হলেও দরকার ছিল। আমি চলে যাচ্ছি। তাতে একটা লোক কমবে সংসারে, তোমাদের এমনিতে অভাব, কিছুটা সুবিধে হবে। তাছাড়া তোমার বড় আপাকে আমি যতই ভালোবাসি, এখন যদি থেকে যাই, কেউ নেই তোমাদের সংসারে যে বড়, তাতে লোকে মন্দ বলবে,

তোমার আপাদের নামে কুৎসা ছড়াবে। আনু তুমি যখন বড় হবে তখন বুঝবে আমি ভালোই করেছি, তোমাদের ভালোর জন্যেই আমি চলে যাচ্ছি। তোমার বড় আপা বোঝে না। তুমি বড় হলে বুঝবে। তোমাকে বলে যাচ্ছি।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন মাস্টার সাহেব। আনু তাকিয়ে দেখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। চোখে হাত দিয়ে দেখে, পানি। পানি মুছে দেখে সন্ধ্যায় কালো হয়ে গেছে নদী। তার কুলকুল আস্তে আস্তে বাড়ছে। দূরে নৌকা থেকে মাঝি আজান দিচ্ছে। একটা তন্দ্রার ঘোরে যেন ঝাউগাছগুলো এখনো একটু একটু নড়ছে।

সে রাতে মাস্টার সাহেব চলে গেলেন।

আনু একদিন শুনলো বাবাকে মহিমপুর হাজতে কয়েকদিনের জন্যে নিয়ে এসেছে। সেদিনই সে খোঁজ নিতে গেল। ছোট দারোগা তাকে দেখে নিয়ে গেলেন বাবার কাছে। আনু যেন চিনতে পারে না তাঁকে। চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে, পরনের জামাটা আধময়লা, কেমন এক শূন্যতা তাঁর চারদিকে। তিনি ব্যগ্র দু' চোখ মেলে দেখলেন আনুকে। আনু মাথা নামিয়ে রইলো।

প্রত্যেকদিন আনুরা সবাই যেত বাবার সঙ্গে দেখা করতে। শেষদিন যখন বাবাকে ওরা এখান থেকে নিয়ে যাবে, সেদিন একটু আগেই এলো আনু. আপারা, মা। আনু ছিল সবার পিছনে। কিন্তু বাবা তাকেই ডাকলেন প্রথমে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বারবার ডাকলেন।

আনু, ও আনু, আনু, বাবা।

উঁ।

সংক্ষেপে জবাব দেয় আনু। কী জানি যদি কান্না পেয়ে যায় তার। বাবা তখন তার কানের কাছে মুখ রেখে মাথার ওপর গলাটা ঠেকিয়ে বললেন, তুমি আমার একমাত্র ছেলে। তোমাকে নিয়ে আমার কত আশা, কত ভরসা। ভালো করে লেখাপড়া করবে। লেখাপড়া শেষ হলে কত বড় চাকুরি করবে। কিছুরই অভাব, কিছুরই ভাবনা থাকবে না তোমার। তুমি মন দিয়ে পড়াশোনা কোরো। আমি শীগগীরই ফিরে আসব।

আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, নিঃশব্দে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল আনু। দৌড়ে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো, হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করলো অনেক দূরে। বাবা তার মাথাটা আরো কাছে টেনে নিলেন। আরো আদর করতে লাগলেন তিনি। চোখ তুলে তাকালে আনু দেখতে পেত তিনিও কাঁদছেন।

।।৮।।

আনু এখন বড় হয়ে গেছে। এই খবরটা কেবল আনু ছাড়া সবাই জানে। কেবল আনু জানে না. সবাই জানে, আনু এখন বড় হয়ে গেছে।

আগে বেলা করে উঠতে ইচ্ছে করত না তার। সালু আপা একদিন যদি ডাকতে দেরি করত, তাহলে সেদিন সারাদিন তার বেণি আস্ত থাকত না। এখন সালু আপা বেণি করে না, মা-র মতো খোঁপা করে। আনু এখন ভোরে ওঠে।

ভোরে উঠে আর ফুল কুড়োতে ছুটে বেড়ায় না। সবার আগে উঠে, কেবল মা-র পরে উঠে, আনু বড় বড় পা ফেলে বাসা থেকে বেরোয়। মা তখন কুয়োতলায় ওজু করছেন, তার সংগে একটা কথা পর্যন্ত হয় না!

পথটা ভারী নির্জন হয়ে পড়ে থাকে। যেন কালরাতে কার গা থেকে ছাই-রং একটা শাল পড়ে গেছে, আর তোলা হয়নি— আকাশটা তেমনি। যেন মোটা আম গাছটার আড়ালে থেকে বাবাকে এখুনি দেখা যাবে পায়চারি করতে করতে আনুর দিকে আসছেন। তার সমস্ত মুখ সূর্য ওঠার লাল রংয়ে ছবির মতো। তার হাসির ভেতর থেকে যেন সূর্য উঠেছে।

খুব গম্ভীর হয়ে একা একা হাঁটতে থাকে আনু। ডাক বাংলোর পুকুরে এসে পদ্ম দেখে, পাতায় পাতায় একটুও পানি দেখা যাচ্ছে না। একটা দুটো পাতা সরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মুখ ধোয় আনু। রাতভর ঠাণ্ডা হয়ে আছে। ঠাণ্ডা পানিতে চোখের ভেতরটা যেন কাটতে থাকে।

কোনো কোনো দিন আনু সেখান থেকে আসে নদীর দিকে। ধরলার দিকে। ধরলার পাড়ে দাঁড়িয়ে কোনো কোনো দিন হিমালয় দেখা যায়। একেবারে সারা আকাশ জুড়ে নীল মেঘের মতো। তারপর, কখন যেন, একটা মেঘের চূড়া ঝকঝক করে ওঠে। আনুও তখন হাসতে থাকে। তার মনের মধ্যে আর কিছুই মনে থাকে না। না বড় আপার ছায়ার মতো মুখ, মেজ আপার কান্না, সেজ আপার এটা নেই ওটা নেই বলে মুখ ভার, মা'র রাত জেগে জেগে নামাজ, মিনু আপা বখাটে হয়ে যাচ্ছে, সালু আপার জামা ছিঁড়ে শাদা কাঁধ বেরিয়ে পড়েছে, বাবাকে জেলে নিয়ে গেছে, পানু ভাই রেলে কাটা পড়ে মারা গেছে, কিছুই মনে থাকে না। সব ভুলে গিয়ে সে দেখতে থাকে —ঝকঝক করছে, হাসছে।

তারপর দপ্ করে নিভে যায়। বাবা বলতেন, সূর্য একটু উঠে গেলেই আর রোদ পড়ে না, তখন কাঞ্চনজংঘা আবার নীল হয়ে যায়। সেটাও মজা লাগতো। দপ্ করে নিভে যেতেই বাবার হাত ধরে আনন্দে লাফিয়ে উঠত আনু। দৌড়ে বাসায় এসে বাকুম বাকুম করে সেই গল্প শোনাতো। মিনু আপা যদি ঠোঁট উলটে বলত, 'যা, আমিও দেখেছি' তাহলে মনটা ভারী ছোট হয়ে যেত আনুর। বাবা সেটা লক্ষ্য করে মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলতেন, মিনু আর কি দেখেছে? আজকের মতো কোনদিন হয়নি। কি বলিস আনু?

এখন আনু কাঞ্চনজংঘা নিভে যাওয়া পর্যন্ত আর দাঁড়ায় না। তার আগেই চলে আসে। এসে আর গল্পও করে না।

আসবার পথে দেখতে পায় ইস্টিশানের দোকানগুলোয় ডালপুরি বানাচ্ছে গরম গরম। ভারী ইচ্ছে করে একটা কেনে। পকেটে হাত দিয়ে দেখে হয়ত চারটি পয়সাও আছে। কিন্তু কেনে না। পকেটের মধ্যে হাত দিয়ে শক্ত করে পয়সাটাকে অনুভব করতে থাকে, ঘোরাতে থাকে, হাতের তেলো ঘামতে থাকে। কিন্তু কেনে না। বাসায় এসে শুধু এক পেয়ালা চা খেয়ে নাশ্তা করে। বারান্দায় বসে বসে দেখে, রান্নাঘরে গতরাতের বাসি ভাত নিয়ে বসেছে মেজ আপা, সেজ আপা; বড় আপা বড় এক গেলাসে পানি খাচ্ছেন। কেউ তাকে পড়তে বলে না। একটু পর আনু নিজেই পড়ার বই নিয়ে বসে। আবৃত্তি করে পড়ে না। মনে মনে, মাথা নিচু করে, বারান্দার থাকে ঠেস দিয়ে এস্কিমোদের কথা পড়ে আনু।

পানু ভাই রেলে কাটা পড়ে মারা গেছে। সেদিন হঠাৎ অফিস থেকে পিয়ন এসে বলল, আনু মিয়া মাস্টার সাহেব আপকো বোলায়া।

মাস্টার সাহেব? কে মাস্টার সাহেব? আনু জানে না পোস্টমাস্টারকেও মাস্টার সাহেব বলে। তাদের বাসায় জায়গির থেকে পড়ত মাস্টার সাহেব, বাবা যখন জেলে গেলেন, তিনি চলে গিয়েছিলেন। যাবার সময় তাকে সব সাদা খাতা, দুটো গল্পের বই, একটা টাকা, কাচের দোয়াত দান, পেতলের একটা ছোট্ট বক দিয়ে গিয়েছিলেন। আনু এখন বুঝতে পারে–বাবা যে নেই, তারা খেতে দিতে পারবে না, তাই চলে গিয়েছিল মাস্টার সাহেব। পানু ভাই বুঝি আগেই টের পেয়েছিল ঘুস নিতে গিয়ে ধরা পড়বেন বাবা, জেলে যাবেন, তাই রেলে কাটা পড়ে ফাঁকি দিয়ে গেল। পানু ভাইয়ের কী? বড় হয়েছে, বি,এ, পাশ করেছে, ঢাকা দেখেছে, ভালো ভালো জামা আর জুতো কিনেছে, বড় বড় জংশনে কাজ করেছে। তার মরে যেতে কী। মরতে একটুও দুঃখ নেই তার।

পিয়নের ডাক শুনে মা এসে দাঁড়িয়েছিলেন দরোজার ওদিকে। নিচু গলায় তিনি জিগ্যেস করলেন, আনু জিগ্যেস কর, ওরা ডাকছে কেন?

পিয়নটা উত্তর করে, মা-জি হামারা মালুম নেহি।

আনু ভেতরে আসে। একটা কথাও বলে না। আলনা থেকে বেছে একটা শার্ট বের করে গায়ে দেয়। সুন্দর করে শার্ট ধুয়ে রাখেন মা। নোখ দিয়ে দিয়ে কালারে, বোতামের জায়গায় কুচিগুলো সমান করে রাখেন।

মা বললেন, বুলুকে নিয়ে যা।

বুলু পাশের বাড়ির ছেলে। এবার নাইনে পড়ে। বুলুর মাকে খুব ভালো লাগে আনুর। বুলুর বাবাকেও, বুলুকেও। বুলুদের সবাইকে ভালো লাগে আনুর। বুলুরা কেউ কখনো বলে না, আনুর বাবা ঘুস খেয়ে জেলে গেছে। সারা শহরে শুধু বুলুরাই বলে না। আর সবাই বলে। বলে, আর দাঁত বার করে হাসে। কেবল বুলুরা বলে না। আর বলে না ইয়াসিন সিপাহী। বাবা যখন এখানে দারোগা ছিল, তখন ইয়াসিন বাজার করে দিত। ইয়াসিন এখনো মাঝে মাঝে হাট করে দিয়ে যায়। ইয়াসিন আনুকেও বলত, দারোগা সাহেব। বলত, আনু যখন দারোগা হবে তখন তার ঘোড়া রাখবে ইয়াসিন। আনু দারোগা হবে না। আনু হবে গার্ড সাহেব। পানু ভাই তো ছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার। সে হবে গার্ড। রাত দুপুরে ঝক্ ঝক্ ঝিক্ ঝিক্ করতে করতে তার গাড়ি বানার পাড়া ছাড়িয়ে ময়মনসিংহ হয়ে ঢাকা চলে যাবে। বুলুর বাবা মাসে দু'মাসে রোজ ঢাকা যান। দোকানের জিনিস কিনে আনেন। পিন, কলের গান, রেডিও, রেকর্ড, কাচে বাঁধানো বিলেতের রাস্তা ঘাট সমুদ্রের ছবি। একটা ছবি খুব ভালো, যেটাতে দুটো ছেলে বসে মাছ ধরছে। আনুও মাছ ধরে। আনুর জন্যে বুলুর বাবা গেল মাসে এক সেট বড়শি আর মুগা সুতো এনে দিয়েছেন। আনু কাল যখন মাছ ধরতে যাবে বুলুর বাবাকে অনেকগুলো মাছ দেবে।

বুলুকে সংগে করে আনু পোস্ট অফিসে এলো। মাথার ওপরে বড় বড় করে লেখা 'পোস্ট ও টেলিগ্রাম অফিস'। পানু ভাই যখন মরে গেল তখন টেলিগ্রাম এসেছিল একটা।

পোস্টমাস্টার বললেন, রেলকোম্পানি তোমার বাবাকে টাকা পাঠিয়েছে পানুর ক্ষতিপূরণ হিসেবে। কে নেবে টাকা? তোমার বাবা তো জেলে। তোমার মাকে নিতে হলে দরখাস্ত করতে হবে সাতদিনের মধ্যে। নইলে টাকা ফেরৎ যাবে।

বেরিয়ে এসে বুলু বলল, কী তুই। বুঝতে পারলি না? তোর ভাই ডিউটিতে মারা গেছে কিনা, তাই টাকা দিচ্ছে।

তবু আনু বুঝতে পারে না। ভাবে রেলের লোকজন খুব লজ্জা পেয়ে গেছে তার ভাই মরে যাওয়াতে, তাই টাকা দিয়ে ভাব করতে চাইছে। দরকার নেই তার টাকার। নেবে না সে টাকা। টাকা দিয়ে কী হবে?

বাবার খুব টাকার দরকার ছিল না। আনু যেন স্পষ্ট শুনতে পায়, একদিন মা রাতে খাওয়া দাওয়ার পর সব ভাইবোনকে নিয়ে দুখের গল্প করছিলেন। বাবার খুব টাকার দরকার ছিল? চিন্তায় চিন্তায় মাথা ঠিক ছিল না বাবার। বড় আপা, সেজ আপা, ছোট আপা সবগুলোকে বিয়ে দিতে হবে। তাই বাবা ঘুস নিয়েছিল। শুনে মুখ কাচুমাচু করেছিল আপারা। তাদের দেখাদেখি সালু আপা, মিনু আপাও— ওরা বড় নয় তবু। বাবা বলতেন, আনুকে বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াবেন। তাঁর দারোগার চাকুরি খালি বদলি আর বদলি। বোধ হয় আনুর বোর্ডিংয়ের জন্যেও মেলা টাকা দরকার ছিল বাবার। মুখ ছোট করে আনুও মাথা নামিয়ে নিয়েছিল।

বাসার কাছাকাছি এসে গিয়েছিল এরা। দেখা যাচ্ছে বকশীদের বাড়ির মাঠে আনুদের ছাগলের বাচ্চাগুলো খুব লাফাচ্ছে। কোরবানির সময় বিক্রি করবেন বলেছেন। ততদিনে ওরা বড় হয়ে যাবে।

আনু কম্পিত গলায় জিগ্যেস করে, বুলু ভাই?

কিরে?

কত টাকা দেবে পানু ভাইয়ের জন্যে।

কী জানি।

বুলু ভাবতে থাকে। আনুর কাঁধে হাত রেখে আচমকা বলে, টাকা পেলে, এবার তোর সালু আপাকে ভালো জামা কিনে দিস।

আনু মুখ তুলে দেখে, বুলুর মুখটা হঠাৎ খুবই ঝকঝকে দেখাচ্ছে। চোখে চোখ পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নিল বুলু। তাড়াতাড়ি বলল, তোর মা সেদিন আমার মাকে বলছিল ও নাকি কিছু চেয়ে নেয় না।

আনমনা হয়ে যায় আনু। কাল বিকেলে ওদের বাসার পেছনে সরু গলিটায় সালু আপাকে দেখেছিল কি যেন বলতে। বুলুকে বলতে। বুলুকে বোধ হয় জামার কথা বলেছে। আনু বলল, ওর একটা ভালো শাড়ি ছিল। সাইত্রিশ টাকা দাম। বড় আপা সেদিন বেড়াতে যাবে. ওর ভালো শাড়ি নেই দেখে দিয়ে দিল সালু আপা। আর নেয়নি।

দরোজার পাট ধরে দাঁড়িয়েছিলেন বড় আপা। আনু কাছে আসতেই সে জিগ্যেস করল, কিরে?

আনু বলল, টাকা এসেছে।

কার?

পানু ভাইয়ের।

কী ভেবে আনু আবার বলল, আমাদের।

পাঁচ হাজার টাকা এসেছিল। বুলুর বাবাই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন পোস্টমাস্টারের সংগে দেখা করে। মাস্টার সাহেব নিজে এসে নিজে হাতে টাকা দিয়ে গেলেন আনুর মাকে। সইটা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন, চশমা পরে দেখলেন, চশমা ছাড়া দেখলেন। তারপর

বুলুদের বাড়িতে চা খেয়ে ছাতা খুলে মাথায় দিতে দিতে চলে গেলেন।

বুলুর বাবা গলা বড় করে ভেতর বাড়িতে আনুর মাকে বললেন, কাল পোস্টাফিসে একটা পাশ বই করেন। এত টাকা কাছে রাখা ঠিক না। আনু, সকালে দোকানে যাবার সময় আমাকে মনে করিয়ে দিও।

রাতে খেয়ে দেয়ে শুয়ে ছিল আনু। এই ঘরটাতে ও থাকে একা চৌকিতে। বাবার বড় পালংকে থাকে মা মিনু আপা আর সালু আপা। ওপাশের ঘরে বড় আপারা। আসলে ঘর একটাই, মাঝখানে হাত তিনেক পথ রেখে বেড়া দিয়ে পার্টিশন করা। ও ঘরে হারিকেন। এ ঘরটা অন্ধকার। শুয়ে পড়েছে সালু মিনু আপা। ও ঘরে মেজ আপার চুল আঁচড়ানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেজ আপা গুন গুন করছে, বোধ হয় মুখে সর মেখে শোবে। যেদিন রাতে ও মুখে সর মাখে সেদিন অমনি গুন গুন করে। আনু কতদিন মাছ ধরতে যায়নি। মা বকে, বলে, মাঝি পাড়ায় গিয়ে থাক, এ বাড়িতে আসিস কেন? হাত নিসপিস করতে থাকে আনুর। বুলুর বাবার দেওয়া সুতো বড়শি যে-কে-সেই পড়ে আছে। কাল যদি মাছ ধরতে যায় বুলুর বাবাকে অনেকগুলো মাছ দেবে। কাল যদি মাছ ধরতে যায়, আনু তাহলে কটা মাছ পাবে? তিনটে, না পাঁচটা জিয়োল, এক গণ্ডা বাচা, একটা বড় শোল, দুটো বেলে। বড় আপা বেলে মাছ ভালোবাসে। আর সবাই জিয়োল। মা, যেদিন শোল মাছ হয় খুব সুন্দর করে রাঁধেন। বাচা মাছ দেবে বুলুর বাবাকে। একটা রুই মাছের বাচ্চা যদি পাওয়া যেতো, হাত দেড়েক, ঝাল ঝাল মাখা মাখা করে রান্না হতো, মাছটা দিয়ে একটুখানি ডাল রান্না করত যদি মা। কিন্তু হাফিজ মিয়ার পুকুর ছাড়া রুই পাবে কোথায় আনু? দেখলে আর কথা নেই। জবাই করে ফেলবে আনুকে। আনুর ঘুম পায়। হাফিজ মিয়ার পুকুরে রুই মাছগুলো যেন দেখতে পায়; কাঁচের মতো পানির নিচে ছবির মতো সব মাথা গুঁজে পানির মধ্যে পড়ে আছে। মাথার 'পরে খুব রোদ উঠেছে কিনা!

লণ্ঠনের আলো সারামুখে টের পায় আনু। দ্যাখে, মা। মা লণ্ঠন তুলে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

ঘুমিয়েছিস?

না।

কিন্তু মা লণ্ঠন নামিয়ে নেন। যেন যাবার উদ্যোগ করেন। বলেন, থাক, তাহলে ঘুমো।

আনু কান পেতে শোনে, এখন আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। অনেক রাত হয়েছে নিশ্চয়ই। বড় আপাদের ঘরে বাতিটা নেভানো। আনু উঠে বসে। বলে, কি?

মা খুব দ্বিধা করে আদর নিয়ে বলেন, একটা চিঠি লিখবি আনু? আয়, আমি পোস্টকার্ড কলম বার করে রেখেছি।

আনু তখন উঠে দাঁড়ায়। যেন পড়ার টেবিলে যাবে লিখতে। তারপরই মনে হয় টেবিল তো এ বাড়িতে আনা হয়নি। ঘুমিয়ে গিয়েছিল আনু, সব ভুলে গিয়েছিল আনু।

কলম টলম নিয়ে এসে মা বসলেন চৌকির এক কোণে। মাঝখানে লণ্ঠন রেখে মনোযোগ দিয়ে ছোটবড় করে আলো ঠিক করলেন মা। পোস্টকার্ডটা তেলতেলে হয়ে গেছে। কলম নিয়ে আনু ওপরে সুন্দর করে লিখল, গড ইজ গুড। তারপর জিগ্যেস করল, কার কাছে লিখবো মা?

তোর মামার কাছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল আনু পোস্টকার্ডের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু মা কিছুই বললেন না। যখন চোখ তুলে তাকাল দেখল মা খুব ভাবছেন। মা তাকে মাথা তুলতে দেখে একটু থতমত খেলেন যেন। তারপর পরামর্শ করার গলায় বললেন, টাকা যখন পাওয়াই গেল আনু এবার তোর বড় আপাকে বিয়ে দিতে হয়। কত বড় হয়ে গেল। লোকে কত কী বলে, আরো বলবে এখন। তোর মামাকে ডেকে আনি, কি বলিস? তুই বড় হলে আমার দুঃখ ছিল না।

মার চোখ যেন পানিতে চিকচিক করতে থাকে। আনু দেখতে চায় না। আনু চোখ নামায় আবার। মা বলেন, লেখ, পাকজোনাবেষু, আমার শত কোটি ভক্তিপূর্ণ সালাম জানিবেন ও ভাবীজানকে দিবেন।

সোমবারে রংপুরে গেল আনু বাবাকে দেখতে। বুলুর বাবার কাজ ছিল রংপুরে! তার সংগে গেল আনু। মা পিঠে বানিয়ে দিয়েছেন বাবার জন্যে। ছোট্ট টিফিনকারিতে ভরে সারাক্ষণ কোলে কোলে রেখে সকাল দশটার গাড়িতে চেপে বেলা দেড়টায় রংপুরে পৌঁছলো আনু। এর আগে আরো কয়েকবার এসেছিল। মাও এসছিলেন তিনবার। বড় আপা, সেজ আপা, মেজ আপাও তিনবার। সালু আপা দু'বার। মিনু আপা প্রায় প্রত্যেকবার যতবার আনু এসেছে। মিনু আপা আজ আসেনি, ওর পরীক্ষা। আনু রোজ মাসে দুবার। আনু যখন জেলগেটে এলো তখন চারটেও বাজেনি। পথে খুব শস্তা বাঁধাকপি দেখে কিনেছিল একটা। মা দেখলে খুশি হবেন। মার মুখটা মনে করে ভালো লাগলো আনুর।

কত লোক এসেছে দেখা করতে। দুটো বউ এসেছে গরুর গাড়ি করে। তাদের সংগের লোকটা উবু হয়ে বসে আর তিনজনের সংগে পরামর্শ করছে। এককোণে চার পয়সার কবিতা সুর করে করে পড়ছে আর বিক্রি করছে দু'জন চোঙা লাগিয়ে। একজন পড়ছে, একজন থেমে যাচ্ছে, আবার সে পড়ছে, আগের জন দম নিচ্ছে। আনুর এক হাতে কপি, আরেক হাতে টিফিনকারি। মেলা লোক ভিড় করে পাঠ শুনছে। হাতখালি থাকলে আনুও গিয়ে শুনতো। চারটে বাজতে এখনো অনেক দেরি।

তারপর লাইনে গিয়ে দাঁড়াল আনু। এগুলো সব তার এখন মুখস্থ হয়ে গেছে। অফিসের এককোণে ছোটবাবুর টেবিলের কোণায় জিম্মা রাখলো কপিটা। টিফিনকারিটা দেখে দিল ওরা। ডাক পড়ল আনুর।

রোজকার মতো, বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন আনুকে। আনুর এটা অভ্যেস হয়ে গেছে। আনু বলল, পানু ভাইয়ের পাঁচ হাজার টাকা এসেছে। শুনে চমক ভাঙলো বাবার। বললেন, টাকা কোথায় রেখেছে তোর মা?

পোস্টাফিসে। মা বললেন, বড় আপার বিয়ে দেবে।

কোথায়?

জানি না। আমাকে বলেনি।

বাবা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। চারিদিকে খুব হৈচৈ হচ্ছে। সবাই দেখা করছে। নিঃশ্বাসটা তাই শুনতে পেল না আনু।

পানুটা থাকলেও ভাবনা ছিল না। তুই নিজে পছন্দ করিস আনু। তোর পছন্দ না হলে না

করে দিস।

আনুর কেমন লজ্জা করতে থাকে। আবার খুশিও লাগে। বলে, আমার কথা মা শুনবে?

শুনবে। আমি চিঠি লিখে দেব। আর শোন, তোর মামাকে ডাকিস না।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে আনু। বাবা বলে চলেন, তোর মামা লোক ভালো না। নিজের ভালো দেখবে, তোদের কিছু হোক না হোক তাকাবেও না। পানুর টাকার কথা ওকে জানিয়ে কাজ নেই। তোর মায়ের সৎ-ভাই হাজার হলেও।

কিন্তু সেদিনই রাতে আনু মামার কাছে টাকার কথা লিখেছে মার জবানিতে। বাবাকে বলতে সাহস হয় না। পায়ের নখ দিয়ে মেঝে খুঁড়তে থাকে। বাবা তখন তার মাথায় হাত রেখে চুলের জট ছাড়াতে থাকেন। জিগ্যেস করেন, রংপুর এসে কিছু খাসনি?

আনু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে।

কী খেয়েছিস?

আনু জবাব দিতে পারে না। বাবা আরো হাত বুলোতে থাকেন। খামকা আনু বলে, মিনু আপার পরীক্ষা। একটুও পড়ে না।

আচ্ছা আমি লিখে দেব। পড়বে না কেন? না পড়লে কেউ বড় হতে পারে? অনেক পড়বে, পড়তে পড়তে স্কুল পাশ করবে, কলেজে যাবে, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি তারপর বিলেত। বিলেত থেকে ফিরে এসে রিসার্চ করবে, ডক্টরেট নেবে। লোকে কত ভালো বলবে। সালাম দেবে। বিদ্বানের কত সম্মান, কত প্রতিপত্তি। রাজা পর্যন্ত বিদ্বানের কাছে মাথা নত করে।

বলতে বলতে বাবার মুখচোখ দিয়ে আলো ঝরতে থাকে। যেন সুদূর দেখছেন তিনি। আনুর মাথায় হাতটাও কখন থেমে যায়। আনু টের পায়, বাবার গলা ধরে এসেছে। তার নিজেরও কেমন ছমছম করতে থাকে বুকের ভেতর। ঠিক তখন ঘণ্টা পড়ে। ঢং ঢং করে বুড়ো সেপাই ঘণ্টা বাজায়। বটগাছটা থেকে কাকগুলো হঠাৎ উড়ে গিয়ে আবার একে একে বসতে থাকে। আনু বেরিয়ে আসে। এসে বাঁধাকপিটা নেয়। খালি টিফিনকারি পায়ের সঙ্গে লেগে লেগে ঢন্ ঢন্ করতে থাকে। নবাবগঞ্জে এসে গ্রামোফন-ডিলার দাশ-কোম্পানির বেঞ্চিতে জিরোয় আনু। সন্ধ্যের সময় বুলুর বাবা এখান থেকে এসে তাকে নিয়ে যাবেন। বসে বসে গান শুনতে থাকে আনু। সেজ আপা গান শিখলে গলাটা এমনি মিষ্টি হতো। লোকে কত রেকর্ড কিনে নিয়ে যেত সেজ আপার। দাশ কোম্পানির আলমিরার মাথায় বাঁধানো থাকত সেজ আপার ছবি সবার সঙ্গে।

আজ মাছ ধরতে যাবে আনু। দুপুরে সকাল সকাল খেয়ে চুপ করে বেরিয়ে পড়ল। হাফিজ মিয়ার পুকুরে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু যাওয়া যাবে না। হাফিজ মিয়া নিজেই কাল থেকে ছিপ ফেলছেন। পকেটে তবু মেথি দিয়ে তৈরি বড় মাছের টোপ বানানো আছে। কাল রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে মেজ আপা আর সে বানিয়েছে। মেজ আপার খুব সখ এদিকে। বাবার সাইকেলটা নিয়ে উঠোনেই সে পাক খায়। চড়তে শিখেছিল কমলাগঞ্জে থাকতে। মা বলেন, গেছো মেয়ে। আনুর খুব ভালো লাগে। বুলুর বাবার দোকানে একটা ছবি ঝোলানো আছে, অনেক ক'টা মেমসাহেব সাইকেল চালিয়ে একসংগে সবাই ডানহাত তুলে হাসতে হাসতে যাচ্ছে।

পথে পিয়ন একটা চিঠি দিল আনুকে। পথে এরকম দেখা গেলে সে আর বাসায় যাবার কষ্ট করে না। বেঁচে যায় যেন, খুব খুশি হয়। আনু ছিপটা মাটিতে ঠেকিয়ে পোস্ট কার্ডটা তক্ষুণি পড়তে শুরু করে। পড়ে দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে মাথায়। কিন্তু সেটা টের পায় না আজ। ছিপ তুলে খুব তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে আসে।

এসে দেখে মা জলচৌকিতে শুয়ে আছেন। তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে তোলে আনু। বলে, মামা চিঠি লিখেছে মা।

ধড়মড় করে মা উঠে বসেন। বলেন, কই? কখন?

মা পড়তে বলার আগেই আনু পড়তে শুরু করে দেয়— দোয়া বহুত বহুত পর সমাচার এই যে, আয়ুষ্মান আনুর হস্তাক্ষরে একখানি পত্র পাইয়া তোমার যাবৎ বিষয় অবগত হইলাম। রেল কোম্পানি নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছে ইহা একরূপ ঠকাইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। পানুর এন্তেকালে এ সংসারের যাহা ক্ষতি হইল তাহা লক্ষ টাকাতেও শোধ হইবার নহে। যাহা হউক, আল্লাহ্‌র নিকট শোকর গোজারি করিলাম যে, অন্তত কিঞ্চিত কিনারা হইয়াছে। তোমার প্রথমা কন্যার বিবাহের জন্য ভাবনা করিও না। আমি নিজ দায়িত্বে তাহা সম্পন্ন করিব। অত্র মহাকুমা সদরে একজন বি,এ, ফেল শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত বংশীয় পাত্রের সন্ধান আছে। আমি দুই চারি দিনের মধ্যেই তাঁহাকে ও তাঁহার দুই একজন খাস্‌ দোস্ত সমভিব্যহারে তোমার বাটিতে পহুছিব। পছন্দ হইলে শুভকার্য এই যাত্রাতেই সম্পন্ন করা যাইবে। আর বিশেষ কি লিখিব? এদিকে আরেক সুযোগ হাত ছাড়া হইতেছে। বিলাতের মাতা তাহার নিষ্কর জমির তিন বিঘা মাত্র দুইশত পঁচিশ টাকা প্রতি বিঘা দরে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। আমার হাত বর্তমানে কপর্দক শুন্য। যদি সাত শত টাকা ঋণ দিতে পারো তো প্রথম বর্ষের শস্য হইতেই শোধ করিতে পারিতাম। আমি তাহাকে বহু বুঝাইয়া রাখিলাম। তুমি অর্থের জোগাড় রাখিও। শ্রেণীমত আমার দোয়া পৌছাইয়া দিও।

চিঠি পড়া শেষ হতেই মা বলেন, তাহলে তো বাড়িঘর দোর ঠিক করতে হয় আনু।

আনু সেদিকে কান না দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, টাকা দেবে নাকি তুমি মামাকে?

মা অবাক হয়ে তাকান। আনু আবার বলল, বলো, তুমি দেবে নাকি?

তুই চেঁচাচ্ছিস কেন আনু?

হাত ধরে তাকে চৌকিতে বসাতে চেষ্টা করেন মা। কিন্তু আনু শক্ত করে চিঠিটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, তুমি টাকা দিতে পারবে না।

তার গলার স্বর শুনে আপারা এসে ঘিরে দাঁড়ায়। বড় আপা জিগ্যেস করে, কার চিঠিরে আনু?

সবার দিকে তাকিয়ে মা'র চেহারাটা যেন হঠাৎ বদলে যায়। দেখতে পায় আনু, যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। আনু যেন ছোট হয়ে যায়। মনে হয়, ভীষণ একটা অন্যায় করে ফেলেছে সে।

মা বলেন, এত যে চেঁচাস একা মামা ছাড়া তোদের আছে কে? বাপ তো জেলে, তাকে এসব দেখতেও হয় না, শুনতেও হয় না। গুষ্টি মরলে দুনিয়ায় শান্তি হতো।

চোরের মতো বেরিয়ে আসে আনু, ছিপটা লাথি মেরে সরিয়ে দেয়। ছিপটা বাইরের ছোট্ট ঘরে আড় হয়ে পড়ে ছিল। পথে এসে প্যান্টের পকেটে হাত দিতেই টোপের কৌটা ঠেকল। সেটা খুলে সব ফেলে দিল কচুবনের মধ্যে। বুলুদের বাসায় কলের গান বাজছে। সবাই যদি

এক সংগে আজ মরে যেতে পারত তো মা টের পেতেন মজা। বড় আপার ওপর খুব রাগ হলো তার মাকে কিছু বলল না দেখে। অন্য দিন বকলে খুব এসে পেছনে ডাকে, আড়ালে নিয়ে যায়। আজ সে চলে এলো, কেউ চোখ তুলে দেখলও না। বুক পকেটে পোস্টকার্ডখানা উঁকি দিচ্ছে। ভাঁজ করে রাখল আনু। তারপর ইস্টিশনে গিয়ে বসলো। বেলা চারটের গাড়ি এসেছে, ইঞ্জিন ব্যাক করছে, পানি নেবে একটু পরে। উলিপুর চিলমারীর বাস এসে পৌছুলো। লোকগুলো দৌড়ে দৌড়ে সব টিকেট ঘরের কাছে যাচ্ছে। বুলবুল চানাচুর বিক্রি করছে, বস্তা একআনা, লালমণিরহাট থেকে ভেজে আনে। ভারী চমৎকার। আনু একটা কিনল।

।।৯।।

তিনদিন পরে রাত আটটার গাড়িতে মামা এলেন। সংগে আরো দু'জন। দু'জনেই প্যান্ট-বুশ শার্ট পরা, একজনের হাতে সব সময় সিগারেট, আরেক জনের চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। দুজনে নিজেরা নিজেরা কি বলে আর হাসে। তার মধ্যে চশমা পরা লোকটা কম হাসে। সিগারেটওয়ালা প্রায় কাতুকুতু দেয়ার মতো করে আনুকে বগলে বগলে টানে আর খালি জিগ্যেস করে তোমার ক'বোন? কোন বোন বেশি আদর করে? কে ভালো গান গায়? কার চুল লম্বা? একটারও জবাব দিতে পারে না আনু। ভীষণ লজ্জা করে তাব। লোকটার গায়ে মাখনো সেন্ট, তার গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে আনুর। লোকটা নতুন সিগারেট ধরানোর জন্যে হাত ছাড়তেই আনু প্রায় ছুটে পালায়।

মামা আড়ালে ডেকে ধমকান, বেয়াদব ছেলে! মেহমানদের কথার জবাব না দিয়ে উঠে আসে! দারোগার ব্যাটা আর শিখবে কত!

তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে মামা যান রান্নাঘরে। সেখানে রান্নার জোগাড় করছে আপারা। আজ মেহমান বাড়িতে। মা মুরগির খাঁচা থেকে সেই দশটার সময় দুটো বের করে জবেহ্ করেছেন। পালক ছাড়ানো, দেখতে দুটো .কবল-হওয়া বাচ্চার মতো, শুয়ে আছে গামলায় গরম পানিতে। গরম মশলার খোশবু ছড়িয়েছে। মামা উবু হয়ে বসতেই মা একটা পিঁড়ি টেনে দিলেন, মাথায় ঘোমটা টানলেন। মামা বললেন, তোমরা একটু যাও।

আপারা উঠে যেতেই অনুচ্চ কণ্ঠে মামা হাত নেড়ে নেড়ে কী বলতে লাগলেন মাকে। আনু বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। একবার ভাবল, কাছে যায়। আবার সংকোচ হলো। বাবা বলেছেন আনুকে পছন্দ করতে। আনু তখন পায়ে পায়ে বাইরের ঘরের দিকে আসে। কিন্তু তার আগেই সেজ আপা, মেজ আপা, ছোট আপা, সালু আপা, মিনু আপা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে। নিজেরা ঠেলাঠেলি করছে। মিনু আপা হাসতে গেছে তার মুখ চেপে ধরলো মেজ আপা।

শোবার ঘরে এসে দেখে খাটো করে রাখা হারিকেন। বড় আপা নামাজের চৌকিতে এক কোণে চুপ করে বসে আছে। তার দু'হাত কোলের ওপর, যেন এখুনি উঠে যাবে। উঠল না। আনুকে দেখে ম্লান হাসলো বড় আপা। বড় আপা কখনো হাসে না। হাসলে এত সুন্দর লাগে, মনে হয় নতুন মানুষ, ও যেন আনুর বড় আপাই না, অন্য কেউ, একেবারে ছবি।

বড় আপা নিঃশব্দে অনেকক্ষণ হাসে। তখন আনু একটা কথাও না বলে তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। একটা হাত টেনে নিল মুখের ওপর। সুন্দর চেনা চেনা গন্ধ। আনু টের পায়, বড় আপা আজ লুকিয়ে মুখে সর মেখেছে। হাতের ভেতরটা ভারী মিষ্টি হয়ে আছে তার।

পরদিন বড় আপাকে দেখল ওরা।

চশমা পরা লোকটা হচ্ছে পাত্র। আনুর খুব অস্বস্তি লাগে। বুলুর বাবা বড় আপাকে নিয়ে এসে তার মুখোমুখি বসলেন। আনু বসল তার আরেক পাশে। ভেতর থেকে এ বাড়ি ও বাড়ির সবাই তাকিয়ে রইল। সবাই মিলে আজ বড় আপাকে সাজিয়েছে। মার গয়নাগুলো পরিয়েছে। তোলা নীল শাড়িটা থেকে চামেলী আতরের গন্ধ দিচ্ছে। হাতের নখে ঠিকরে পড়ছে হ্যাজাকের আলো। বুলুর বাবা তাঁর দোকান থেকে একদিনের জন্যে ধার দিয়েছেন হ্যাজাকটা। শুম শুম করছে তার তেল পোড়ার শব্দ। বড় আপাকে জমিদারের বউয়ের মতো লাগছে। বুকের মধ্যে দুপদুপ করছে আনুর।

মামাই কথা পাড়লেন— মেয়ে দেখতে হবে না কাশেম মিয়া। আমার ভাগনী বলে নয়, এরকম মেয়ে দু'চার জেলায় হয় না। রান্না, সেলাই, নামাজ-রোজা, আদব-তমিয সব কিছুতেই বরাবর কাবেল। ম্যাট্রিক পাশ করেছিল সেকেণ্ড ডিভিশনে। এতদিন আমরা বিয়েশাদির কথা— বড় মেয়ে খান্দানি পাত্র শিক্ষিত নওশা তো আর হাতের তুড়িতে আসে না।

বলেই মামা অন্দরে চোখ ঠারলেন। শেষে বললেন, সওয়াল করুন, নাশতা-পানি জুড়িয়ে যাচ্ছে। কই আক্কাস কথা কও না?

আক্কাস অর্থাৎ সিগারেট সর্বক্ষণ যার হাতে হেঁ হেঁ করে হাসল। তারপর কোল বালিশ টেনে গলা সাফ করে জিগ্যেস করল, আপনার নাম?

ফাতেমা খাতুন।

বড় আপা একটুও ভয় পায়নি। গলা একটুও কাঁপল না। কেবল কেমন যেন লজ্জা জড়ানো— তাও ভালো করে ঠাহর হয় না। বড় আপাকে এই নিয়ে আট ন'জন দেখে গেল। একবার এসেছিল একজন, তাকে খুব পছন্দ হয়েছিল আনুর। রায়বাজারে এক ছোট দারোগা ছিল, মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে শীস দিত আর হাঁটত বিকেল বেলায়, চিনিচম্পা কলা খেতে খুব ভালোবাসত, ঠিক তার মতো দেখতে। সকালের গাড়িতে এসে রাতের গাড়িতেই চলে গিয়েছিলেন। যাবার সময় আনু সংগে সংগে ইস্টিশান পর্যন্ত গেছে। অন্ধকারে হঠাৎ তাকে দেখে লোকটা ভারী লজ্জা পেয়েছিল, তার সংগে কথা বলতে ভারী ইচ্ছে করছে লোকটার। সেও ঘুর ঘুর করছে। কিন্তু কথা হয়নি। লোকটা গিয়ে আর কোনো খবর দেয় নি।

জিগ্যেসবাদ চলল অনেকক্ষণ ধরে। মামা বাইরে গেলেন, বুলুর বাবা বাইরে গেলেন, পাত্র কথা বলল বড় আপার সংগে। আনু বসে রইল সারাক্ষণ। বুলুর বাবা বাইরে গেলে বড় আপা যেন খুব ভয় পেল। ভাল করে কথা বলতে পারল না। নিঃশ্বাস যেন গলার মধ্যে আটকে রইলো। আবার যখন ওরা ফিরে এলেন, বড় আপা নড়ে চড়ে বসলো। বড় আপাকে নিয়ে ভিতরে এলো আনু। বারান্দায় বুলু খাবার সাজাচ্ছে খানচায়। মা, মেজ আপা, বুলুর মা তুলে তুলে দিচ্ছেন।

আনুর পছন্দ হয়নি। কিন্তু বলতে পারল না কাউকে। বড় আপা শোবার ঘরে গেল। তাকে সংগে যেতে হলো। বড় আপা তার আঙুল ধরে আছে শক্ত করে। ঘরে যেতেই সালু আপা, মিনু আপা, ছোট আপা, সেজ আপা ঘিরে ধরল। সবার চোখ মুখ দিয়ে খুশি লাফিয়ে পড়ছে। গা টিপছে, হাসছে, ঢলে ঢলে পড়ছে। এমনকি বড় আপাকেও খুব খুশি লাগছে. কিন্তু দেখাচ্ছে না। আনু বলতে পারল না কাউকে। আনু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল জানালার শিক ধরে, এক পা ভাঁজ করে আরেক পায়ে ঠেকিয়ে। অনেক্ষণ বসে থেকে তার পা ধরে গেছে। বড় আপাকে বললে যেন এখুনি ডাকবাংলা, নদীর পাড়, চৌধুরীদের দালান, দু'তিন মাইল বেড়িয়ে আসতে পারবে।

রান্নাঘরে আনুকে খেতে দিয়েছিলেন মা। মামা চটি চট্‌পট্ করতে করতে এসে একটা মোড়া টেনে বসলেন। উদ্বিগ্ন হয়ে মা জিগ্যেস করলেন, কি বলল ছেলে?

কি বলবে। সব আমার হাতে। পাকা কাজ না হলে আমি হাতই দিই না। তোমরা দু'তিন গণ্ডা পাত্র দেখলে, খালি মুরগি পোলাও ধ্বংস।

অপ্রস্তুত হয়ে মা জড়সড় হয়ে বসলেন। আনুকে বললেন, আনু আর একটা গোশ্‌ত দিই?

আনু মাথা নাড়ল। কিন্তু নিল। অনেক্ষণ চুপ করে রইলেন মামা। পরে গলা নামিয়ে বললেন, দাবি দাওয়া খুব বেশি। তাই সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি। ওখানে তোমার ভাবীকে দিয়ে কায়দা করতে হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

মা একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আল্লাহ্ এবার মুখ না তুললে আমার আর দিশা নেই ভাইজান।

তুলবে, বুবু তুলবে। আমি সামনের মাসেই তারিখ ফেলব. তুমি সাফ নিশ্চিন্ত থেকো। আনু, যাও তো পান নিয়ে এসো বাবা।

আনু ঢকঢক করে পানি খেল পুরো এক গেলাস। তারপর যেতে যেতে বারান্দার কাছে এসে চোখ ফিরিয়ে দেখল মা আর মামা ফিসফিস করে কি বলছেন। পান সে যতক্ষণ খুশি দেরি করে আনতে পারে. মামা রাগ করবেন না। আনু আর পান আনলো না। আনু গিয়ে রাতের রাস্তায় জোড়া সুপারি গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে রইল। তার পছন্দ হয়নি. এ কথা কাউকে বলা যাবে না। তার ইচ্ছে করছে বলতে, কিন্তু তাহলে বড় আপা হয়ত মুখটা আঁধার করে ফেলবে। আনু ফিরে এসে দেখল. বড় আপা শুয়ে রয়েছে। মাথার কাছে তোলা কাচের জগ আর পাতলা গেলাস চারটে। হয়ত ঘুমের মধ্যে হাত লেগে ভেঙে যাবে। মাথার কাছ থেকে একটা একটা করে সরিয়ে রাখল আনু।

পরদিন ভোরে মামা যাবার আগে বললেন, আনুর মা, তো আমার কি করলে?

এ প্রশ্নের জন্যেই যেন কাল থেকে বুক কাঁপছিল আনুর মার। তিনি চোরের মতো আনুকে একবার দেখলেন। আনু তখন পরম সাহসে তার ছিপ বার করে উঠোনে বসে বসে তেল খাওয়াচ্ছে। সে শুনতে পেল মা বলছে, আমার এ দুর্দিনে টাকা কোথায় ভাইজান? দারোগা সাহেবের বিপদের পর উপরে আল্লাহ্ জানে কী করে দিন যাচ্ছে এই ছেলেমেয়েদের নিয়ে।

খুব গম্ভীর হয়ে শুনলেন মামা। আনু ছিপটাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে আবার ছেড়ে দিল। চমৎকার তার হয়েছে ছিপটা। পাঁচ সাত সের পর্যন্ত ভাঙবে না।

শেষ অবধি রাহা খরচ দিতে হলো মামাকে। মামা খুব অন্যমনস্ক হয়ে বাড়ি থেকে

বেরোলেন। মার কথার ভালো করে জবাব দিলেন না। যাবার সময় আনুকে একবার বলেও গেলেন না। আনু আর ইস্টিশনে গেল না।

রান্নাঘরে পানি খাবার ছুতো করে এসে আনু দেখল মা সেখানেও নেই। ছাগলের বাচ্চাগুলো তরকারির খোসা চিবোচ্ছে। মা কুয়োতলায় বসে হাঁপাচ্ছেন আর গতরাতের সুরুয়া লাগা দস্তর খানা আছড়ে আছড়ে সাবানের ফেনায় সাফ করছেন। মার খুব কষ্ট হচ্ছে। মা তাকে দেখে লজ্জা পেলেন যেন। কোনো রকমে থুপথাপ করে কাপড় রেখে হাত ধুতে ধুতে নিচু গলায় বললেন, বুলুদের হ্যাজাকটা দিয়ে আসবি?

পনেরো দিন ধরে মুখর হয়ে রইল বাড়ি বড় আপার বিয়ের গল্পে। মামা তো বলেই গেছেন, পছন্দ অপছন্দ তার হাতে, সামনের মাসে তারিখ দেখবেনই। মা আবার শেফালির বোঁটাগুলো রোদে বার করে শুকোচ্ছেন। বুলুর বাবাকে টাকা দিয়েছেন ঢাকা থেকে শাড়ি আনতে। বড় আপাকে দিয়ে একটা কাজও আর করিয়ে নেন না মা। একটা কিছু করতে এলে হাত থেকে কেড়ে নেন। গাল পেড়ে সামনে যে মেয়েকে পান, বলেন, তোরা করিস কি? খালি আড্ডা আর খাওয়া। লেখাপড়া তো মাথায় উঠেছে।

বড় আপা এখন রোজ রাতে মুখে সর মাখে। সেদিন গুন গুন করে গানও গাইছিল। পরশুদিন নতুন স্যাণ্ডেল পরে আনুকে নিয়ে টাউন হলে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল। বাবাকে আনু বলে এসেছিল বিয়ের কথা। বাবা জিগ্যেস করেছিলেন, তোর পছন্দ হয়েছে আনু?

উত্তরে সে মাথা কাত করে জানিয়েছে— হ্যাঁ। বাবাকেও সে বলতে পারেনি। আনুর পছন্দ হয়নি। মা তাহলে খুব কষ্ট পাবে। বড় আপা আবার ঘরের সব কাজ করতে শুরু করবে। ময়লা কাপড় পরবে, গোসল করবে সেই বিকেল বেলায়, একদিনও বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আর বলবে না আনুকে।

বড় আপা চলে যাবে। আনুর খুব খারাপ লাগে। বড় আপাকে আরেকদিন নিয়ে যাবে বকশীদের বাড়িতে। বকশীদের মেয়েগুলো একদিন আনুকে বলছিল, তোর দিদির নাকি বিয়ে? একদিন নিয়ে আসবি বেড়াতে?

আনু নিয়েই যেত। বড় আপা যেতে চায় না। হাসে আর বলে, ওদের নিয়ে যা। কিন্তু অন্য কোনো আপাকে নিয়ে বেড়াতে ভালো লাগে না আনুর। তার উৎসাহে যেন পানি পড়ে।

আয়নার মতো নিজেকে দেখা যাচ্ছে নদী থেকে একটু দূরে খালের পানিতে। আনু ছিপ হাতে নিয়ে ভাবে, বেলে মাছ পেলে বড় আপা খুব খুশি হতো। বেলে মাছ কী মিষ্টি, নারে? বড় আপা বলবে আর খাবে।

ইস ইস্। ছিপ ধরে প্রচণ্ড টান দেয় আনু। কয়েকটা পচা পানা এসে ঠেকেছে। একটা দোলা দিয়ে বড়শিটাকে বাঁ হাত দিয়ে কাছে আনে, তারপর পানা ছাড়িয়ে নতুন একটা পোনামাছ গেঁথে টুপ করে আবার পানিতে ফেলে দেয়। ভাসতে ভাসতে ফাৎনাটা স্থির হয়ে আসে। আনু আস্তে আস্তে তখন কাঁধ নামিয়ে দু'হাঁটুর মাঝখানে ছিপটা রেখে বসে। ঝোপের মধ্যে কোথাও একটা পাখি ডাকতে থাকে— তা টুক টুক, তা টুক্ টুক্।

বাবাকে বললেও হতো। বাবাকে বললে, বাবা খুব শক্ত চিঠি লিখে দিতেন মাকে। মিনু

আপাটা পড়ে না কেন? আমি বলতে যাবো। আমি বললেও পারতাম বাবাকে। বাবা আমাকে বললেন, তোর মামা টাকা চেয়েছিল নাকি রে? আমি তখন মাথা নেড়ে চোখে মুখে বললাম, না, না। মা যদি মামাকে টাকা দিত, কি বলতাম বাবাকে? আমার একটুও পছন্দ হয়নি। বাবাকে বললেও হতো। বললে, চিঠি লিখে দিতেন। বাবাকে বললাম না কেন?

কোল থেকে খরখর করে নেমে যাচ্ছিল ছিপটা। দু'হাতে আঁকড়ে ধরে পড়ি পড়ি করে উঠে দাঁড়াল আনু। দু'তিন পা এগিয়ে একেবারে পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে আড় করে একবার টানলো। স্রোতের উল্টো দিকে টানছে। কি? আবার একটু ডানদিকে ফেরালো ছিপটা। ছিপ এলো, বড়শি রয়ে গেছে সেখানেই। মাছটা নড়ছে না। চুপ করে দম নিচ্ছে বুঝি। বড় কই হবে। না কই না। কই হলে গোঁত্তা মারত হঠাৎ। একবার ডানে, একবার বামে কয়েকবার দুলিয়ে হু-উ-স করে ডাঙায় তুলে ফেলল ছিপ্। সংগে সংগে গোঁড়ালির ওপর ঘুরে আকাশ পানে হা করে তাকিয়ে দুলতে দুলতে আনু দেখে রূপোর করনির মতো ফলি মাছটা দাপাচ্ছে, ভাঁজ হচ্ছে আবার সোজা হচ্ছে। পিঠের ওপর আটকেছে বড়শি। খানিকটা ছাল শুধু ধূসর মাংস ছিলে উলটে গেছে। খুব লেগেছে মাছটার। বড়শিটা গিললে কষ্টই পেতি না। নিচে দিয়ে যাচ্ছিলি কেন? খুব সাবধানে খুলে আনে আনু। নিচে দিয়ে যাবার সময় বাঁকা হয়ে জোরে ভেসে উঠেছিল, তখন গেঁথেছে।

পেট থেকে আতুরি বার করে ছুরিটা পকেটে রাখে আনু। তারপর একটা গর্ত বানায়, গর্তটা আপনা আপনি ভরে ওঠে পানিতে। কতগুলো ঘাস ছিড়ে বিছিয়ে মাছটাকে সেখানে রাখে আনু। একটা বড় নৌকা নদী থেকে খাদের মধ্যে ঢোকে— পলাশ বাড়ির হাট আছে কালকে। আরো কয়েকটা নৌকা গেছে।

একটা বেলে পেলে হতো। ছোট্ট, এই আধ হাত মতো হলেও হয়। বেলে কেউ পছন্দ করে না। কেবল সে আর বড় আপা। আবার ছিপ ফেলে আনু। বাবাকে বললেও পারতাম। বাবাকে বললাম না কেন?

বুলু ভাইকে বললেও হতো। বুলু ভাইকে বললাম, আসতে, এলো না। সালু আপার সংগে ক্যারম খেলছে দুপুর থেকে। মা ঘুমিয়ে কিনা, নইলে দিত এক বকুনি। দিতাম যদি মাকে ডেকে।

অনেক্ষণ কিছু ওঠে না। ছিপ উঠিয়ে আনে আনু। টোপ বদলায় অনেক্ষণ ধরে। একটা তাজা পোনা লাগায়। লাগিয়ে আবার ফেলে। ফেলে চুপচাপ বসে থাকে। নৌকাটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

মামাকে যদি টাকা দিতেন মা? ইস্, দেবে কী' আমি তাহলে বাবাকে বলে দিতাম। মা একটা বোকা। মা খুব বোকা। মা কিস্সু বোঝে না। বাবাকে বললাম না কেন? আমি একটা বোকা। আমি খুব বোকা। আমি বোকা। শুনলে, বাবা রাগ করবেন। বাবাকে বললাম না কেন?

আস্তে আস্তে বেলা পড়তে থাকে। পেছনে বাজপড়া তাল গাছটায় কাক বসে আছে। কা কা করছে। একটা ঢিল ছুঁড়তে গিয়ে ছিপ নড়ে গেল। যাক্গে। আমি খুব বোকা। কাকটা উড়ে গেল।

বাবাকে বলব। আবার যখন দেখতে যাবো বাবাকে, বলব। বলব, আমার পছন্দ হয়নি।

বলব, মামা টাকা চেয়েছিল। আমি খুব চেঁচামেচি করেছিলাম কিনা, তাই মা টাকা দেয়নি। আমি অমন না করলে, দিত টাকা মামাকে। মামা সব টাকা নিয়ে যেত। বাবাকে বলব। আমি ভারী বোকা। বাবাকে সব বলব। আবার যখন দেখা করতে যাবো, প্রথমেই বলব।

ছিপ তুলে আনে আনু। পশ্চিম দিকে আকাশ লাল হয়ে এসেছে। মা এতক্ষণে উঠোন ঝাড় দিয়ে ওজু করতে বসেছেন। ছোট আপারা বেণী করছে বারান্দায় বসে বসে। বড় আপার জন্যে বেলে মাছ একটা পেলে হতো। বেলে মাছের জন্যে কাল পুলের নিচে যাবে আনু। সেখানে একবার দশটা পেয়েছিল আনু। পকেট থেকে সুঁতো বের করে ফলি মাছটার ঠোঁটে গেঁথে হাতে ঝুলিয়ে নিল সে। আরেক হাতে কাঁধের 'পরে ফেলল ছিপটাকে। খালের পানি সুন্দর কুলকুল করছে। যেন যেতে দিতে চায় না। আজ রেল লাইন ধরে ধরে বাসায় যাবে আনু। হোক সন্ধ্যে মা বকুক। মা কি জানে? মা কিস্‌সু জানে না। মা একটা বোকা। মা খুব বোকা। মা যদি বোকা না হতো, আনু একটুও দুঃখ পেত না।

আনু বাসার উঠোনে এসে দাঁড়ায়। ছিপটাকে বারান্দায় রাখে ঠেস দিয়ে। মা নামাজ পড়ছেন। মাছটা দেয় সেজ আপার হাতে। ওরা অবাক হয় এতবড় মাছ দেখে। আনু একটুও হয় না। আনু হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসে। নামাজ থেকে উঠে এসে মাছ দেখে মা তাকে বকুক না। সে মন খারাপ করবে না, শুয়ে পড়বে না, ইস্টিশনে যাবে না, রাস্তায় গিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে না। আনু এখন পড়বে। আনু পড়তে শুরু করে। আনু বই নিয়ে পড়তে শুরু করে। আনু ইংরেজি বই থেকে দাগানো শব্দগুলোর মানে মুখস্থ করে মনে মনে। ছ'মাস থেকে কিস্‌সু পড়া হয়নি।

যেন আজ নিজেও জানে, আনু বড় হয়ে গেছে।

।। ১০ ।।

গীর্জার পুকুরটা ঘন গাছপালায় ঘেরা-ঢাকা. নির্জন. কেমন গা ছমছম করে, দুপুর বেলাতেও সন্ধ্যের মতো মনে হয়। মনে হয়, এক্ষুণি রাত হয়ে যাবে। কিন্তু ভয় করে না আনুর। ভাঙা ঘাটে শেষ ধাপে বসে ছিপটা ফেলে তাকিয়ে থাকে সবুজ পানির দিকে। এখানে এর আগে কোনদিন আসেনি সে। সেদিন বুলু ভাইদের বাড়িতে রাজমিস্ত্রীর কাজ হচ্ছিল, মিস্ত্রী বলেছে গীর্জার পুকুরের কথা।

রাস্তা থেকে প্রথমে চোখে পড়ে বড় আটচালা লম্বা টিনের ঘরটা। এর একদিকে লাইব্রেরী, বিনি পয়সায় ছোট ছোট বই দেয় পাদ্রীরা, আবার যতক্ষণ খুশি বসে বসে পড়ো ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ, কেউ কিছু বলবে না। লাইব্রেরীর পাশে গীর্জা-ঘর। এই ঘরটার দক্ষিণে তিনটে টিনের বড় বড় ঘর। এখানে স্কুল। মাদার সর্বজয়া গার্লস স্কুল। মিশন থেকে স্কুলটা করে দিয়েছে। স্কুলের পেছনে থাকেন হেড মিসট্রেস জিনি সিসটার। পুরো নামটা শোনেনি আনু। এ নামেই সারা শহরে সবাই চেনে। সকাল বেলায় মেয়েরা দল বেঁধে হেঁটে হেঁটে স্কুলে আসে। মিনু আপা সালু আপা পড়ত এই স্কুলে। বাসা বদলের পর সেই যে কদিন কামাই দিল, আর যায় না ওরা। কেউ আর যেতে বলে না ওদের। বাসায় যখন ইচ্ছে হয়, বই নিয়ে বসে।

ফাৎনার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে কেমন সব ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সালু আপা ভারী আড্ডাবাজ হয়েছে। খালি ক্যারম খেলবে বুলু ভাইদের বাসায় গিয়ে। বাবার মুখ মনে পড়ে যায় আনুর। বাবাকে গিয়ে এবার বলবে। সেজ আপাকে বলবে, একটা দরখাস্ত করে দিতে ফুল ফ্রি-র জন্যে। ফুল ফ্রি হয়ে গেলে আবার মিনু আপা সালু আপা স্কুলে যেতে পারবে। ওদের জামাগুলো পুরনো হয়ে গেছে, ছিঁড়ে গেছে। একটা পাখি না পোকা কোথা থেকে তখন থেকে কিট্ কিট্ করে ডাকছে।

এইসব মুহূর্তে আনু একেবারে একা হয়ে যায়। চারদিকে কেউ নেই, কোথা থেকে বিচিত্র সব শব্দ উঠছে, ফাৎনাটা স্থির হয়ে আছে। মনে হয় আনুর ঘর নেই, বাড়ি নেই, ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, তার কেউ নেই। সে কোনদিন বড় হবে না, মহিমপুর ছেড়ে কোথাও যাবে না। মনে হয় সব স্থির হয়ে গেছে।

একটা ঢিল এসে লাগে তার পিঠে। চমকে ওঠে আনু। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকায়। কি ব্যাপার? গীর্জা ঘর, স্কুল, জিনি সিস্‌টারের কোয়ার্টার সব দেখা যাচ্ছে দূরে, সেখানে কেউ নেই। আশেপাশে একেবারে ফাঁকা। গাছের ওপরেও কিছু চোখে পড়ল না আনুর। তাহলে তাকে ঢিল ছুঁড়ে মারলো কে?

কিস্‌সু বুঝতে না পেরে বোকা হয়ে গেল আনু। তারপর আবার বসলো ছিপ নিয়ে। কিন্তু মনটা তার খুঁতখুঁত করতে লাগলো। এ সব নির্জন জায়গায় কত রকম কী আছে! আনু শুনেছিল, অনেকদিন আগে এক পাদ্রী আত্মহত্যা করেছিল। জোছনা রাতে তাকে নাকি এখনো দেখা যায় গীর্জা-ঘরে হাঁটতে, পুকুর পাড়ে বসে থাকতে, আবার তকতকে উঠোনে নাকি মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আনুর সঙ্গে একটা খ্রিষ্টান ছেলে পড়ত পিটার পল দাস। সেই পিটার বলেছে, তার বাবা নাকি নিজের চোখে দেখেছে।

আনুর গা ছমছম করে ওঠে। কি জানি, সেই পাদ্রী ভূতটা না তো! এখন আরেকটা ঢিল এসে পায়ের কাছে লাগে। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে, পিন্টু। ফিচ ফিচ করে হাসছে বুড়ো জারুল গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে। আনু অবাক হয়ে গেল। পিন্টু। গলা তুলে ডাকতে সাহস পেল না, পাছে গীর্জার লোকেরা টের পেয়ে যায়। এমনিতে সে চুরি করে মাছ ধরতে বসেছে। জিনি সিস্‌টার ভারী কড়া। ধরতে পারলে শাস্তি দেবেন। আনু তাই নিঃশব্দে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো পিন্টুর দিকে। সে এখন এক পা এক পা করে কাছে এগিয়ে এলো।

মাছ ধরছিস?

আনু জবাব দেয় না। পিন্টু আবার বলে, এঃ, একটাও ধরতে পারিস নি।

আনু ফাৎনার দিকে তাকিয়ে থাকে। পিন্টুর সাথে তার সেই প্রথম দিনের ঝগড়ার পর মুখে ভাব হয়ে গেলেও মনে মনে কিছুতেই আনু ওকে ভালো চোখে দেখতে পারে নি। সারাক্ষণ এমন সব বিচ্ছিরি কথা বলতে থাকে আর ইশারা করে যে আনুর চোখ কান লাল হয়ে যায়। পিন্টু এখন বলে, বলে দেব তুই মাছ ধরছিস?

যা বলগে। বল না?

পিন্টু কী ভাবে। তার গা ঘেঁসে বসে আরো। খুব উদার একটা ভঙ্গিতে ঘাটে কাৎ হয়ে শুয়ে বলে, যা, বলবো না।

হাতটা আলগোছে ধরে পিন্টু। আনু ছাড়িয়ে নেয়। ফাৎনাটা বুঝি নড়ে ওঠে। নিঃশ্বাস বন্ধ

করে ফেলে আনু দূর, কিছু না। আজ আনুর বরাতটাই খারাপ। বাজে কথা বলেছে। ফাঁকি দিয়েছে। তারচেয়ে টোগরাই হাট পুলের নিচে গিয়ে বসলে ঢের মাছ ধরতে পারত আনু।

পিন্টু পকেট থেকে সিগারেট বার করে, আর দেশলাই। আনু অবাক হয়ে জিগ্যেস করে, তুই সিগ্রেট খাস?

এবারে পিন্টু চুপ করে থাকে। ঠোঁটের ফাঁকে তেরছা হাসি ফুটিয়ে সিগারেটটা নেড়ে দেখে। তারপর পুরো চিৎ হয়ে শুয়ে ঠোঁটে গুঁজে দেয়। দেশলাই জ্বালায়। একমুখ ধোঁয়ার আড়ালে পিন্টুর মুখ ঢেকে যায়। কেমন অদ্ভুত দেখায়। গা শিরশির করে ওঠে আনুর। পিন্টু বলে, খাই তো। সিগারেট না টানলে কেউ বড় হয় না।

তোর বাবা কিছু বলে না?

বাবা জানেই না। চালের বাতায় গুঁজে রাখি, ভাত খেয়ে পায়খানায় বসে খাই। জানবে কি করে? বুদ্ধি থাকা চাই।

তখন ভীষণ ভয় করে আনুর। এখন যদি কেউ দেখে ফেলে। তাহলে সবাই ভাববে, আনুও সিগারেট খায়। সে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। পিন্টু কোথা থেকে এলো শয়তানের মতো? যায়ও না ছেলেটা। আনু ছিপ তুলে নেয়, গুটিয়ে ফেলে সব। পিন্টু খপ্ করে তার হাত ধরে ফেলে।

কোথায় যাচ্ছিস?

হাত ছাড়।

আগে বল, কোথায় যাচ্ছিস?

বাসায়।

একটু বোস না ভাই।

পিন্টু হঠাৎ নরোম গলায় বলে উঠে বসে। আনু কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে বসে। বলে, তাহলে তুই সিগারেট খেতে পারবি না।

দূর, ভয় কিরে? এখানে কে দেখছে?

না দেখুক। আমার ভালো লাগে না।

তুই খাবি একটা?

ফস্ করে পকেট থেকে সিগারেট বার করে পিন্টু। কিছু বলার আগেই আনুর হাতে গুঁজে দেয়।

খা না। কে দেখবে?

না, কক্ষনো না।

তুই গাধা। খেলে বুঝতি কী মজা। খা না। দ্যাখ, এইরকম করে টান দিবি, কিছু লাগবে না। বলতে বলতে পিন্টু টান দিয়ে দেখায়। তারপর নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে।

তুই কিন্তু প্রথমে নাক দিয়ে আমার মতো ছাড়তে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবি। প্রথমে গিলবি না। টানবি আর ধোঁয়া ছাড়বি। ধর।

এক ধাক্কা দিয়ে তার হাত সরিয়ে দেয় আনু। হাতটা শানের ওপর গিয়ে পড়ে। ব্যথা লাগে পিন্টুর। লাফ দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলে, এঃ সাধু মহারাজ। ঘুসখোরের

ব্যাটা, তার ফুটানি কত!

মাথার ভেতরে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল আনুর। একটা প্রচণ্ড ঘুষি সে বসিয়ে দিল পিন্টুর মুখে। পিন্টু মুখ দু'হাতে ঢেকে বসে পড়ল। তারপর যখন তাকাল তার চোখ লাল হয়ে গেছে, পানি ভরে এসেছে। সে প্রথমেই এক কাণ্ড করল। আনুর পড়ে থাকা ছিপটা দু'হাতে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল পুকুরে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আনুর ওপর।

ইয়াসিনের কাছে কুস্তি শিখেছিল আনু। এখনো মনে আছে তার। চট করে সে সরে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল পিন্টু। তারপর দু'জন দুজনকে ধরলো জাপটে। হাতে পায়ে লাথি মেরে ঘুষি দিয়ে গড়াতে গড়াতে শান বাঁধানো ঘাট পর্যন্ত চলে গেল ওরা। পিন্টুর গায়ে জোর কম না। আনু কিছুতেই আর সুবিধে করতে পারছে না। তার হাতটা বেকায়দায় পড়েছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, কোথায় যেন নোখ দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছে পিন্টু, পুড়ে যাবার মতো জ্বালা করছে। হঠাৎ পিন্টু তার মাথাটা ধরে আছড়ে দিল শানের ওপর। বিকট আর্তনাদ করে উঠল আনু। পায়ের শব্দে লাফ দিয়ে পালাল পিন্টু।

কে, কারা, কে ওখানে?

একটা মাঝবয়সী দারোয়ান ছুটে এলো। আর তার পেছনে জিনি সিস্‌টার স্বয়ং। আনু উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখে রক্ত।

রক্ত! জিনি সিস্‌টারকে দেখে আনু বড় বড় করে বলে ওঠে, আমার দোষ নেই। আমাকে মেরে পালিয়েছে। সিগারেট খেতে বলে।

তারপর মাথাটা কেমন ঝিম দিয়ে আসে আনুর। চোখের সামনে জিনি সিস্‌টার, দারোয়ান, গীর্জা ঘরের চকচকে টিনের চাল— সব দুলে ওঠে। তারপর আঁধার হয়ে যায়। সে বিড়বিড় করে বলে, রক্ত! বহুদূর থেকে ভেসে আসা কথার মতো সে শুনতে পায় জিনি সিস্‌টার বলছেন, ওকে ধর. পড়ে যাচ্ছে। ঘরে নিয়ে আয়।

চোখ মেলে দেখে জিনি সিস্‌টার সামনে বসে আছে। হাতে তার গরম দুধের গেলাশ। দেয়ালে মা-মেরীর ছবি। হাত দিয়ে দেখে. মাথায় ব্যাণ্ডেজ। উঠে বসতে চায় আনু। তিনি তাকে শুইয়ে দিয়ে বলেন, আরো একটু শুয়ে থাকো খোকা। কিছু হয়নি তোমার।

আনু আবার শুয়ে পড়ে। কেমন একটা অবসাদ সারা শরীরে, আর আনু কিছু না। দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয় সব— পিন্টুর আসা, সিগারেট খাওয়া, মারামারি। ছিপটার জন্যে মন কেমন করে ওঠে। কত যত্ন করে বানিয়ে ছিল আনু। ভীষণ লজ্জা করতে থাকে তার। চুরি করে মাছ ধরতে এসে এইভাবে ধরা পড়ে গেল। আর সে কি ধরা পড়া! একেবারে জিনি সিস্‌টারের হাতে। চোখে তার পানি এসে যায়। পিন্টু তার বাবাকে ও ভাবে গাল দিতে গেল কেন? এর পরে আবার কোনদিন বললে আছড়ে মানুষ করে দেবে পিন্টুকে। আজ নেহাৎ তার হাতটা বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল বলে।

চেয়ারে বসে আছেন জিনি সিস্‌টার। এই প্রথম তাকে এত কাছে থেকে দেখল আনু। অনেকটা মনিরের মা-র সমান। কিন্তু ছিপছিপে শ্যামল, গায়ে একটা গয়না নেই শুধু গলায় রূপোর চেনে ক্রুশের লকেট, হাতে ঘড়ি, কালো চিকন পাড়ের শাদা শাড়ি পরনে। চোখের চশমার জন্যে ভারী গম্ভীর দেখাচ্ছে। কিন্তু কথাগুলো কী মিষ্টি। তার বড় আপার মতো মায়া করে কথা বলেন। আনু চোখ বুঁজে থাকে। আবার যখন চোখ খোলে তখন জিনি সিস্‌টার

গেলাশটা এগিয়ে বলেন, খেয়ে নাও দিকি।

লজ্জা করে আনুর, কিন্তু উঠে বসে চোঁ চোঁ করে সবটা খেয়ে ফেলে। কেন যেন চোখে পানি এসে যায় তার। জিনি সিসটার জিগ্যেস করেন, কি নাম তোমার?

আনু।

কোন্ বাড়ির ছেলে তুমি?

কী বলবে আনু? বাবার নাম করতে সংকোচ হয়। আর কী দিয়ে সে পরিচয় দেবে নিজের? বুদ্ধি করে শেষে বলে, আমার বোন পড়ত এই ইস্কুলে।

কে?

নাম করলো আনু। তখন ছোট্ট করে জিনি সিস্টার উচ্চারণ করলেন, ও।

অনেক্ষণ আর কিছু বললেন না। অস্বস্তি করতে লাগল আনুর। ঝি এসে গেলাশ নিয়ে গেল। আনু মাথা নিচু করে রইলো। শেষে সে নিজেই বলল, পিন্টু, বক্‌শীদের ছেলে, চেনেন? আমাকে সিগারেট খেতে বলে। খারাপ কথা বলে। আমি ঘাটে চুপচাপ বসেছিলাম। আমি কিস্‌সু করিনি।

জিনি সিস্‌টার হাসেন। আনু বুঝতে পারে ঘাটে চুপ করে বসে থাকার মিথ্যেটা ধরা পড়ে গেছে। সে সেটা ঢাকার জন্যে আবার বলে, আমার মাথা কেটেছে নাকি?

না। একটু কেটে গেছে। ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিয়েছি। খারাপ ছেলের সঙ্গে কক্ষনো মিশো না। তুমি পড়ো?

হ্যাঁ, ফাইভে। এবার সিক্সে উঠব।

বাঃ, বেশ। তুমি এতো ভালো ছেলে, দুপুর বেলায় মাছ ধরতে বেরোও কেন? এখন লেখা-পড়া করবার সময়।

চোখ নামিয়ে নেয় আনু। জিনি সিস্‌টারকে তার ভালো লাগে। ভয় করে না আর। তাই ভয় পায় না কথা শুনে। উনি তো জেনেই গেছেন আনু মাছ ধরতে এসেছিল। বলে, রোজ ধরি না। আমি পড়ি। ফোর থেকে সেকেণ্ড হয়ে ফাইভে উঠেছি।

এবার কি হবে?

কী জানি। আমার দু'টো বই নেই।

মা-কে বোলো কিনে দিতে। তোমরা ক'ভাই বোন?

পাঁচ বোন আর আমি। বড় ভাই ছিল, রেলে কাটা পড়ে মারা গেছে।

হ্যাঁ, আমি শুনেছি।

তখন আরো আপন মনে হয় তার জিনি সিস্‌টারকে। বলে, এখানে কত ফুল গাছ। আমি বাগান করেছিলাম, একটা ভালো গাছ পাই না।

তুমি বাগানও করো? আচ্ছা, তোমাকে আমি চারা দেব। কাল এসো। একা যেতে পারবে?

হ্যাঁ।

মাথার ব্যাণ্ডেজে হাত বুলোতে বুলোতে আনু বলে। কিন্তু উনি উদ্বিগ্ন গলায় বলেন, তোমার মা দেখলে কি বলবেন? তোমাকে দিয়ে আসুক। এখন ভালো লাগছে না একটু?

আনু মাথা কাৎ করে সায় দেয়। জিনি সিস্‌টার দারোয়ানকে ডাকেন। আনু উঠে দাঁড়ায়।

আজ একটা মাছ ধরতে পারেনি সে, ছিপটা গেছে। মারামারি করে মাথা ফাটিয়েছে, তবু একটুও মন খারাপ করে না আনুর। যেন ভারী আশ্চর্য কিছু পেয়ে গেছে সে আজ। খুব বাহাদুর মনে হয় নিজেকে, ভিতরটা ফুরফুর করে ওঠে।

সুবিনয়, যা তো বাবা, একে বাসায় দিয়ে আয়।

আনু বাইরে আসে। আকাশটা লাল হয়ে গেছে। তকতকে উঠোনটা আরো বড় দেখাচ্ছে। লাইব্রেরী ঘরে লোকেরা বসে বই পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছে। কয়েকটা মেয়ে ধপধপে ধোয়া কাপড় পরে, চুল টানটান করে বেঁধে গীর্জা ঘর ঝাড় দিচ্ছে। আবার কয়েকজন বাগানে পানি দিচ্ছে। ঠাণ্ডা ঝিরঝির বাতাস বইছে উত্তুর থেকে। ফুল গাছগুলো ছবির মতো আঁকা হয়ে আছে যেন। টিনের বড় গেটটা পর্যন্ত এলেন জিনি সিস্‌টার। হঠাৎ বললেন, শোনো, তোমার বোনদের স্কুলে আসতে বোলো কাল থেকে। মা-কে বোলো আমি ফ্রি করে দেব। বোলো, জিনি সিস্‌টার বলে দিয়েছে। কেমন?

কাল আমাকে চারা দেবেন। আমি আসবো?

আচ্ছা, এসো।

বাড়ির দরোজায় মেজ আপার সঙ্গে দেখা। দরোজা ভেজিয়ে রাস্তা দেখছিলেন গাল পেতে। সুবিনয়ের সঙ্গে আনুকে দেখে চমকে উঠলেন তিনি।

এ-কী? তোর কি হয়েছে আনু?

কিছু না। ফুটবল খেলতে গিয়ে—

হঠাৎ তার খেয়াল হয় সুবিনয় পাশে দাঁড়িয়ে : সে তাকে বললো, তুমি যাও দারোয়ান। এটা আমার বাসা।

সে চলে গেলে আনু সোৎসাহে বলতে থাকে, ফুটবল খেলতে গিয়ে মাথায় চোট লেগেছিল। জিনি সিস্‌টার, সর্বজয়া স্কুলের বড়দি'মনি, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। সালু আপা আর মিনু আপার ফুল ফ্রি করে দেবে বলছে। আমাকে ফুলের চারা দেবে, দেখো।

এসব কিছুই শোনেন না মেজ আপা। তার মাথার ব্যাণ্ডেজে হাত রেখে বলেন, শীগগীর চল তুই ভেতরে। মা দেখলে! ইস্, এত দুষ্টু হয়েছিস তুই।

আনুর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সে বলে, যাও, যাও। মা কী বলবে? আমি ইচ্ছে করে মাথা ফাটিয়েছি, না? আর ওদের ফুল ফ্রি হয়ে গেল, সেটা কী? আমাকে বকবে, এঃ।

তারপর থেকে এমন হলো প্রায় রোজ যেত জিনি সিস্‌টারের কাছে আনু। ফুলের চারা এনে লাগিয়েছে সে। গোলাপের দু'টো কলমও এনেছে। বারান্দার পাশে আনুর বাগানটা এখন কী সুন্দর হয়েছে। গোলাপ যেদিন ধরবে সেদিন হবে আসল মজা। সেদিন একটা ফুল চুরি করে সেজ আপা খোঁপায় দিয়েছিল, আনু কী রাগ করলো। মা বললেন, একরকম করলে তোর সব গাছ আমি কেটে ফেলব। মানুষ হয়েছে না জানোয়ার হয়েছে একটা।

আজকাল কী হয়েছে, কথায় কথায় মা বিরক্ত হয়ে ওঠেন, চ্যাঁচাতে থাকেন, গাল পাড়েন। সারাক্ষণ মুখটা কালো হয়ে থাকে। আনু কিস্‌সু ভেবে পায় না। এ রকম হয়ে গেছেন কেন উনি? তার খুব রাগ হয় একেক সময়। মার সঙ্গে কথাই বলে না সে সারাদিন। আবার রাতে এসে মাথার কাছে বসেন। আস্তে আস্তে ডাকেন, ওঠ, বাবা আমার। ভাত খাবি না?

তখন আর কিস্‌সু মনে থাকে না আনুর। তখন সে আবার আগের মতো হয়ে যায়। মার হাত জড়িয়ে ধরে আরো কিছুক্ষণ পড়ে থাকে। মা বলেন, তুই রোজ ভাত না খেয়ে ঘুমোলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে। ওঠ। কাল থেকে সন্ধ্যার সময় ভাত রেঁধে দেব। ওঠ আনু।

সালু আপা মিনু আপা আবার স্কুলে যায়। ওদের একটা বছর নষ্ট হয়ে গেল। বাবাকে গিয়ে যখন সেদিন আনু বলল ওরা আবার স্কুলে যাচ্ছে, কী খুশি হলেন তিনি। লেখাপড়ার কথা শুনলে, এত খুশি হন বাবা। মুখটা সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করে ওঠে। আনু আরো ভালো করে লেখাপড়া করবে। এবার যদি সে ফার্স্ট হতে পারে তো স্মা একটা কাণ্ড হয়। বাবা শুনে প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইবেন না। তখন আনু তাকে প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেখাবে। বলবে, বৃত্তি পরীক্ষা দেবে। বৃত্তি পেলে কত ভালো হয়। এক পয়সা লাগবে না পড়তে, আবার মাস মাস ছ'টাকা করে পাবে। ছ'টাকায় কত কী করা যায়। আনু একজোড়া স্যাণ্ডেল কিনবে। খালি পায়ে তার এত লজ্জা করে স্কুলে। কিন্তু কোনদিন সে কথা বাসায় বলে না। সে তো বোঝে, কী কষ্টে সংসার চালাচ্ছেন মা। পানু ভাইর জন্যে টাকা দিল রেল কোম্পানি। সেই টাকা দিয়ে আপাদের বিয়ে দেবার কথা। তা থেকেও এখন পাঁচ টাকা দশ টাকা করে কমছে। এদিকে মামা প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখছেন টাকা চেয়ে। আজকাল মামার চিঠি মা পড়েনও না, জবাবও দেন না। মামার ওপরে ভীষণ রাগ হয় আনুর। তারচেয়ে মনিরের বাবা অনেক ভালো। রোজার ঈদে একশ টাকা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মা যেন কেমন! টাকা সই করে রাখলেন কিন্তু কদিন ধরে বারবার বলতে লাগলেন, না নিলেই হতো। এখন বড়লোকী দেখাচ্ছে।

সেই টাকা দিয়ে ঈদে নতুন জামা হলো। আনু একাই নামাজ পড়তে গিয়েছিল মাঠে। বাবা থাকতে ভোর বেলায় তোপ পড়বার আগে, অনেক আগে আনুকে নিয়ে মাঠে হাজির হতেন। বসতেন একেবারে প্রথম সারিতে। হাফেজ সাহেবের ঠিক পেছনে। তারপর একটা তোপ পড়তো, তার আধঘণ্টা পরে আবার একটা। আবার যখন পড়তো, তখন সবাই কাতার বেঁধে দাঁড়াত। লোকেরা দৌড়ে দৌড়ে পুকুর থেকে ঝপাঝপ ওজু করে আসতো। গরিবদের জন্যে কাগজের রঙ্গিন টুপি বিক্রি হতো একআনা করে; সেই টুপি কিনবার জন্যে কাড়াকাড়ি লেগে যেত। জং পড়া পানির খালি ট্যাঙ্কে কাক ডাকতো কা-কা করে। হাফেজ সাহেব পাগড়ি পরে সামনে এসে দাঁড়াতেন তখন। একটি লোক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নামাজের নিয়ত বলে দিত। আবার বলত, যারা মনে রাখতে পারবেন না, তারা বলবেন, ইমামের যে নিয়ত আমারো সেই নিয়ত, আল্লাহ আকবর। যা হাসি পেত শুনে আনুর।

এবার একা গিয়ে সে সবার আগে বসেছিল। কিন্তু কারা এলেন, তাকে পাশে সরতে বলল। সেখান থেকেও শেষ পর্যন্ত ঠেলাঠেলি করে তাকে পেছনের কাতারে ঠেলে দিল। কে ঠেলল, কখন ঠেলল, কিছুই জানে না। যখন সবাই কাতার ঠিক করবার জন্যে দাঁড়িয়েছে তখন আনু দেখে সে পেছনে পড়ে গেছে। চোখে পানি এসে গিয়েছিল তার। সামনে যারা দাঁড়িয়েছে সবার ওপরে রাগ হচ্ছিল ভীষণ। সে ছোট বলে, কেউ তাকে পাত্তা দেয় না। সে একা বলে, কেউ তাকে তোয়াক্কা করে না। বাবার কথা এত মনে হলো তার। কোথা দিয়ে নামাজ শেষ হয়ে গেল, কিসসু বলতে পারবে না আনু, সারাক্ষণ বাবার কথা মনে পড়ছিল আর বুক ঠেলে ঠেলে কান্না উঠছিল। নামাজ শেষে আনু দেখে চোখে কিছুই দেখতে পারছে না সে। খালি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে সব।

বাসায় এসেই আবার ছুট ইস্টিশানে। মা টিফিনকারীতে সেমাই, পোলাও, গোশত দিয়ে দিয়েছেন। বড় আপা, মেজ আপা আর সেজ আপা তাকে মোট দু'টাকা আর মা দু'টাকা দিয়েছেন। বুলু ভাই এসে বারবার বলছে, চল, চল, গাড়ি ফেল করবি।

বুলু ভাই ঈদের দিন বেড়াতে যাচ্ছে রংপুর। সিনেমা দেখবে। আনু যাচ্ছে বাবাকে দেখতে। এর মধ্যে দাঁড়িয়েই সেমাই খেতে হলো বুলু ভাইকে। তার একমুহূর্ত সময় নেই। সালু আপা পানি দিতে গিয়ে অর্ধেক গায়ে ফেলে দিল তার। বুলু ভাই লাফিয়ে উঠলেন, এহেহে। দিল তো আমার জামা ভিজিয়ে। মারবো একটা।

গা দিয়ে ফুরফুরে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে এসে বুলু ভাই বলে, দাঁড়া আনু, আগে তোর সাথে কোলাকুলি করে নি।

সেদিন বাবার সঙ্গে পাঁচ মিনিটেই দেখা হয়ে গেল। অন্যদিন কত ঝামেলা, আজ ঈদের দিন কিনা, তাই চারদিকে কেমন আনন্দ আর দিল খোলার দরিয়া বয়ে যাচ্ছে। রঙিন জামাকাপড় পরে কত যে লোক এসেছে দেখা করতে। ভিড়ে যেন আর ঠাঁই হচ্ছে না। কলের গান বাজছে তারস্বরে, দূরে রেস্তোরাঁয়। পথের মোড়ে বাদর নাচের ডুগডুগি বাজছে। ঈদের স্পেশাল শো-এর ব্যাণ্ডপার্টি বেরিয়েছে সিনেমার পোস্টার ঘাড়ে করে। সাঁই সাঁই গাড়ি মোটর রিকশা ছুটে চলেছে। সারা পৃথিবী যেন একতারে অনর্গল খলখল করে হাসছে। রোদ উঠেছে খুব।

বাবা দেখা হতেই তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে চুমো খেলেন। জিগ্যেস করলেন, কিরে নামাজ পড়েছিস?

হ্যাঁ।

এই জামা কিনলি? বেশ মানিয়েছে। গাড়িতে খুব ভিড় হয়েছিল?

হ্যাঁ। সবাই রংপুরে সিনেমা দেখতে এলো, তাই।

একেবারে ঘেমে গেছিস।

বলতে বলতে বাবা তার মুখ হাত দিয়ে মুছিয়ে দেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করতে থাকেন কে কি পরেছে আজ, কি করছে, ঈদ কেমন হলো। আনু বলে চলে, বড় আপা নীল শাড়িটা পরেছে। কিছুতেই পারব না। মা বলল তারপর। মেজ আপা একটা সবুজ, না কচি কলাপাতার মতো রং মা-র শাড়ি পরেছে। স্যাণ্ডেল কিনেছে নতুন, সাদা, চিকন দু'ফিতে। সেজ আপা বাক্স খুলে দেখে ওর ব্লাউজের ইস্ত্রী নষ্ট হয়ে গেছে, তাই কী মন খারাপ! আমি যখন আসি তখনো কিছু পরে নি।

আনু টের পায়, বাবা কল্পনার চোখ দিয়ে দেখছেন প্রত্যেককে। হাঁ করে গিলছেন তাঁর কথাগুলো। চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠছে সব। তখন আনু আরো বিশদ করে বলতে থাকে। এক কথা বারবার করে বলতে থাকে। কিছু বাদ দেয় না। একটা বলতে বলতে আরেকটা মনে পড়ে যায়, খেই হারায়, আবার প্রথম থেকে বলে। বাবা একটুও বাধা দেন না! তন্ময় হয়ে শোনেন। তাঁর চোখে মুখে ব্যথা মেশানো খুশি বেলা শেষের মেঘের মতো ছড়িয়ে থাকে। আস্তে আস্তে মুখটা কেমন দূরে সরে যায়। আনুর মনে হয়, দূর থেকে বাবার একটা বড় ছবি দেখছে আনু। সে আপনমনে বলে চলে। তারপর চুপ করে যায়। বাবা চুপ করে থাকেন। টুপ্ টুপ্ টুপ্ টুপ্ করে সময় বয়ে যায় যেন। একটা নদীর মতো, বৃষ্টির ফোঁটার মতো, প্যাঁচার চোখ দু'টোর মতো। আনু হঠাৎ চোখ তুলে জিগ্যেস করে, তোমাদের বাইরে

যেতে দ্যায়?

কেনরে?

ঈদের নামাজ পড়তে।

ভেতরেই মৌলবি সাহেব আসে। এখানে জামাত হয়।

আনু অবাক হয়ে যায় শুনে। হাঁ করে বাবার কথাগুলো শোনে। কল্পনা করতে চেষ্টা করে উঁচু পাঁচিল ঘেরা জেলের মধ্যে ঈদের নামাজটাকে। বাইরে থেকে কয়েকটা গাছের মাথা দেখা যায় শুধু। আনু কল্পনা করে থই পায় না। বাবা একটু পরে বলেন, আনু জেলের মধ্যে একটা আলাদা দুনিয়া। ঠিক আল্লার দুনিয়ার মতো। কে কোথা থেকে এসেছে। নিজের স্বাধীনতা নেই। ওপর থেকে হুকুম হচ্ছে, সেই মোতাবেক কাজ করে চলেছে সবাই। যা দেয় তাই খেতে হয়। যা করতে বলে, তাই। নিজের ইচ্ছার কোনো শক্তি নেই। আবার একদিন হুকুম আসে, ছাড়া পেয়ে যায়। ঠিক দুনিয়াদারির মতো। হায়াৎ মওৎ, রেজেক, কাজকর্ম, সব যেমন আল্লার ইচ্ছায় হয়, তেমনি।

আনু আবছা আবছা বোঝে। বাবা মোহগ্রস্তের মতো কথাগুলো বলেচলেন। কি প্রসঙ্গ, কেন বলা, সে বুঝবে কিনা, কিছুই যেন তিনি ভাবছেন না। কেবল বলতে হবে, এই বোধটা থেকে বলছেন। আনু বুঝতে পারে না; কিন্তু কোথায় যেন কষ্ট হয় তার! মনটা ভারী উদাস হয়ে আসে। সব আনন্দ, হাসি, রোদ, অর্থহীন মনে হয়। যেন সবকিছু তাকে স্পর্শ না করে তার বাইরে বিরাট একটা চাকার মতো ঘুরছে। তার দুঃখ হয় না, কান্না পায় না, বাবা তার হাত ধরে আছেন, সে হাতটাও যেন আর বোঝা যায় না।

বেরিয়ে এসে কেমন শূন্য লাগে ভেতরটা। সে হাঁটতে থাকে। পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে মোটরে তেল ভরা দেখে আনু। ঝরঝর শব্দ করে লেখা উঠছে এক—দুই—তিন কতটা পেট্রোল যাচ্ছে। ফুটপাথের ওপর দু'টো লোক কোলাকুলি করছে। সিল্কের টুপি মাথায় বাচ্চা একটা ছেলে তার বাবার হাত ধরে কোথায় যাচ্ছে। ছেলেটা হাঁটতে পারছে না ঢিলে, বড়সড় নতুন কাপড়ের ভারে, টলমল করছে। রিকশার খুদে হর্ণ বিকট শব্দ করছে ঘ্যা-পুঁ-ঘ্যা-পুঁ। চাঁদোয়া টানানো রঙ্গিন শরবতের দোকানে ভিড় করে লোক বসেছে বেঞ্চিতে। হাতে গেলাস নিয়ে একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছে। নেবুর ঘ্রাণ বেরিয়েছে ভারী : দাশ কোম্পানিতে গিয়ে বসে আনু। সিনেমা দেখে বুলু ভাই এখানে আসবে। এখানে থাকতে বলে গেছে তাকে। হিন্দুর দোকান। ওদের তো আর ঈদ না। তাই দোকানটা কেমন দেখাচ্ছে আজ। স্ফুর্তি নেই, রঙিন কাগজের মালা নেই, হৈচৈ নেই— একেবারে ঠাণ্ডা, অন্ধকার।

দাশবাবু বললেন, কী খোকা! বাবার সঙ্গে দেখা হলো? কেমন আছেন?

হ্যাঁ, ভালো।

বোসো তুমি। ঐখানটায় বোসো।

বলেই আবার কাজে লেগে গেলেন দাশবাবু। একটা কলের গান মেরামত করছেন তিনি। আনু তন্ময় হয়ে তাঁর কাজ করা দেখে। দেখতে দেখতে বেলা পড়ে আসে। বুলু ভাই আসে। মহিমপুরের গাড়ি আটটায় ছাড়ে। বুলু ভাই বলে, টাউন হলে বিচিত্রানুষ্ঠান হচ্ছে। যাবি? গাড়ির আগেই চলে আসব।

আসলে নাম তাঁর ভার্জিনিয়া দাস। সেই থেকে জিনি সিস্টার। আনু শুনেছে মেজ আপার কাছে। মেজ আপার সঙ্গে ভারী ভাব হয়ে গেছে জিনি সিস্টারের। একদিন আনু নিয়ে গিয়েছিল বেড়াতে, বলে দিয়েছিলেন উনি। তারপর থেকে আর কোনদিন না হোক রোববারে মেজ আপা যাবেই। বলে দিয়েছিলেন সবাইকে নিয়ে যেতে। কিন্তু বড় আপা আজকাল বেরোয়ই না। মা বলেন, আমার আবার বেড়ানো? সেজ আপার প্রথম দিনই পছন্দ হয়নি জিনি সিস্টারকে। সেজ আপাও প্রথম দিন গিয়েছিল আনুর সঙ্গে। ফিরে এসে বলে, মাগো। কালো কুষ্টি। তার ওপর আবার চশমা। দেখলে গা জারিয়ে আসে।

মেজ আপা তাকে ধমক দিয়ে উঠেছিলেন, থাক আর তোকে গীত গাইতে হবে না। নিজে যা একখানা সুন্দরী, আয়নায় সুরত দেখিস।

আনু বুঝেই পায় না সেজ আপার এত অপছন্দ কেন। রাতে মেজ আপাকে সে চুপ করে বলে, জানিস, সেজ আপা আরো কী সব খারাপ কথা বলে। মাকে বলেছিল।

বলুকগে'। আমার কী বাবা।

রোববারে যাওয়া চাই-ই মেজ আপার। মিশনের মেয়েগুলো ভোরে নেয়ে উঠে ঝকমক করে। পিঠের ওপর ছড়িয়ে দেয় চুল। থালায় করে ফুল নিয়ে গীর্জা ঘরে যায়। বেদি সাজায়। তারপর প্রার্থনা শুরু হয়। জিনি সিসটারের বাবা জন দাস পাদ্রী। তিনি গিয়ে বেদিতে দাঁড়ান। বক্তৃতা দেন। সাধু ভাষায় যখন কথা বলতে থাকেন এত মজা লাগে আনুর।

"একশত মেষের ভিতর নিরানব্বইটি গৃহে ফিরিয়া আসিলেও যে একটি প্রত্যাবর্তন করে নাই, রাখাল বালক তাহার নিমিত্ত গৃহ হইতে অন্ধকার অরণ্যসংকুল পথে বাহির হয়। এবং উচ্চস্বরে রোদন করিয়া ডাকিতে থাকে।"

তারপর বেজে ওঠে অর্গ্যান। গমগমে হয় ওঠে সারা গীর্জাঘর। মনে হয় শাদা দুধে কে যেন সমস্ত ভাসিয়ে ধুয়ে নির্মল করে দিয়ে যাচ্ছে। একসাথে ছেলেমেয়েরা গেয়ে ওঠে— শান্তিময় তোমার কোলে ডাকিয়া লও মোরে।" বারবার করে গায়। আবেগে মন্থর গম্ভীর শোনায় সম্মিলিত গলা। সুরের কাঁপনে বুকের মধ্যে গিয়ে পৌছায়। কেমন জড়িয়ে আসে সবকিছু। যেন বাস্তব থেকে স্বপ্নের দিকে দেবদূতেরা আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বাড়ি, ঘর, মানুষ, প্রকৃতি সবকিছু।

মিষ্টি খেতে দেন জিনি সিস্টার। এই গান আর মিষ্টির লোভে আনু রোববারে আসে। সারাক্ষণ মেজ আপা গল্প করতে থাকেন। ঘরের ভেতরে যান। আবার আনুকে বসিয়ে রেখে মেয়েদের ঘরে গিয়ে গল্প করেন। আনু বসে বসে দেখে সামনের চালাঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাইবেলের গল্প বলছেন জিনি সিস্টার। ছবি দেখাচ্ছেন। একটা ছবি আনুর খুব ভালো লেগেছিল। যিশুখৃষ্ট ইদারার পাড়ে একটা মেয়ের কলসি থেকে আজলা ভরে পানি খাচ্ছেন। বেলা দশটা এগারোটা হয়ে গেলে তখন ওরা ফেরে। মা বকেন, 'তবু যাওয়ার কামাই হয় না। সেজ আপা টিটকিরি কাটেন, তবু মেজ আপার যাওয়া চাইই।

একদিন মেজ আপা বাসায় এসে মাকে বললেন, মা আমি মাস্টারি নিলাম।

শুনে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলেন না মা। তখন মেজ আপা আবার বললেন, বিশদ করে। সর্বজয়া গার্লস স্কুলে ছাত্রীদের পড়বে। এখন মাসে পঁচাত্তর আর দশ টাকা অ্যালাউন্স দেবে! এতক্ষণে আনু বুঝতে পারে এইজন্যে আজ মিশনারী থেকে ফিরে আসবার সময় এত খুশি

লাগছিল মেজ আপাকে। সে বলে, জিনি সিস্টার দিয়েছে চাকরি, না?

দেবে কি? আমি চেয়ে নিলাম। বাসায় বসে থেকে করব কি? পড়া তো আর হবে না। তবু দুটো টাকা এলে কাজে লাগবে।

মা জিগ্যেস করলেন, মাইনে কত বললি?

সব মিলিয়ে পঁচাশি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তখন তিনি বললেন, দ্যাখো আমার কপাল। মেয়ে হলো ছেলের সমান। এমন মা যেন সাতজন্মে কেউ না পায়।

থাক ও কথা মা।

মেজ আপা মা-র হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে সেইটে করতে করতে বলে। আবার বলে, রোজ ভোর সাতটায় যেতে হবে। ফিরতে ফিরতে একটা। দাই এসে নিয়ে যাবে।

সেই সময়ে বড় আপা এলেন ঘরে। মা তার মুখের দিকে তাকালেন। কেমন নিরস কণ্ঠে তাকে শোনালেন, শুনলি, ও মাস্টারী নিয়েছে। মাসে পঁচাশি টাকা মাইনে।

চোখ বড় করে বড় আপা তাকিয়ে থাকেন মেজ আপার দিকে। মুখে একটু পর বলেন, ভালো তো।

তারপর নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে যান। আনু বুঝতে পারে, শুনে বড় আপা কোথায় যেন কষ্ট পেয়েছেন। মা যেন টাকার কথাটা শুনিয়ে শুনিয়েই বললেন বড় আপাকে। অমন করে না বললে কী হতো? আনুর খুব রাগ হয় মা-র ওপর। মা আজকাল কী রকম যেন হয়ে যাচ্ছেন। এই সেদিন স্কুল থেকে বাসায় এসে শোনে বড় আপাকে বকছেন, বাপকে জেলে পাঠালি তাতে শান্তি নাই। এখন আমার হাড়মাংস চিবিয়ে খা, তাহলে পেট ভরবে। যমেও পছন্দ করে না তোকে?

ঘরে ঢুকে দেখে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন বড় আপা। আনু সাহসই পেল না তার কাছে যাবার। মনটাই খারাপ হয়ে গেল। বইখাতা ছুঁড়ে ফেলে বাইরে চলে যাচ্ছিল, মা চেঁচিয়ে উঠলেন, ইস্কুল থেকে এসে কোথায় চললি টো টো করতে। দাঁড়াও আজ তোমার একদিন কী আমার একদিন।

আনু রুখে দাঁড়িয়েছিল। ইস, তাকে মারবে এত শস্তা?

আনু উঠে দাঁড়ায়। মেজ আপা আর মা গল্প করতে থাকেন। স্কুলে চাকরি নেয়ার কথা শুনে আনুর কেমন খুশি হচ্ছিল, সেই খুশিটাও ম্লান হয়ে যায়। শোয়ার ঘরে এলে দেখে বড় আপা বসে গেছেন সেলাই নিয়ে। সুঁচে সুতো পরাচ্ছেন। আনু তার বিছানায় গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর একসময় মুখ ফিরিয়ে বলল, তুই মন খারাপ করিস না। আমার ভালো লাগে না।

বড় আপা চকিতে মুখ তুলে তাকান। আনুকে দেখেন। তারপর মুখখানা হাসিমাখা করে সুতো টানতে টানতে বলেন, কই মন খারাপ করি রে? কই?

আনু আর কিছু বলে না। মুখ ফিরিয়ে নেয়। বড় আপা জোর করে হাসতে চেয়েছে। তাই আরো কেমন করুণ লাগছে। তাকিয়ে দেখা যায় না।

সেজ আপা শুনে ঠোঁট উলটে বললেন, ও তো খ্রিষ্টান হয়ে গেছে, তাই ওকে নিয়েছে। মা

একটা বোকা, তাই খুশি কত তাঁর। আমাকে কেটে ফেললেও যেতাম না বাবা।

আনুর কেমন সন্দেহ হয় শুনে। তবু সে ধমকে ওঠে, হিংসা হচ্ছে কিনা, তাই।

মনের মধ্যে কেমন করে ওঠে আনুর, সত্যি মেজ আপা খ্রিষ্টান হয়ে গেছে নাকি?

সেজ আপা আবার বললেন। তুই খোঁজ নিয়ে দেখগে, ওদের সব মাস্টারনী খৃষ্টান। একটা মোসলমান নেবে কিনা? কত দায় পড়েছে তাদের।

পরদিন আনু ভোরে মেজ আপাকে দিয়ে এলো স্কুলে। আজ দাই আসবে না। পথে জিগ্যেস করল সে, তুই খ্রিষ্টান হয়ে গেছিস আপা?

কে বলল রে?

এমনি। বল না? ওদের সব মাস্টারনী খ্রিষ্টান?

হ্যাঁ, কি হয়েছে?

তাহলে তোকে নিল কেন? মোসলমান নেয়?

নেবে না কেন? ওদের কত দরকার। এত খ্রিষ্টান পাবে কোথায়? জিনি সিস্‌টার কত ভালো দেখিস না।

তবু কেমন খচ্‌ খচ্‌ করে ভেতরটা। আর কিছু জিগ্যেস করে না সে। তার যেন মনে হয় সবাই কেমন দূরে সরে যাচ্ছে। মা, বড় আপা, মেজ আপা, সেজ আপা— সবাই বদলে যাচ্ছেন। কি যেন একেকজনের ভেতরে ভেতরে হয়, আনু তার কিস্‌সু জানতে পারে না। ভারী একা লাগে। কষ্ট হয়। কাউকে বলতে পারে না।

হঠাৎ মাস্টার সাহেবের কথা মনে পড়ে তার। নদীর পাড়ে সেদিন সন্ধ্যেটার ছবি ফিরে আসে। নদীর দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন— তুমি যখন বড় হবে, তখন বুঝবে। আনুর মনে হয়, সে বড় হয়ে গেছে। সে এখন সব বোঝে। স্কুলের দরোজায় সুবিনয়কে দেখে সে বলে ওঠে, ঐ তো দারোয়ান। আমি যাই।

মেজ আপা টিনের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে যান।

এখন থেকে রোজ সকালে দাই এসে নিয়ে যায় তাঁকে। কত ভোরে ওঠেন মেজ আপা। তারো আগে মা উঠে রুটি বানাতে থাকেন। চা দিয়ে রুটি খেয়ে মেজ আপা চলে যান ইস্কুলে। তারপর চা খেতে বসে সবাই। আনু আজকাল একা চা খায়। কাপটা নিয়ে চলে আসে বারান্দায়। বইগুলো পড়ে থাকে সামনে। রোদ উঠোনময় হয়ে যায়। কাক ডাকতে থাকে। বুলু ভাইদের বাড়িতে কলরব শোনা যায়। একেকদিন আনু খুব মন দিয়ে পড়ে। আবার একেক দিন কী হয় তার কিস্‌সু ভালো লাগে না। বসে বসে ছিপটা পাকা করে। টোপ বানায়। আজ কোথায় মাছ ধরতে যাবে, তাই ভাবে।

মা চিৎকার করে উঠেন, ওরে তোর চোদ্দ পুরুষ মাঝি ছিল কিনা। তুই ধরবি না তো কে ধরবে? মাছ ধরবি আর বাজারে বিক্রি করবি। লেখাপড়ার কি দরকার?

পালটা জবাব দেয় আনু, আমার বই নেই তো, আমি কি করব! দু'খানা বই সাত টাকা লাগে। দিলেই হয়।

মা থামবেন কেন? তিনিও বলে চলেন, সাত টাকার জন্যে তোমার বিদ্যার জাহাজ ভাসে না, না? গরিবের ছেলে লেখাপড়া করে না? চেয়ে চিন্তে বই পড়ে না তারা? বই নাই তো এদ্দিন

পরে বললি কেন? খবরদার বলতে পারবি না? যা আমার চোখের সামনে থেকে। যা সব, যা। গুষ্টি দূর হ।

আনু একটু ভয়ই পেয়ে যায়। ভয় পাবে না? মা-র চিৎকার শুনে আপারা পর্যন্ত গুটিগুটি পায়ে সরে পড়েছে। ছিপটা হাতে করে আনু বাইরে এসে দাঁড়ায়। যাক চুলোয়, আজ সে স্কুলেই যাবে না।

পরদিন সাতটা টাকা দেন মেজ আপা। বাসায় এসে সালু আপার কাছে সব শুনেছেন তিনি। আমাকে আগে বলিস নি কেন?

মাথায় হাত দিয়ে একটু পরে বলেন, দাঁড়িয়ে থাকিস না। বই কিনে নিয়ে আয়।

আনু তবু নড়ে না। কালকের রাগ আজ কান্না হয়ে আসতে চাইছে। টাকাগুলো মুঠো করে ধরে রাখে। তখন মেজ আপা বলেন, আচ্ছা, বইয়ের নাম লিখে দে, আমি সুবিনয়কে দিয়ে আনিয়ে নেব'খন।

রাতেই বই দু'টো এসে যায়। সুবিনয় দিয়ে গেলে আনু বাতির সামনে ধরে নেড়ে চেড়ে দেখে। গন্ধ শোঁকে নতুন বইয়ের। তক্ষুণি মলাট করে ফেলে। মেজ আপা তার পাশে বসে বলেন, কি এবার থেকে পড়বি তো?

আনু ঘাড় কাৎ করে। তারপর এদিক ওদিক দেখে ফিসফিস করে মেজ আপাকে বলে, আমাকে একজোড়া স্যাণ্ডেল কিনে দিবি?

।। ১১ ।।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে আনু দেখে, বড় আপা শুয়ে আছেন। মাথার কাছে গেলাশে পানি ঢাকা। দেখে কেমন করে উঠল ভেতরটা। পাশে বসে জিগ্যেস করল, কি হয়েছে?

কিছু না।

তার কপালে হাত দিয়ে দেখে জ্বর। বলল, জ্বর তো।

সেরে যাবে।

তখন একটু স্বস্তি পেল যেন আনু। না, তেমন কিছু নয়। একটু গা গরম শুধু। বসে বসে সে স্কুলের গল্প করল। বলল, বৃত্তি পরীক্ষা কাছে চলে এসেছে কিনা, তাই এখন ক্লাশে খুব পড়াচ্ছে। হেড মাস্টার তাকে ডেকে নিয়ে, ভালো করে পড়তে বলেছেন। বলেছেন, চেষ্টা করলে আনু বৃত্তি পেয়ে যেতে পারে। বড় আপা তার হাত ধরে উজ্জ্বল মুখ করে বলে উঠলেন, তাহলে বেশ ভালো হয়, নারে? তুই পড়।

সেই অসুখ আর কিছুতে কমল না। জ্বরটা বেড়েই চলল। মাঝখানে আনু একদিন হাসপাতাল থেকে ওধুধ এনে দিয়েছিল। কিস্সু কাজ হয় নি তাতে। বুলু ভাইর মা এসে সবাইকে খুব বকলেন, কী আক্কেল তোমাদের! এমন শক্ত অসুখ, হাসপাতালের ওপর ভরসা করে আছো।

পরদিন সকালে বুলু ভাইর সঙ্গে গিয়ে আনু ডাক্ত'র নিয়ে এলো। হাফপ্যান্ট পরে মাথায় হ্যাট চাপিয়ে সাইকেলে করে এলেন ডাক্তার নিয়োগী। পরীক্ষা করে বলে গেলেন টাইফয়েড।

আনু তার সঙ্গে সঙ্গে গেল ডিসপেনসারী। ওষুধ কিনে বাড়ি ফিরল। বলল, ডাক্তার খুব

সাবধানে থাকতে বলেছে।

আনু এখন আর খেলতে যায় না, মাছ ধরতে যাওয়াটাও বন্ধ করে দিয়েছে। আজকাল কিছুই যেন ভালো লাগে না তার। বড় আপার অসুখ বলে নয়, সামনে বৃত্তি পরীক্ষা বলেও নয়, এমনিতে। সে নিজেই বুঝতে পারে না, তার কি হয়ে গেছে। মনটা যেন এখানে নেই, কিংবা কোথাও। একটা উড়ে চলার, দূরে চলে যাওয়ার, হারিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে যেন ভেতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠতে চায়। চারপাশের সমস্ত কিছু এত দূরের মনে হয়–নিস্পৃহতায় ভরে থাকে মন। বড় উদাস মনে হয়।

স্কুলে বসে থাকতেও ভালো লাগে না। একদিন সে স্কুলেই গেল না। বইখাতা নিয়ে বেরুলো, বেরিয়ে গিয়ে নদীর পাড়ে যেখানে খেযাপাড় হয়, ছোট্ট একটা বাজার মতো যেখানে, সেখানে বসে রইলো। আবার সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে ধরলো রেললাইন। রেললাইন দিয়ে ইস্টিশানে এলো। দুপুর বারোটার ট্রেন আসবে এখন। খবর কাগজ আসবে। একটু পরেই হকার কাগজের বাণ্ডিল নিয়ে বসবে, তাকে খুলবার সময় পর্যন্ত দেবে না, সবাই ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে কাড়াকাড়ি করবে কাগজের জন্যে।

আনু বসে বসে ভিড় দেখতে লাগল। বটগাছের নিচে টমটম তিনটে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘোড়াগুলো মাটিতে পা ঠুকছে, গা কাঁপিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে। মিষ্টির দোকানে গ্রামোফন বাজছে। উলিপুরের বাস এসে গেছে। আবার প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাবে উলিপুর। ড্রাইভার পানি খাওয়াচ্ছে ইঞ্জিনের বনাট তুলে। আনুর মনে হয়, সেও যদি কোথাও চলে যেতে পারতো তো ভালো হতো। বড় আপা জ্বরের ঘোরে এখন পড়ে আছেন বিছানায়। মার রান্না বোধহয় শেষ হয়নি। সেজ আপা নাইতে গেছেন নিশ্চয়। আনু হাই তোলে। তার এখানেও ভালো লাগছে না। সে উঠতে যাবে, এমন সময় মাটি কাঁপিয়ে, চারদিক চঞ্চল করে ফুঁসতে ফুঁসতে ট্রেন এসে দাঁড়াল। হৈহৈ করে লোকেরা নামছে, কুলিরা চিৎকার করছে, বৌ-ছেলেমেয়েরা হাঁটতে পারছে না, তবু দৌড়চ্ছে খালি গাড়ির দিকে, গেটের কাছে চেকার দাঁড়িয়ে গেছে। আনু গিয়ে গাড়িতে বসলো।

ট্রেন ছেড়ে দিল। সড়াৎ করে বেরিয়ে গেল মহিমপুরের প্ল্যাটফরম, মালগুদাম, স্টেশন মাস্টারের বাড়ি। এ হলো মাঠ, মাঠ শেষে জলা জায়গাটা, তারপর গ্রামের মধ্যে নেমে গেল ট্রেন। আনুর বুকের ভেতরটা ছমছম করে উঠছে, তবু ভালো লাগছে। কোথাও যাবার নেই, তবু সে কোথাও যাচ্ছে। মুখে ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগছে। রোদে ঝকঝকে দেখাচ্ছে আকাশ, মাঠ, ধানক্ষেত, চিল, সাদা বক, মাছরাঙা, পানি সেঁচার চড়ক। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে টোগরাই হাটের ব্রীজ। ব্রীজের নিচে একদিন মাছ ধরতে যাবে আনু। ওখানে ভালো মাছ পাওয়া যায়। বড় আপা বেলেমাছ যা ভালোবাসে। বেলেমাছ ধরে আনবে আনু।

ব্রীজের নিচে কাচের মত স্বচ্ছ পানি। পেরিয়ে গিয়ে আবার ধানক্ষেত। রেললাইনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তাটা। যেন অন্তহীন একটা ফিতে কেবলই খুলে যাচ্ছে। আনুর ঘুম পাচ্ছে খুব। সে কাৎ হয়ে বইখাতা কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর আর কিছু মনে থাকে না।

হঠাৎ একটা ঝাকুনিতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাকিয়ে দেখে, আরে তিস্তা এসে গেছে! তিস্তা জংশন। চোখ কচলে তাড়াতাড়ি উঠে বসে সে। এ গাড়ি এখানেই থাকবে। তারপর বিকেলে

রংপুরের প্যাসেঞ্জার নিয়ে আবার ফিরে যাবে মহিমপুর। আনু লাফ দিয়ে নামে। কী বিরাট প্ল্যাটফরম তিস্তার। এ মাথা থেকে ও মাথা হাঁটলে পা ধরে আসতে চায়। ঐ শেষমাথায় দুটো বড় বড় কৃষ্ণচূড়া আর শিমুল ফুলের গাছ। তারপরে মাঝে খোলা শেড। ইঞ্জিনের পানি খাবার চোং ঝুলছে মাথার ওপর। আরো এগিয়ে এলে ওজন করবার কল। কলটার ঠিক পাশে নিচু সাইনবোর্ড। তাতে লেখা 'পার্বতীপুর লাইনে যাইবার জন্য গাড়ি বদল করুন।' আরো খানিকটা হাঁটলে ইস্টিশান। ইস্টিশানের দু'দিকে মুখ। একদিকে মহিমপুর থেকে গাড়ি এসে দাঁড়ায়, আরেকদিকে রংপুর থেকে, কাউনিয়া থেকে, লালমনিরহাট থেকে। ওয়েটিং রুমে শেতলপাটির টানা পাখা ঝুলছে। স্টেশন মাস্টারের ঘরে মাস্টার সাহেব খবর কাগজ পড়ছেন। এদিকের ঘরে টেলিফোনের সব চৌকো বাক্স বসানো। ইস্টিশান ঘরের পরে ইদারা। লোহার শেকল বাঁধা বালতি থেকে পানি খাচ্ছে যাত্রীরা। তারপর সোজা হেঁটে গেলে একেবারে শেষ মাথায় দোতলা উঁচু ছোট্ট একটা ঘর। গায়ে বড় বড় করে লেখা 'সাউথ কেবিন।' ওখান থেকে সিগন্যাল ওঠায়, নামায়; আবার টেলিফোনে কথা বলে। সেখান থেকে দেখা যায় তিস্তা ব্রীজ। রোদে তার রংটা গোলাপি দেখায়— একটা অতিকায় খেলনার মতো লাগে। রংপুর যেতে কতবার আনু ব্রীজটার ওপর দিয়ে গেছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেছে। ব্রীজের ত্রিভুজগুলো গুনবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এত জোরে চলে গাড়ি, কোনদিনই সঠিক গুনতে পারেনি। আজ মনে হলো হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় ব্রীজটার কাছে। তার মনের মধ্যে ভারী রোমাঞ্চ হয়। যে ব্রীজের ওপর দিয়ে গাড়ি করে গেছে, সেটাই সে পায়ে হেঁটে পার হবে, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখবে।

হাঁটতে থাকে আনু। মাথার ওপরে চড়া রোদ। গলাটা কেমন শুকিয়ে আসছে। কাক ডাকছে। চারদিক খাঁ-খাঁ করছে। টেলিগ্রাফের মেলা তার মাথার ওপরে। বাতাস লেগে মিষ্টি একটা বাজনার মতো শব্দ উঠছে তার থেকে। আনু একটু জিরিয়ে আবার এগোয়। ইস্ কতদূর। ইস্টিশান থেকে ব্রীজটা যতটুকু দেখা গিয়েছিল এখনো ঠিক ততটুকুই লাগছে। ঠিক যেন পাহাড়ের মতো। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে পাহাড় দেখতো আনু, বাবার সঙ্গে। বাবা বলতেন, পাহাড় মনে হয় কাছে, যতদূর যাবি পাহাড়ও ততদূর সরে যাবে।

আর যেন পারে না আনু। কিন্তু কেমন একটা নেশার মতো পেয়ে বসেছে তাকে। ট্রেন, ইস্টিশান, সিগন্যাল, ব্রীজ— সব যেন তার স্বপ্নের দেশ থেকে আসে। বুকের মধ্যে এমন একটা নিবিড় টান অনুভব করে সে চিরকাল। সে যদি সারাজীবন গাড়িতে গাড়িতে ঘুরতে পারত, হাঁটতে পারত কাঁকর বিছানো প্ল্যাটফরমে, এই রকম রোদে দাঁড়িয়ে টেলিগ্রাম তারে বাতাসের বাজনা শুনতে পারতো। এখানে দুঃখ নেই, অভাব নেই, অসুখ নেই— শুধু একটা স্থির হয়ে থাকা আনন্দ কেবল। আনু জোরে জোরে হাঁটতে থাকে। ব্রীজটার কাছে সে পৌঁছুবেই।

পায়ের নিচে তেতে উঠেছে নুড়িগুলো। স্লিপার লাফিয়ে লাফিয়ে চলে আনু। দশ বারোটা লাইন এই খানে কাটাকুটি হয়ে ছড়িয়ে গেছে। একটা ধাঁধার মতো লাগছে। একসময়ে সে পৌঁছে যায় তিস্তা ব্রীজে।

তখন আর গোটা ব্রীজটা দেখা যায় না। তার সমুখে অতিকায় গেটের ঠ্যাংয়ের মতো লোহার বরগা দু'দিকে উঠে গেছে। চূড়োটা দেখতে হলে মাথা ঘাড়ের সঙ্গে ঠেকে যায়। লাল টকটকে রংটা সূর্যের হল্‌কা থেকে তৈরি হয়েছে যেন। হাত দেয়া যায় না, হাত পুড়ে যায়।

ব্রীজের ওপর রেললাইন চলে গেছে, পাশে পায়ে হাঁটবার পথ। আবার ট্রেন এলে সরে দাঁড়াবার জন্যে মাঝে মাঝে রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া গোল একটু জায়গা। ইটের মোটা থামগুলো নেমে গেছে নদীর ভেতরে। যেখানে নেমেছে, তার চারপাশে অবোধ একটা ছেলের মতো পানি ঘুরছে, ঘুরতে ঘুরতে আবার বয়ে যাচ্ছে। একটা খামের নিচে বড় পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে মাছ ধরছে একটা লোক। মাথায় তার গামছা বাঁধা। ওপর থেকে তার প্রসারিত হাত দু'টো দেখা যায় শুধু।

গুনতে লাগল আনু। আজ সে গুনে দেখল মোট সতেরোটা ত্রিভুজ। একবারে শেষ মাথায় গিয়ে দাঁড়ায় সে। আবার ফিরে আসতে থাকে। পায়ের নিচে নদীটা কী বিশাল, মনে হয়। আকাশটা উপুড় হয়ে পড়েছে, নীলচে একটা রং লেগেছে–তাই কেমন যেন উদাস দেখায়। একটা নৌকা নেই, তাই মানুষ নেই, পাখি নেই খাঁ খাঁ করছে নদীর বুক। দূরে গুমগুম করে একটা শব্দ ওঠে।

আনু তাকিয়ে দেখে ট্রেন আসছে। তক্ষুনি সে রেলিং ঘেরা গোল জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। শক্ত করে ধরে থাকে। বুক কেঁপে ওঠে। পায়ের নিচে শিরশির করছে, কাঁপনটা বাড়ছে, শব্দটা ভীষণ হচ্ছে। গুমগুম করতে করতে ট্রেনটা তীরের মতো চলে আসছে, বড় হচ্ছে, কাছে এলো। সড়াৎ সড়াৎ করে আকাশে বাতাসে ঢাকের কাঠি বাজিয়ে বেরিয়ে গেল ট্রেনটা। তখন কাঁপুনিটা কমে গেল। আনু তাকিয়ে দেখে সে ঘেমে গেছে। আনু ভেবে দেখে, ট্রেনটা সে কিছুই দেখতে পায় নি। সে চোখ বন্ধ করে ছিল, খালি শব্দটা শুনেছে, তার গায়ের ওপর দিয়ে ঝড়ের মতো একটা বাতাস বয়ে গেছে।

ইস্টিশানে ফিরে এসে মেল-বাক্সের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে আনু। চারদিকের বাতাস থেকে একটা ঝিমোনো সুর এসে কানে ফিসফিস করে তার। স্টেশন মাস্টার বাসায় চলে গেছেন। টেলিফোনের বাক্সগুলো চুপ হয়ে গেছে। একটা লোক কোট ভাঁজ করে মাথার নিচে দিয়ে ঘুমোচ্ছে। কোথায় একটা বাচ্চা কাঁদছে। পানির ট্যাঙ্ক থেকে টপ্ টপ্ টপ্ টপ্ করে চুঁইয়ে পড়ছে পানি।

আস্তে আস্তে কোমল হয়ে এলো রোদটা। ছায়াগুলো লম্বা হলো। রেললাইনের ওপর গিয়ে পড়ল ইস্টিশানের ছায়া। কৃষ্ণচূড়া আর শিমুলের ডালে শোনা গেল পাখিদের কলরব। আবার মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আবার বেজে উঠতে লাগল টেলিফোনের বাক্স। কুলিরা লণ্ঠনগুলো মাজতে লাগল, কাচ পরিষ্কার করল, তেল ভরল। টিভি স্টলে জমে উঠল ভীড়। মহিমপুরে যাবার জন্যে ফুঁসতে লাগল ইঞ্জিন। হেলতে দুলতে এসে হাজির হলেন গার্ড সাহেব। একটা পান কিনে খেলেন। আনু গিয়ে গাড়িতে উঠল।

মহিমপুরে বাত আটটায় পৌঁছুলো সে। তার ভয় করতে লাগল বাড়ির জন্যে, মার জন্যে। মা কি বলবেন তাকে? সারাদিন সে কোথায় ছিল? সারাদিন বাড়ির কথা একটুও মনে ছিল না তার। সে যেন একটা অন্য মানুষ এই সারাদিন ঘুরে বেরিয়েছে স্কুল পালিয়ে আর যে আনু বাসায় ফিরছে সে যেন মরে ছিল সারাদিন,সন্ধ্যের সময় আবার জেগে উঠেছে।

পায়ে পায়ে ফিরে আসে সে। মনে মনে একটা গল্প বানায়। বলবে বৃত্তি পরীক্ষার পড়া বুঝতে গিয়েছিল ক্লাশের একটা ছেলের বাড়িতে। বলবে সেই ছেলেটার প্রাইভেট মাস্টারের কাছে সে আজ থেকে পড়ছে, হেডমাস্টাব বলে দিয়েছেন, তার পয়সা লাগবে না। বলবে

হেডমাস্টার তাকে খুব ভালোবাসেন।

বাসায় এসে দেখে জিনি সিস্‌টার এসেছেন। বড় আপার মাথার কাছে বসে আছেন। পায়ের কাছে বসেছেন মেজ আপা। সালু আপা আর মিনু আপা বারান্দায় চুপ করে বসে আছে অন্ধকারে। ঘর থেকে এক ফালি আলো এসে পড়েছে তাদের মুখে। জিনি সিস্‌টার তাকে দেখে বললেন, এসো।

সে জিগ্যেস করলো, ভালো আছেন?

তুমি আজকাল আর যাও না যে?

আমার বৃত্তি পরীক্ষা।

বড় আপা চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন। ঘুমিয়ে কি জেগে তা বোঝা যাচ্ছে না। সেদিকে আড় চোখে একবার তাকাল আনু। বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে আছেন। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় আরো শীর্ণ দেখাচ্ছে তাঁকে। মেজ আপা বললেন, সারাদিন কোথায় থাকিস?

আনু সে কথার জবাব না দিয়ে রান্নাঘরে এলো। সেখানে সেজ আপা মা-র কাছে বসে। আজ তিনি রান্না করছেন। মা চোখ মুছছেন। মা আনুকে দেখে বললেন, নিচু গলায়, যেন শোনাই গেল না, এই এলি! ফতেমা আজ কেমন করছে দেখগে।

ধক করে উঠলো আজ আনুর বুকের ভেতরটা। অসুখটা আবার বেড়েছে? সে কী করবে বুঝতে পারল না। বলল, ডাক্তার আসেনি?

বুলুকে দিয়ে ডাকালাম।

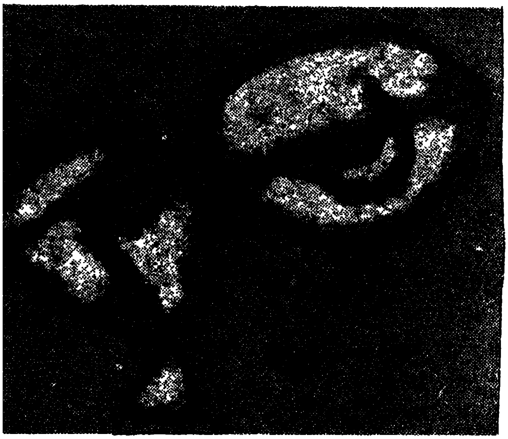
মা আবার চোখ মুছলেন। আনু বেরিয়ে এলো বাইরে। বড় আপার কাছে যেতে পারল না। জিনি সিস্‌টার বসে আছেন; তার লজ্জা করল কেমন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। তার দম যে ফুরিয়ে যেতে চাইছে। সে নড়ল না। একটা কুকুর মানুষের বাচ্চার মতো কেঁদে উঠলো কোথায়। বুলু ভাই এসে তার হাত ধরল একটা কথা না বলে। যেন, দুজনে দাঁড়িয়ে আছে, কে আসবে, কার আসবার কথা আছে।

রাতে বড় আপার কাছে এলো আনু। জিনি সিস্‌টার চলে গেছেন অনেক্ষণ। সবাই খেতে বসেছে। কেবল মিনু আপা বসে আছেন পায়ের কাছে। আনুর এতক্ষণ আসতে সংকোচ করছিল। কেমন একটা অপরাধ বোধ তাকে দংশে মারছিল। সারাদিন সে বেড়িয়েছে, আর বড় আপার অসুখ বেড়েছে এদিকে— একবারও তার মনে হয়নি বাড়ির কথা। মাথা নিচু করে পাশে বসলো সে চোরের মতো। বড় আপা চোখ মেললেন। তখন বিব্রতবোধ করল আনু। সে একটা কথা বলতে পারল না। বিছানার চাদর খুঁটতে লাগল অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে। বড় আপা তাকে দেখে যেন হঠাৎ খুশি হয়ে উঠলেন, তারপর ফিসফিস করে বললেন, বাবাকে দেখতে যাবি না আনু? বাবাকে আসতে বলিস।

পরদিন ভোরে, সূর্য ওঠার অনেক আগে বড় আপা মারা গেলেন।

সে কাঁদলো না। যেন তার জানাই ছিল সব। মা-র করুণ কান্নার পটভূমিতে সে তন্ময় হয়ে মনের মধ্যে দেখতে লাগল দুপুরের রোদে পুড়ে যাওয়া লাল টকটকে তিস্তা ব্রীজ।

কুড়িগ্রাম ও ঢাকা
জানুয়ারি ১৯৫৭



# অচিন্ত্য পূর্ণিমা

আজকাল কত সুবিধে। তিস্তা থেকে মিটার গেজ লাইন বেরিয়ে গেছে। সকালে একটা আর রাতে একটা লোক্যাল ছাড়ে। চলে যাও সোজা শেষ স্টেশন কুড়িগ্রাম পর্যন্ত। স্টেশনের পরেই নদী। খেয়া পেরোও। পেরিয়ে বাস। বাস একেবারে পতিদহ পর্যন্ত যায়। ব্যাস, পৌঁছে গেলে গন্তব্যে।

কিন্তু তখন এ সব কিছুই ছিল না। মার্টিন কোম্পানির লাইট রেলওয়ে ছিল বটে কুড়িগ্রাম অবধি, কিন্তু তার সময়সূচি বলতে কিছু ছিল না। যাত্রীতে বগি ভরে উঠলে গাড়ি ছাড়ত, নইলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত। বংশ গরিমায় আর ধনের মহিমায় যারা টগবগ করত তারা নাইট ট্রেনে চড়তেন না। নাক সিটকোতেন। তাদের জন্যে পালকি আসত, বেহারা আসত, তাজি ঘোড়া মওজুদ থাকত।

তিস্তা তখন দার্জিলিং মেলের পথে ছোট্ট একটা স্টেশন মাত্র। তিস্তা নদীর ব্রীজ পেরোবার আগে একটা লম্বা সিটি দিতে হয় মাত্র। স্টেশন মাস্টার রাতে হলে সবুজ বাতি দেখান, দিনে ছেঁড়া নিশান। এক ঝলক উদ্দাম স্বপ্নের মতো হুহু করে বেরিয়ে যায় কলকাতার গাড়ি, আসামের গাড়ি।

তবে হ্যাঁ, প্ল্যাটফরমের দুই মাথায় যে দুটো বুড়ো শিমুল গাছ এখনো দেখা যায়, দেখা যায় মৌসুমের সময় আগুন রং ফুলের কিরীট পরে থাকতে, সে গাছ দুটো তখনো ছিল। একেবারে এইটুকুন। কাটিহারের কোন্ এক ঘরবিরহী কুলি সর্দার শখ করে লাগিয়েছিল চারা দুটো।

সেই সেদিনের তিস্তায় এসে নাবলেন ইদ্রিস ডাক্তার আর পতিদহের বড় তরফ হাজি জয়েনউদ্দিন।

স্টেশন ঘরের সামনে টিমটিম করে বাতি জ্বলছে কাচের ডোমের ভেতর। তাতে স্টেশনের নাম লেখা। পেছনে বাঁশের জঙ্গল থেকে শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। যেন মহোৎসব লেগে গেছে তাদের রাজত্বে। চারিদিকে জনমনিষ্যির সাড়া শব্দ নেই।

পার্বতীপুরে মিটার গেজ গাড়িতে চড়বার পর থেকে দুজনের মধ্যে প্রায় কোনো কথাই হয়নি। এবারে গলা সাফ করে ইদ্রিস ডাক্তার বলল, এই বুঝি তিস্তা?

হ্যাঁ, সন্ধ্যে হয়েছে। নইলে নদীটাও দেখতে পেতেন। বর্ষার সময় ভীষণ মূর্তি হয়ে ওঠে।

তাই নাকি?

নিজের কাছেই নিজের গলার স্বর কেমন অদ্ভুত ঘরঘরে শোনায়। ইদ্রিস ডাক্তার আবার গলা সাফ করে। সেটা লক্ষ্য করে হাজি সাহেব আবার বলেন, ইচ্ছে করলে এখনো ফিরে যেতে পারেন। রাত দুটোয় একটা ফিরতি ট্রেন আছে।

কোথায়?

কেন, কলকাতায়। ইচ্ছে করলে সিরাজগঞ্জেও যেতে পারবেন। সেখানেই আপনার দেশ বলেছিলেন না?

হ্যাঁ।

যাবেন ফিরে?

স্টেশন ঘরের বাতিতে ইদ্রিস ডাক্তারের ঘন শ্যামল মুখটা স্পষ্ট দেখা যায়। লজ্জিত হয়ে হাসে সে একবার। মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, ফেরৎ যাবার কথা ভাবলে তো আর বেরুতামই না।

তবু।

তবু কী ?

বলছিলাম, এখনো ভেবে দেখতে পারেন। ছিলেন কলকাতায়। সে এক বিরাট শহর। আপনার মতো লোকের একটা না একটা রুজি হয়েই যেত সেখানে। তাছাড়া আপনার প্রিন্সিপ্যাল সাহেবও খুব স্নেহ করে আপনাকে। আপনি চাইলে তিনি আপনার ভালো ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন কলকাতায়।

সে আমি জানি।

আর ভেবে দেখুন পতিদহ এক গণ্ডগ্রাম। এখান থেকে ঝাড়া পঞ্চাশ মাইল। বর্ষা শুরু হলে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। থিয়েটার বায়োস্কোপ নেই। গড়ের মাঠের হল্লোড় নেই। রোশনি নেই। মন টিকবে পতিদহে ?

কেন একথা জিজ্ঞেস করছেন বারবার ?

এই জন্যে করছি, আপনার মতো শহুরে লোক হুট করে পতিদহের দাতব্য ডিস্পেন্সারীতে ডাক্তারী নিতে চাইবে, আমার যেন ভালো করে বিশ্বাস হতে চায় না। আমি যখন ডাক্তারের খোঁজে কলকাতা গিয়ে আপনার প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করলাম তখন এক রকম ধরেই নিয়েছিলাম কেউ রাজি হবে না আসতে।

সে ভুল তো আপনার ভেঙেছে।

হ্যাঁ, তা ভেঙেছে। সেই জন্যেই আরেকবার ভাবতে বলছি। কী জানেন, আমি সবসময়ই খোলামেলা কথা পছন্দ করি। কারো ওপরে জোর করি না। নিজেই ভালো করে জানি, পতিদহে কী আছে ? পতিদহে কেন আপনার মতো শিক্ষিত মানুষ যাবে ? ক টাকাই বা মাইনে দেব ?

আচ্ছা, সে কথা এখন থাক।

ইদ্রিস ডাক্তার থামিয়ে দিল হাজি সাহেবকে। একটু পর বলল, রাতেই কি রওয়ানা দেবেন? না, এখানে রাতটা কাটিয়ে ভোর বেলায় ?

পতিদহের বড় তরফ হাজি জয়েনউদ্দিন মাথা দুলিয়ে দাড়ি খেলাল করলেন বার কয়েক। বললেন, পাগল হয়েছেন ? এই রাতে রওয়ানা দিতে চান ?

ক্ষতি কী ?

এটা কলকাতার রাজপথ নয় ডাক্তার সাহেব। সিঙারদাবড়ি হাটের পর থেকে বন শুরু হয়েছে। সে বনে বাঘও আছে বলে লোকে বলে। আমি দেখিনি নিজে। বাঘের মুখে উৎসাহের তোড়ে প্রাণ দেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

ও।

হাজি সাহেবের সঙ্গে এসেছে দুই খানসামা আর এক পাইক। তারা ততক্ষণে স্টেশনের বিশ্রাম ঘর খুলিয়ে বিছানা করে ফেলেছে। রাতের রান্নার যোগাড় দেখছে এখন তারা। একজন বাজারে বেরিয়ে গেছে চাল ডাল কিনতে।

ইদ্রিস ডাক্তার সব শুনে বলল, আমি তাহলে একটু হেঁটে আসি।

রাতে আবার কোথায় হাঁটতে যাবেন ডাক্তার ?

প্ল্যাটফরমেহ।

দেরি করবেন না। শীত পড়তে শুরু করেছে। মাথায় হিম বসে গেলে শরীর খারাপ করবে।

কথাটা ইদ্রিসের মনে প্রবল নাড়া দেয়। এক মুহূর্তের জন্য অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে সে। এরকম করে কত বছর কেউ তাকে কথা বলেনি। শুনে যেন চমকে উঠতে হয়। ইদ্রিস ডাক্তার ইতস্তত করে বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে এসে নুড়ি বিছানো রুক্ষ প্ল্যাটফরমের ওপর জমাট অন্ধকারের ভেতর আনমনে হাঁটতে থাকে। মাথায় হাত দিয়ে দেখে হিম পড়ছে সত্যি সত্যি।

কাল দুপুরের কথাগুলো আবার ভিড় করে আসে তার মনে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বৌবাজারের ডিস্পেন্সারীতে বসে তখন রোগী দেখছিল সে। এমন সময় চাকর এসে খবর দিল দুপুরে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বাসায় ডেকেছেন খেতে।

এ রকম তো কত দিন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ডেকেছেন। তাঁর হোমিওপ্যাথিক কলেজে পড়াশোনা করেছে ইদ্রিস। ইচ্ছে ছিল, কলকাতায় এসেছিল সে, এলোপ্যাথি পড়বে বলে। ক্যাম্‌বেল পাশ ডাক্তার হবে বলে। কিন্তু এক বছর পড়বার পড় সামর্থ্যে আর কুলোলো না। বাবার এন্তেকালের পর বড় ভাই সংসার দেখতে এগিয়ে এলেন না। তিনি তখন মহম্মদী হয়েছেন। লম্বা লম্বা চুল রাখেন, চোখে দেন সুরমা, মাথায় বিরাট সাদা পাগড়ি বাঁধেন। চেহারা ছিল এমনিতেই নুরানি। এই লেবাসে মনে হতো বড় ভাইকে যেন ইরান তুরানের বাদশাহর ছেলে স্বপ্নাদেশে ফকিরি নিয়ে পথে বেরিয়েছে। ঘর-ছাড়া বড় ভাই মাঝে মাঝে ঘরে আসতেন টাকার জন্যে। বাবার কাছে তা পাওয়া যেত না। রাত দুপুরে বাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় মাকে ডাকতেন। মা বেরিয়ে এসে আঁচল আড়াল দিয়ে তাকে রান্নাঘরে বসিয়ে খেতে দিতেন। ঘুমন্ত স্বামীর বালিশের নিচ থেকে চাবি চুরি করে টাকা বের করে দিতেন। বড় ভাই সেই রাতেই গ্রাম ছেড়ে আবার চলে যেতেন মাস দুমাসের জন্যে। কোথায় কোন সাঙ্গো পাঙ্গো নিয়ে থাকতেন, কোন মাজারে বসে জেকের করতেন, হানাফিদের সঙ্গে বিবাদ পাকিয়ে তুলতেন তার সঠিক খবর কেউ জানতো না।

বাবা মারা যাবার পরও সে আদত গেল না বড় ভাইয়ের। সংসার ভেঙ্গে পড়তে লাগল। মার পক্ষে সম্ভব হলো না সব জমিজমা থেকে ধান আদায় করা, তার বিলি বন্দোবস্ত করা। গাছের আম-কাঁঠাল পাড়া পড়শি পেড়ে খেতে লাগল, চুরি হতে শুরু করল, মা কিছু করতে পারলেন না। ঘরে এক সোমত্ত মেয়ে আর তিনি, আর তো কোনো ব্যাটা ছেলে নেই। বড় ভাইকে কতবার বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন মা, তবু তিনি ফিরলেন না। মা বললেন, বাবা তোর ফকিরি করতে হয়, জেকের করতে হয়, বাহাস করতে হয় ভিটেয় এসে কর। কেউ তোকে বাধা দেবে না। তোর বাবা তুই মুহম্মদী হয়েছিস বলে বাড়িতে উঠতে না দিলেও আমি কিছু বলব না। তুই যেমন চাস তেমনি হবে।

কিন্তু বড় ভাইর মনে যেন তখন ঘোর লেগেছে। কঠিন হাতে মার বাড়ানো হাত সরিয়ে দিয়ে বলতেন, সংসারের লোভ আমাকে দেখিও না মা। যে সংসারের সন্ধান আমি পেয়েছি তার খবর তুমি কী জানো?

ভণ্ড, পাষাণ্ড! ইদ্রিস ডাক্তার দাঁতে দাঁত চেপে তিস্তার প্ল্যাটফরমে হাঁটতে হাঁটতে উচ্চারণ করল। বলল, তাই যদি হবে তাহলে অনাথা মায়ের কাছে হাত পাততে আসিস কোন

লজ্জায়? ফকিরের আবার টাকার দরকার কী ? এত যে আল্লাবিল্লা করিস তাও তো আকাশ ফুঁড়ে টাকার বৃষ্টি হয় না। টাকার জন্যে তো সেই সংসারেই আসতে হয়। ভণ্ড কোথাকার। নিজের সঙ্গেই এতগুলো কথা বলবার পর ভেতরের উত্তেজনা খানিকটা কমে এলো ইদ্রিসের। মা টাকা পাঠাতে পারেনি বলে যে এলোপ্যাথি পড়তে সে পারেনি তার জন্যে মনটা তেঁতো হয়ে গেল না আবার। কেমন মমতায় ভরে উঠল বুকটা। এমনকি বড় ভাইয়ের জন্যেও একটু টনটন করে উঠল শরীরের ভেতরে কেথায় যেন।

একবার তো সে ভেবেছিল নাম যখন ক্যাম্‌বেল থেকে কাটাই গেল মাইনে আর মেস ভাড়ার অভাবে। সে ফিরে যাবে সিরাজগঞ্জে, তার গণ্ড গ্রামে। সংসার দেখবে। বোনটাকে বিয়ে দেবে। মার সেবাযত্ন করবে। শেষ বয়সে মা যেন একটু শান্তিতে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করবে। আর তার নিজের ভবিষ্যৎ ? হোক না, যা কপালে লেখা আছে, তাই হোক। হালচাষ নিয়ে থাকতে খুব যদি খারাপ লাগে তো গাঁয়ের মকতবে মাস্টারি করবে। মাস্টারি করাটাও একটা বড় কাজ।

আসলে সারাজীবন সে একটা কিছু করতে চেয়েছে, বড় একটা কিছু। কিন্তু সেই বড় কাজটা কী, তা নিজেও কোনদিন ভালো করে বুঝে উঠতে পারে নি। বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষ কেউ ইংরেজি পড়েনি। সে জেদ করে, বাবার সঙ্গে বিস্তর ঝোলাঝুলি, কাঁদাকাটি করে চৌবাড়ির স্কুলে ইংরেজি পড়তে গিয়েছে। পরীক্ষায় ভালো ফল করার দরুণ বাড়ি এসে চৌবাড়ির সেকেণ্ড টিচার যখন বাবাকে বলে গিয়েছিলেন, আপনার ছেলেটা লেখাপড়া শিখলে কালে একজন মানুষ হবে, তখন সেই প্রশংসা শুনে বাবার মনটাও বেশ নরোম হয়ে গিয়েছিল।

শুধু সে নিজে ভর্তি হয়েই ক্ষান্ত হয় নি। বড় ভাই পড়তেন মকতবে, তাঁকেও বুঝিয়ে শুনিয়ে ইংরেজি স্কুলে টেনে নিয়ে এসেছিলেন। তখন বড় ভাই তাঁর কথা শুনতেন। তখন বড় ভাই ইদ্রিস ছাড়া কাউকে বুঝতেন না।

সেই ছেলেবেলাতেই ইদ্রিস স্বপ্ন দেখত, দু'ভাই তারা ইংরেজি পড়ে মস্ত বড় হয়ে গেছে। দেশের লোক হাটমাঠ ভেঙ্গে আসছে তাদের দেখতে। জেলার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট খাস হুকুমবরদার পাঠাচ্ছেন বড় চাকরির পয়গাম দিয়ে। ইদ্রিস কল্পনায় দেখতে পেত কলকাতাকে বুড়ি দাদির কিস্‌সায় শোনা বাগদাদ দামেস্কের মতো ঝলমলে, মণিমুক্তো পথে পথে ছড়ানো, রং বেরংয়ের রোশনাই জ্বলা, বাদ্য বাজনায় ডগমগ করতে থাকা কলকাতা। সেই কলকাতায় যাবে তারা।

তা হলো অন্যরকম। সেকেণ্ড ক্লাশে পড়তে পড়তে বড় ভাই মহম্মদী হয়ে গেলেন। কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল তা জানতেও পারল না ইদ্রিস। তবে কানাঘুষোয় শুনেছিল শাজাদপুরের কোন এক জেলার মেয়ের রূপ নাকি তাঁকে টেনেছিল। তারা ছিল মহম্মদী। বড় ভাইও তাই হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়েটা কেন হয়নি তা ইদ্রিস শত চেষ্টা করেও জানতে পারে নি। তাছাড়া তখন চলছিল তার এন্ট্রান্স পাশের পড়া। দম নেবার ফুরসৎ ছিল না বলতে গেলে।

পাশ করেছিল ভালোভাবে। কলকাতায় গিয়াছিল ডাক্তারী পড়তে। চৌবাড়িতে একবার কঠিন অসুখ হয়েছিল তার। বড় ভাই যে বাড়িতে জায়গির থাকতেন সে বাড়ির মিয়া সাহেব দয়াপরবশ হয়ে টাকা খরচ করে ডাক্তার আনিয়েছিলেন। সেই ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে ভালো হয়েছিল ইদ্রিস।

ভারী ভালো লেগেছিল ডাক্তারকে তার। লম্বা নল দিয়ে বুক পরীক্ষা করছেন। চোখ কপালে তুলে জিভ একটু বের করে নাড়ি টিপে দেখছেন। খসখস করে লিখে দিচ্ছেন ব্যবস্থা। মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল সেই ছবিগুলো। আজরাইলের সঙ্গে লড়াই করা সে কি সহজ!

ইদ্রিসের যেন মনে হয়েছিল, লেখাপড়া শিখে যদি কিছু হতে হয় তো ডাক্তার হবে সে। আজরাইলকে কাবু করার ফন্দি সন্ধি জানার চেয়ে চূড়ান্ত আর কী দিতে পারে ইংরেজি শিক্ষা? সে ডাক্তার হবে।

বাবা এন্তেকাল করার পর টাকার অভাবে যখন তার পড়াশোনা বন্ধ হলো, তখন একবার এক ঝলক মনে হয়েছিল বেঁচে থেকে কী লাভ? মনে হয়েছিল, এক ফুয়ে কে যেন বিরাট এক ঝলমলে ঝাড়বাতি নিবিয়ে দিল। কলকাতার ব্যস্ত রাজপথে চলমান মানুষগুলোকে তার মনে হয়েছিল অন্য জগতের মানুষ, কত সুখী তারা, কত সজীব, পায়ের নিচে শক্ত মাটি তাদের। আর একমাত্র সে-ই এদের মধ্যে দলছুট। তার মনে হচ্ছিল যেন, রাস্তার লোকেরাও তা জেনে গেছে; তাকে ভারী অদ্ভুত আর বেখাপ্পা দেখাচ্ছে সবার ভেতরে। এখুনি যেন সবাই হা হা করে হেসে উঠবে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে দৌড় দিতে যাবে, এমন সময় চোখের সম্মুখে এক দৃশ্য চোখে পড়ল। দেখল কয়েকজন যুবক একটা দরোজা দিয়ে সার বেধে বেরিয়ে আসছে। হাতে তাদের বই খাতা। দরোজার ওপরে সবুজ সাইনবোর্ড। তাতে সূর্যোদয়ের ছবি আঁকা। সেই সূর্যের ওপরে আধখানা বৃত্তের আকারে লেখা 'প্রিন্সিপ্যাল খানস সানরাইজ হোমিও কলেজ'। তার নিচে লাল কালিতে লেখা 'দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়।'

আল্লাহ্‌রই কুদরত বলতে হবে। নইলে এই বৌবাজার দিয়ে কত কত দিন সে গিয়েছে, কিন্তু কই, আগে তো এ সাইনবোর্ড চোখে পড়েনি। ঐ যে বড় বড় করে লেখা 'দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়'— লেখাটা টকটক করছে; এত বড় লাগছে যে তার রীতিমত বিস্ময় হয় সে কি তবে এতকাল চোখ বুজে পথ চলত?

সোজা সে ঢুকে গিয়েছিল দরোজা দিয়ে। প্রিন্সিপ্যাল খান তখন ক্লাস ছুটি দিয়ে ডিস্পেন্সারীতে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী চাই তোমার?

গরিব আর মেধাবী ছাত্রদের কী সুবিধা দেওয়া হয় তাই জানতে এসেছি। সালাম না আদাব না, কোনো ভনিতা নয়, এমনকি দ্বিধা বা ভয়ও নয়— একেবারে সরাসরি এ রকম প্রশ্ন ডাঃ খান আগে শোনেন নি। স্মিত হেসে বললেন, তুমি পড়তে চাও?

জানি না।

অবাক হয়ে এক মুহূর্তের জন্য ভ্রু তুললেন ডাঃ খান। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ি কোথায়?

সিরাজগঞ্জ।

কী পাশ করেছ?

এন্ট্রান্স।

কলকাতায় কদ্দিন আছো?

দু'বছর।

এসো আমার সঙ্গে।

ডিস্পেন্সারীতে তিনি নিয়ে গেলেন ইদ্রিসকে। বাইরে তখন বেশ কয়েকজন রোগী অপেক্ষা করছে। খাস কামরায় ঢুকে ইদ্রিসকে একটা টুল দেখিয়ে বললেন, বোসো এখানে।

অভিভূতের মতো বসলো ইদ্রিস। তার সঙ্গে আর একটি কথাও বললেন না ডাঃ খান। রোগী দেখে চললেন একের পর এক। একজন জিজ্ঞেস করল, ভিজিট কত দিতে হবে ? ডাঃ খান হেসে বললেন, ভিজিট তো বাড়ি না গেলে নিই না। ওষুধের দাম দিলেই হবে।

রোগী যেন আর শেষ হতে চায় না। বেলা পাঁচের ঘরে এসে পৌঁচেছে। ইদ্রিসের এক সময় যেন সব অবাস্তব বলে মনে হলো। মনে হলো সে এখানে কেন ? কী করছে ? কোথা থেকে এসেছে ? নিজের নামটাও যেন আরেকজনের নাম বলে মনে হতে লাগল তার কাছে। এই তো সে কাল রাতেও ভাবছিল দেশে ফিরে যাবে সংসার দেখবে, বোনটাকে বিয়ে দেবে, মকতবে মাস্টারী করবে। আজ, এখন, এই মুহূর্তে মনে হলো তার, সে সিদ্ধান্ত আর কেউ নিয়েছিল। কেন সে নিজেকে নষ্ট করবে এভাবে ? বড় ভাই যদি সংসার না দেখে পার পেয়ে যান তো সে-ই বা কেন পার পাবে না ? ছোট হয়ে তারই বা কী এমন দায়িত্ব! আর সে যদি গাঁয়ে ফিরেই যায় তো সংসারের তাতে লাভ হবে কতটুকু ? মা না খেয়ে থাকবেন না, সে না গেলেও। বোনটার বিয়ে সে কলকাতা থেকে গিয়েও দিয়ে আসতে পারবে। শুধু ক-টা বছর। এই বছর ক-টা দাঁতে দাঁত চেপে কোন মতে পার করে দিতে পারলেই তার আবাল্য সেই স্বপ্ন সফল হতে পারে, সে ডাক্তার হতে পারে। লোকে হয়ত এ ক'বছর বলবে, বড় ভাই না হয় ফকির হয়ে গেছে, তুই তো বুড়ি মা আর বোনকে দেখতে পারতিস! তা ডাক্তার হয়ে সে যখন গাঁয়ে ফিরে যাবে তখন—

চমক ভাঙ্গলো ডাঃ খানের কথায়। তিনি বললেন, খাও। তাকিয়ে দেখে গরম জিলিপি পিরিচে করে রাখা। আর ঠাণ্ডা দু 'গেলাশ পানি। ইতস্তত করল সে। ডাঃ খান বললেন, খাও। আমিও নিচ্ছি।

তবু ইতস্তত করছে দেখে তিনি আবাব যোগ করলেন, আহা, তোমার জন্য বিশেষ করে আনাই নি। ক্লাশ শেষে রোগী দেখে এটুকু নাস্তা করি। নাও।

সে একটা জিলিপি নিল। বাবার কথা মনে পড়ে গেল তার। চৌবাড়িতে সে যখন পড়ত বাবা মাঝে মাঝে দেখতে আসতেন। হাতে থাকত খাবারের পুটুলি। রাগ করে সে বলত, কেন আপনি এ সব বয়ে নিয়ে আসেন। বাবা হাসতেন। পরে করতেন কী, খাবার আনতেন ঠিকই; কিন্তু বলতেন না যে তার জন্যে আনা। বলতেন, তোর মা আমারই নাস্তার জন্যে সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল, তা তুইও খা আমিও খাই।

পানি খেতে খেতে ইদ্রিস ভাবল, না হয় নাই হলো এলোপ্যাথি পড়া। হোমিওপ্যাথিই বা মন্দ কী। দামে শস্তা। খেতেও ভালো। কোনো বদ ক্রিয়া করে না। দেশ গায়ের লোকেরা দু'বেলা পেট পুরে খেতে পায় না। এলোপ্যাথির পয়সা জোগাবে তারা কোত্থেকে। হোমিওপ্যাথি শিখলে সবার সেবা করতে পারবে ইদ্রিস। গাঁয়ের অবস্থা তার চেয়ে ভালো তো আর কেউ জানে না। বরং আল্লার ফজলে এই ভালো হলো। সে হোমিওপ্যাথি পড়বে।

মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো। এ-কী আকাশ কুসুম সে বানাচ্ছে ? তার তো কলকাতায় একবেলা থাকবার মতো সঙ্গতি নেই। আজ দেড় দিন পেটে ভাত পড়ে

নি। মেসওলা বলে দিয়েছে কাল পর্যন্ত টাকা দিতে না পারলে সে যেন সীট ছেড়ে দেয়। এত সৌভাগ্য কি তার হবে যে সে হোমিওপ্যাথিই পড়তে পারবে ? না হয় কিছু সুবিধে করে দেবেন ডাঃ খান। কিন্তু তাতে তো আর খাওয়া পরার সমস্যা সমাধান হবে না। মনটা একেবারে নিভে যায় ইদ্রিসের। সে মাথা নিচু করে বসে থাকে।

তা কলকাতায় এতদিন কী করছিলে ?

ডাঃ খান প্রশ্ন করেন।

ক্যাম্‌বেলে পড়তাম।

ভ্রু কুঞ্চিত করলেন ডাঃ খান। বললেন, ক্যাম্‌বেল ?

জ্বি হ্যাঁ।

তারপর ?

সব খুলে বলল ইদ্রিস। শুনে ডাঃ খান চোখ বন্ধ করলেন। চেয়ারের পেছনের দু'পায়ে শরীরটাকে ঠেলে ভর দিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। রোগী এলো আরেকজন। তখন আবার সোজা হয়ে বসলেন। সব শুনে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন তার। তারপর ইদ্রিসের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, আমার এখানে যারা পড়ে তারা সবাই প্রায় তোমার মতো। আমার কিছু বাঁধা রোগীপত্র আছে। তাদের কেউ খানসামা, কেউ রাজমিস্ত্রী, কেউ বই বাঁধানোর বা ছাপাখানার কাজ করে। নিজেরা গরিব হলেও ওরা বাড়িতে থেকে ছেলে পড়িয়ে নিজেরা পড়াশোনা করে। পারবে তুমি ?

আগ্রহে দু'হাত জড়ো করে উজ্জ্বল চোখে ইদ্রিস উত্তর করে, হ্যাঁ পারবো। খুব পারবো। কিন্তু কলেজের মাইনে ?

সেটা ? সেটা না হয় তুমি আপাতত নাই দিলে। আমার ডিস্পেন্সারীতে আরেকজন লোক দরকার লেবেল কাটা, শক্তি লেখা, কর্কের মাথায় ব্লকের ছোপ দেবার জন্যে। কিন্তু প্রথম বছরের পরীক্ষায় যদি ফল খারাপ হয় তাহলে এ সুবিধে আর পাবে না। মোট চার বছর পড়তে হবে।

আমি পড়ব স্যার। আমি চেষ্টা করব ভালো ফল করতে স্যার।

প্রথম বছরেই পড়াশোনায় ইদ্রিস এত ভালো করল যে ক্লাশের ভেতরে প্রথম হলো সে। ছকু খানসামা লেনে জায়গির পেয়েছিল। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে বৌবাজার আসতো সকাল ন'টায়। ক্লাশ করতো। পড়াতেন ডাঃ খান নিজে। আর কোনো প্রফেসর ছিল না কলেজে। নিজেই অর্গানস, ফিজিওলজি, অ্যানাটমি, মেটিরিয়া মিডিকা, প্র্যাকটিস অব মেডিসিন সব সাবজেক্ট পড়াতেন। ক্লাশ শেষে ইদ্রিস গিয়ে বসতো ডিস্পেন্সারীতে। সেখানে সন্ধ্যে পর্যন্ত ওষুধ ঢালা, লেবেল লাগানো, প্যাক করা, পয়সা গুণে রাখা, মেমো কাটা এই করত সে। সন্ধ্যের পর যখন বাসায় ফিরত প্রায়ই সঙ্গে নিয়ে আসত ডাঃ খানের লেখা বইয়ের পাণ্ডুলিপি। রাত জেগে নকল করে দিত ইদ্রিস। বই ছাপাতেন ডাঃ খান নিজেই। সে বই তাঁর নিজের কলেজেই পাঠ্য ছিল। আর কিনত মফস্বলের মুসলমান হবু হোমিওপ্যাথরা।

এক বছর পরে একদিন ডাঃ খান ইদ্রিসকে ডেকে বললেন, আমার বাসায় তো বাইরের ঘরটা পরেই থাকে। চলো এসো।

মানে স্যার ?

গর্ধব কোথাকার। মানে আবার কী ? আমার বাসায় থাকবে আজ থেকে।

ডাঃ খানের প্রিয় ছাত্র ইদ্রিস সম্মানের সঙ্গে ফাইন্যাল পাশ করল। ডাঃ খান নিজের খরচে তার ছবি ছাপিয়ে দিলেন সাপ্তাহিক মোহাম্মদী আর শিক্ষা-সমাচারে। পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে ইদ্রিস বিদায় নিল। ফিরে এলো তার গাঁয়ে। ততদিনে বড় ভাই মহম্মদী নাম ঘুচিয়ে আবার হানাফি হয়েছেন। সংসার করছেন। ইদ্রিস ফিরে এলে বললেন, এবার বিয়ে করে সংসারী হ'।

সে কেমন করে হয় ? বড় ভাই থাকতে ছোট ভাই আগে বিয়ে করবে সে কী কথা ?

কিন্তু কিছুতেই তাঁকে বোঝানো গেল না। আর ইদ্রিসেরও পণ বড় ভাই বিয়ে না করলে সেও বিয়ে করবে না। ইতিমধ্যে বোনের বিয়ে ফরজ হয়ে পড়েছে।

এক বিকেলে কাণ্ড হলো একটা। গাঁয়ে ঘোড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। কে এক দিব্যকান্তি তরুণ ঘোড়ার পিঠে চড়ে ধীরে ধীরে মাঠ ঘাট ভেঙে গাঁয়ের ভেতরে ঢুকেছে।

মকতবের হেড মোদাররেস কাঁপতে লাগলেন থরথর করে। বোধহয় স্কুল ইনেস্পেক্টর এসেছে মকতব দেখতে, খাতা দেখতে। কোথায় তাঁকে বসায়, কী দিয়ে খাতির করে ভেবে না পেয়ে গলদঘর্ম হলেন। নাম জিজ্ঞেস করলেও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন, ধাম জিজ্ঞেস করলে আমতা আমতা করেন।

কিন্তু একটু পরেই হেড মোদাররেস সাহেবের কেমন সন্দেহ হলো। স্কুল ইনেস্পেক্টরের মতো রুক্ষ মেজাজ নয়, ধমক দিয়ে কথা বলেন না। খাতাও দেখতে চাইলেন না, এ আবার কে বটে ?

তাই বলো! শাজাদপুরের উত্তর পাড়ার তালুকদার বাড়ির বড় ছেলে। বাপ মরার পরে গদিতে বসেছেন।

তা হুজুর কী মনে করে ? ওরে শরবৎ আন। পাখা আন। হারামজাদাগুলো গেল কোথায় ?

তালুকদার হাসলেন। বললেন অনর্থক কেন তালবেলেমদের হারামজাদা বলছেন মৌলবী সাহেব। ব্যস্ত হবেন না। আমি দু'দণ্ডের জন্যে এসেছি। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামবও না।

কেন ? কেন ? হাঁ হাঁ করে উঠলেন হেড মোদাররেস। খাতিরদারিতে কোনো কসুর হবে না। দয়া করে এসে পড়েছেন যখন, বসবেন না, সে কী কথা ?

আস্তে আস্তে শোনা গেল সব। তালুকদার সাহেব নিজের জন্যে পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছেন এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে। খাঁটি সোনা চান তিনি। রূপে যেন জাহাঙ্গীর বাদশার বেগম মেহেরুন্নিসাকেও হার মানাতে পারে সে মেয়ে। গরিব হোক ক্ষতি নেই। নিচু বংশ হোক পরোয়া নেই। ঘরে বৌ এলে স্বামীর পরিচয়ে পরিচিতা হবে সে। আছে তেমন ?

হেড মোদাররেস সাহেব জাফরান রাঙানো দাড়ি ঝাড়লেন বার কয়েক। মাথার টুপি হাপরের মতো উঠানামা করিয়ে শীতল করলেন চাঁদি। তারপর হাসিতে বিগলিত হয়ে বললেন, আছে, অবশ্যই আছে। দু'বেলা কোরান পড়ান তাকে তিনি। কিন্তু এত কথা তো ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে থাকলে হয় না! নামতে হবে, বসতে হবে, দশ দিক বুঝে শুনে কথা চালাতে হবে।

সেদিন মগরেবের আগেই মেয়ে দেখে পছন্দ করলেন তালুকদার সাহেব। সাতদিনের মাথায় বিয়ে হয়ে গেল। লোকে বলাবালি করল, বাপের ভাগ্য ছিল বটে! নইলে এত বড় ঘরে এ মেয়ে যায়!

ইদ্রিস আর তার ভাই বোনের বিয়েতে খরচ করল সাধ্যাতীত। একমাত্র বোন ছিল সে। চলে যেতেই বাড়িটা যেন খাঁখাঁ করতে লাগল।

মা ধরে বসলেন, এবারে তোরা বউ আন ঘরে। নইলে একবস্ত্রে আমি যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবো।

বড় ভাই বললেন, সংসারে মন দিয়েছি বলে মনটা তো সংসারী হয়ে যায় নি। আমি সেই ফকিরই আছি। আমার হুজুর বলেছেন, সংসার সাধনার পথে বাধা। বিয়ে আমি করবো না। মা যদি আত্মত্যাগী হন তো ইদ্রিসের একগুঁয়েমির জন্যেই হবেন।

অতএব ইদ্রিসকে রাজি হতে হল। পদ্মার ওপারে শিবালয়ের মেয়ে পছন্দ হলো। পছন্দ করে এলেন ওদের বাপের চাচাতো ভাই। দিন-ক্ষণ দেখে ইদ্রিস বড় ভাই আর চাচাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বিয়ে করতে। এখনো মনে আছে ইদ্রিসের বিয়ে করতে বেরুনোর সময় চৌকাঠে হোঁচট খেয়েছিল। মা বললেন, দাঁড়িয়ে যা। ইদ্রিস দাঁড়িয়ে গেল খানিকক্ষণ।

তারপর যে কাণ্ড হলো, ইদ্রিসের মনে পড়লে এখনো গায়ের রক্ত টগবগ করে ওঠে। সে কথা আর কোনদিন ভাবতে চায় না সে। বিয়ে করা নতুন বৌ ফেলে ভোর রাতে কারো মুখদর্শন পর্যন্ত না করে সোজা চলে এলো ডাঃ খানের কাছে।

তিনি তখন ডিস্পেনসারীতে কেবল এসে বসেছেন। সকাল বেলায় একঘণ্টা বিনি পয়সায় ওষুধ দেয়া হয়। ভিড়ে থইথই করছে এক ফালি বারান্দাটা। ইদ্রিস এসে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে দাঁড়াল।

কী ব্যাপার ? ঔষুধ কিনতে এলে ? প্রাকটিস কেমন ? আছো কেমন ? খুশিতে একের পর এক প্রশ্ন করে চললেন ডাঃ খান। এতদিন পরে কৃতি ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যেন আনন্দ আর ধরছে না।

ইদ্রিস বলল, থাকতে এসেছি স্যার।

থাকতে মানে ?

আপনার কাছে। যদি জায়গা দেন আপনার ডিস্পেন্সারীতে বসব। যদি যোগ্য মনে করেন কলেজে ছাত্র পড়ানোয় সাহায্য করব। দেশে আর ফিরে যাবো না।

ও।

না স্যার, আপনাকে একটা কিছু কথা দিতেই হবে।

আচ্ছা তুমি বোসো তো।

কথা না পেলে বসবো না স্যার।

কী পাগলামো করছ ? বোসো বোগী বিদেয় করে নি, পরে তোমার কথা শুনব। উঠেছ কোথায় ?

ধমক খেয়ে নরম হয়ে গিয়েছিল ইদ্রিস। বিনীত গলায় উত্তর করল, শেয়ালদা থেকে সোজা এখানে এসেছি।

বেশ করেছো। বাসায় যাও। গোসল করে কিছু খেয়ে নাও। দুপুরে কথা বলব।

ইদ্রিস বহুদিন পরে প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসায় গেল। দেখল, আরেক ছাত্র জায়গির রয়েছে সেখানে। তার সঙ্গে গল্প করল খানিক। ভেতর থেকে বিবি সাহেবা— তাকে আম্মা বলত

ইদ্রিস— সে এসেছে শুনেই নাস্তা পাঠিয়ে দিলেন। ইদ্রিসের মনে হলো অনেকদিন পরে নিজের বাড়িতে যেন ফিরে এসেছে সে।

সেদিন কলেজ ছিল ছুটি : ক্লাশ পড়ানো ছিল না প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের। দুপুরে ইদ্রিসকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসলেন তিনি। বললেন, হ্যাঁ এবার বলো, কী হয়েছে ?

পিড়াপিড়ি করেও একবর্ণ বার করতে পারলেন না প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ইদ্রিসের পেট থেকে। সে শুধু এক কথা বলে, আপনার এখানে জায়গা দিন, দেশে আর ফিরে যাবো না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, সে তুমি যতদিন খুশি থাকো এখানে। কিন্তু এভাবে নিজেকে নষ্ট করবে কেন ?

নষ্ট করবার কী আছে স্যার ? আপনার সঙ্গে প্র্যাকটিস করবো। কলেজ দেখবো।

ফাইন্যাল ইয়ারে যখন পড়ত ইদ্রিস, ডাঃ খান তাকে মাঝে মাঝে নতুন ছেলেদের ক্লাশ নিতে বলতেন। মন ঢেলে পড়াতো সে। আম্মা সাহেবার কাছে একদিন ইদ্রিস শুনেছে, স্যার বলেছেন, চমৎকার পড়ায় ছেলেটা। সেই প্রশংসার ভরসায় ইদ্রিস কলেজে সাহায্য করার প্রস্তাব দিচ্ছিল বারবার।

প্রিন্সিপাল সাহেবকে হঠাৎ বড় করুণ এবং অসহায় দেখালো। বললেন, তোমার কাছে লুকিয়ে রাখব না ইদ্রিস। কলেজের অবস্থা সুবিধের নয়। আমার বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালিয়েছে ডাঃ সেন আর ডাঃ চক্রবর্তীর দল। ছাত্র কমে গেছে আমার। এবার মাত্র পাঁচজন ভর্তি হয়েছে।

অবাক হয়ে গেল ইদ্রিস।

সে কী স্যার!

সেন আর চক্রবর্তীর দোষই বা কী দেব ? প্রিন্সিপ্যাল সাহেব খেদের ভঙ্গিতে হাতের পিঠ ঘষতে লাগলেন। দোষ আমাদেরই। আমার কলেজে হিন্দু ছেলে পড়তে আসবে এ আশা কোনদিন করিনি। ওদের জাতপ্রীতিটা বড় কঠিন। কিন্তু মুসলমান ছেলেরাও আজকাল কি বলে জানো ?

কী স্যার ?

বলে, হিন্দুর কলেজে পড়লে ডাক্তার হিসেবে নাম পোক্ত হয়। একে হোমিওপ্যাথি পড়ছি। তাও যদি মুসলমান প্রিন্সিপ্যালের কাছে পড়ি তো আর রোগী দেখে পেটের ভাত জুটাতে হবে না।

কিন্তু আমাদের সময়ে তো এরকম ছিল না স্যার ?

ছিল না, তখন দু'দিনের জন্য একটা উদ্দীপন এসেছিল মুসলমান সমাজে। নেতাই নেই তো সে উদ্দীপনা টিকিয়েই রাখবে কে আর তা কাজেই বা লাগাবে কে ? মুসলমান লেখাপড়া করে, টাকা করে, ভেতরে কিছু পার্টস থাকলে সমাজের কাজে তা না লাগিয়ে গভর্ণর ভাইসরয়ের নেকনজরে পড়বার জন্য ঝুলোঝুলি কামড়াকামড়ি লাগিয়ে দেয়। মেম্বার হয়, কাউন্সিলর হয়, করদ রাজ্যের দেওয়ান হয়। এই তো অবস্থা।

এত কথা ইদ্রিস আগে কখনো ভাবে নি, চোখেও পড়েনি তার। গুম হয়ে বসে থাকে সে। পায়ের নিচে যেন মাটি দেখতে পায় না। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলে চলেন, ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। দেখি কী হয় ? এদিকে আমার বইগুলোরও সেই এক দশা।

মুসলমানের বই পড়ে ডাক্তার হওয়া যায় কেউ যেন বিশ্বাসই করতে চায় না। কলকাতায় এতগুলো হোমিওপ্যাথির দোকান, কোন একটা দোকান আমার বই রাখতে রাজি হলো না। একবার ভেবেছিলাম সীজন টিকেট করে নিজেই সারা বাংলাদেশ ঘুরে বেড়াবো, বই ক্যানভাস করব। তা শরীরে কুলোয় না। ইচ্ছে পর্যন্তই, কিছু করতে পারলাম না।

এ যেন এক অন্য মানুষ। এ মানুষকে ইদ্রিস আগে দেখেনি। ভালো করে তাকিয়ে দেখে, সত্যি বুড়ো হয়ে গেছেন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব। মুখের চামড়া ঢিলে হয়ে এসেছে। দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে বলে চোখ কুঁচকে তাকান। হাত কাঁপে। গায়ের জামাটাও নুন ময়লা, এখানে ওখানে জ্যালজেলে হয়ে পড়েছে, একটু টান লাগলেই ছিঁড়ে যাবে। অথচ এই প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে সে দেখেছে ধবধবে ধোয়া দুধের মতো শাদা টুইলের শার্ট পরতে, তাতে রূপোর বোতাম লাগানো। তার অনুকরণে ইদ্রিসও টুইলের শাদা শার্ট পরতে শুরু করে দিয়েছিলো। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের চেহারা দিয়ে যেন আলো ঠিকরে বেরুতো। সে আলো আজ নেই। সারারাত জ্বলবার পর নিভে যাওয়া অপরিচ্ছন্ন সলতের মতো দেখাচ্ছে তাকে।

ইদ্রিস মাথা নিচু করে রইলো।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব শেষ অবধি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মুখে বিষণ্ন হাসি ফুটিয়ে বললেন, থেকে যাও আমার এখানেই। আমি তো কিছু দিতে পারবো না। সে সামর্থ্য নেই। আগের মতো খাবে-পরবে, বাড়ির ছেলের মতো থাকবে।

সেই আমার যথেষ্ট স্যার।

তবু বলি, তোমার মতো গুণী ছেলেকে এভাবে নষ্ট হতে আমি দেখতে পারবো না। সুযোগ পেলে সুযোগ ছেড়ো না, এই একটা উপদেশ তোমাকে দিই।

যে আঘাত ইদ্রিস পেয়েছে তার ফলে মনটাই যেন অসাড় হয়ে গেছে তার। নিজেকে নষ্ট করেছে কী করছে না সে উপলব্ধিটুকু ধরে এমন মন তার আর নেই।

সে বলল, আপনি যদি কখনো কোথাও সুযোগ করে দিতে পারেন তো না হয় যাবো। আমার এমন পয়সা নেই যে নিজে প্র্যাকটিসে নামতে পারি আর আপনার কাছে যদি না থাকতে পারি তো কলকাতাতেই থাকবো না।

থাকো কিছুদিন। দেখি কী হয়।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ঐ রকম মানুষ। দেখি কী হয় বলা যেন তার মুদ্রাদোষ। ইদ্রিস জানে, তাকে পেয়ে তিনি খুশিই হয়েছেন। এই ভেঙ্গে পড়ার মুহূর্তে তাঁর কাছে থাকতে পেরে সে নিজেও কৃতার্থ বোধ করছে। তাঁকে সে শুধু শিক্ষক হিসেবেই দেখেনি, দেখেছে পিতা হিসেবে, প্রাণদাতা হিসেবে, তার স্বপ্ন সফলের পেছনে সবল বাহু হিসেবে।

রয়ে গেল ইদ্রিস। সকালে উঠে কলেজে যায়। নিচের ক্লাশে পড়ায়। ছাত্র সাকুল্যে আটজন। ইদ্রিস প্রায় শূন্য ক্লাসঘরে বক্তৃতা করে এমন উচ্চকণ্ঠে যেন পঞ্চাশ একশ ছাত্রে গমগম করছে কক্ষ। প্রাণ ঢেলে পড়ায়। রাত জেগে পড়াশোনা করে পড়াশোনার জন্যে। ডাঃ সেন আর ডাঃ চক্রবর্তীর কলেজের ছাত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে এমন ছাত্র গড়ে তোলার কাজে যেন প্রাণপাত করবার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে সে। বিকেলে রুগী দেখে ডিস্পেন্সারীতে বসে। ডাঃ খানের দস্তুর মতো সেও পয়সা নেয় না, শুধু ঔষধের দাম ছাড়া।

সে আসার পর থেকে অনেকটা ভারমুক্ত হয়েছেন ডাঃ খান। এখন বেশ অবসর পেয়েছেন তিনি। ইদ্রিসের অনুরোধে বৃহৎ মেটেরিয়া মেডিকা লিখছেন বাড়িতে বসে।

কিন্তু বই লেখার মতো অবসর পেয়েও ডাঃ খান তেমন উৎসাহ পেতেন না বই লেখার। বিবেক তাকে দংশন করত। ইদ্রিস বিনি পয়সায় তাঁর কলেজ চালাচ্ছে, ডিস্পেন্সারী দেখছে। আর তিনি তার সুযোগ নেবেন এরকম ধাতের মানুষ তিনি নন। গোপনে গোপনে চেষ্টা করতেন কোথাও যদি একটা হিল্লে করে দেয়া যায় ইদ্রিসের। কিন্তু মুসলমান দরিদ্র একজন হোমিওপ্যাথ, হোক না সে যতই প্রতিভাবান, এই কলকাতায় তাঁর প্রতিষ্ঠা খুব সহজে সম্ভব নয়। অথচ একটা ডিস্পেন্সারী করে দেবেন ইদ্রিসকে এমন পয়সাও ডাঃ খানের নেই। যদি তা পারতেন তাহলে কী আনন্দ হতো তার সেই কথাটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বারবার স্মরণ করেন তিনি আর বিষণ্ন হন। এভাবেই চলছিল। তারপর গেল কাল এলেন হাজি জয়েনউদ্দিন। পতিদহের বড় তরফ। ভাইসরয় কাউন্সিলের মেম্বার, উত্তর বাংলার প্রতাপশালী জমিদার প্রৌঢ় হাজি জয়েনউদ্দিন।

তখন ডিস্পেন্সারীতে ছিল ইদ্রিস। হাজি সাহেব এসে ডাঃ খানের খোঁজ করলেন। ডাঃ খান তখন ছিলেন না। শুনে হাজি সাহেব বললেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যই আমি এ যাত্রা কলকাতা এসেছি। আজকেই দেখা হওয়া দরকার। সম্ভব হলে আজ রাতেই কিংবা কাল সকালে আমি পতিদহে ফিরে যাবো। তা আপনি কে ?

ইদ্রিস জবাব দিয়েছিল, ওঁর ছাত্র ছিলাম। ওঁর সঙ্গেই আছি।

বেশ, বেশ। তা একটা খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন ? বলবেন পতিদহের হাজি সাহেব এসেছেন।

সেকেণ্ড ইয়ারের একটা ছেলে তখন বসেছিল। সে বলল, আমি স্যারের বাসায় যাচ্ছি খবর দিতে।

হাজি সাহেবের নাম শুনে তখুনি এলেন ডাঃ খান। হাজি সাহেব তাঁকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে দু'জনে মোসাফা করলেন। কুশল বিনিময় হলো। সারাক্ষণ সসম্ভ্রমে পাশে দাঁড়িয়ে রইলো ইদ্রিস। সে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে অতিথি সাধারণ কেউ নন এবং প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তাঁকে অসীম শ্রদ্ধাভক্তি করেন।

হাজি সাহেব বললেন, সময় কম। কথাটা বলেই ফেলি। আমার একজন ডাক্তার দরকার।

ডাক্তার দিয়ে কী করবেন ?

লোকে ডাক্তার দিয়ে কী করায় শুনি, অ্যাঁ ?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব লজ্জিত হেসে বললেন, তাতো বটেই।

হ্যাঁ, একজন ডাক্তার আমাকে দিতে হবে। কাছারি বাড়িতে দাতব্য ডিস্পেন্সারী খুলেছি। জানেন তো, এলোপ্যাথি আমার দু'চোখের বিষ। আর হোমিওপ্যাথির ভক্ত হলাম তো আপনার জন্যেই। আপনাকে পতিদহে নিয়ে যাই এতবড় সৌভাগ্য আমার হবে না। তাছাড়া কলকাতায় আপনার কলেজ আছে, ছাত্র তৈরি করছেন; পতিদহে চেরিটেবল ডিস্পেন্সারীর মেডিক্যাল অফিসারের চেয়ে এ অনেক বড় কাজ। আপনার কোনো পাশ করা ভালো চরিত্রবান ছাত্র থাকলে তাকে সাথে করেই নিয়ে যেতাম।

একই সঙ্গে দু'জনের চোখ পড়ল দু'জনের দিকে। ইদ্রিস আর প্রিন্সিপ্যাল খান। ইদ্রিস চোখ নামিয়ে নিয়ে সরে গেল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ভ্রুকুঞ্চিত করে ভাবতে লাগলেন।

কী, আছে তেমন কেউ ?

প্রশ্ন করলেন হাজি সাহেব।

ভাবছি।

সাথে করেই নিয়ে যাবো। কাল থেকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট। থাকা-খাওয়া ফ্রি। মাইনে দেবো চল্লিশ টাকা।

হুঁ।

অবশ্য পতিদহ বড্ড ব্যাকওয়ার্ড জায়গা। সে কথাটাও পরিষ্কার বলা ভালো। সেই জন্যেই চল্লিশ টাকা দিচ্ছি। ডাক্তার হলেই শুধু চলবে না, দেশ গাঁয়ের মানুষকে ভালোবাসে, আল্লা-রসুলের পাবন্দ এমন ছেলে চাই। আর জানেন তো, দিতে আমি কার্পণ্য করি না। নিজের ছেলেপুলে নেই। এই নিয়েই থাকি। পতিদহে গেলেই যে জীবন নষ্ট হয়ে যাবে এমন নয়। আমিও তার ভবিষ্যৎ দেখব।

সে আমি জানি। জানি বলেই ভাবছি, কাকে দেওয়া যায়।

হাজি সাহেব বসে বসে তাঁর দাতব্য ডিস্পেন্সারীর বর্ণনা দিতে লাগলেন। বললেন, ওষুধপত্তর যা দরকার হবে তারও একটা লিস্ট চাই। সাজসরঞ্জামেরও।

ডাঃ খান ইদ্রিসকে ডাকলেন। বললেন, পতিদহে যাবে ?

ইদ্রিস কোনো উত্তর দিল না। এ রকম আকস্মিক প্রশ্নের উত্তর চট্ করে তার মাথায় এলো না। যখন বুঝল হাজি সাহেবও তাকিয়ে আছেন তার দিকে, তখন উত্তর না দেয়াটা অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে বিবেচনায় সে বলল, আপনি বললে নিশ্চয়ই যাবো স্যার।

তখন ডাঃ খান হাজি সাহেবকে বললেন, ওর সামনে বলেই বলছি না । আমার কলেজ থেকে এরকম ছেলে বেরোয়নি। ওর চেয়ে যোগ্য আর কাউকে দেখি না। শুধু গরিব বলে এতদিন কিছু করতে পারে নি, আমার এখানেই পড়ে আছে। আপনি সুযোগ দিলে ওর একটা বড় উপকার হয়।

হাজি সাহেব তখন ইদ্রিসের নাম পরিচয় জিগ্যেস করলেন। তারপর হাজি সাহেব ডাঃ খানকে বললেন, ওষুধপত্র যা যা লাগে আর সাজ-সরঞ্জাম আপনিই দিয়ে দিন।

কিন্তু আজ রাতের ভেতরে তো সব তৈরি হয়ে উঠবে না। তাছাড়া কলকাতায় এসেছেন আমার গরিবখানায় দাওয়াত কবুল করবেন না, সে হতেই পারে না।

বেশ তো। কাল সকালের মেলে যাতে রওয়ানা হতে পারি সে রকম ব্যবস্থা করে নিন। আমি এখন বেরুচ্ছি। ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।

সেখানে গেলে কি আর রাতে আমার গরিবখানায় আসতে পারবেন ?

খুব পারবো। রাত দশটা হোক এগারোটা হোক আসবোই। 'আর ডাক্তার–' ইদ্রিসকে লক্ষ্য করে হাজি সাহেব বললেন, 'আপনি তৈরি হয়ে নিন। যা যা লাগে সব দেখে শুনে নিন। এখন তো আপনি আমারই লোক। ভালো কথা, বিশটা টাকা রেখে যাচ্ছি। নিজের কিছু কেনাকাটা থাকলে এ থেকে করে নেবেন।'

আপত্তি করাবার আগেই দশ টাকার নোট দুটো তিনি গুঁজে দিলেন ইদ্রিসের হাতে।

তিনি চলে গেলে ইদ্রিস ডাঃ খানকে বলল, স্যার !

কী ?

কিছু বলতে পারল না ইদ্রিস। অনেকক্ষণ পরে শুধু উচ্চারণ করল, কিছু না স্যার।

হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফরমের শেষ মাথায় চলে গিয়েছিল ইদ্রিস। সেখানে কাঠের ফলকে বড় বড় করে নাগরী, বাংলা আর ইংরেজিতে লেখা 'তিস্তা'। অনেকক্ষণ যেন বোধগম্য হলো না, এ কোথায় আছে সে ? তিন ভাষাতেই লেখাটার আলাদা আলাদা অক্ষর পড়ল সে। তারপর সম্মুখে তাকিয়ে দেখল অন্ধকারে মাটির ওপরে লাল একটা বড় তারা যেন নেমে এসেছে। তিস্তা ব্রীজের ওপর জ্বলছে লাল বাতি।

হাওয়া বইছে সোঁ সোঁ করে। একটু ঠাণ্ডা করছে। মাথার চাঁদিতে হাত দিয়ে দেখল হিমে বরফ হয়ে আছে চুলগুলো। সে ফিরল।

প্ল্যাটফরমের এক কোণায় বেহারি কুলিরা বসে জটলা করছে। পিঠের সঙ্গে ভাঁজ করা হাঁটু গামছা দিয়ে বাঁধা। চমৎকার একটা ছবি বিশ্রামের । একজন হেড়ে গলায় চোখ বুজে গান করছে। বাকি সবাই শুনছে তন্ময় হয়ে । তার সে উচ্চ কণ্ঠ বহুদূর পর্যন্ত শোনা যেতে লাগল।

সব কিছু কেমন আপন মনে হতে লাগল ইদ্রিসের।

সে দূরে দাঁড়িয়ে গান শুনলো খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ দেখল হাজি সাহেবের হুকুমবরদার যেন অন্ধকার ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কী ব্যাপার ?

রান্না হয়ে গেছে। হুজুর আপনার জন্যে বসে আছেন।

তাই তো বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

সেই সময়ে একটা কুকুর কেঁদে উঠল কোথাও। গা-টা শিরশির করে উঠল তার। অকারণে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বিয়ে করতে বেরুবার সময় চৌকাঠে হোঁচট খেয়েছিল সে। অর্থহীন এই মনে পড়া।

দূর, দূর।

কিছু বললেন ?

হুকুমবড়দার প্রশ্ন করল।

না, কিছু না। চলো।

এসে দেখে, হাজি সাহেব জায়নামাজ পেতে নামাজ পড়ছেন। পাশে খাবার সাজানো। ধোঁয়া উঠছে গরম ভাত থেকে। সে বলল, এখানে পানি কোথায় ? আমিও নামাজ পড়ে নি।

সালাম ফিরিয়ে হাজি সাহেব বললেন, কোথায় ছিলেন ? আপনাকে না দেখে জামাতের জন্যে আর দেরি করলাম না।

ভারী লজ্জিত হলো ইদ্রিস। সে এককোণে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে শুরু করে দিল।

।।২।।

ভোরে উঠে দেখে প্ল্যাটফরমে আট বেহারার পালকি দাঁড়িয়ে আছে। জামাতে নামাজ আদায় করে নাশ্‌তা করে নিল ওরা । হাজি সাহেব বললেন, কুড়িগ্রাম পৌঁছে যাবো বিকেল চারটে নাগাদ। পতিদহে পৌঁছতে রাত দুপুর হয়ে যাবে।

ইদ্রিস শুনেছিল পতিদহ অনেক দূরে। ব্যাকওয়ার্ড প্লেস যাকে হাজি সাহেব বলেছিলেন। এখন তা হাড়ে হাড়ে টের পেল সে।

স্টেশনের ওপাশে এসে সে দেখল লাইট রেলওয়ের যাত্রীরা জটলা করছে। খেলনার মতো খোলা বগি আর এই এতটুকুন ইঞ্জিনটা দাঁড়িয়ে আছে।

এ গাড়ি কোথায় যায় ?

কুড়িগ্রাম।

অবাক হলো ইদ্রিস। কুড়িগ্রাম যায়! তবে যে হাজি সাহেব পালকি আনিয়েছেন! ব্যাপারটাই কেমন গোলমেল মনে হলো তার। একজন যাত্রীকে আবার শুধালো, কুড়িগ্রাম যায় এ গাড়ি?

হ্যাঁ।

জিগ্যেস করে জানতে পারলো, যাত্রী আর কিছু হলেই গাড়ি ছাড়বে। কুড়িগ্রাম পৌঁছে যাবে দুপুর নাগাদ।

দ্রুত পায়ে হাজি সাহেবের কাছে এসে ইদ্রিস বলল, আমরা ট্রেনে যাচ্ছি না কেন?

কোন্‌ ট্রেন ? ঐ যে খোলা বগি, ওতে ?

অবজ্ঞা এবং অনুকম্পা মেশানো গলায় হাজি সাহেব পাল্‌টা প্রশ্ন করলেন।

জি । ওরা বলছে এ গাড়ি নাকি দুপুর নাগাদ কুড়িগ্রাম পৌঁছে যাবে।

তা যেতে পারে।

তাহলে পালকিতে খামোকা দেরি করে লাভ কী ?

হেসে ফেললেন হাজি সাহেব। বললেন, ডাক্তার, সময়টাই শুধু দেখলেন, আর কিছু চোখে পড়ল না আপনার ?

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ইদ্রিস।

হাজি সাহেব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন হঠাৎ। বললেন, ঐ খোলা গাড়িতে যেতে বলেন আমাকে ?

কেন, দোষ কী ?

কী, বলছেন কী আপনি ?

নিজেকে সংযত করে ফেললেন পতিদহের বড় তরফ হাজি জয়েনউদ্দীন, ভাইসরয় কাউন্সিলের মেয়র। আবার হাসলেন। পিঠে একটা মৃদু থাবড়া বসিয়ে দিলেন ইদ্রিসের।

বললেন, সবার পক্ষে ও গাড়িতে সোয়ার হওয়া সাজে না। হলোই বা দু' ঘণ্টায় পৌঁছে যাবো। তাতে কী ? খোলা বগিতে কাঠের বেঞ্চে বসে সাধারণ মানুষের সাথে গা ডলতে ডলতে তাড়াতাড়ি পৌঁছুনোর বদলে পালকিতে তিনদিন লাগলেও তা ভালো। বুঝেছেন ডাক্তার ?

যুক্তিটা কিছুতেই বুঝতে পারল না ইদ্রিস। কোথায় যেন খট্‌কা লাগছে তার। কলকাতায় মানুষটাকে যেমন মনে হয়েছিল ঠিক তেমনটি মনে হলো না এখন। কৃষক নেতা ফজলুল হকের সঙ্গে ওঠবোস করেন, গাঁয়ের লোকের সুবিধের জন্যে দাতব্য ডিস্পেন্সারি খুলেছেন, তার মুখে এ কথা শুনতে হবে এ আশা করেনি ইদ্রিস।

ইদ্রিসের একরোখা স্বভাবটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সে বলল, তাই বলে সুবিধের কথা ভাববেন না ?

কিসের সুবিধে ?

তাড়াতাড়ি পৌঁছুচ্ছেন। তাছাড়া মিটার গেজ ব্রড গেজের গাড়িতে তো চড়েন না এমন নয়। লাইট রেলওয়েতে আপার ক্লাশ নেই দেখছেন না।

ঘাড় বাঁকা করে দাঁড়িয়ে রইল ইদ্রিস।

হাজি সাহেব বললেন, কী তর্কই করবেন, না পাল্‌কিতে উঠবেন ? অনেকটা পথ যেতে হবে।

ইদ্রিস ভাবলো, কাজটা বোধ হয় সে ভালো করছে না। যার চাকরি করতে যাচ্ছে তার সঙ্গে তর্ক করাটা অন্যায় হচ্ছে। কী দরকার তার এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে। সে যখন পতিদহে যাবে বলেই কলকাতা থেকে পা বাড়িয়েছে, তখন আর পালকি বা লাইট রেলওয়ের প্রশ্ন তোলা কেন ? তার পৌঁছুনো দিয়ে কথা।

তবু মনের মধ্যে কেমন খচখচ করতে লাগল। হাজি সাহেবও গম্ভীর হয়ে গেছেন। তার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখল মুখটা থমথম করছে বোশেখ মাসের হঠাৎ মেঘের মতো।

হাজি সাহেবের পেছন পেছন সেও পালকিতে গিয়ে উঠল। পালকিতে চড়ার অভ্যেস নেই। উঠতে গিয়েই মাথায় একটা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল দরোজার সঙ্গে। কপালে হাত বুলোতে বুলোতে ইদ্রিস এক পাশে পা ভাঁজ করে বসলো।

দুলে উঠল পালকিটা। তারপর আট বেহারার হুমহাম কোরাসের তালে তালে চলতে লাগল কুড়িগ্রামের দিকে।

এই ইঞ্জিনের পানি খাবার কল পেরুলো, সিগন্যাল পেরুলো। চৌবাচ্চার পাশ দিয়ে প্রাইমারি স্কুলের সমুখ দিয়ে, গাঁয়ের ভেতর দিয়ে পাল্‌কি গিয়ে মাঠে পড়ল।

ভোরের রাঙা আলো আস্তে আস্তে সোনার মতো হয়ে গেল। উজ্জ্বল সূর্যালোকে খেতখামার যেন হাসতে লেগেছে। ঘাসের ওপর, ফসলের ডগায়, পথের পাশে বুনো ফুল আর কন্টিকারির ঝোপের মাথায় শিশির দেখা যাচ্ছে এখনো। একটু পরে আর থাকবে না। রোদ টেনে নেবে সব সিক্ততা। ইদ্রিসের মনে পড়ল এই তো সেদিনও গাঁয়ের বাড়িতে শিশির ভেজা মাঠে খালি পায়ে হেঁটেছে সে। খালি পায়ে ভোরের শিশির লাগলে স্বাস্থ্য ভালো হয়। মনটা প্রসন্ন হয়ে এলো ইদ্রিসের। একটু আগে হাজি সাহেবের সঙ্গে তর্ক করে মনটা অস্বস্তিতে ভরে ছিল। শিশিরের মতোই সে অস্বস্তিটুকু একেবারে উবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

ইদ্রিস বলল, চমৎকার দেশ!

হাজি সাহেব গলা সাফ করে বললেন, পছন্দ হয়েছে ?

জি, হ্যাঁ।

জীবনে কত দেশ ঘুরলাম ডাক্তার, রংপুরের কাছে কোনটাই লাগে না। বিশেষ করে তিস্তা থেকে এই রাস্তাটা। পতিদহে গেলে আর ফিরে আসতে চাইবেন না আপনি।

পরিবেশ-শোভন হাসি ফুটে উঠল ইদ্রিসের ঠোঁটে।

হ্যাঁ, দেখে নেবেন। আমার জন্মভূমি বলে বলছি না, দেশ বিদেশ থেকে কতজন পতিদহে আমার গরিবখানায় এসেছেন। যাবার সময় সবাই বলে গেছেন, পতিদহের তুলনা হয় না।

সেই হাসিটা বিলম্বিত হলো ইদ্রিসের ঠোঁটে। সে ভাবলো তার নিজের গাঁয়ের কথা। মাঠের কথা। বিরাট বিলের কথা। কালো অতল পানি তার। আড়াআড়ি পাড়ি দিতে সাহস হয়নি কোনো দিন কারো। একবার সে কয়েক বন্ধুর সঙ্গে কী করে যেন গিয়ে পড়েছিল মাঝ বিলে। লোকে বলেছিল, জ্বীনে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। মা কত দোয়া পড়ে ঝাড়ফুঁক করে দিয়েছিলেন।

ঝমঝম একটা শব্দে চমক ভাঙ্গলো ইদ্রিসের। বাইরে তাকিয়ে দেখে ধোঁয়া উড়িয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে মার্টিন কোম্পানির গাড়ি চলেছে কুড়িগ্রামের দিকে। খোলা বগিতে সার সার কালো মাথা দেখা যাচ্ছে। ছবির মতো মনে হচ্ছে। পৃথিবীতে কত সুন্দর দৃশ্য আছে দেখার, তার কিছুই সে দেখেনি।

পর মুহূর্তেই সচকিত হয়ে উঠল ইদ্রিস। এই খোলা গাড়ি আবার সেই তর্কের তিক্ত স্মৃতিটা ফিরিয়ে এনেছে। আড়চোখে সে তাকাল হাজি সাহেবের দিকে।

হাজি সাহেব বললেন, ডাক্তার, এবার দিল্লিতে গিয়ে কথা প্রায় পাকা করে এসেছি।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ইদ্রিস।

হাসলেন হাজি সাহেব। বললেন, এ লাইট রেলওয়ে আর বেশি দিন নেই। মিটার গেজ বসলো বলে। তখন তিস্তা কুড়িগ্রাম করবেন ট্রেনে দু'বেলা। খোদ ভাইসরয়ের কানে তুলে দিয়েছি। জানেন তো ইংরেজের জাত সে এক আজব চীজ। কথা মনে ধরল তো কাজের হুকুম সঙ্গে সঙ্গে। হুকুম হলো তো কাজ হয়ে গেল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে। এই জন্যেই সান নেভার সেটস ইন ব্রিটিশ এম্পায়ার। আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে ইংরেজের কাছ থেকে।

আপন মনে কথা বলে চলেছেন হাজি জয়েনউদ্দিন। তার কিছু কানে যাচ্ছে ইদ্রিসের, কিছু যাচ্ছে না। সে ভাবছে তার ভবিষ্যতের কথা। কোথায় চলেছে, কী হবে, এই সব সাত সতেরো। ছেলেবেলা থেকেই মনের মধ্যে বড় হওয়ার সাধ, কিন্তু কী করলে বড় হওয়া যায় শুধু সেইটাই জানা নেই।

পাশ করবার পর গ্রামে ফিরে যাবার সময় প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেছিলেন, কলকাতায় থাকলেই বড় হওয়া যায় না। যে বড় হবার গাঁয়ে থেকেও হতে পারে।

কথাটা নতুন করে মনে পড়ল ইদ্রিসের। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব নিজে যখন তাকে পতিদহে পাঠাচ্ছেন তখন তার আর দ্বিধা করবার কী আছে? দেখাই যাক না, ভাগ্য তাকে আর কতদূরে নিয়ে যায়, আর কত ভেল্‌কি দেখাতে পারে ভাগ্য সেইটে এবার পরখ করবে ইদ্রিস।

ঢুলুনিতে সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছিল। এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল ইদ্রিস। হাজি সাহেব তার অনেক আগেই কাত্‌ হয়ে পড়েছেন। মিহি সুরে নাক ডাকছে তার এক পয়সার বাঁশির মতো।

ইদ্রিসের আর এখন রাগ হয় না, হাসি পায়। ট্রেন ফেলে পালকি চড়াটা পরম একটা পরিহাসের বিষয় মনে হয় তার। একটু যেন করুণাও হয় তার। সেই করুণা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

ঘুম ভাংগে রাজার হাটের কাছে এসে। ঈদগাঁর পাশে বড় বড় ক'টা কদম গাছ। তারই ছায়ায় পালকি নামানো হয়েছে। বিশ্রাম নিচ্ছে বেহায়ারা। রান্না চড়েছে।

অনেকক্ষণ পালকিতে বসে থেকে পা ধরে গিয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর পর্যন্ত বেড়িয়ে এলো সে। ঈদগাঁ পেরিয়ে টিনের চালায় মাদ্রাসা। মাদ্রাসার পেছনে আম বন। আম বনের তলা দিয়ে ছায়াঢাকা পথ গাঁয়ের দিকে চলে গেছে। পথের পাশে মুদি দোকান। বাতাসা কিনছে পেট বড় ন্যাংটো কয়েকটা ছেলে। একজনের হাতে একটা শালুক ধরা। শালুকটা নেতিয়ে পড়েছে।

এই ছেলে তোর নাম কী ?

ছেলেটা চমকে ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে তার দিকে তাকায়। তারপর ঝেড়ে দৌড় দেয় গাঁয়ের দিকে। চিৎকার করে ডাকে— চাচা গো। হা হা করে হাসে ইদ্রিস।

ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে ছেলেটার হয়েছে কী ?

আরো খানিকটা এগোয়। দেখে জলার ওপরে মেলা শালুক ফুটে রয়েছে। ছেলেরা মাছ ধরছে গামছা পেতে। খিলখিল করে হাসছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় কালো কালো মোটা কতগুলো শোল হুটোপাটি করছে জলায়।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের মাছধরা দেখল ইদ্রিস। মাছধরা তো নয় এ যেন পানি ছোঁড়াছুঁড়ির মহোৎসব। আহা, ভারী ঠাণ্ডা নিশ্চয়ই জলার পানি। সবুজ লালা ঘাসে হেলে দুলে নাচছে গলা পর্যন্ত সে পানিতে ডুবে। ইদ্রিস যদি গোসল করতে পারত, ভারী ভালো লাগত। হুস হুস হুস হুস শব্দ ওঠে। ছেলেরা কান খাড়া করে দাঁড়ায়। হাতের গামছা হাতে থেকে যায় তাদের। তারপর একসঙ্গে ছুটতে থাকে সবাই একদিকে।

ঐ তো মার্টিন কোম্পানির ট্রেন দেখা যাচ্ছে। কুড়িগ্রাম থেকে ফিরে এলো যাত্রী নিয়ে। হাসি পায় ইদ্রিসের। দ্যাখো কাণ্ড, তারা এখ'না রাজার হাটই ছাড়াতে পারল না, আর ওরা কুড়িগ্রাম ছুঁয়ে ফের তিস্তায় চলেছে। হাজি জয়েনউদ্দিনের মাথায় বোধ করি ছিট আছে।

কতদিন এ রকম প্রশান্ত স্বচ্ছন্দ মন নিয়ে ইদ্রিস মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াতে পারে নি। আজ এত ভালো লাগছে যে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে এইখানে জলার ধারে হেলে পড়া বাবলার ছায়ায় সারাজীবন বসে থাকে সে।

কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে যাবে। তাকে আবার খোঁজাখুঁজি করতে লোক বেরুবে। পা চালিয়ে ফিরতি পথ ধরে ইদ্রিস।

মাঠের পারে গাঁয়ের পথ যেখানে আরেক গাঁয়ের দিকে এঁকেবেঁকে চলে গেছে সেখানে একটা জটলা চোখে পড়ে ইদ্রিসের। কান্নার শব্দও যেন শোনা যায়। ব্যাপার কি ?

কাছে এসে দেখে কচি বৌ নিয়ে ঝাঁকড়া চুল বর দাঁড়িয়ে আছে মাথা হেঁট করে। তাদের ঘিরে বুড়োবুড়ি আত্মীয়স্বজন মরা কান্না করছে। বড্ড দূরে বিয়ে দিলে বুঝি ?

না গো না। ঐ যে দুটো অশ্বত্থ গাছ ঐ হোথায় দেখা যায়। তারপরে পাথার। পাথারের পরে শিমূলকলি গ্রাম। সেই গ্রামে মেয়ে বিক্রি করে কপাল চাপড়াচ্ছি।

মেয়ে বিক্রি কী রকম ? চোখ কপালে তোলে ইদ্রিস। তাও জানো না। এ দেশে মেয়ের বিয়েকে মেয়ে বিক্রি করা বলে। মাইয়া বেচেয়া খাইছং। অদ্ভুত তো। গাঁয়ের পিঠে গাঁয়ে বিয়ে দিয়েছ, এত কাঁদতে আছে ? বলেন কী। গাঁয়ের পিঠে গাঁ বই কী! ভিন্ গাঁ মানেই বিদেশ। বৈদ্যাশে মাইয়া চলি যায়, বুক ফেটে কান্না আসে না ?

অবাক হয়ে যায় ইদ্রিস। দু'ক্রোশ দূরও হবে না, একে বলে দূর বিদেশ। আসলে বোধ হয় বাপ মার এক মেয়ে গো! না তাও না। আর পাঁচ মাইয়া আছে ঘরৎ।

হাজি সাহেব তাকে দেখেই বললেন, খুব ঘুরে বেড়াচ্ছেন! কেমন ঠিক বলি নি, রংপুরের মতো দেশ হয় না।

জি, তাই দেখছি। খুব ভালো লাগছে।

এই যে এলেন এদেশে, আর যেতে মন চাইবে না।

দেখি!

আমি বলি, দুদিন পরে পরিবার নিয়ে আসুন, মাকে নিয়ে আসুন। আমি জমি করে দেব, ঘর তুলে দেব, রংপুরের লোক আপনাকে মাথায় করে রাখবে।

ইদ্রিসের মন রঙিন হয়ে উঠে মুহূর্তে। তার নিজের বাড়ি হবে, সংসার হবে। এই রকম জলার পারে শালুক ফুটে থাকবে। কদমের মিষ্টি ঘ্রাণে বাতাস ম'ম' করবে। খুব ভালো হয়। একটা বাইসাইকেল কিনবে ইদ্রিস। দূর দূরান্তে রোগী দেখতে যাবে। কলকাতায় বাইসাইকেল দেখত আর তৃষিতের মতো চেয়ে থাকত ইদ্রিস। আহা, অমন যদি তার একখানা থাকত! ছেলেবেলায় চৌবাড়িতে কে একজন বাইসাইকেল চড়ে এসেছিল। সে কী কাণ্ড! দল বেঁধে ক্লাশ ভেঙে ছেলের দল গিয়েছিল অদ্ভুত সেই দুই চাকার যন্ত্র দেখতে। মানুষটা কী যাদু জানে? এমনি দাঁড় করিয়ে রাখো, কাৎ হয়ে ধপাস করে পড়ে যাবে। মানুষটা উঠলো কী তেজি একটা খরগোশের মতে বাঁই বাঁই করে ছুটতে লাগল। তাজ্জবই বটে। ছেলেরা গবেষণা করে, বাঁই বাঁই করে ছোটে বলেই বাইসাইকেল নাম। কে একজন বলে, ধ্যাৎ, সাইকেলে আবার শব্দ হয় নাকি। আসলে এটা বাইছাগল। দেখছিস না ছাগলের মতো দুটো শিং। ইদ্রিসের মনে পড়ে হ্যাণ্ডেলের কালো দুটো গ্রীপ দেখে সেদিন তারও বিশ্বাস হয়েছিল এ নিশ্চয়ই কলের ছাগল।

খেয়ে দেয়ে জোহরের নামাজ পড়ে আবার পালকিতে উঠল ওরা। হুমহাম কোরাসের তালে তালে পালকি চলল রাজার হাট ছাড়িয়ে। এই যায় পলাশবারী, এই গেল শিমুলকলি, এই এলাম কালীরবাজার। হুমহাম হুমহাম। জোরে চলো ভাই জোরে চলো। পা চালিয়ে চলো। বেলাবেলি কুড়িগ্রামে পৌছুতে হবে। নইলে খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

ইদ্রিস বলল, আজ এক ঘটনা দেখলাম হাজি সাহেব।

কী ডাক্তার ?

রাজারহাটে মেয়ে বিদায় দিতে এসে বাপ মা আর আত্মীয়স্বজনের মরা কান্নার কথা বলল ইদ্রিস।

এই ব্যাপার ?

পিঠেপিঠি গাঁ। এত কান্নার কী আছে ?

হাজি সাহেবের গলাটা হঠাৎ ভারী নরোম শোনাল। তিনি বললেন, আমার এখানকার মানুষগুলো ভারী সরল ডাক্তার। নিজের গাঁ ছাড়া কিছু বোঝে না। গাঁয়ের বাইরে এক পা ফেলে না। গাঁয়ের বাইরে জীবনে দু'চার বারের বেশি এরা যায় না। বুঝলেন ?

ইদ্রিসের বিস্ময় তবু যায় না। এ যুগে এরকম মানুষও হয় নাকি। হাজি সাহেব বলে চললেন, সারা বাংলায় এমন সরল  এমন ঘরকুনো মানুষ আপনি পাবেন না ডাক্তার। বিদেশীকেও ভারী ভয় করে ওরা। এই যে দক্ষিণ থেকে এলেন আপনি, আপনাকে ওরা বলবে ভাটির মানুষ— ভাটিয়া। ভাটিয়াকে বড় ভয় করে রংপুরের লোক। ভাবে, তাদের ঠকিয়ে-লুটপাট করতে এসেছি ভাটি থেকে। আমার মনে হয় কী জানেন, এককালে দক্ষিণ থেকে ডাকাতের দল আসতো এ দেশে। এখানকার ফসল ভালো। বীজ বুনলেই সোনা ফলে। দক্ষিণের মতো কষ্ট করে ফসল ফলাতে হয় না। তাই দক্ষিণের মানুষ যে লোভ করবে এতে আর আশ্চর্য কী ?

হুঁ তাতো বটেই।

ভালো কথা মনে পড়ল। হাজি সাহেব একটু ঘন হয়ে বসলেন। গলা নামিয়ে বললেন, আপনাকে একটু সাবধানে চলতে হবে।

মানে ?

না, না, সাবধান মানে প্রাণের ভয়ে সাবধান হতে বলছি না। ঐ যে বললাম ভাটির মানুষকে এরা ভয় করে, অবিশ্বাস করে। আপনাকে একটু বুঝে সমঝে চলতে হবে। ভয়টা ভাঙ্গাতে হবে। অবিশ্বাস দূর করতে হবে। ওদের মন জয় করতে হবে। একবার যদি ওদের মনের নাগাল পেয়ে যান, একবার যদি আপনাকে ওরা নিজদের বলে ভাবতে পারে, তাহলে দেখবেন আপনার জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে ওরা গররাজি হবে না।

ইদ্রিস চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। এতক্ষণ মন বড় চঞ্চল হয়েছিল পতিদহে পৌঁছুনোর জন্যে। মনে মনে সে ছবি দেখছিল কেমন হবে তার ডিস্পেন্সারী, কী ভাবে সাজাবে। সে দেখছিল, ঐতো রোগীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, সে ওষুধ দিচ্ছে, ঐতো সে ব্যাগ ঝুলিয়ে দূরে যাচ্ছে রোগী দেখতে। এখন, হাজি সাহেবের এই কথার পর, ছবিটা যেন মুছে গেল। একটা উদ্বেগ এসে সব ঢেকে দিয়ে গেল। মনের মধ্যে কেমন শিরশির করতে লাগল তার। মনে হলো, হঠাৎ তার কাঁধে এক গুরুভার চেপে বসেছে। সে বাইরের চলমান দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে বসে রইল।

তার সে ভাব গোপন রইলো না হাজি সাহেবের কাছে। তিনি হেসে বললেন, আরে ডাক্তার যে একেবারে ভয় পেয়ে গেলেন।

ম্লান হাসলো ইদ্রিস। বলল, কই না।

ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি রয়েছি কী করতে! ভাটির লোক হলেই যে বাঘ ভালুক হবে তা নয়। ওরা হচ্ছে শিশুর মতো। একটু আদর চায়, আন্তরিকতা চায়। ব্যাস, দেখবেন আপনার পায়ে পায়ে ঘুরছে পতিদহের মানুষ।

হাজি সাহেব যথাসম্ভব চেষ্টা করেন ইদ্রিসের মনের মেঘ দূর করতে। বলেন, দোষ এদেশের লোকেরই বা কী দেব। তাহলে এক গল্প বলি শুনুন।

ইদ্রিস বাইরের দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে আনে।

হাজি সাহেব বলতে থাকেন, শুনুন তাহলে। নাম ধাম বলব না। দু'দিন বাদে নিজেই বুঝতে পারবেন কার কথা বলছি। যার কথা হচ্ছে সে এদেশেই আছে। বিরাট জমিজমা সহায় সম্পত্তি, টাউনে চার পাঁচখানা পাকা বাড়ির মালিক। বাড়ি ঢাকায়। আজ থেকে বছর তিরিশেক আগে এসে পড়ে কুড়িগ্রামে। লোকটা ম্যাজিক জানতো কিছু কিছু। দলবল কিছুই নেই। একাই খেলা দেখায়। খেলা দেখাতে এলো এ অঞ্চলে। হাটে হাটে যায়, ম্যাজিক দেখায়। লোকে হাঁ করে দেখে আর ভাবে না জানি কত বড় দৈবশক্তি আছে তার। বলছিলাম না, আমার দেশের মানুষের মতো সরল মানুষ আর হয় না। সেই ভদ্রলোক ম্যাজিক দেখিয়ে নিরীহ লোকজনের ওপর এমন প্রভাব করে ফেলল যে, দু'দিন বাদে তারা সব তার কথায় ওঠবোস করতে লাগল। এই করে, বলব কী ডাক্তার, পাঁচ টাকা বিঘে দরেও জমি হাতাতে লাগল সে। অপুত্রক যারা তারা জমি লিখে দিয়ে যেতে লাগল সেই ম্যাজিশিয়ানের নামে।

ম্যাজিশিয়ানই বটে! ইদ্রিস বলল। নইলে লোকজন এত বোকাও হয়! কিচ্ছু বুঝতে পারে না?

এই হচ্ছে আমার দেশের মানুষ। হাজি সাহেব খেদের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন। তারপর শুনুন। বছর পাঁচেকের মধ্যে এ অঞ্চলের মধ্যে কেউকেটা হয়ে পড়ল লোকটা। এখন পাটের কারবার করে। গঙ্গার পাড়ে নিজের গুদাম করেছে কয়েকটা। লাখপতি। আর যাদের জমি যাদের টাকা ঠকিয়ে নিয়েছিল তারা না খেয়ে মরছে। বলুন, এরপরও ভাটির মানুষকে বিশ্বাস করবে এরা? এতো একটা শুনলেন। এ রকম কত ঘটনা হয়েছে খাস রংপুরে, গাইবান্ধায়, নীলফামারীতে।

হঠাৎ ইদ্রিস প্রশ্ন করে বসল, আমিও তো ভাটির লোক। আমাকে বিশ্বাস করলেন কী করে?

হাতের পাঁচ আঙুল কি আর সমান হয় ডাক্তার?

সমান না হলেও পাঁচটাই আঙুল তো বটে। আমিও যে ওরকম হবো না তার গ্যারান্টি কী?

হাজি সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, না, মানুষের গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না। এ কী আর ওয়েস্ট এণ্ড কোম্পানির ঘড়ি?

বলেই হা হা করে হেসে উঠলেন হাজি জয়েনউদ্দিন। সে হাসির সঙ্গে অস্বস্তি বোধ করল ইদ্রিস। হাজি সাহেব বললেন, প্রিন্সিপ্যাল খান লোক চিনতে ভুল করেন না। তিনি যখন আপনার নাম করেছেন, তখনি জানি মনের মত লোক পেয়েছি আমি। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বাংলার গৌরব, মুসলমান সমাজের জন্যে তার যে দান তা আজ কারো চোখে না পড়ুক কাল পড়বে।

বেলা পড়ে আসছে। আরো জোরে পা চালাও ভাই। টোগরাইহাটের শ্মশান দেখা যায়। শ্মশান বাঁয়ে রেখে আবার বড় সড়কে উঠল পালকি।

ইদ্রিস লক্ষ্য করছিল লাইট রেলওয়ে আর ডিস্ট্রিকট্ বোর্ডের এই রাস্তা যেন জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। এই একটা আরেকটাকে কেটে সরে যাচ্ছে, আবার কাছে আসছে, বেশ খানিকটা সমান্তরালে গেছে, এক সময়ে আর দেখা গেল না, আবার দেখা গেল। কত রং বেরংয়ের পাখি, গাছ-গাছালি। বড় বড় আমের ছায়ায় ঢাকা ডিস্ট্রিকট্ বোর্ডের পথ। কোথাও বুঝি হাটবার আজ। দলে দলে হাটুরেরা ঘাড়ে পিঠে বাকে করে শাক-সবজি চাল-ডাল তেলের কলসি দুধের ভাড় নিয়ে চলেছে। তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, রাস্তা ছাড়ো রাস্তা দাও।

বেহারারা সুর করে বলে আর তালে তালে পা ফেলে এগোয়।

ঐ যে দূরে কুড়িগ্রামের ডাক-বাংলো দেখা যায়। লাল টিনের ছাদে অপরাজিতা লতিয়ে উঠেছে।

বেলাবেলিই পৌঁছুনো গেছে। ধরলার পাড়ে মসজিদ। সেখানে মাগরেবের নামাজ পড়ল ওরা। নামাজিরা অনেকেই হাজি জয়েনউদ্দীনকে সালাম দিল, কুশল জিজ্ঞেস করল।

কোত্থেকে আসছেন?

কলকাতা থেকে। ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছি আমার ডিস্পেন্সারীর জন্যে। এই যে ডাক্তার।

ইদ্রিসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন তিনি। ইদ্রিসকে তারা গভীর চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

বাড়ি কোথায় আপনার?

সিরাজগঞ্জ।

ইদ্রিস যেন দেখতে পায় সন্দেহের কালো ছায়ায় আঁধার হয়ে আসে প্রশ্নকর্তার চোখ। হাজি সাহেব বলছিলেন ভাটির মানুষকে এরা ভয় করে। কথাটা বোধ হয় মিথ্যে নয়।

একজন হাজি সাহেবকে জিজ্ঞেস করে, রেললাইন কদ্দুর? নতুন ইটিশন কবে হবে?

এই হলো বলে। সামনের মাসে দিল্লি যাচ্ছি আবার।

হবে তো?

হবে না মানে? যে বুদ্ধি দিয়েছি! বলেছি নতুন করে সড়ক বাঁধতে হবে না লাইনের জন্য। এখন যে ডিস্ট্রিকট্ বোর্ডের রাস্তা আছে তার ওপরই লাইন বসানোর পরামর্শ দিয়ে এসেছি। লাইনটা দিতে পারলে হাজি সাহেব আপনার একটা নাম থেকে যাবে।

হাজি জয়েনউদ্দীন হাসেন ছোট্ট করে। নিজের প্রশংসা শোনতে অভ্যস্ত তিনি। ইদ্রিস লক্ষ্য করে, প্রশংসা গ্রহণ করেন এমন সুন্দরভাবে যে নিলর্জ্জিত মনে হয় না তাকে। প্রসঙ্গ বদলানোর জন্যে হাজি সাহেব বলেন, ডাক্তার পছন্দ হয়েছে?

ভালোই তো। দশ বিশ ক্রোসের ভেতরে ডাক্তার নাই। গরিব আমরা দোয়া করি আপনাকে।

ধরলা পার হতে বেশিক্ষণ লাগল না!

অদ্ভুত এই নদী। এখন পড়ে আছে সুতোর মতো চিকন চাকন। বর্ষায় ফুলে ওঠে, বাদামি রংয়ের পানি টগবগ টগবগ করতে থাকে, একেকদিনে বিশ তিরিশ হাত পাড় ধ্বসিয়ে খলখল করে হাসতে হাসতে ছোটে।

ওপারে ঘোড়া এসেছে হাজি সাহেবের। মনিবকে দেখে ঘোড়া মাটিতে পা ঠুকতে থাকে। হাজি সাহেব ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন। বললেন, ডাক্তার আমি যাচ্ছি। ওরে তোরা দেরি করিসনে বাবা। জোর পায়ে পালকি দিয়ে আসবি।

অন্ধকারের ভেতরে এক নিমিষে হারিয়ে গেলেন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে পতিদহের বড় তরফ। ইদ্রিস দাঁড়িয়ে রইল পালকির সামনে। কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে নদী। দূরে বিন্দুর মতো চলমান এক ফোঁটা আলো দেখা যাচ্ছে। এক গাঁ থেকে আরেক গাঁয়ে যাচ্ছে কেউ। কয়েকজন লোক খেয়ার আশায় বসে ছিল, তারা উঠে গেল নৌকোয়। চারদিকে নিস্তব্ধ, শান্ত, স্থির। আকাশে ঝকঝক করছে তারা, যেন কেউ একটা বিরাট সুজনী পেতে রেখেছে।

এতক্ষণ হাজি সাহেব সঙ্গে ছিলেন, সে ছিল একরকম। এখন একা, সে আরেক রকম। দুর দুর করতে লাগল বুকের ভেতরটা। আল্লাহ্ যা করেন তা মানুষের মঙ্গলের জন্যই। ইদ্রিসের মনে পড়ল কোরানের সেই আয়াতটা— ওঠ হে বস্ত্রাচ্ছাদিত মানব, তোমার প্রভু তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি কি তোমাকে এতিম হিসেবে পান নাই ? এবং সেখান থেকে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করেন নাই ?

মনটা দৃঢ় সংযত হয়ে এলো তার। আপনা থেকেই নুয়ে পড়া মাথা খাড়া হয়ে উঠলো। এই বরং ভালো হয়েছে। নতুন করে সে শুরু করবে জীবন, ভুলে যাবে অতীত। এ মাটিকে সে আপন করে নেবে। এখানে সে তার স্বপ্ন রচনা করবে। এই যে মানুষগুলো তার চারদিকে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে, এদের মুখ সারাজীবন ধরে পরিচিত হয়ে থাকবে তার। তাই নতুন করে আবার সে সবার দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর পালকিতে বসে বলল, বেরিয়ে পড় ভাই।

পালকি চলল অন্ধকার মাঠঘাট পেরিয়ে। টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল ইদ্রিস। মায়ের কথা মনে হলো। মা তার নাম ধরে ডাকছেন। কতদূর থেকে মিহি হয়ে ভেসে আসছে তাঁর গলার আওয়াজ। ই-দ্রি-ই-স।

মা এখন কী করছেন ? হয়ত হাঁস-মুরগির খোপ বন্ধ করে ডিবে হাতে এ দুয়োর সে দুয়োর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হাতে হাতে তুলছেন উঠোনে কী পড়ে আছে না আছে। একটু পরে নামাজ পড়তে বসবেন মা। নামাজ শেষে বার বাড়িতে বাবার কবর জিয়ারত করতে আসবেন। পায়ের কাছে ভাঙা ইটের উপর ডিবেটা জ্বলতে থাকবে, কাঁপতে থাকবে বাতাসের দাপটে। ইদ্রিসের একেক সময় মনে হয় মা বোধ হয় সারাদিন পরে এই সময়টাতে বাবার কবরের কাছে আসেন কথা বলতে। ঠিক যেমন বাবা বেঁচে থাকতে মা রাতে পানের বাটা নিয়ে বসতেন বাবার পায়ের কাছে। রাত হবে আরো। রমজান চৌকিদার জাগো হো হাঁক দিয়ে দাওয়ায় চেপে বসে এক টুকরো আগুনের আবদার করবে। আগুন আছে তো তামাকও দাও। তামাক টানবে আর বলবে, আপনার কোনো ভয় নাই মা জননী। দুয়োরে ঝাঁপ দিয়া শুইয়া থাকেন গা।

মার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে কে জানে ? কাল একটা চিঠি লিখবে ইদ্রিস।

।।৩।।

ডিস্পেন্সারীটা পছন্দ হয়েছে ইদ্রিসের। কাছারির পাশে জামরুল গাছের নিচে ছোট্ট একটা ঘর তোলা হয়েছে উঁচু ভিটের পরে। এই ডিস্পেন্সারী। নতুন আলমারি, চেয়ার, টেবিল এসেছে। কাঠাল কাঠের গন্ধটা ভারী মিষ্টি। তার ওপরে রং করা হয়েছে কাঁচা সোনার।

ঘরের মাঝখানে রোগী দেখবার টেবিল। এক পাশে ডিসপেনসিং টেবিল। পরিষ্কার শাদা কাপড় বিছানো। মাঝখানে নিকেলেছ নিক্তি রাখা ওষুধ মাপবার জন্যে। পাশে এক কৌটো চুন। চুন আবার কেন ? শিশিতে ওষুধ ঢেলে গায়ে চুনের দাগ দিয়ে কাঠি টেনে মাত্রাভাগ দেখানো হয়।

থরে থরে ওষুধ সাজানো আলমারিতে। আছে ডাক্তারী বইপত্র, স্টেথ্‌সকোপ, সুগার অব

মিল্‌ক। আর ডিস্পেন্সারীর রেজিস্টার, রিপোর্ট বুক। ইদ্রিসের তোরঙ্গে কবে থেকে মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' আর কায়কোবাদের 'অমিয় ধারা' ছিল। সে বই দুটোর গায়ে নতুন মলাট চড়েছে। ঠাঁই পেয়েছে আলমারিতে।

প্রথম দিন পাত্রমিত্র নিয়ে হাজি সাহেব এসেছিলেন ডিস্পেন্সারীতে। বসতে দেয় কোথায় ? তবে ভাবনা কী ? হুকুম বরদার পেছনে পেছনে চেয়ার আনছে। হেলনা বেঞ্চ আসছে আর দুজনের মাথায়।

হাজি সাহেবকে দেখেই ইদ্রিস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আপনি বসুন এখানে।

আরে না, ও হলো ডাক্তারের চেয়ার। এ ধরগে তোমার কাছারি। তোমার গদিতে আমি বসতে পারি। তা আজ রোগী আমিই! নাড়িটা দেখোত ডাক্তার।

হাজি জয়েনউদ্দিন তুমি বলতে শুরু করে দিয়েছেন ইদ্রিসকে। সেটা লক্ষ্য করে খুব খুশি হতে পারল না ইদ্রিস। চেষ্টা করল মুখভাব স্বাভাবিক রাখতে। চাকরি করি বলেই একেবারে কেনা হয়ে গেছি নাকি ?

ইদ্রিস বলে, নাড়ি দেখব, বুক দেখতে হলে বুক।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন হাজি জয়েনউদ্দিন। আচমকা আবছা হেসে বললেন, ঠিক ঠিক। পার্শ্ববর্তীকে শুনিয়ে বললেন, এই না হলে ডাক্তার ? তারপর ইদ্রিসকে আবার বললেন, তুমিও তো তেমনি। ঠাট্টা করছিলাম। তাও বোঝো না। এরা ধরেছে আমাকে দিয়েই নাকি ডিস্পেন্সারীর কাজ শুরু করতে হবে। তা দ্যাখোই না নাড়িটা।

ও এই কথা। আমি ভাবলাম সত্যি কিছু হয়েছে বুঝি।

যদি চেপে ধরো, তাহলে অসুখ যে একেবারে নেই তা বলব না।

কী রকম ?

পারবে তার ওষুধ দিতে ?

বিবরণ বললে সাধ্যমতো চেষ্টা করব। বাকি আল্লাহর হাতে।

ঠিক বলেছ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন হাজি জয়েনউদ্দিন। বলেন, ঠিকই বলেছ। বাকি আল্লাহর হাতে। বাকিই বা বলছ কেন, সবটাই তাঁর। সেই গল্প শোনোনি ? তোমরাও শোনো হে।

পাত্রমিত্র ঘন হয়ে বসে।

হাজি সাহেব বলেন, একবার এক লোক এসেছে বড়পীর সাহেবের কাছে। সে বললে বাকিটুকু আল্লাহর হাতে তা আমাকে বুঝিয়ে দিন। বড়পীর সাহেব তখন বললেন, তোমার ডান পা'টা ওঠাও তো বাপু। ওঠালো লোকটা। বড়পীর সাহেব বললেন, এবার বাঁ পা ওঠাও। তাও হলো। লোকটা বলল, এবার ? বড়পীর সাহেব তখন হেসে বললেন, এবার দুটো পা'ই একসঙ্গে ওঠাও দেখি। লোকটা বলল, বাহ্‌ তা কী করে হয় ? দু'পা এক সঙ্গে কেউ ওঠাতে পারে নাকি ? লোকটা শুনে বেকুব। মাথা নিচু করল। হুজুর বললেন, ঐটুকু আল্লাহর হাতে।

মারহাবা, মারহাবা।

পাত্রমিত্রেরা সমস্বরে বলে উঠল। ইদ্রিস তাদের সঙ্গে ঠিক যোগ দিতে পারল না। সে নিজে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। কোরান রসুল মানে। নামাজ পড়ে। কিন্তু তাই বলে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ এভাবে গ্রহণ করতে সে রাজি নয়। চমকা গল্প দিয়ে কি আল্লাহকে ব্যাখ্যা করা যায়! কিন্তু গল্পটার সঙ্গে বড়পীর সাহেবের নাম জড়িত রয়েছে বলে সে কিছু বলল না। হাজি জয়েনউদ্দিন রহস্যময়ভাবে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

ইদ্রিস জিজ্ঞেস করল, কই রোগের কথা বললেন না ?

বলব, আরেকদিন বলব। আজ নয়। বলতেও হবে না। তুমি নিজেই বুঝে নিতে পারবে। দাওয়াইপত্র অনেক করেছি। তুমি যদি একবার চেষ্টা করতে চাও, দেখতে পারো। ফল হবে আশা নেই।

হঠাৎ গা মোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

যাক চলি। বাইরে ক'জন রোগী এসেছে দেখছি। কাল বিকেলে হাটে ঢোল সহরৎ করে দেয়া হয়েছিল ?

পার্শ্ববর্তী একজন বলল, হ্যাঁ হুজুর হয়েছিল।

তা লোক এত কম দেখছি যে!

ইদ্রিস হেসে বলল, সে কী কথা! দেশে রোগ না থাকা তো খুশির কথা।

না হে না, তুমি জানে না। এখানে ঘরে ঘরে রোগী। ডাক্তার কোন দিন ছিল না বলে চাড় বোঝে না। এছাড়া বিলেতি ওষুধ, কলকাতার ডাক্তার, ভাটির মানুষ— ম্যালা গেরো আছে। এদের মনে একটু বিশ্বাস এনে দাও, ওষুধে একটু ফল হোক, দেখবে তোমার বারান্দা থইথই করবে রোগীতে।

হাজি সাহেব চলে গেলেন। পাত্রমিত্রের দল পেছনে গেল। রোগী দেখতে বসল ইদ্রিস। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের কথা একবার মনে করল। মনে মনে বলল, নাম যেন থাকে। আল্লাহু শাফি, আল্লাহু কাফি। রোগী হয়েছিল কুল্যে পাঁচজন। সবারই এক ব্যামো। ম্যালোরিয়া। ভারী মুশকিলে পড়ল ইদ্রিস। হোমিওপ্যাথিতে ম্যালেরিয়া চট্ করে সারে না। সময় লাগে। কিন্তু সময় নিলে তার বদনাম হবে। বলবে, এ কেমন ডাক্তার ? ওষধ দিল, জ্বর গেল না। সে রকম জ্বর ধামাচাপা দিতে পারে কাঁচা সিঙ্কোনা, কুইনিন। মরে গেলেও সে নীতিভ্রষ্ট হতে পারবে না; কুইনিন দিতে পারবে না।

পানিতে গুলে ওষুধ দিল সবাইকে সে। বলল, কাল আবার আসবে। আর এর পর যারাই আসবে বলে দিও খালি শিশি ভালো করে গরম পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করে যেন আনে। শিশি তো আর জমিদার সাহেব মাগনা দিবেন না।

দুপুর পর্যন্ত রোগী দেখার সময়। বিকেলে ডাক্তারকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারো। চার আনা ভিজিট। আর যাতায়াতের ব্যবস্থা তোমাদের। হাটবারে বিকেল বেলাতেও ডিস্পেন্সারী থাকবে— বিনি পয়সায় ওষুধ দেয়া হবে।

এসব নিয়মকানুন হাজি সাহেবই বেঁধে দিয়েছিলেন।

সেদিন দুপুরে ডিস্পেন্সারী বন্ধ করে কাছারিতে গেল ইদ্রিস। হাজি সাহেব দরবার নিয়ে ছিলেন তখনো। এক পাশে চুপ করে বসল ইদ্রিস। বসে বসে বিচার-আচার দেখতে লাগল। মহাল থেকে পাইক প্রজা দর্শনপ্রার্থীরা এসেছে। তাদের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে। সে আলাপের

কিছুই সে মাথামুণ্ডু বুঝতে পারল না। সব আবেদন নিবেদনের পেছনে পূর্ব ইতিহাস রয়েছে, সেটা জানা না থাকলে উটকো শুনে কিছু ঠাহর করা মুশকিল।

একে একে বিদায় নিল সবাই। বেলা তখন মাথার পর থেকে ঢলতে শুরু করেছে। একটু পরেই জোহরের আজান পড়বে।

কী ডাক্তার, কথা ছিল কিছু ?

জি।

আজ যা দেখলাম সবই ম্যালেরিয়ার রোগী।

হুঁ।

হোমিওপ্যাথি তো সঙ্গে সঙ্গে জ্বর কমায় না। সময় লাগে। রোগীরা যদি তা না বুঝতে চায়? একদিনে ফল না পেয়ে আর ওষুধ নিতে না আসে ?

কোনো উপায় নেই ?

আছে। কুইনিন দিতে হয়।

দাও কুইনিন। মানা করছে কে ? না থাকলে আনিয়ে নাও।

জি, কুইনিন তো দেয়া যায় না।

কেন ?

হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা সেটা।

চুপ করে গেলেন হাজি সাহেব। ভ্রু গভীরভাবে কুঞ্চিত হলো তাঁর।

চোখ তীক্ষ্ণ করে শুধালেন, কী রকম ?

সে এক কথায় বলা যাবে না। পুরো অর্গানস পড়তে হবে।

অর্গানস আবার কী ?

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সংজ্ঞা পদ্ধতি তাতে লেখা আছে।

একটু রুক্ষ মেজাজেই হাজি সাহেব বললেন, সে বই পড়ে আমি কী করব ? আর তুমিও বেশ কথা বলছ দেখি। রোগী মারা যাচ্ছে, তবু যে ওষুধে কাজ হয় সে ওষুধ দেবে না। থাকবে তোমার অর্গানস নিয়ে ?

জি, কুইনিনে কাজ হয় ওপরে ওপরে। ভেতরে রোগ যেমনকার তেমনি থাকে। হোমিওপ্যাথিতে সময় লাগলেও সমূলে রোগ দূর হয়।

তা হোক। এরা বহুদিন ভুগছে। তুমি কুইনিন দাও।

বললাম তো, সেটা আমি পারি না।

তাহলে এসেছ কেন ?

যদি আপনি নিজে একটু বলে কয়ে দিতেন : এ চিকিৎসায় ধৈর্য ধরতে হয়।

তুমি বলতে পারো না ?

আমি বলেছি, কিন্তু ওরা শুনবে বলে মনে হলো না। কাল একজনও ফেরৎ আসবে বলে ভরসা পাচ্ছি না।

বেশ তো। কুইনিনই দাও না। ডিস্পেন্সারী খুলে যদি কারো উপকারই না হলো, তাহলে আর খোলা কেন ? যাও, যা ভালো বোঝো করো গে। মনে রেখো, মরহুম আব্বাজানের নামে এ ডিস্পেন্সারী দিয়েছি। একেকটা রোগী ভালো হলে দোয়া পৌঁছুবে তার রুহে। বেলা অনেক হয়েছে, গোসল খাওয়ায় অনিয়ম করে কাজ করবে সেটা আমার পছন্দ নয়।

ভীষণ ক্ষুব্ধ মন নিয়ে ইদ্রিস তার ঘরে ফিরে এলো।

ঘর বলতে, কাছারির লাগোয়া মসজিদের পেছনে মাঠ, সেই মাঠ পারে অতিথ-পথিকের জন্যে চারচালা টিনের ঘর। মাঝখানে বেড়ার পার্টিশন করা। একটা কামরা ইদ্রিস ব্যবহার করছে।

বিছানায় এসে চিৎ হয়ে শুয়ে রইলো সে। কিছুতেই সে বুঝতে পারছে না, হাজি সাহেবের সঙ্গে সেই তিস্তা থেকে কথায় কথায় তার বিরোধ হচ্ছে কেন ? তার নিজের দোষ ? সে কি একগুঁয়ে ? তাও তো নয়। সে যা ভালো মনে করেছে, যুক্তি দিয়ে যা সঙ্গত মনে করেছে, তাই বলেছে সব সময়। তাতে যদি কেউ ক্ষুণ্ন হন, রুষ্ট হন, তাহলে কী করতে পারে ?

অনেকক্ষণ কড়িকাঠের দিকে গুম হয়ে তাকিয়ে রইল ইদ্রিস ডাক্তার। অন্দরমহল থেকে চাকর এসে তাড়া দিল গোসলের জন্যে। ইদ্রিস তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিল। বলল, শরীর ভালো নেই। খাবো না এবেলা।

না, কাজটা বোধহয় ভালো হচ্ছে না। নতুন জায়গায় নতুন কাজে এসেই মনিবের সঙ্গে বিরোধ হলে লোকে তারই নিন্দে করবে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব শুনলেই বা কী মনে করবেন ? বড় মুখ করে তাকে পাঠিয়েছেন তিনি। আজ রাতেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে একটা চিঠি দেবে সে। হ্যাঁ তাই ভালো। তাঁর কাছে পরামর্শ চাইবে ইদ্রিস। তিনি যদি কুইনিন ব্যবস্থা করতে বলেন তো হোক শাস্ত্র বিরুদ্ধ ওস্তাদের কথা শিরোধার্য করে সে কুইনিনই দেবে।

আর মাকেও চিঠি দেয়া হয় নি। তাকেও আজ লিখবে ইদ্রিস। বরং এখনই বসা যাক। সকালের রিপোর্ট লেখাও পড়ে আছে। ও বেলা যদি কেউ কল দিয়ে বসে তো আর সময়ই পাওয়া যাবে না।

এমন সময় জোহরের আজান পড়ল। দুপুরের তপ্ত মাঠ পেরিয়ে ভেসে আসা সেই আজানের ধ্বনিটাকে মনে হলো মড়ক লাগা গ্রামে কেউ আল্লাহ্‌র করুণা ভিক্ষা করে বুকফাটা আর্তনাদ করছে। ধড়াস্ করে উঠলো ইদ্রিসের বুকের ভেতরটা। তওবা, তওবা। এ সব কী ভাবছে সে ? অমঙ্গল ভাবতে নেই। অমঙ্গল ভাবলে নিজের অমঙ্গল হয়।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে পুকুরে নাইতে গেল ইদ্রিস। ফিরতি পথে নামাজটাও সেরে নিল সে। জামাত তখন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কাছারির কর্মচারীরাই জামাতের সামিল। নোয়াখালীর এক গাঢ় সুরমা পড়া মৌলবি ইমামতি করেন মসজিদে। তিনি ততক্ষণে হাত বেধে ফেলেছেন। ইদ্রিস প্রায় দৌড়ে এসে জামাতে সামিল হয়েছিল।

নামাজ শেষে মৌলবি সাহেব বললেন, আঁরে দয়াই দিবেন আপনে।

কাল আসবেন ডিস্পেন্সারীতে। সকালে।

আঁর লাই'ন। আঁর বিবি সাব হায়েজ লই বহুৎ তকলিফ পায় ভারি।

খ্যা খ্যা করে মৌলবি সাহেব হাসলেন খানিক। আরো কী বলবার জন্যে ঘনিষ্ঠ হতেই ইদ্রিস বলল, আচ্ছা কাল শুনব।

নাহ, আজ সত্যি সত্যি মেজাজটা তার ভালো নেই। নইলে যে যা বলছে তা-ই অসহ্য লাগছে কেন ? হতেও তো পারে, মৌলবি সাহেব তার স্ত্রীর অসুখের জন্যে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ইদ্রিসের যেন মনে হলো, অসুখের কথাটা গৌণ, আসলে লোকটা রোগ বর্ণনার ছলে নিজের ক্ষুধার্ত কামচেতনায় সুড়সুড়ি দিতে চাইছে।

ফিরে এসে দেখে, অন্দর মহলের চাকরটা কাসার ঢাকা জামবাটি নিয়ে তার অপেক্ষা করছে। এ আবার কী ?

তোমরা খাবার নন শুনি বুবুজান মোর হাতোৎ দুধ পাঠেয়া দিল্। জামবাটিটা মেলে ধরল বছির।

ন্যান, টপাটপ পান করি ন্যান।

ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল ইদ্রিসের। যেন এক ঝলক আনন্দ বহুদূর থেকে এসেই ঝাপটা দিয়ে চলে গেল।

বাটিটা হাতে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, বুবজান কেরে বছির ?

তাও জানেন না ?

বল্ না শুনি ?

হুজুরের বড় বইনের মাইয়া। তাঁই মরি যাবার পর একে যে মাইয়া তাক্ আনি আইখছেন হুজুর।

ও।

দুস্কের কথা কী কমো তোমরার আগোৎ। হুজুরের ছাওয়া-পোয়া নাই। ইয়াক্ আপন হতে আপন মাইয়া বুলি পালেন ওমরায়।

দুদিনেই এদেশের কথা বেশ শিখে ফেলেছে ইদ্রিস। সে যে আজ দুপুরে খাবে না, এই কথাটা নিশ্চয়ই হাজি সাহেবের ভাগ্নির কানে গেছে। বড়লোকের হঠাৎ এই প্রীতিটা তাকে কৌতূহলি করে তুলল। এদের ভাষাতেই সে কথা বলতে চেষ্টা করল।

ডাঙর হইছে তোর বুবু ?

হয় নাই বলে ? কন্ কী তোমরা? ছাওয়া-পোয়ার জননী হয়্যা যাইত এতখনে।

কেনে, বিয়াও হয় নাই কেনে ?

না কন সে কথা। বেচেয়া খাইছলো তাক্ তার বাপোমায়। সে ঘর ভাঙ্গি গেইছে। বজ্জাতের ঝাড় আছিল সে মানুষকোনা।

তাই নাকি ?

মুই অ্যালায় যাঁও।

বছির যাবার জন্যে পা বাড়ায়। ইদ্রিস পিছু ডাকে, শোন শোন। তুই আবার তাকে বলেছিস কেন, কিছু খাবো না।

পুছ কইরেলে যে।

কাঁই ?

এদের ভাষা অজান্তেই বেরিয়ে পড়ে ইদ্রিসের আবার।

কাঁই পুছ কইরলে রে!

কাঁই আবার ? কাঁই দুধ পাঠাইলে। নিদ্রা যান তোমরা। মোর মেলা কাম পড়ি আছে।

বছির চলে গেল।

চৌকির ওপর চুপ করে বসে রইলো সে। অবাক হয়ে দেখল কুইনিন নিয়ে মনের মধ্যে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল তার লেশমাত্র আর নেই। এ রকম কেন হলো, বুঝতে পারল না সে। দুপুরে খাবে না বলেছিল তখন সে রাগ করে। এখন এক বাটি দুধ খেয়ে খিদেটা যেন আরো চাগিয়ে উঠল।

হাসল ইদ্রিস। রাগ করে ভারী লাভ হলো তো ?

আরে, রাগ সে করেছিলই বা কার ওপর ?

এখানে সে চাকরি করতে এসেছে। কাজ নিয়ে কি রাগ করতে আছে ? না সে রাগ চাকরি যে করে তার পোষায় ?

হঠাৎ মনে পড়ল হাজি সাহেব তার কী এক অসুখের কথা একসময়ে বলবেন বলেছিলেন। বছিরের কথায় চোখ খুলে দিয়ে গেল তার । ছেলেপুলে হয় না— এই অসুখ। সেই কথাটাই বলতে চেয়েছিলো হয়ত হাজি সাহেব।

কিন্তু সে তো এরকম কেস এর আগে কখনো হাতে পায় নি। তার বইতেও কিছু লেখা নেই। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে লিখলে হয়। হাজি সাহেবের জন্যে মনটা তার সহানুভূতিতে ভরে উঠল। ইদ্রিস যখন বিয়ে করবে না বলে গোঁ ধরেছিল তখন মা প্রায়ই বোঝাতেন, দ্যাখরে, ছাওয়াল না থাইকলে ঘরের আন্ধার যায় না।

ইদ্রিস তখনি কাগজ টেনে চার ভাঁজ করে ছিঁড়ে নিল। তারপর আসবার সময় শখ করে কেনা রাজা কলমটা বের করে চিঠি লিখতে বসল প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে।

কুইনিন নিয়ে যে বিরোধটা হয়েছিল তার আভাস দেবার ইচ্ছে ছিল চিঠিতে । এখন ভাবল, সে কথা থাক। শুধু জিগ্যেস করলেই হবে, কুইনিন তিনি অনুমোদন করেন কিনা। আর জিগ্যেস করবে— নিঃসন্তান হাজি সাহেবের রৌদ্রতপ্ত চেহারাটা তার সামনে ভেসে উঠল।

।। ৪ ।।

শীত পড়তে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে চার পাঁচটা মাস কেটে গেল। এর ভেতরে অনেক কিছু হয়ে গেছে। ইদ্রিস এখন এদের ভাষায় চমৎকার কথা বলতে পারে। তার কথা শুনে বুঝবার উপায় নেই সে ভাটির দেশের মানুষ। গোড়াতেই সে বুঝেছিল এদের মন জয় যদি করতে হয়, বিশ্বাস জন্মাতে হয় তাহলে এদের ভাষা শিখতে হবে। ভাটি থেকে আগে যারা এসেছিল, তাদের উদ্দেশ্যও খুব ভালো ছিল না, এদের ভাষা শেখার দরকারটাও তারা টের পেত না। বরং হাসাহাসি করত ভাষা শুনে।

ইদ্রিসের এখানে এক নাম চালু হয়ে গেছে। কলা খাওয়া ডাক্তার। একদিন হাটে গিয়ে দেখে সোনার টুকরোর মতো কড়ে আঙ্গুল সাইজের কলা বিক্রি হচ্ছে।

নাম কী বাহে এই কলার ?

চিনিচাম্পা।

বাহ্, ভারী সুন্দর নাম তো ।

কী দর দিছেন তোমরা ?

সুকি সুকি পণ।

অর্থাৎ এক পণ এক সিকি। আশিটা চার আনায়।

আধ পণ ধরি দে মোক।

চল্লিশটা কলা নিয়ে সেখানেই একটা ছাড়িয়ে মুখে দিল ইদ্রিস। ভারী মিষ্টি আর তেমনি সুঘ্রাণ। কর্পূরের মতো মাতাল করা। খেতে খেতে কলার খোসার স্তূপ জমে গেল পায়ের কাছে।

তাকিয়ে দেখে ছোট খাটো একটা ভিড়ও জমে তার চারদিকে। গাঁয়ের লোকেরা সওদা করতে এসে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে এই কাণ্ড দেখে! মুখ টিপে হাসছে। ফিসফিস করছে এ ওর কানে। ভারী মজা লেগেছে তাদের।

কী হে ?

চল্লিশটার শেষ কলাটা মুখে পুরতে পুরতে ইদ্রিস বলে।

না, কিছু নোয়ায়।

দে, মোক আরো আধ পণ দে।

আরো চল্লিশটা কিনল ইদ্রিস।

চোখ কপালে উঠল জনতার। ইদ্রিস আরো গোটা দশেক খেল। মাথা দুলিয়ে বলল, অমৃত বুঝিস ?

তাক আবার কী ?

বুঝিস না। কী বুঝিস তাহলে ? তোমরার চিনিচাম্পা অমৃত লাগিল হামার।

কী বুঝল, খুব হাসল সবাই।

সেই থেকে ইদ্রিসের নাম ছড়িয়ে পড়ল 'কলা খাওয়া ডাক্তার।'

দূর দূরান্তে রোগী দেখতে গেলে, গাঁয়ের লোক তাকে এখন কলার ছড়া দেয়। বলে, খান তোমরা।

ইদ্রিস টের পায় ভেতর বাড়ির বৌ-ঝিয়েরাও উঁকি দিয়ে দেখছে তার কলা খাওয়া। খুব আমোদ লাগে তার।

আগে রোগী বাড়ি গেলে কিছু খেত না । চিড়ে মুড়ি মুড়কি দৈ ধরে দিত। ফিরিয়ে দিত। তাতে মনে কষ্ট পেত কেউ কেউ। কলার কথাটা চাউর হয়ে যাওয়ার পর সুবিধে হয়েছে। বাড়িওলাও ক্ষুণ্ন হয় না, খিদেটাও যায়।

এদিকে তিস্তা থেকে কুড়িগ্রাম মিটার গেজ লাইন বসছে। কাজ শুরু হয়ে গেছে। হাজি সাহেব মাঝে মাঝেই যান দেখতে। বলতে গেলে তাঁর একার চেষ্টায় এত বড় একটা কাজ হচ্ছে এ অঞ্চলে। তার রাত দিনের ভাবনা এখন— রেললাইন। রেললাইন ছাড়া মুখে কোনো কথা নেই। ভাইসরয় কী বললেন, রেল কোম্পানির লাল মুখো আইরিশ এঞ্জিনিয়ার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাকে রেলপথ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে শুনে কী রায় দিয়েছিলেন, তার আপত্তি কোন্ কোন্ যুক্তিতে খণ্ডালেন হাজি সাহেব— এইসব কথা এখন পতিদহের কাচারি

বাড়ি গরম করে রাখে।

এঞ্জিনিয়ার বলেছিল, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা বড্ড এঁকেবেঁকে গেছে। তার ওপরে রেললাইন পাতা মানেই রেলও যাবে এঁকেবেঁকে। এতে গাড়ি খুব স্পীডে যেতে পারবে না। বড় জোড় ঘণ্টায় পনেরো কুড়ি মাইল।

তা হোক।

হাজি সাহেব বলেছিলেন, নতুন পথ কাটতে সময়ও লাগবে, টাকাও লাগবে। এ অঞ্চলে মিটার গেজ লাইন আশু হওয়া দরকার। হাজার হাজার মণ উদ্বৃত্ত ধান চাল পাট শুপারি মহকুমার বাইরে যেতে পারছে না শুধু এই লাইনটার জন্যে। সরকারের কত বড় ক্ষতি। দেশের কতখানি অপচয়।

শেষ অবধি সেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার ওপরেই রেললাইন বসছে। ইদ্রিসের বড় ইচ্ছে ছিল একবার দেখে আসবে কী করে রেল বসায়। কিন্তু সময় পায় না। আজকাল রোগী এত হচ্ছে যে এক দণ্ড বিশ্রাম নেবার ফুরসৎ হয় না তার।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ডিস্পেন্সারীতে রোগী দেখে। দুপুরে গোসল করে চারটি খেয়ে নিয়ে নামাজ পড়ে। তারপর লিখতে বসে রিপোর্ট । রিপোর্ট শেষ হতে না হতেই কল আসে। বেরুতে হয় এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে রোগী দেখতে।

গাঁয়ের লোক ডাকতে আসতো ঘোড়া নিয়ে। ঘোড়ার পিঠে যাবেন ডাক্তার। কিন্তু ইদ্রিসের ভারী অস্বস্তি হয় ঘোড়ার পিঠে চড়ে। কথাটা হাজি সাহেব জানতে পেরে সাইকেল কিনে দিয়েছেন তাকে। ঝকঝকে নতুন, তিন বন্দুক মার্কা বি-এস-এ সাইকেল। রডের সঙ্গে পাম্প মেশিন আঁটা। সাইকেলের ত্রিভুজাকৃতি পেটে কাপড়ের থলে লাগিয়ে নিয়েছে সে। তাতে থাকে স্টেথসকোপ, ওষুধের বাক্স, নামাজ পড়বার জন্যে টুপি গামছা। সিটের পেছনে চামড়ার খাপে লিক মেরামতের সাজসরঞ্জাম। বিকেল হতে না হতেই এখন কুয়াশা নেবে আসে। থোকা থোকা কাশফুলের মতো ভেসে বেড়ায় মাঠের ওপর, ঝুলে থাকে গাছের নিচু ডালে, খড়ের চালায়। কেমন শান্ত স্তব্ধ মনে হয় চারদিক। মনে হয়, খুব ভালো, খুব মিষ্টি কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে আর কিছুক্ষণ পরে। গলা পর্যন্ত বোতাম লাগিয়ে হাঁটতে বেরোয় ইদ্রিস। একা লাগে আরো বেশি করে পথের ওপরে উদ্দেশ্যহীন চলতে গিয়ে। একাকীত্বটুকু নেশার মতো জড়িয়ে ধরে ইদ্রিসকে। মনটা ক্ষমাশীল হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে যত দুঃখ আছে সব মিথ্যে মনে হয়। যত বিরোধ, যত দ্বন্দ্ব সব তুচ্ছ হয়ে যায় তার কাছে। ক্ষমাই এই মুহূর্তের মূল সুর হয়ে ওঠে তার মনে। কোথায় কোন্ ছেলেবেলায় শীত রাতে এক যাত্রা শুনতে গিয়ে গানটা ভারী ভালো লেগেছিল। অতল অতীত তোলপাড় করে কথাগুলো মনে পড়ে তার। একটু একটু। আবার মনে পড়ে না। খানিকটা স্মৃতি থেকে, খানিকটা নিজে বানিয়ে ইদ্রিস গুণগুণ করে, 'নিশি না পোহালে মন অভাগিনীর ভরসা কী'? তারপর সন্ধ্যে হয়। আকাশটা নীলাক্ত লাল দেখায়। ডানা ঝটপট করে পাখিরা বাসায় ফেরে। এক দুই তিন চার। কালো কালো পাখিরা কোন্ মাঠঘাট পেরিয়ে তাল সুপারির বনের পাশ দিয়ে চলেছে। কোথা থেকে আজানের সুর ভেসে আসে। মনে হয় কোনো মানুষ নয়, প্রকৃতিই যেন ডাক দিচ্ছে যোজন দূর থেকে। পথের পাশে কারো বাড়িতে হাঁক দেয় ইদ্রিস। নামাজটা সেখানেই সেরে নেয় সে। তারপর ঘরমুখো হয়।

ঘরে এসে বারান্দায় কড়ি কাঠ থেকে ঝোলানো লণ্ঠন নাবিয়ে চিমনি সাফ করে। সলতে টেনে তোলে। আলো জ্বালে। দূরে শেয়ালের আনাগোনা শুরু হয়। দুদ্দাড় করে এক আধটা দৌড়ে মাঠ পেরোয়। কোনদিন ইদ্রিস চিঠি লেখে বসে বসে, ডাক্তারি বই পড়ে কোনদিন, আবার এক একদিন 'অমিয় ধারা' খুলে মনে মনে আবৃত্তি করে।

এশার নামাজের আগেই বছির এসে হাঁক দেয়, ভাত দেইম গো ডাক্তারের ব্যাটা ?

হাঁকটা অভ্যাসবশত দেয় সে। হাতে গামলা ধরাই থাকে। যতক্ষণ সে খায় বছির পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করে। তার গল্পের প্রধান বক্তব্য : বিশ্বসংসারের সবাই পাগল, এত পাগল নিয়ে সে আর পারে না।

আবার কোনো কোনো দিন রোগী দেখে ফিরতে রাত হয়ে যায় ইদ্রিসের। এক প্রহর, দুই প্রহর। ফিরে এসে দেখে লণ্ঠনটা কে জ্বালিয়ে সলতে ছোট করে রেখেছে। টেবিলের ওপর ঢাকা দেয়া আছে ভাত তরকারি। সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধোয় ইদ্রিস। বারান্দায় রাখা বালতির পানিতে মুখ গলা পা ধুয়ে খেতে বসে সে। পাশের ঘর থেকে মসজিদের মৌলবি সাহেব সাড়া দেন, ডাক্তার সাব নি ?

জি হ্যাঁ।

একটু পরে মৌলবি সাহেব এসে জাঁকিয়ে বসেন। কী করে যে আলাপটা রোজ জ্বীন পরীর দিকে চলে যায় তা ভেবে পায় না ইদ্রিস। রোজই সে অন্যমনস্কতা থেকে জেগে উঠে দেখে কোথায় কার বৌকে কবে জ্বীন ধরেছিল সেই গল্প শুরু হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে মৌলবি সাহেবের উৎসাহ অসীম। মাথাটাও খুব খোলে। বর্ণনা দেন জীবন্ত ভাষায়। রূপ বর্ণনায় রীতিমত প্রতিভাবান মনে হয় তাকে। সব গল্পের শেষেই মৌলবি সাহেব দেখা দেন উদ্ধার কর্তা রূপে।

অসহ্য, অশ্লীল মনে হয় লোকটাকে। ইদ্রিস হুঁ হাঁ ছাড়া বিশেষ প্রায় কিছুই বলে না। কিন্তু পার পাওয়া যায় না তাতে। মৌলবি সাহেব প্রতিদিনই হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে প্রশ্ন করেন, জ্বীন পরীতে ইদ্রিসের বিশ্বাস আছে কিনা!

প্রতিদিনই ইদ্রিস বলে, আমার ঘুম পাচ্ছে মৌলবি সাহেব। কাল আলাপ হবে আবার।

মৌলবি সাহেব বিরস মুখে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে খড়মের আওয়াজ তুলে পাশের ঘরে চলে যান।

সেদিন এমনি রোগী দেখে ফিরতে রাত দশটা হয়ে গেল। রোগীটাকে বাঁচাতে পারে নি ইদ্রিস। সান্নিপাতিক জ্বর। কিছুদিন থেকে চিকিৎসা চলছিল তার হাতেই। আজ বিকেলে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ায় কল দিয়েছিল তাকে।

বেরিয়ে পড়েছিল আছরের নামাজ পড়েই। রোগী বাড়িতে পৌছুতে পৌছুতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। গিয়ে দেখে কান্নার রোল পড়ে গেছে বাড়িতে। খড়ের ঘ্রাণ আর মায়ের কান্না মিলে মিশে ভারী করুণ হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। হাত ধরে বুঝল, নাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না রোগীর। একটা ওষুধ দিল সে। মালিশের ব্যবস্থা করল। ঘর থেকে ভিড় সরিয়ে দিল। কিন্তু শেষ অবধি কিছুতেই কিছু হলো না। আটটার দিকে নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল।

হায়াত না থাকলে সে করবে কী ? তবু যেন মনে হলো এ তারই পরাজয়। সে দুর্বল বলেই আজরাইল জয়ী হয়ে গেল আজ। মাথা নিচু করে সাইকেল ঠেলে বেরিয়ে এলো সে পথের

ওপর। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল তারা ঝকঝক করছে দিগন্তের ওপরে। মা বলতেন, মানুষ মরে আকাশের তারা হয়ে যায়। একটা করে লোক মরলে আকাশে একটা তারা বাড়ে। সদ্য একজনকে মরতে দেখে এসে একাকী অন্ধকারে পথের ওপর দাঁড়িয়ে কথাটা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

দূর, দূর! এ সব কী ভাবছে! কদিন হলো দেখছে ইদ্রিস, তার ভেতরটা যেন তার কাছেই অচেনা হয়ে উঠেছে। সে তো অনেক দিন থেকেই একা; কিন্তু আগে সেটা চোখে পড়ত না, এখন পড়ে। কদিন থেকে বাড়ির কথা মনে পড়ে কারণে অকারণে। পৃথিবীতে অসম্ভব অবাস্তব যা কিছু হতে পারে সব যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। কিংবা হতে চায়। নিজেকে মনে হয় দুর্বল, অসহায়।

মনে হয়, খুব প্রবল একটা স্রোতে ভেসে চলেছে সে। তার নিজের যেন করণীয় কিছু নেই। যেদিকে নিয়ে যাবে সেদিকেই যাবে সে।

কৃষ্ণপক্ষ চলছে। পথ-ঘাট ভালো করে কিছু দেখা যায় না। প্রায় সবটাই আন্দাজের ওপর সাইকেল চালাতে হচ্ছে। তার দরুণ এক ঘণ্টার পথ পেরুতে লাগছে দু'ঘণ্টা। এই হরিরামপুরের শ্মশান পেরুলো। চিতা জ্বলছে একটা। অন্ধকারের একটা পাড়ে যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কেউ। সেদিকে তাকাতে যাচ্ছিল ইদ্রিস। হঠাৎ দেখে, দুটো লোকের ঘাড়ে সাইকেল তুলে দিচ্ছিল সে। এ অঞ্চলে সাইকেল আছে, একমাত্র তার। কাজেই অন্ধকারেও তারা চিনতে পারল তাকে। হেঁকে বলল, কাঁই বাহে, কলাখাওয়া ডাক্তার?

হ্যাঁ। তোমরা ?

হরিরামপুরের অছিমদ্দি আর হাগুরা খাঁও।

ছাওয়া ভাল আছে তোমার ?

এককোণা আসেন না কেনে হামার বাড়ি ? ছাওয়াক দেখি যাইবেন। গুয়া পানও খাইবেন।

অছিমদ্দির ছেলেটা কৃমিতে ভারী কষ্ট পাচ্ছিল। তার ওপরে ম্যালেরিয়া তো আছেই। এক বাঁক পরেই তার বাড়ি। এত কাছে যখন একবার দেখে গেলে হয়। সাইকেল ফেরাল ইদ্রিস। জাম গাছের সঙ্গে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রাখল সে। বলল, তাড়াতাড়ি করো ভাই অছিমদ্দি। অছিমদ্দি ভেতরে যাবার পরেই ভেতর থেকে তার ক্রুদ্ধ গলা শোনা গেল। আর পরক্ষণে প্রহারের আওয়াজ। অছিমদ্দির ছেলেটা কেঁদে কঁকিয়ে উঠল।

ডিবে এক হাতে, আরেক হাতে ছেলেটাকে টানতে টানতে অছিমদ্দি এলো সামনে।

ব্যাপার কী ?

কন কেনে ডাক্তারের ঘর। মুঁই মানা করি গেছং গুড় খাবু না, আসি দ্যাহো গুড় খাবার নাইগছে জানোয়ার কোন্টেকার।

ইদ্রিসই মানা করেছিল ছেলেটাকে মিষ্টি কিছু দিতে। সে বলল, আহা ছেলেমানুষ তো। ছাওয়া পোওয়াক তাই বুলি মারেন তোমরা ?

ডিবেটা ধরে শিউরে উঠল ইদ্রিস। ছেলেটার চোখ কংকালের মতো ভেতরে বসে গেছে। কালি পড়েছে। বুকের সবকটা হাড় গোনা যাচ্ছে। ঝুলে পড়েছে ঢাকের মতো পেটটা। কোমরে ঘুনসি ছাড়া পরনে আর কিছু নেই। শেষ যখন দেখেছিল প্লীহাটা তখনো এত বড় ছিল না। ছেলেটা তখনো ফুলে ফুলে উঠছে কান্নায়। ঠোঁট গাল দু'হাত চটচট করছে আখের গুড়ের রসে।

পেটটা একবার টিপে দেখল তার। নাড়ি দেখল। কিছু জিজ্ঞেসাবাদ করল। তারপর বলল, কাল ডিস্পেন্সারীতে আসেন তোমরা। ওষুধ দেমো ভাল দেখি।

যান কোটে ? গুয়া পান মুখোৎ দিয়া যান।

পেছন থেকে অছিমদ্দি ডাকে। কিন্তু সে আর থামে না। অন্য সময় হলে হয়ত দু'দণ্ড দাঁড়াতো। আজ ছেলেটাকে দেখেই তার মনে হয়েছে, বাঁচবে না। এ রকম একটা দুধের শিশু মারা যাবে, ভাবতেই ভেতরটা শিউরে উঠেছে তার। এক মুহূর্ত আর দাঁড়াতে পারেনি সে।

কাঁচা সড়ক দিয়ে সাইকেল চালিয়ে ফিরতে ফিরতে তার মনে পড়ে গেল বড় ভাইয়ের কথা। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই কুড়িটা টাকা সে মনিঅর্ডার করে দিয়েছিল। লিখেছিল, বড় ভাই যেন একজোড়া ভালো জুতো কিনে নেন, আর মাকে একটা মখমলের জায়নামাজ কিনে দেন। কুপনটা ফেরৎ এসেছে অনেকদিন। কিন্তু কোনো চিঠি পায় নি সে। বড় ভাইও দেন নি, মাও না। মা তো লিখতেই জানেন না। বড় ভাই যদি লিখে না দেন তো মার হাত পা বাঁধা।

বড় ভাই বোধহয় এখনো তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। দোষ তো তাঁরই। তবু ইদ্রিস সব ভুলে গিয়েছে। পতিদহে এসেই চিঠি দিয়েছে এমনভাবে যেন দু'ভায়ে কোনোদিনই কিছু হয় নি, আগের মতোই সদ্ভাব আছে। সে চিঠির উত্তরও পায় নি সে।

খুব দুঃখ হলো ইদ্রিসের। ছেলেবেলায় একবার তার জ্বর হয়েছিল, বড় ভাই সারারাত জেগে মাথায় পানি দিয়েছিল তার। সে ভাই বুঝি মারা গেছে। আর কোনোদিন তার দেখা পাবে না সে।

যা কিছু হয়ে গেছে, তার জন্যে তো সে দেশ ছেড়েই চলে এসেছে। এখনো যদি সে কথা মনে রাখেন বড় ভাই, তাহলে অবিচার করা হয়।

ইদ্রিসের ইচ্ছে হয়, বড় ভাই যদি গোঁয়ারতুমি না করে কোনো একটা কাজকর্ম ধরতেন! আজকাল ইংরেজি লেখাপড়া না জানলে বড় হওয়া যায় না। তাই নিজে জেদ ধরে বড় ভাইকে টেনে নিয়ে এসেছিল সে ইংরেজি ইস্কুলে। কিন্তু কিছুই লাভ হলো না শেষ অবধি। ইদ্রিস মনে মনে ভাবে, সে যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, একটু গুছিয়ে নিতে পারে, তাহলে বড় ভাইকে নিয়ে আসবে দেশ থেকে। আর কিছু না হোক, হোমিওপ্যাথি শিখতে বলবে তাঁকে। দেশে ডাক্তারের বড় অভাব। ইদ্রিস একা বড় হতে চায় না, সে যদি বড় হবে তো বড় ভাইকে সঙ্গে নিয়েই হবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে ঘরে এসে পৌঁছোয় ইদ্রিস। দেখে মৌলবি সাহেব আর বছির কথা বলছে। তাকে দেখেই মৌলবি সাহেব দৌড়ে এলেন। বললেন, আইলেননি ভাই ছাব!

দেখছেনই তো।

এক কাম হই গেছে।

মৌলবি সাহেবের চোখ চকচক করতে থাকে। কানের কাছে মুখ এনে বলেন, বুবুজানেরে জ্বীনে ধইচ্ছে।

তাকে উপেক্ষা করে ইদ্রিস বছিরকে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে রে ?

যা শোনা গেল তা এই সন্ধ্যের সময় ওজু করতে পুকুর ঘাটে গিয়েছিল হাজি সাহেবের ভাগ্নি

আয়েশা বিবি। সেখানে কী হয়েছে কেউ বলতে পারে না। এক ঝি গিয়ে দেখে দাঁত কপাটি লেগে ঘাটের ওপর পড়ে আছে আয়েশা। তাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হয়েছে ভেতরে। মাথায় পানি ঢালা হয়েছে। জ্ঞানও ফিরে এসেছে। কিন্তু মানুষ চিনতে পারছে না। ভুল বকছে। থেকে থেকে চিৎকার করে উঠছে। তারপর আবার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো যাচ্ছে। এদিকে হাজি সাহেব বাড়িতে নেই। তিনি দু'দিন হলো সদরে গেছেন কী একটা কাজে।

হাজি সাহেবের স্ত্রী ইদ্রিসকে ডেকে পাঠাতে বলেছিলেন। বছির এসে দেখে, ইদ্রিস রোগী দেখতে বেরিয়ে গেছে। সেই থেকে বাড়ির সবাই পথ চেয়ে তার জন্যে। এক্ষুণি তাকে ওষুধ দিতে হবে।

ইদ্রিস বলে, চল বাবা, দেখি কী হয়েছে।

সাইকেল রেখে সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াল ইদ্রিস। মৌলবি সাহেব সঙ্গী হলেন। বলতে লাগলেন, দাওয়াইর কাম ন' ডাক্তার ছাব। আঁই ভালা দোয়া জানি, আঁই কইৎ পারি, দোয়া পড়ি ঝাড়ি দিলে ভালা হই যাইতো।

অন্দর মহলের বার দরোজায় এসে থামলো ইদ্রিস। বছির ভেতর থেকে এক চট্‌কা ঘুরে এসেই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল অন্দরে। বসবার ঘরে চেয়ার টেনে দিল তাকে। মৌলবি সাহেব নিজেই একটা আসন টেনে বসে পড়লেন।

ভেতরে এর আগে আর কখনো আসেনি ইদ্রিস। চোখ যেন জুড়িয়ে গেল তার। মেহগিনি কাঠের কী সুন্দর নকশা তোলা সব আসবাব! গালিচা বিছানো। দেয়ালে বাঁধানো ফটোগ্রাফ। এক পাশে লেখাপড়ার টেবিল। মোটা মোটা বই তাতে সাজানো। মাথার ওপরে জ্বলছে ঝকঝকে চোদ্দ ল্যাম্প।

হাজি সাহেবের স্ত্রী পর্দার ওপাশে এসে দাঁড়ালেন। কথা হতে লাগল বছিরের মারফৎ। নতুন কোনো তথ্য পাওয়া গেল না। বছির আগে যা বলেছিল তাই আরেকবার বললেন উনি।

ইদ্রিস বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না। মানে–

ইতস্তত করল সে। সে যা বলতে চাইছিল তা হচ্ছে, রোগিনীকে একবার দেখা দরকার। কিন্তু কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা তা বুঝতে পারছিল না। এতদিন সে আছে এখানে, মনে হয় এঁরা পর্দা মানেন ষোলআনা। পর পুরুষকে ঘরের মেয়ে দেখতে দেবে না।

এদিকে মৌলবি সাহেব সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। তিনি 'আম্মা' বলে এক লম্বা হাঁক পেড়ে নিবেদন করলেন, ডাক্তারের ওষুধ তাঁরা নিতে পারেন, কিন্তু রোগিনী ভালো হবে না। কারণ, তিনি স্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন, জ্বীন আছর করেছে। জ্বীনের দাওয়াই আল্লার কালাম। বুবুজানের হাল শুনেই তিনি ছুটে এসেছেন। এখন যদি তাঁরা অনুমতি করেন তো তিনি গিয়ে ঝাঁড়ফুক করতে পারেন। সবশেষে তিনি আরেকবার বললেন, এবং বেশ জোরের সঙ্গেই, ওষুধে কিছু কাজ হবে না।

অন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা হাজি সাহেবের স্ত্রীর মনোভাব চট্ করে বাইরে থেকে টের পাওয়া গেল না। ইদ্রিস এটুকু অনুভব করতে লাগল। এর প্রতিবাদ করা দরকার। কিন্তু হাজি সাহেবের স্ত্রী কী বলেন সেটা আগে শোনা ভালো।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন দু'পক্ষ।

মৌলবি সাহেব আবার হাঁক দিয়ে উঠলেন, আম্মা। ইয়ে জরুর জ্বীন কা কাম হ্যায়। আপ

বড়া দেখকে তামাকা এক বর্তন লাইয়ে পানি ভরকে। হাম দো মিনিট মে জ্বীন কো ভাগ্যা দেতো হু।

আর বছিরকে বললেন, খাড়া খাড়া কেয়া দেখতা হ্যয় ? জলজি করো।

ইদ্রিসের গোড়া থেকেই খারাপ লাগছিল বিনা আমন্ত্রণে মৌলবি সাহেবের অন্দর মহলে ঢোকাটা। তার ওপরে তার মুখে উর্দু শুনে তার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। সে বছিরকে বলল, আম্মা হুজুরাণীকে বলো যদি ঝাড়ফুঁক করাতে হয় তো আমি চলি। মৌলবি সাহেব রইলেন। বছির নিবেদন করে জবাব শুনে এলো। বলল, তোমরাও থাকেন ডাক্তারের ঘর। আম্মা কইলে, ডাক্তারের থাকা যাইবে।

ইদ্রিস বুঝতে পারল, ঝাড়ফুঁকটাই ভালো মনে করছেন হাজি সাহেবের স্ত্রী। তাকে থাকতে বলা শুধু ভদ্রতার খাতিরে। সে উঠে দাঁড়াল। বলল, না বছির, আমি রোগী দেখে ফিরেছি বহুদূর থেকে। ঘরে যাচ্ছি। দরকার হলে খবর দিও। আমাকে একটু পথ দেখাও বাবা। ভেতর থেকে শাড়ির খসখস চুড়ির রিনিঝিনি উঠলো। মৌলবি সাহেব ঠোঁট ফোলানো হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন ইদ্রিসের দিকে। ইদ্রিস বেরিয়ে এলো।

বার দরোজায় দাঁড়িয়ে পড়ে বছিরকে সে বলল, মৌলবি সাহেবকে আগে ডাকলেই পারতি। আমার জন্যে রাত দুপুর করার কী দরকার ছিল ?

মঁই কী জানো।

আচ্ছা যা, তোকে আর কী বলব। ভাত দিয়েছিস ?

আছে তোমার ঘরৎ।

ইদ্রিস মাঠটা লম্বা লম্বা পায়ে অতিক্রম করে এসে হাত মুখ ভালো করে ধুলো। মাথায় পানি দিল। পানি পড়তেই ভারী আরাম লাগলো তার। একটু কষ্ট হলো আয়েশার জন্যে, সেই না দেখা তরুণীর জন্যে, যে তাকে একদিন দুধ পাঠিয়ে দিয়েছিল শরীর খারাপ শুনে। এতক্ষণে মৌলবি তার কেরামতি দেখাতে শুরু করেছে নিশ্চয়ই।

আয়েশার কথা বারবার মনে হচ্ছিল তার। তাকে সে চোখে দেখেনি কখনো। আয়েশা তার কাছে শুধু একটা নাম। এখন যেন সেই নামটাকে অবলম্বন করে অস্পষ্ট একটা মূর্তি গড়ে উঠতে লাগল। হাজি জয়েনউদ্দিন সুপুরুষ। তাঁর ভাগনি নিশ্চয়ই দেখতে সুন্দরী হবে। একবার বিয়ে হয়েছিল শুনেছে ইদ্রিস। তালাক হয়ে গেছে। কেন হয়েছে ? বছিরের কাছ থেকে স্পষ্ট কিছু জানা যায় নি। আর তারও এর আগে তেমন কৌতূহল কিছু ছিল না।

ঘুম আসে না ইদ্রিসের।

মৌলবি সাহেব অন্দর থেকে এখনো ফেরেন নি। রাত কত হলো! বছির যদি একবার আসতো তাহলে ভেতরের সংবাদ জানা যেত। সে থেকে গেলেই পারত অন্দর বাড়িতে। তাতে অন্তত এই অস্বস্তি ভোগ করতে হতো না।

বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে অন্ধকারে হাঁটতে লাগল ইদ্রিস। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। কনকন করছে উত্তুরে হাওয়া। গায়ে কাঁপন উঠছে। ভেতর থেকে চাদর এনে গায়ে জড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে ইদ্রিস এলো কাচারি বাড়ির বারান্দায়। চৌকিদার ঘুমিয়ে আছে একটা হেলনা বেঞ্চে পা গুটিয়ে হাতের ওপরে মাথা রেখে। পরে পরে আরও কয়েকটা বেঞ্চ। অতিথ পথিক রায়ত এলে বসে এখানে। দিনের বেলায় ভারী সরগরম হয়ে থাকে বারান্দাটা।

ইদ্রিস একটা বেঞ্চের দিকে লক্ষ্য করে এগুতেই কিসের সঙ্গে হোঁচট খেল প্রচণ্ড। বাঁ পায়ের

বুড়ো আঙুলটা টনটন করে উঠলো। ইস। বেঞ্চের ওপর বসে পায়ে হাত বুলোতে লাগল সে।

হঠাৎ মনে পড়ল, সে যখন বিয়ে করতে যাচ্ছিল হোঁচট খেয়েছিল এমনি। খুব দূরে কেউ ডেকে উঠল। শীতে এখানে কখনো কখনো বাঘ দেখা যায়। কান পাতল ইদ্রিস। অনেকক্ষণ পর ফেউটা আবার ডাকলো। মনের মধ্যে কেমন ভয় ভয় করল একবার। তবু সে বসে রইল সেখানে।

মা তাকে বলেছিলেন, শুভ কাজে বাধা পড়ল, একটু দাঁড়িয়ে যা।

আগে এই সব কথা মনে করে ভারী রাগ হতো তার। একটা কিছু প্রতিশোধ নেবার জন্যে নিসপিস করত হাতটা। পতিদহে এসে অবধি সে ভাবটা কী করে যেন কেটে গেছে। আজ সন্ধ্যেই তার মন কাঁদছিল বড় ভাইয়ের জন্য। দুঃখ হচ্ছিল তিনি একটা চিঠি দিলেন না বলে। গল্পের মতো মনে হয় সব।

ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিয়ে শিবালয়ে পৌছুতে হবে। শিবালয় থেকে গয়নার নৌকোয় রহিমগঞ্জ। রহিমগঞ্জে সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে ইদ্রিসের। বরযাত্রী বলতে বড় ভাই আর চাচা মিয়া।

চাচা মিয়া পথঘাট চেনেন। জানেন গয়নার নৌকো কখন ছাড়ে। শিবালয়ে এসে ভোর হলো। সারি সারি মিষ্টির দোকান আছে ঘাটে। সেখানে পেট পুরে মিষ্টি খেল ওরা। ইদ্রিস ভাল করে কিছু খেতে পারল না। হাজার হোক, বিয়ে করতে যাচ্ছে। মনের মধ্যে একটা কী হয় কী হয় ভাব। পাকস্থলী একেবারে কঠিন হয়ে আছে উদ্বেগে।

আগু বাড়িয়ে নেবার জন্যে শিবালয়ে লোক আসার কথা ছিল। কিন্তু তার দেখা পাওয়া গেল না। চাচা মিয়া অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন তাকে। বাজারের কয়েকটা দোকানে জিগ্যেসাবাদ পর্যন্ত করলেন। কিন্তু কোনো সন্ধানই মিলল না।

কেমুন কথা বাজান।

চাচা মিয়া চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

আমরাই রওয়ানা দেই গা। কইছিল লোক পাঠাইবো। অবশ্য সঠিক কইরা কিছু কয় নাই। আল্লা ভরসা। দেরি করমু না আর। আসো। রহিমগঞ্জে কোন্ গয়না যায় গো?

পারে দাঁড়িয়ে চাচা হাঁক পাড়েন।

এক নাও থেকে মাঝিরা আওয়াজ দেয়, আসেন, এই নায়ে আসেন। তারপর ভালো করে এক মাঝি নিরিখ করে তাদের। বলে, মিয়া সাবরা রহিমগঞ্জে কার বাড়িতে যাইবেন?

ক্যান, তা দিয়া কী দরকার?

না, জিগাইলাম। বরযাত্রী মনে অয়।

তাই বাপু।

তাইলে আসেন। আপনাগো লইয়া যওনের লিগা এক ব্যাটা আইছিল। কাইল রাইত ভরা নায়ে বইসা গাঞ্জা টানছে। আহেন, এই নায়েই বেহুঁশ অইয়া পইড়া আছে হে।

কও কী?

মাঝিরা দাঁত বের করে হাসে। খুব মজা পেয়েছে তারা। বিয়ের বরকে আগু বাড়িয়ে নিতে এসে গাঁজা টেনে চিৎ হয়ে আছে, আর ওদিকে বর ঘুরছে বোকা বলদের মতো।

আহেন, আহেন মিয়া সাবরা।

কাণ্ড দেখে তো বড় ভাই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

শালার এরা ভদ্রলোকই না। গাঁজাখোররে পাঠায় ভদ্রলোক হলে ? কেমুন জাগায় সম্বন্ধ করছেন চাচা মিয়া।

ন্যাও বাপু আর দিক কইরো না । ভালো খারাপ দুই জাত নিয়াই দুনিয়া । হের তুমি করবা কী ?

বেলা তিনটে নাগাদ নাও এসে ভিড়ল রহিমগঞ্জের ঘাটে। না এখানে কোনো ত্রুটি নেই অভ্যর্থনার। নৌকো থেকেই দেখা যাচ্ছিল পাড়ে কয়েকজন প্রৌঢ় এক পাল ছেলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের সবার পরনে পরিষ্কার করে কাচা কাপড়, মাথায় টুপি, পায়ে পাম্পশু। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল বর নিতে এসেছে তারা।

তাদের ভেতরে একজনকে চাচা মিয়া চিনলেন। নৌকো থেকেই সালাম বিনিময় হলো।

সালামালাইকুম।

অন্যান্য যাত্রীরা নেমে যাবার পর কল্লিদার টুপি পরা লোকটা পাড় থেকে নৌকোয় উঠে বড় ভাইর হাত ধরে বললে, আসেন।

চাচা মিয়া তড়বড় করে বলে উঠলেন, আরে, হে জামাই না। জামাই ইনি। আর ইনি জামাইর বড় ভাই।

অপ্রস্তুত হয়ে লোকটা বলল, ঐ এ্যাক কথাই অইলো।

ঘাট থেকে কয়েক রশি পরেই বাড়িটা। হেঁটেই চলল সকলে। লোকটা দুঃখ করতে লাগল, বুছ লাইন ভাই সাব। গাঁয়ের সে অবস্থাও নাই, জলুসও নাই। আগে তিন তিনখান পালকি আছিল। এহন একখানও পাইবেন না। বহুৎ কোশিস করছি পালকির জইন্যে। মাফ কইরা দিয়েন।

বাংলা ঘরটাকে সাজানো হয়েছে বিয়ের জন্যে। ঘর থেকে সব কিছু বের করে সারা মেঝে জুড়ে ধবধবে ফরাস পেতে দেয়া হয়েছে। তার মাঝখানে মখমলের জায়নামাজ বিছানো। সেখানে হাত ধরে বসানো হলো ইদ্রিসকে। শরবৎ এলো, পাখা এলো। ভেতর থেকে উঁকিঝুকি দিতে লাগল বৌ ঝিয়েরা।

একটু পরে লোকটা এসে খবর দিল, গোসল করনের ব্যবস্থা অইছে। দামাদ মিয়া আসেন। আপনেরাও চলেন।

গোসল করে পোর্টম্যান্টো খুলে আচকান পাজামা বের করে পরল ইদ্রিস। বড় ভাই মাথায় বাঁধলেন দশ প্যাঁচের পাগড়ি। চোখে ঘন করে সুরমা দিলেন। যুবক দরবেশের মতো ধবধব করতে লাগল তাঁর চেহারা । ছবিটা ইদ্রিসের চোখে এখনো লেগে রয়েছে।

বাংলা ঘরের পাশে এই ঘরটা বরযাত্রী দুজনের জন্যে। সেখানেই কাপড় বদলানো হচ্ছিল। চাচা মিয়া বললেন, ইদ্রিস তুমি বসো বাজান আমরা ঘুরনা দিয়া আসি।

আধ ঘণ্টার মতো একা ছিল ইদ্রিস। *ঠিক একা বলা যায় না বাড়ির কিছু ছেলেপুলে ঘিরে রেখেছিল তাকে। গলা জড়াজড়ি করে তাকে দেখছিল ওরা বড় বড় চোখে। ইদ্রিস* দু'একজনের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সুবিধে হয় নি।

ইদ্রিসের পরে মনে হয়েছে, ঐ আধঘণ্টা যে বড় ভাই আর চাচা মিয়া বাইরে ছিলেন, কথাটা হয়েছে তখনই।

আধঘণ্টা পরেই সেই কল্লিদার টুপি পরা লোকটার সঙ্গে এলেন চাচা মিয়া । বড় ভাইকে দেখা গেল না।

তারা দু'জন এসে ইদ্রিসের দু'দিকে বসলেন চৌকির পরে। লোকটা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে কৌতুককণ্ঠে বলল, কী রে পোলাপান, দুলা পছন্দ অইছে ?

হি হি করে হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে আর কী !

যাহ, ভাগ্ এহান থনে। শীগগীর বাইরা। গেলি!

হুড়মুড় করে ছেলেদের দল চলে গেল। একটু পরে আরো কয়েকজন মুরুব্বি এসে সমস্বরে সালাম আলাইকুম দিয়ে বসে গেলেন চৌকির ওপর। চৌকিতে মানুষ আর ধরে না।

সদালাপ হলো খানিকক্ষণ। তারপর এক প্রৌঢ় এক বুড়োকে ঠেলা দিয়ে বললেন, কথাডা কইয়া ফালান চাচা। সময় নষ্ট কইরা লাভ কী ?

চমকে উঠল ইদ্রিস। বিয়ের বর, মাথা তুলতে নেই। মাথা নিচু করেই সে রইলো। কিন্তু কানটা সজাগ হয়ে উঠলো, কঠিন হয়ে এলো হাত পা। কী কথা বলতে এসেছেন ওরা ?

অনেকক্ষণ কেউ কিছু বললেন না। থমথম করতে লাগল ঘর। সবাই অস্বস্তিতে উসখুস করতে লাগলেন।

অবশেষে একজন বললেন, দুলামিয়া, আমরা দশজনে আপনের কাছে একডা কথা কইবার চাই। কথাডা কিছু না। দ্যাহেন, হায়াত মউত রিজিক দৌলত আল্লার হাতে। বিয়ে শাদি যার যেহানে লেখা আছে আল্লার খাতায়, আল্লা ভিন্ন কেউ তারে খণ্ডাতি পারে না। তা আপনে এই বাড়ির দুলাহ্ অইবেন। আমরা কিন্তুক, খালি আপনেরে না, আপনের মিয়া ভাইরেও দুলাহ্ কইরা রাইখতে চাই।

অবাক হয়ে ইদ্রিস তাকাল চাচা মিয়ার দিকে।

চাচা মিয়া মাথা নামিয়ে নিলেন।

মুরুব্বিদের আরেকজন বললেন, কথাডা ভাইঙ্গাই কওনা ছোট মিয়া। দুলামিয়া শিক্ষিত লেহাপড়ি জানা মানুষ, হে খুশিই অইবো শুইনা। দুই ভাই এক জোটে দুই বৌ নিয়া দ্যাশে যাবি অ্যারচে খুশির কথা আর কী অইবার পারে!

ইদ্রিস নিচু গলায় চাচাকে জিজ্ঞেস করল, মিয়া ভাই কেনে ? এনারা কইতাছেন কী ?

চাচা মাথা নিচু রেখেই কম্পিত গলায় বললেন, আমি কিছু জানি না ইদ্রিস। আমার মতই আছিল না। কিন্তুক হঠাৎ এই কথা হইয়া গেল। এহন কী করি ? তুমিই কও। বিয়া না কইরা যদি ঘরে যাও মাইনষে ছি ছি কইরবে, ছ্যাব দিবে, তোমার মায়ে যে কী কইরা বইসবে তা আল্লাই জানে।

এসব কথার একবর্ণ ইদ্রিসর বোধগম্য হলো না । সব অসম্বন্ধ; অসম্ভব বলে মনে হলো তার। বড় ভাইকে এরা দুলাহ্ করতে চায় অর্থ কী ? এই তো সেদিন পর্যন্ত তাকে কত বোঝানো হলো তিনি রাজি হলেন না। এখন হঠাৎ কিসের গুণে কী হয়ে গেল ?

অবশেষে সব কথাই প্রকাশ পেল। যে বাড়িতে ইদ্রিস বিয়ে করতে এসেছে সে বাড়িতে দুই মেয়ে। বাপ নাই, মা আছে। দুঃখে কষ্টে সংসার চলে। বড় মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে ইদ্রিসের। এখন গাঁয়ের লোক বড় ভাইকে দেখে এবং তিনি অবিবাহিত শুনে ঠিক করেছে বড় মেয়ের সঙ্গে বড় ভাইয়ের আর ছোট মেয়ের সঙ্গে ইদ্রিসের বিয়ে দেবে তারা।

শুনে হতভম্ব হয়ে গেল ইদ্রিস। কী বলবে, কী করবে, কী করা উচিত কিছু বুঝতে পারল না সে। চাচা মিয়া কফ ফেলার নাম করে কাশতে কাশতে বাইরে চলে গেলেন। গাঁয়ের মুরুব্বিরা হাত চেপে ধরলো ইদ্রিসের— তাদের কথা তাকে রাখতেই হবে। এদের বাপ নাই। জানেনই তো, দুঃখের সংসার। দুই মেয়ের বিয়ে এক সঙ্গে হয়ে গেলে ঝামেলা যায়। তাছাড়া এই বিয়েতে যে খরচ হচ্ছে তা জোগাতেই মেয়ের মা প্রায় সর্বস্ব বাঁধা দিয়েছেন। ডাক্তার দুলা বলেই কোন দিকে তাকান নি তিনি। এখন ইদ্রিসেরও তো এ বাড়ির জামাই হিসেবে দায়িত্ব একটা হবে, শালীকে বিয়ে দিতে হবে নিজের খরচে। তার চেয়ে এই ব্যবস্থাই ভালো নয় কি ? দুই ভাই দুই বোন। বোনে বোনে ভাইয়ে ভাইয়ে ছাড়াছাড়ি নেই। এক সংসারে গলাগলি হয়ে থাকবে। এর চেয়ে সুখের আর কী হতে পারে ?

ইদ্রিস কিছু বলল না। পাথর হয়ে বসে রইলো।

কয়েকজন উঠে দাঁড়াল । তাদের ভেতরে একজন বলল, তাইলে সুখবরটা দিয়া দেইগা মজলিশে।

হাজার চেষ্টা করেও ইদ্রিস নিজের কণ্ঠে একটি ধ্বনিও ফোটাতে পারল না। জীবনে এত বড় বিস্ময় তার হয় নি।

অভিভূতের মতো বিয়ের মজলিশে গিয়ে বসলো সে। প্রথমে বড় ভাইয়ের বিয়ে পড়ানো হলো। তারপর তার। আলহামদুলিল্লাহ্‌র মিলিত ধ্বনিতে বারবার মুখরিত হয়ে উঠল মজলিশ। গোলাপপাশ থেকে গোলাপজলের ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গেল একবার। মিছরির টুকরো হাতে হাতে ফিরতে লাগল।

ইদ্রিসের শুধু দুটি কথাই মনে হয়েছিল। আর সে কথা দুটিই তাকে দুর্বল করে ফেলেছিল। বড় ভাই বাপের অবর্তমানে বাপের মতো— তার ইচ্ছে মান্য করা ছোট ভাইয়ের কর্তব্য। আর মনে হয়েছিল, তাদের বংশে কেউ কখনো বিয়ে করতে এসে ফিরে যায় নি।

চাচা যখন পাত্রী খুঁজতে বেড়িয়েছিলেন, জিজ্ঞেস করেছিলেন ইদ্রিসকে, তার কিছু বক্তব্য আছে কিনা। উত্তরে ইদ্রিস বলেছিল, আমি টাকা পয়সা চাই না, বড় ঘরও চাই না, তবে মেয়ে যেন সুন্দরী হয়।

রহিমগঞ্জ থেকে ফিরে গিয়ে চাচা বলেছিলেন, পাত্রী যা দেইখা আসছি একশ জনের মইধ্যে একজন। যেমুন রং তেমুন চেহারা। দেইখলে ইরানি বুইলা ধন্দ হয়। পান খাইলে গলা দিয়া পানের পিক নাইমতে দেখা যায়। আর কী চাও!

ইদ্রিস ধরেই নিয়েছিল ছোট বোনও তেমনি সুন্দরী হবে।

বাসর ঘরে ঢুকে দেখে লাল শাড়ি জড়ানো ছোট্ট পুঁটুলির মতো একটা বাচ্চা মেয়ে পড়ে আছে। এ যে একবারে সাত বছরের বালিকা! একে তো সে আশা করে নি। দপ করে আগুন ধরে গেল মাথার ভেতরে। এক হাতে মুখটা তুলে দেখেই আর্তনাদ করে পিছিয়ে এলো ইদ্রিস। কোথায় দুধে আলতা রং, আর কোথায় ছবির মতো চেহারা, ঘোর শ্যামবর্ণ, ঠোঁট পুরু, নাক খাটো, কপাল উঁচু তার।

দুই বোনে এত পার্থক্যও হয় ?

গুম হয়ে বসে রইলো সে সারারাত। না, চৌকিতে না। ঘরের কোণে জলচৌকি ছিল একটা তাতে।

পরদিন ভোরে কাক ডাকার আগে বেরিয়ে পড়ল ইদ্রিস। সঙ্গে কিছু টাকা ছিল। ঘাটে এসে শুনলো গয়নার নৌকো ছাড়বে বেলা এক পহর হলে। একটা ছোট্ট নৌকা এক টাকায় ভাড়া করে এলো শিবালয়। সেখান থেকে গোয়ালন্দ হয়ে কলকাতা। কলকাতায় নেবে সোজা প্রিন্সিপাল খানের কাছে। মাকে একটা চিঠি দিয়েছিল পরদিন। কিন্তু গাঁয়ে ফিরে যায় নি।

পতিদহে আসবার আগে পর্যন্ত মায়ের কাছে দ্বিতীয় চিঠিও লেখেনি সে। পতিদহে কাছারি বাড়ির বারান্দায় রাত দুপুরে অতীত পরিক্রম করে এলো ইদ্রিস ডাক্তার। কার কপালে কী লেখা আছে কেউ বলতে পারে না। কোথায় পতিদহ, ইহজীবনে এখানে আসা দূরে থাক নাম পর্যন্ত জানার কথা নয়। অথচ পতিদহই এখন তার কাছে একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র সত্য হয়ে উঠেছে।

বারান্দা থেকে নেমে এসে আবার হাঁটতে লাগল ইদ্রিস। নাহ্, শীত জোর পড়েছে। চাদর টেনে কানমুড়ি দিল সে। ভারী ক্লান্ত লাগছে শরীরটা। চোখ জড়িয়ে আসছে। এবার বোধহয় ঘুম আসবে।

হঠাৎ রাতের অন্ধকার যেন খানখান হয়ে গেল নারী কণ্ঠের চিৎকারে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ইদ্রিস। কান থেকে নামিয়ে দিল চাদর। তারপর প্রায় দৌড়ে অন্দর মহলের বার দরোজায় এসে চিৎকার করে ডাকল, বছির, বছির।

সঙ্গে সঙ্গে বছির এসে তার গায়ের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বলল, কাঁই ডাকেন? তোমরাই? মুই তোমার আগোৎ যাবার ধরছিনু। আম্মা তোমাক বোলায়।

কেনে? তোমার বুবুজান চিখ্‌রি উঠিল কেনে?

কাঁই কবার পায়। আইসেন তোমরা। ওমরা কত ঝাড়ন ঝাড়িল, কিছুই হইল না। বুবু আরো দাপেয়া ওঠে থাকি থাকি।

আয়েশার চিৎকারটা যেন তখনো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারিদিকে। ইদ্রিস বলে, চল দেখছি।

ভেতরে এসে দেখে মৌলবি সাহেব গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। তার দিকে দ্বিতীয় বার আর তাকাল না ইদ্রিস। বছিরকে বলল, খবর দে। মুই রোগী দেখিম্। ফির ওষুধ দিম্।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ভেতরে ডাক পড়ল তার। প্রকাণ্ড উঠোন পেরিয়ে পুবের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। ঢুকে দেখে বিছানার ওপর এক তরুণীকে ঘিরে কয়েকজন বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন। তরুণী আপাতত সঙ্গাহীন। মেঝের ওপরে পানি ভর্তি তামার ডেক রয়েছে একটা। এক পাশে মাটির হাঁড়িতে খানিকটা আগুন তখনো ধিকিধিকি করে জ্বলছে, ধোঁয়া উঠছে।

প্রথমেই সে বছিরকে বলল, এসব বাইরে নিয়ে যেতে। জানালাটা খুলে দিতে। জানালা খুলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে গেল। ঘরের ভেতরে গুমোট ভাবটা কেটে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল শীতল স্নিগ্ধতা।

ইদ্রিস প্রশ্ন করতে লাগল বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য না করে।

পুকুরঘাটে সঙ্গে কেউ গিয়েছিল?

বৃদ্ধাদের ভেতর একজন ইতস্তত করে উত্তর দিল, না। এর পরে সে-ই মুখপাত্রী হিসেবে অন্যান্য প্রশ্নেরও উত্তর দিতে থাকল। সব শুনে ইদ্রিসের মনে হলো, আসলে ভয় পেয়েছে আয়েশা। সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকী পুকুরঘাটে একটা বেড়াল দেখেও ভয় পাওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

ইদ্রিস বলল, নাড়িটা দেখতে হবে।

ওরা একটু দূরে সরে দাঁড়াল।

আয়েশার হাত তুলে নিল ইদ্রিস । শরীরে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়ে গেল তার। আর কোন দিন কোনো নারীকে স্পর্শ করে এরকম অনুভূতি তার হয় নি। শীতল, অবিশ্বাস্য কোমল, অসহায় একটি হাত। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, এমন রূপও মানুষের হয়! গোলাপের মতো অবিকল বর্ণ। ছিপছিপে নাক, সুগঠিত চিবুক, পাতলা ঠোঁট, দীর্ঘ গ্রীবা। ভরা একটা নদীর মতো স্বাস্থ্যের সম্ভার। ইতিহাসের বই পড়ে নূরজাহান, মমতাজমহল এদের ছবি যেমন কল্পনা করা যায়, ঠিক তেমনি। মোহগ্রস্তের মতো হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ইদ্রিস। চোখ ফেরাতে পারে না। অথচ সে চোখে যেন সে কিছু দেখতেও পাচ্ছে না। যেন একখণ্ড স্বপ্নের সঙ্গে বেহেস্তের সঙ্গে আজ মধ্যরাতে তার হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেছে। পরমুহূর্তে গ্লানিতে ভরে উঠল তার মন। ছি, ছি, এ কী হলো তার । এ কেমন মন নিয়ে সে অসুস্থের শয্যা পাশে দাঁড়িয়ে আছে! সচকিত হয়ে উঠল তার শরীর। কঠিন হয়ে গেল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেছিলেন, মাতৃজ্ঞানে পর-রমণীর চিকিৎসা করবে। তা যদি না পারো তাহলে তার চিকিৎসাই কোরো না।

জীবনে এমন মতিভ্রম তার হয় নি।

ইদ্রিস সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কঠিন শাসন করে নাড়ি দেখল আয়েশার। অত্যন্ত ক্ষীণভাবে বইছে । বছিরকে থার্মোমিটার স্টেথসকোপ আনতে বলল। তুমুল জ্বরের ঘোরেই অচেতন হয়ে পড়ে আছে আয়েশা।

স্টেথসকোপ দিয়ে এবারে বুক দেখল তার।

সারাক্ষণ নিজের সঙ্গে প্রবল লড়াই চলতে লাগল ইদ্রিসের। এ রকম সমস্যায় জীবনে সে পড়ে নি। ডাক্তার হয়ে মাতৃজ্ঞানে নারীকে দেখতে পারছে না, এই সত্যটা ছুরির মতো তার বুকে বারবার বিদ্ধ হতে লাগল। সে বেরিয়ে এলো।

এসে ডিস্পেন্সারী খুলে ওষুধ পাঠিয়ে দিল বছিরের হাতে।

মৌলবি সাহেব একবার কী বলবার জন্যে কাছে এলেন। কিন্তু ইদ্রিসের কঠিন মুখভাব এবং চিন্তান্বিত ভ্রূকুটি দেখে সাহস পেলেন না।

ইদ্রিস এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

অন্ধকারে ভেতরের অস্থিরতা যেন শতগুণ হয়ে উঠল তার। কেবলি এপাশ ওপাশ করতে লাগল সে। একদিকে নিষিদ্ধ আকর্ষণ, আরেক দিকে চিকিৎসকের কর্তব্য। একবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল আয়েশার মুখ, শরীর; আরেকবার মনে পড়তে লাগল প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

লণ্ঠনের আলোয় মোহময়ী হয়ে উঠেছিল আয়েশা। অচেতন হয়ে পড়ে আছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ওপর নেই তাই শাসন বারণ। বৃদ্ধারা খানিকটা ঢেকে-ঢুকে দিয়েছিল বটে কিন্তু তাতে আরো রহস্য সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। চকিতে একটা শুভ্র গোড়ালি দেখা গিয়েছে। দেখেছে ফিকে গোলাপি আভা বাহুমূলের। ভেতরের সুপ্ত যন্ত্রণায় আর জ্বরের উত্তাপে বিযুক্ত হয়ে আছে দুই ঠোঁট— একটা লীলায়িত ভঙ্গিতে কঠিন হয়ে আছে আয়েশা। বালিস ডুবিয়ে বিছানার ওপর ঢলে পড়েছে একরাশ কালো রেশমি চুল। নিটোল গালে নীল শিরা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল তার। একটি মাত্র মুহূর্ত। তার ভেতরে আগুন জ্বলে উঠল। আগুন জ্বলতে তো এক মুহূর্তের বেশি

লাগে না। আর আগুন সবভুক। নীতি, আদর্শ, চেতনা, বিবেক সব সে পোড়ায়— যেমন পোড়ায় কাঠ, মাংস, অরণ্য, মৃত্তিকা।

তার ব্যর্থ বাসরে এই এলায়িত যুবতীকেই সে কল্পনা করেছিল। সে রাতে যদি এমন হতো! সে রাতে যদি সাত বছরের কুশ্রী সেই বালিকার বদলে থাকত আয়েশা!

নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসে ইদ্রিসের । উপুড় হয়ে দুহাতে মাথা চেপে সে শান্ত হবার চেষ্টা করে। দূরে ফেউ ডেকে ওঠে আবার। অন্ধকার বিলে যেন ঢিল পড়েছে— তরঙ্গ কাঁপতে কাঁপতে সুদূরে মিলায়, আবার ফিরে আসে, আবার মিলায়।

শরীরটাকে ঘুরিয়ে চিৎ হয়ে শোয় ইদ্রিস। উঠে বসে। না এ তার ভাবা উচিত নয়। অবাক হয়ে সে লক্ষ্য করে, এতক্ষণ যাকে এড়িয়ে চলেছে, তার হাতেই সে বন্দি। সে আয়েশার কথা ভাবছে।

আয়েশার কথা ভাবা তার উচিত নয়। আয়েশা তার রোগী, সে চিকিৎসক। যে নারীকে মাতৃজ্ঞান করতে না পারবে, তার চিকিৎসা কোরো না। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের ভ্রুকুটি স্পষ্ট দেখতে পায় ইদ্রিস। সে মনে মনে তওবা করে। এক থেকে একশ পর্যন্ত গোনে। আবার একশ থেকে উল্টো দিকে গুনতে গুনতে একে ফিরে আসে। অতীতে যখন তার মনে হয়েছে নিজেকে শাসনে রাখতে পারছে না, চেতনা গুলিয়ে যাচ্ছে, সংকটে অবশ হয়ে যাচ্ছে চিন্তা, তখন এমনি সংখ্যা গণনা করে শান্তি পেয়েছে সে।

আজ সে সংখ্যা গণনা কোন কাজে এলো না।

জীবনে যে পূর্ণিমা সে কামনা করেছে, সে পূর্ণিমা কি এভাবে এলো ?

এ পূর্ণিমা স্নিগ্ধ করে না, পোড়ায়। ছোবল দেয়। শরীর নীল করে দেয় বিষে।

ইদ্রিস একবার ভাবল, পতিদহ থেকে চলে যাবে সে। হাজি সাহেব ফিরে এলে পদত্যাগপত্র পেশ করবে তার কাছে। জীবনে এই প্রথমবারের মত পরাজিত মনে হয় নিজেকে, ধিকৃত মনে হয়। এই ধিক্কার, এই পরাজয় বাইরের কেউ জানুক বা না জানুক তাতে কী ? সে নিজে কী করে বহন করবে এই অপরিসীম গ্লানি। তাকে বড় হতে হবে, ছেলেবেলা থেকে এই কথাটা কানে শুনতে পেত নদীর স্রোতে, অরণ্যের মর্মরে, বাতাসের প্রবাহে। কিন্তু কীভাবে বড় হবে, সেটা আজো জানা হয় নি তার। আজ এই নিশুতি রাতে মনে হলো, সত্য যদি তার সঙ্গে থাকে, নিজের কাছে নিজেই যদি মাথা উঁচু করে থাকতে পারে তবেই সে বড়। তক্ষুণি উঠে সে বাতি জ্বালিয়ে পদত্যাগপত্র লিখল।

লেখার সঙ্গে সঙ্গে অসীম শান্তিতে ভরে উঠল মন। এতক্ষণ চাদর ছিল না গায়ে। তবু শীত করছিল না । এখন শরীরে আবার টের পেল বাতাসের স্পর্শ। গায়ে চাদর জড়িয়ে নিল ইদ্রিস। বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

খোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক দুরন্ত বাতাস কখন অস্থির করে তুলল তার পদত্যাগপত্র। এক সময়ে ঝটপট করে কাগজটা পড়ে গেল মেঝেয়। চৌকির নিচে ঘুমিয়ে থাকা বেড়ালটা সজাগ হয়ে তাকাল চারদিকে। তারপর ঝাপিয়ে পড়ল কাগজটার পরে। তীক্ষ্ণ নখরে কুটিকুটি করে পদত্যাগপত্রটা ছিঁড়ে ফেলল লাওয়ারিশ ক্রুদ্ধ বেড়ালটা।

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ১৯৬২



# দেয়ালের দেশ

লঞ্চ থেকে নেমে যখন নৌকোয় উঠল ফারুক, বেলা তখন পড়তি পহর। তেঁতুলিয়ার শাখা নদী আঁধার হয়ে আসছে। ইলশাঘাটা, লাখুটিয়া, উলানিয়ার নৌকো দুরন্ত পাড়ি জমিয়েছে। কেউবা মাঝরাতে, কেউবা ভোর রাতে পৌঁছবে।

সে তুলনায় ফারুক যাবে অনেক কাছে। টিম্বার মার্চেন্ট আবিদের বাংলোয়। হয়ত ঘণ্টা তিনেকও লাগবে না স্রোত পেলে। নদী এখানে অনেক শান্ত। আকাশের দিগন্ত অবধি তার বিস্তারই শুধু, কিন্তু দক্ষিণের মত জোয়ারের পাহাড়-ঢেউ ওঠে না এদিকে। দেখতেই যা বিশাল। ছোট ছোট নৌকো নিয়ে এমনকি বাচ্চা ছেলেরাও পাড়ি দিয়ে ওপারে যায়। খেলনার মত তাদের নৌকো দেখে বুকে ভর করে ভয়। কিন্তু এখানকার অধিবাসীদের কাছে এ তুচ্ছ। নদী আর অরণ্যের সাথে সংগ্রামই তাদের জীবন। কিন্তু ফারুকের কেমন ভয় ভয় করে। আচ্ছা, এদিকে কি নৌকোডুবি হয় না ? ধরো, আজকেই যদি অমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে ? ফারুক ছইয়ের ভেতরে পাটাতনে শুয়ে ভাবছিল। চোখ বুঁজলো। খানিকটা অবসাদে, খানিকটা হয়ত ভয়ে।

অথবা সে শুনেছে এদিকে নাকি নৌকোয় ডাকাতি হয়। বড় বড় জাঁদরেল পুলিশ সায়েবেরাও নাকি তাদের শায়েস্তা করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যান। সে কথা মনে করলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

ফারুক হাতের আঙটি দুটো নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবে, না এলেই সে পারত। বেশতো ছিল সে ঢাকায়। সব কিছু প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। আজ তিনবছর বাদে সেই ভুলে যাওয়া অতীতটাই তাকে যে এখানে টেনে আনবে তা কে জানতো ? তাহমিনাকে তিনবছর আগেই ভুলে যেতে চেয়েছিল ফারুক।

তাহমিনার এতদিন পরে হঠাৎ আসা এক চিঠিতে এমন করে না বেরিয়ে পড়লেও চলতো।

তাহমিনা লিখেছে, "এতদিন বাদে তোমাকেই লিখছি বলে অবাক হয়ো না ফারুক। তোমাকে আমি জানি। যদি কোনোদিন আমাকে তুমি তোমার বলে ভেবে থাকো, তাহলে এ চিঠিকে তুমি উপেক্ষা করবে না, এ আমি জানি। তোমাকে আমার ভীষণ দরকার। চিঠি পাবার সাথে সাথে এখানে চলে আসবে। জরুরি কাজ। আমার দিব্যি রইল, আসবে নিশ্চয়ই। পথের নিশানা নিচে লিখে দিচ্ছি। তাছাড়া আমাদের বাংলো এ অঞ্চলের সব মাঝিই চেনে। যতো কাজই তোমার থাক, তুমি আসবে ফারুক।"

তাহমিনাদের বাংলো এ নায়ের মাঝিও চেনে।

কিন্তু কী এমন বিপদ তাহমিনার ? আর ফারুকই বা কী করতে পারে ? একথা শুধু এখন নয় ঢাকা থেকেই মনে হয়েছে তার। কিন্তু না এসে পারে নি।

চিঠিটা যেদিন পেয়েছিল সেদিন অনেক রাতে ফারুক তার সুটকেসটা খুলেছিল। তাহমিনা কবে তাকে একটা ছবি দিয়েছিল। খুঁজে পেল না সেটা। ছবি দেয়ার ইতিহাসটা আজো তার মনে আছে। ফারুক একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহমিনাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলেছিল বাগানে বিরাট এক সূর্যমুখীর সোনালির দিকে দেখিয়ে, কবিতা লিখতে ইচ্ছে হয়, তাহমিনা।

তাই ?

হ্যাঁ। এই অন্ধকারের মতই আমার চারদিকে অন্ধকার; আর তুমি যেন সেই অন্ধকারে সূর্যমুখীর মত।

বার থেকে বুঝি তাহমিনার বাবা কামাল সাহেব ফিরলেন। ওধারের বারান্দা থেকে তাঁর ডাক শোনা গেল, মিনু, মিনু মা কইরে ?

তাহমিনা বলেছিল, বাবা বুঝি পেশেন্ট দেখে ফিরলেন। যাই আমি।

যাবে ?

বাঃ! বাবা ডাকছেন যে।

তাহমিনা চলে গেছ। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল ফারুক। হয়ত ও আর শীগগির আসবে না। এখুনি হয়ত কামাল সাহেব চা করতে বলবেন ওকে। তাহমিনাকে না হলে কামাল সাহেবের একদণ্ড চলে না।

কিন্তু তাহমিনা ফিরে এসেছিল একটু পরেই প্রায় দৌড়ে। বলেছিল, আমি ভাবলাম তুমি বুঝি চলে গেল। তারপর একটু থেমে, বলোত আমার হাতে কি ?

ফারুক একটু ভাবল। কিন্তু তার আগে ও নিজেই উত্তর করল, ছবি। আমার ছবি। সেদিন আমরা সবাই স্টুডিওতে গিয়ে তুলেছিলাম। একটা গ্রুপ, আর সবার একটা করে। বাবা প্রিন্ট নিয়ে এলেন এই মাত্তর।

তাহমিনার হাত থেকে ফারুক কেড়ে নিল খামটা। একটু আলোর দিকে সরে বেছে বেছে বের করল তাহমিনার একলা ফটোর তিনটে প্রিন্ট।

তারপর বলল, একটা নিলাম। কাছে রাখব।

তাহলে আর এসো না। ছবিই দেখো। ছবি তো পেলে।

আচ্ছা তাই হবে। আসবো না। যদি তাই চাও।

সেই থেকে ছবিটা ফারুকের সুটকেশে। সে আজ পাঁচ বছর আগের কথা কী তারো বেশি হবে হয়ত।

সেদিন চিঠি পেয়ে রাতে সুটকেশটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছিল ফারুক। কিন্তু ছবিটা পাওয়া যায়নি। অবশেষে তার মনে পড়ল, একদিন সে নিজেই ওটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আর খুঁজতে খুঁজতে চোখে পড়েছিল তাহমিনার আরো দুটো স্মৃতিচিহ্ন। একটা সেলুলয়েডের ছোট্ট স্বচ্ছ কেসে রাখা শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া মধুমল্লিকা। ফারুকের সাথে সন্ধি করে একদিন তাহমিনা দিয়েছিল। কেসের ভেতরে চ্যাপটা আর ম্লান হয়ে গেছে ফুল। বিবর্ণ হয়ে গেছে পাপড়ি। ধূসর হয়ে এসেছে। আর তার পাশে একটা কাগজের টুকরো। যার একপিঠে গোটা গোটা অক্ষরে একদিন তাহমিনা লিখে দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের কবিতার ক'টা লাইন—

কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে।

লেখাগুলো আজো উজ্জ্বল। ফারুকের মনে হয়েছিল, ভালো করে কান পাতলে, আর বাইরের সমস্ত স্বর আর ধ্বনি থেমে গেলে, বুঝি আজো তাহমিনার সুরেলা গলায় সেই আবৃত্তি শুনতে পাওয়া যাবে।

নৌকোর ভেতর থেকে ফারুক আস্তে আস্তে বাইরে এসে বসলো। কিছুই ভালো লাগছিল না তার। বেলে জ্যোছনা ছড়িয়েছে আকাশে। আর সেই আলো-আঁধারে নদীর ওপার হয়ে এসেছে আবছা। মিশে গিয়েছে আকাশের সাথে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বার-দরিয়া দিয়ে নৌকো চলেছে।

এমনি করে আরো ঘণ্টা দুয়েক যেতে হবে। ফারুক একটা সিগারেট ধরিয়ে মাঝিকে শুধালো, কী নাম তোমার ?

ইয়াসিন, হুজুর।

আচ্ছা ইয়াসিন, এ নদীতে কুমির নেই ?

আছে হুজুর। একটু থেমে বলল, কেন আপনার ডর করে নাকি ? ডরের কী আছে ?

না, না। এমনি বলছিলাম ইয়াসিন।

কিছুক্ষণ শুধু দাঁড় টানার শব্দ। কোথাও বুঝি মাটির ধ্বস ভেঙে পড়ল অনেক দূরে।

ইয়াসিনের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কপালের ছায়া এসে পড়েছে চোখের ওপর। চোখের ভ্রু প্রায় পেকে গেছে তার। মাথায় শুধু দু'এক গাছি অগোছাল সাদা চুল। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বয়সের নিষ্ঠুর ছাপ তার মুখে আর সারা দেহে। কুঁজো হয়ে গেছে পিঠ। দাঁড় টানার সাথে সাথে বাহুর মাংসপেশী মোটা কাছির মত ফুলে উঠে দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছিল। ইয়াসিন খানিকটা যেন আপন মনেই বলল, আমাদের সায়েবের কিন্তু কুমির শিকারে ভারী নেশা।

কোন সাহেব ? আবিদ ?

ফারুক একটু উদ্বেগভরা গলায় শুধালো।

ইয়াসিন খানিকটা সলজ্জ হেসে উত্তর করল, গরিব মানুষ, সায়েবের নামে কি দরকার হুজুর ?

কেন খুব রাগী বুঝি উনি ?

ইয়াসিন হেসে মাথা নাড়ল। বলল, না, তওবা তওবা। এই তো সেদিন তাঁর বোটমাঝির অসুখ বলে আমার নায়ে করে বেরিয়েছিলেন শিকার করতে।

হঠাৎ তাহমিনার কথা জিজ্ঞেস করতে লোভ হলো ফারুকের। শুধালো, তোমাদের মেমসাব যান না ?

না, হুজুর। বড় ডর করে নাকি ওনার। সায়েবকে তো উনি কিছুতেই বেরুতে দেন না বন্দুক নিয়ে।

ইয়াসিন বলে চলল তাহমিনার এই ডর করার উপাখ্যান।

একদিন নাকি, কথাটা সে শুনেছে আবিদের বোটমাঝি গফুরের কাছ থেকে, ভোর সকালে উঠেই আবিদ বলেছে শিকারে যাবে। কুমির না, আজ দূর চরে পাখি শিকার করবে সে। তাহমিনাও সাথে যাক এই তার ইচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই যেতে চায়নি ও । আবিদের একটা কথা একটা অনুরোধও শোনেনি। এরপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছে আবিদ, এসে দাঁড়িয়েছে বাংলোর বারান্দায়। সেখানে আবদুল টোটার বেল্ট আর হ্যাট হাতে দাঁড়িয়ে। আবিদ বেল্ট আড়াআড়ি মাথার ভেতর দিয়ে গলিয়ে স্ট্যাপ বেঁধে হ্যাট তুলে নিয়েছে তারপর কী ভেবে আবার ফিরে গেছে শোবার ঘরে। সেখানে তাহমিনা রাতের বাসি বিছানা ভাঁজ করে

রাখছিল। পায়ের শব্দে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিয়েছে ও। আবিদ বলেছে, তাহলে তুমি যাবে না ?

এ কথার কোন উত্তর দেয়নি তাহমিনা।

বেশ, যাচ্ছো না বুঝতে পারছি। কিন্তু মুখে সেটা বলতে বাধে নাকি ? তুমি কী—

ইয়াসিন এখানে বলল, গফুরও ভালো করে জানে না কি কথা হয়েছিল। খানিকক্ষণ বাদেই আবিদ গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এসেছে। সেদিন এলোপাথারি শিকার করেছে সে। রেঞ্জের ভেতরে যা কিছু এসেছে স্থির নিশানা করে ট্রিগার টিপেছে। এমনি করে চর থেকে চরে সমস্ত টোটা শেষ করে বোটে এসে ধপ করে বসে বন্দুক ফেলে বলেছে, বোট ছাড়, গফুর।

হুজুর, পাখিগুলো ?

আবদুল আর গফুর গুলি খাওয়া সব পাখি এনে পাড়ে জড় করে রেখেছিল। গফুর সেদিকে আঙুল তুলে ভয়ে ভয়ে শুধালো। আবিদ বলেছে, আজ ওগুলো সব তোদের দিলাম। নিজেরা যা পারিস রেখে গাঁয়ে বিলিয়ে দিস আমার নাম করে।

'সেদিন আমরা খুব খেয়েছি হুজুর ওনার কৃপায়' ইয়াসিন একটু হেসে বলল। এখনো যে কটি দাঁত তার অবশিষ্ট আছে অন্ধকারে তাই চকচক করে উঠল। কিন্তু তারপরেই কেমন বিষণ্ন হয়ে এলো সে। ভারী গলায় বলল, মেমসাব আমাদের খুব স্নেহ করেন হুজুর। বলতে কী মায়ের ব্যবহার পাই তাঁর কাছ থেকে। কোনদিন দোরে হাত পেতে ফিরিনি। ভাবি. কোনদিন হাসতে দেখি না কেন ওঁকে! তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, থাক ও সব কথা, আমরা গরিব মানুষ দিন আনি দিন খাই—- ও আমাদের ভেবে ফায়দা নেই হুজুর।

ফারুক চুপ করে শুনলো। তার হাতের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল. নতুন আর একটা ধরালো এবার! ভাবলো হয়ত ওর কাছে জিজ্ঞেস করে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। কী হয়েছে ওদের ? পরমুহূর্তেই ভাবলো, না থাক। এতখানি কৌতূহল দেখানো হয়ত ভালো হবে না। কিন্তু শেষ অবধি না শুধিয়ে পারল না।

আচ্ছা ইয়াসিন, তোমাদের সায়েবের কিছু হয়েছে, জানো তুমি ?

কই নাতো। আর জানবোই বা কী করে ? দেড় হপ্তা ধরে অসুখে বেহুঁস হয়ে ছিলাম। গতর খাটিয়ে খাই। আজকেই মাত্তর নাও নিয়ে বেরিয়েছি। পয়লা কেরায়া এই আপনি। কই শুনিনি তো কিছু।

ও।

কেন, খারাপ কিছু নাকি ?

উহুঁ না, এমনি। ফারুক কথাটা সহজ করে দেবার জন্য ঘুরিয়ে মিছে বলল, অনেকদিন কোনো খবর পাইনে, তাই।

আল্লা মালেক।

ইয়াসিন নদীর একটা বাঁক পেরুলো। বোধহয় অর্ধেকটা পথ এসে গেছে তারা।

বাইরের বাতাস কেমন ঠান্ডা আর তীব্র। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ফারুক ছইয়ের ভেতর গিয়ে শুয়ে পড়ল। বিছানাটা পেতে নিয়েছিল নৌকোয় উঠেই। এখন আলস্যে গা এলিয়ে দিল। ছইয়ের ফাঁক দিয়ে একটু আকাশ। জ্যোছনাটা ভারী মিষ্টি। অপলক, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায়।

ফারুক সেদিকে তাকিয়ে রইল। পিঠের নিচে তরল নদীর স্রোত আর ঢেউ ভাঙার একটানা শব্দ। দূরে আকাশে একজোট কয়েকটা তারা দুলছে।

।।৩।।

এই সেদিন অবধি আমিনবাগের এই এলাকা ছিল পাড়াগাঁর মতন। কাঁচা রাস্তা। কলার ঝোপ, কাঁঠালের গাছ। এখন সেখানে নতুন পীচের রাস্তা হয়েছে। রাতারাতি উঠেছে দালান— কোঠা। রাজধানী ঢাকা এখন প্রসারিত এই আমিনবাগ অবধি। দোতলা হলুদ জাপান কনসুলেট পার হয়ে রাস্তাটা ঘুরে চলে গেছে মতিঝিল কলোনির ভেতর। সকাল দুপুর বিকেল সবসময়েই এলাকাটা কেমন নিঝুম নিঃশব্দ হয়ে থাকে।

পার্টিশনের পর পরই এই এলাকায় জমি কিনে ছোট্ট একতলা বাড়ি করেছিলেন তাহমিনার বাবা ডাঃ কামাল আহমেদ। সামনে অনেকটা জমি। সেখানে বাগান। তেকোণ ইটের বৃত্তের মাঝখানে একটি কী দুটি গোলাপ ফোটা গাছ, মধুমল্লিকা, রজনীগন্ধা, সূর্যমুখী, আরো কত কী। একদিকে একটা শিশু খেজুরের চিকচিক সরু সবুজ।

একধারে গ্যারেজ। আসমানি রঙের মরিস মাইনরে করে পেশেন্ট দেখতে বেরোন কামাল সাহেব। তাহমিনা যায় ভার্সিটিতে। বড় ছেলে জাকি যায় অফিসে। কখনো কখনো মেজ ছেলে লাবলু চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যায় এই মরিসে করে। গেল বছর পাশ করে অবধি লাবলু এখনো বসে আছে। তাকে, কামাল সাহেব বলেন— হবে, হবে, সবই হবে, অত তাড়াহুড়ো করতে নেই। লিলির স্কুল থেকে বাস আসে। বাসে করেই যায় সে। মালেকাবাণু খুব কম বেরোন গাড়িতে। তবুও গাড়িটার বিরাম নেই। চব্বিশ ঘণ্টা চলার ওপরেই আছে।

ভোর সকালেই দিনকার খবরের কাগজ হাতে করে মরিসে গিয়ে বসেন কামাল সাহেব। বাসায় বসে পড়বার মত সময়ও তাঁর হয় না। ফেরেন দুপুরে একঝলকের জন্যে। তারপর সেই যে যান, আসতে আসতে রাত ন'টা দশটা। তাই সংসারের সবকিছু, সব ভার মালেকাবাণুর হাতে। রান্না থেকে শুরু করে ড্রয়ার থেকে খরচের টাকা বের করে নিখুঁত হিসেব রাখা থেকে, জাকি আর লাবলুর মনমত রঙ জেনে বিছানার বর্ডার সেলাই করা অবধি সব কিছু সারাদিন করেন তিনি। ওটা ফুরুলো, এটা আনতে হবে; অমুকের অমুক দরকার; আজ লাবলুর গোটা দশেক টাকা দরকার; তাহমিনা নতুন একটা শাড়ি দেখে এসেছে— সব যেন মালেকাবাণুর জানবার কথা। সব যেন তাঁরই করবার কথা। অথচ এতটুকু অভিযোগ নেই কোনোখানে। এত চুপচাপ থাকেন যে, তিনি যে আছেন তা চট্ করে অনুভব করা যায় না। অথচ না থাকলে মনে হয় কোথায় যেন কি নেই।

মালেকাবাণুকে দেখে প্রথম দিনই ফারুক মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাহমিনা বলেছিল, আমার মার মত আর দুটি মা হয় না। দেখবে তোমাকে কত আদর করেন উনি।

ফারুক পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বলেছিল, আপনার কথা ওর মুখে অনেক শুনেছি খালাআম্মা। কেউ দেখিয়ে না দিলেও চিনতে আমার এতটুকু কষ্ট হতো না।

উত্তরে মালেকাবাণু হেসেছিলেন। বসতে দিয়েছিলেন নিজের হাতে শেলাই করা আসন পেতে। তারপর একটা পিরিচে করে ফল কেটে এনে দিয়েছিলেন।

তোমার সাথে আলাপ হয়ে ভারী খুশি লাগল ফারুক। উনি এখনো ফেরেননি, নইলে দেখতে এতক্ষণ ওর সাথে বসে গল্প করতে হতো তোমায়।

কেন খালাআম্মা ?

ফারুক গ্লাশ নাবিয়ে রাখল। তাহমিনা বারান্দায়, এখান থেকেই তার শাড়ির মৃদু ভাঁজ ভাঙার শব্দ আসছিল। মালেকাবাণু বললেন, জানো না, সেদিন আমরা সবাই তো তোমাদের নাটক দেখতে গিছলাম। তাহমিনার সাথে যে তুমি অভিনয় করবে তা আমরা আগেই ওর কাছ থেকে শুনেছিলাম।

ও। ফারুক সলজ্জ হাসলো, বলল, কেমন লেগেছিল ?

ভালো, খুব ভালো। উনিও তোমার কথা বলছিলেন সে রাতে।

তাই নাকি ? সে আমার সৌভাগ্য।

এমন সময় বাইরে কার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। এক জোড়া জুতোর হালকা ছন্দময় ধ্বনি। ফারুক হঠাৎ কথা থামিয়ে কান পাতল। মালেকাবাণু গ্লাশ আলমিরার তাকে রাখতে রাখতে বললেন, জাকি ফিরল। মিনুর বড় ভাই। বার্মাশেলে ভালো মাইনেয় কাজ করছে। অফিস থেকে এলো।

ও। তারপর একটু থেমে বলল, লাবলু কোথায় ? বাসায় নেই ?

ওমা, তুমি সবাইকে চেনো দেখছি।

ফারুক যেন লজ্জিত হলো। মাথা নিচু করল একটু। উনি বললেন, কোথায় আড্ডা মারছে কে জানে। পাশ করে অবধি তো ঐ এক কাজ তার। বাবুর এখন একটা কাজ হলেই বাঁচি।

হয়ে যাবে শীগগিরই। আজকাল কাজ পেতে অমন একটু আধটু দেরি হয়ই খালাআম্মা।

লাবলুকে দেখেছ তুমি ফারুক ?

না।

দেয়ালে একটা ফটোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, অই তার ছবি। আর এদিকেরটা জাকির।

ফারুক সেদিকে তাকিয়ে বলল, লাবলু কিন্তু ঠিক আপনার মত দেখতে হয়েছে।

বলো কি, ছবি দেখেই ? মালেকাবাণু স্নেহের এবং হয়ত একটু আত্মগর্বের হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, তুমি একটু বসো, আমি পিরিচ রেখে আসিগে।

আচ্ছা।

ফারুক চুপচাপ বসে আসনে নখের আঁকিবুঁক কাটতে লাগল। এমন সময় বারান্দায়, দোরপর্দার একটু দূরে, কার গলা শুনতে পেল সে। হয়ত জাকির স্বর। তাহমিনাকে বলছে, লোকটা কে রে মিনু ?

জাকির প্রশ্নের সুরটা কেন যেন ভালো লাগল না ফারুকের। একটু অস্বস্তি বোধ করল সে। নড়েচড়ে পিঠ সোজা করে বসলো। আর তার প্রশ্নের উত্তরে তাহমিনা নিচু গলায় কি বলল তা ভালো করে শুনতে পেল না। কিন্তু পরক্ষণেই জাকির গলা আবার শোনা গেল, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। তাই বলে বাসায় আনবি ? যা খুশি তাই করগে।

কী বকছ, দাদা। আস্তে বলো, শুনবে ও।

পায়ের শব্দ শুনে বোঝা গেল জাকি সাথে সাথে চলে গেল। তারপরেই পাশের কামরা থেকে গুনগুন শোনা গেল তার। হয়ত কাপড় বদলাচ্ছে জাকি। একটু পরেই ঘরে এসে ঢুকলো তাহমিনা। ভার্সিটি থেকে যখন দু'জনে বেরিয়েছিল, তখন ওর পরনে ছিল অসম্ভব নীল রঙের বিনিপাড় শাড়ি। মাথায় নীল টেপ। দু'দিকে বিনুনি করা। আর পায়ে সমতল হালকা স্ট্রাপ দেয়া স্যাণ্ডেল। এখন সে তা বদলে ফেলেছে। শুধু সাদা একটা শাড়ি। চওড়া ফ্যাকাশে লালপাড় দেয়া। মাথার সেই বিনুনি খুলে ফেলেছে। ঢেউয়ের মত একরাশ চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। মুখের মিহি প্রসাধনটুকু মুছে গিয়ে এখন সেখানে শুধু শুভ্রতা। তাহমিনা এসে ঠিক মাঝখানে দাঁড়াল ক্ষণেক। ফারুক তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তাহমিনা বলল, কই আমাদের বাড়িটা কেমন বললেন না তো ?

ভারী নিরিবিলি। আরো বলব ? আশ্চর্য গোছানো। থাকতে ইচ্ছে করে। শেষের কথাগুলো বলল নিচু গলায়।

তাহমিনা একটু এগিয়ে এলো, তাই নাকি ? আমার কিন্তু মোটেই পছন্দ হয় না।

কেন ?

তাহমিনা দূরে চৌকির বাজু ধরে বসে বলল, ইতস্তত কপট সুরে, যা নিরিবিলি। একটু যদি পড়তে পারা যায় মন দিয়ে।

অবাক করলেন। ফার্স্ট ইয়ারে এসেই পড়াশোনা ?

কেন না ? ইংরেজি অনার্স কি খুব সোজা নাকি ?

মোটেই না, মোটেই না।

ফারুক মাথা দোলালো হাসতে হাসতে। তারপর বলল, যাই বলুন, আমি নিজে থার্ড ইয়ারে উঠেও কিন্তু পড়ায় মন দিতে পারছি না। কেমন যেন হতেই চায় না।

তাহমিনা একটু উদ্বেগভরা স্বরে বলল, পাশ করবেন কী করে ? মানে, ফার্স্টক্লাশ নিতে হবে তো ?

দরকার নেই আমার।

ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকলেন মালেকাবাণু। শুধালেন, কি দরকার নেই ফারুক ?

পরীক্ষায় ফার্স্টক্লাস, খালাআম্মা।

কেন ?

মালেকাবাণু এসে আবার বসলেন ফারুকের সাথে কথা বলতে। আর তাহমিনা প্রায় সারাক্ষণ চুপ করেই রইল বসে। সন্ধ্যা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরের রাস্তা। বিদ্যুতের আলোয় উজ্জ্বল হয় উঠেছে। পথের পীচ দেখাচ্ছে কেমন নীলাভ। কেউ কেউ হাঁটছে। একটা দামি মোটর বেরিয়ে গেল। চারদিকের বাতাসে কেমন মিষ্টি ফুলের গন্ধ।

আরো কিছুক্ষণ পরে ফারুক উঠল। মালেকাবাণু আবার একদিন আসতে বলে দোর অবধি এগিয়ে এলেন। আর গেট অবধি এগিয়ে দিতে এলো তাহমিনা একেলা। গেটের এ পাশে দাঁড়িয়ে সে বলল, এসে কিন্তু মার সাথেই শুধু গল্প করে গেলেন। ভারী স্বার্থপর আপনি।

তাই নাকি! জানা ছিল না আমার।

এক মুহূর্ত দুজনে চুপ। ছোট্ট লিলি বাইরে থেকে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। একবার তাকাল দুজনার দিকে। তাহমিনা শুধালো, কোথায় গিছলি রে? সারা বিকেল পাত্তাই নেই।

অইতো, রানুদের বাসায়। জানো রানুরা আজ–

থাক এখন। পড়তে যা!

লিলি বুঝি উৎসাহে বাধা পেয়ে ক্ষুণ্ন হলো। বলল, বারে যাচ্ছি তো।

লিলি চলে গেল মুখ ভার করে। ফারুক হেসে বলল, মিছেমিছি মন খারাপ করে দিলেন বেচারির।

যা দুষ্টু। আপনার কিন্তু অনেক সময় নষ্ট হলো আজ।

দূর। চলি তাহলে।

আচ্ছা।

তাহমিনা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে উঠে এলো বারান্দায়। জাকি সেখানে বেতের চেয়ার টেনে দেয়াল-আলোর নিচে ইংরেজি পত্রিকা ওলটাচ্ছিল। চোখ তুলে বলল, চলে গেল নাকি?

হুঁ।

মালেকাবাণু ঘরে উঠে আসছিলেন। তাহমিনা তাকে বলল, আচ্ছা মা, দাদা কী রকম লোক বলোত?

কেন কি হয়েছে এরি মধ্যে আবার?

তখন যে ওসব বলল, যদি শুনে থাকে, তাহলে কী ভাববে? কাল ভার্সিটিতে মুখ দেখাতে পারব?

কি বলেছে শুনি?

কি আবার বলবে? তোমার ছেলের কাছ থেকে শোনো।

তাহমিনা গটগট করে তার নিজের কামরার দিকে চলে গেল। জাকি আবার চোখ ফিরিয়ে নিল কাগজের ওপরে। মালেকাবাণু ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। বুঝতে পারলেন না কি ব্যাপার? আর তাহমিনাই বা এতক্ষণ খুশি থেকে হঠাৎ ছুতনো কথায় মুখভার করে চলে গেল কেন? কিন্তু পরমুহূর্তেই অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটে উঠলো তাঁর ঠোঁটে। যেন কী একটা হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

।।৪।।

ফারুক হঠাৎ জেগে উঠল ইয়াসিনের কণ্ঠস্বরে। ইয়াসিন তাকে কয়েকবার ডাকল, হুজুর, হুজুর, ঘুম গেলেন নাকি?

কিছুটা সময় লাগল তার সেই ঘোর ভাঙতে। কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল, আচ্ছন্ন হয়েছিল। এখন চোখ মেলে তাকাল। ছইয়ের ভেতরটা কী অন্ধকার। পাশ ফিরে তাকাল বাইরে। সেই যে তারাগুলো দুলছিল এখন তাদের আর দেখা যাচ্ছে না। তার বদলে অনেক নিচে দিগন্তের কিছু ওপরে একটা বিরাট নিঃসঙ্গ তারা ধ্বক ধ্বক করছে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম তার একটা রেখা এসে বুঝি পড়েছে নদীর জলে, নৌকোর কিনার অবধি। আর ফারুক যেন কিছুই শোনেনি।

ভাবতে লাগল অতীতের কথা। ইয়াসিন আবার একবার ডাকল। ফারুক এবার বলল, না, ইয়াসিন ঘুমোই নি। ভাবছিলাম। আচ্ছা আর কতক্ষণ লাগবে তোমার পৌঁছুতে ?

বেশি না হুজুর। আর ঘণ্টা খানেক।

ও।

আপনি ঘুম যান। নৌকো একেবারে সায়েবের বাংলোর কাছে গিয়ে লাগবে। আপনাকে ডেকে দেব।

আচ্ছা। তুমি বাও।

ফারুক আবার শরীর শিথিল করে এলিয়ে দিল। কেমন ভার হয়ে এলো তার চোখ। স্রোতের টানে বয়ে যাচ্ছে নৌকা। আর এক বিচিত্র শিরশিব অনুভূতি সে স্পষ্ট অনুভব করতে লাগল শিরায় শিরায়। কেমন ঝিমঝিম একটা সুর তরংগের মত। রাতের এই প্রহর পেরিয়ে নদীর দুই পাড় ছাপিয়ে তীরের দীর্ঘ একেকটা গাছের সারের ভেতর দিয়ে সেই সুর যেন অনন্তকাল প্রবাহিত হয়ে গেল।

ইয়াসিন দাঁড় টানছে আস্তে আস্তে। অল্প শব্দ উঠছে। এবার গুনগুন করে গান ধরল—

"ও আমার গুরুর কথা বলবো কী,
আমার ভরিয়া গেছে দুই আঁখি।"

সেই গুনগুন এসে কোমল মূর্চ্ছনা তুলল ফারুকের ভেতরে। সে তন্ময় হয়ে গেল। ইয়াসিন এবার আরো স্পষ্ট করে গেয়ে উঠল,

"ও বোবায় যেমন স্বপ্ন দেখে
মনের আগুন মনে রাখে
আমারও ভিতরে তেমনি–"

ক্রমে উদাত্ত হয়ে এলে তার কণ্ঠস্বর। ভারী হয়ে নামলো ফারুকের বুকের ভিতরে। সে নিঃসাড় পড়ে রইল। ডুবে গেল ক্রমে ক্রমে। ইয়াসিনের গলা যেন অনেক অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। একসময় বুঝি আর সে শুনতে পাবে না। ধীরে ধীরে চোখের পাতা ভার হয়ে এল তার।

।। ৫ ।।

সামনের বাগানে ছোট ছোট নিচু টেবিলের পাশে রাখা চারটে করে হালকা চেয়ার। বাইরের বারান্দায় ডান দিকে বিছানো দামি কার্পেটের ওপর ধবধবে রেশমের চাদর। আর বসবার ঘরটাও আজ নতুন করে সাজানো হয়েছে। লিলির আজ দশম জন্মতিথি। তাহমিনা আর মালেকাবাণু নিজ হাতে সাজিয়েছেন সব। ফুলদানিতে বিরাট তোড়া বেঁধেছে তাহমিনা মধুমল্লিকা আর গোলাপের। জানালা দরজার পর্দাগুলো বদলে দিয়েছে। কামাল সাহেব সময় পান না মোটে। এদিকে চোখ দেবার মত অবসর তাঁর নেই। তবু আজ বিকেলে কোথাও বেরুবেন না তিনি। বিকেলেই পার্টি হবে। মালেকাবাণুই ঘুরে ঘুরে সব ব্যবস্থা করছেন। আর এই সময় কাজে লাগছে লাবলুকে। মরিস নিয়ে হৈচৈ করে সব আনতে কুড়োতে ঠিকঠাক করতে লেগে গেছে সে।

সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে, লিলিকে দর্জির কাছ থেকে আনা নতুন ফ্রক পরিয়ে চুল বেঁধে প্রসাধন করিয়ে যখন ছেড়ে দিল তখন তাহমিনা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর বিকেল প্রায় হয়ে এলো, একটু পরেই সবাই আসতে শুরু করবে। মালেকাবাণু বললো, এবার একটু নিজকে দেখগে তুই। খেটে খেটে যে একেবারে হয়রান হয়ে গেলি।

ত হাসতে চাইল, কিন্তু দেখাল ম্লান।

যা তুই এখন মুখ ধুয়ে চট করে কাপড় পরে নে। দেরি করিস নে। সকলে এলো বলে।

তাহমিনা বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। আস্তে আস্তে সাবান দিয়ে ঘষে উজ্জ্বল করে তুলল মুখশ্রী। অলস একক বেণি বেঁধে চক্রাকারে সাজিয়ে দিল মাথার পেছনে। আয়নায় তাকিয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর সরে এসে শাড়ি পড়ল অনেকক্ষণ ধরে। ছাই-ছাই-নীলাভ রঙের শাড়ি। রূপোলি বর্ডার দেয়া। তার সাথে মানিয়ে পরল বাহুতে সোনালি রঙের কাজ করা সাদা সাটিনের উন্নত চায়না কলার চোলি।

অলস, কিছুটা উদাস পায়ে বাথরুমের দরোজা ভেজিয়ে ভেতরে বারান্দা ঘুরে বাইরের বারান্দায় এসে যখন দাঁড়ালো, তখন মুখোমুখি পড়ে গেল ফার রের। চোখ নামিয়ে নিচু গলায় শুধালো, কখন এলে তুমি ?

এই তো এখুনি।

বোসো কোথাও।

তোমাকে আজ ভারি সুন্দর লাগছে তাহমিনা। মনে হচ্ছে দেখিনি এর আগে।

যাও। কেউ শুনবে।

ফারুক হাসল। একটু পর শুধালো, লিলি কই ?

ভেতরে। পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি বোসো।

তাহমিনা চলে গেল। আর একটু পরেই প্রায় ছুটতে ছুটতে এলো লিলি। বলল, আপনি সক্কলের আগে এসেছেন কিন্তু।

তাই নাকি ? বলো তো কি এনেছি ?

ফারুক তার হাতের প্যাকেট পেছনে লুকিয়ে শুধালো। লিলি প্রায় গোড়ালিতে ভর করে উদগ্রীব হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। প্রেজেন্টশন টেবিলের দিকে এগিয়ে ফারুক রাখলো তার হাতের বই ক'খানা। তারপর লিলিকে কাছে ডাকলো। পকেট থেকে বের করলো একটা নীল কেস্। উজ্জ্বল একটা লাল পাথর বসানো ছোট্ট তারার লকেট। ওপরে কালো সিল্কের চওড়া টেপ পরানো। লিলির গলায় টেপ বেঁধে, তারাটা ঠিক মত বসিয়ে ফারুক ফিসফিস করে বলল, কেমন হয়েছে লিলি ?

ভালো।

শুধু ভালো ? খুশি হওনি ?

লিলি দৌড়ে চলে গেল ভেতরে।

একটু পরে কামাল সাহেব ফিরলেন। জাকি ফিরলো অফিস থেকে ছুটি নিয়ে। লাবলু ফিরল মরিস নিয়ে। মালেকাবাণুর সাথে ছোট্ট দেখা হলো ফারুকের। আস্তে আস্তে বাইরের সবাই এসে গেলেন। বিকেল হলো পাঁচটা। ভরে উঠলো প্রেজেন্টশনের ছোট টেবিল।

শেষ হলো লিলির ছোট্ট জন্ম-উৎসব। বেলা এখনো পড়ে নি। ফারুক চলে যাচ্ছিল, তাহমিনা ভেতর থেকে এসে আড়ালে বলল, দাঁড়াও, আমিও বেরুবো।

আজ ওর জন্মদিন গেলো। নাইবা বেরুলে।

বড্ড বিশ্রী লাগছে ফারুক। না বেরুলে মরে যাবো। এক কাজ করো, তুমি জাপান কনসুলেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকো, আমি আসছি।

মালেকাবাণুর সাথে আরেকবার দেখা করে এলো ফারুক।

কিছুক্ষণ পরেই এলো তাহমিনা।

এসো রিকশা করি।

কোথায় ?

চলো না যেখানে বেরিয়ে আসা যায়। একটু নিরিবিলি।

অবশেষে মতিঝিলের জন্য রিকশা নেয়া হলো। রিকশায় উঠে তাহমিনা গলা ফিরিয়ে বলল, তোমাকে আগে আসতে বলেছি কেন জানো ? ওরা বেরুতে দিত না এখন। বলে এলাম ক্লাশের এক মেয়ের কাছে যাচ্ছি। খুব দরকার আছে। বাবা বলে দিলেন, তাড়াতাড়ি ফিরিস।

তুমি কী বললে ?

বললুম আর ফিরব না। তাহমিনা মিষ্টি হাসল।

ফারুক একটু পর বলল, হেঁটে গেলেই পারতুম। বেশ হতো।

দূর, রিকশাই ভালো। ঢাকা শহরটা দিন দিন এমন হয়ে যাচ্ছে যে পথ চলা ভার। শুধু ভিড় আর ভিড়। রিকশাওয়ালাকে সে ভিড় সরাবার ভার দিয়ে তবু নিশ্চিন্ত মনে গল্প করা যায়।

ফারুক কিন্তু এর উত্তরে কিছুই বলল না। তাহমিনা একটুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে তারপর চিবুকে ভাঁজ তুলে শুধালো, কি হলো তোমার, কথা বলছ না যে বড় ?

না কই। কী যে বলো।

তাহমিনা ভ্যানিটি ব্যাগ খুললো। তুলে নিল একটা মধুমল্লিকা সেখান থেকে। বলল, নাও সন্ধি করলাম।

কিসের ?

যদি কোন অপরাধ করে থাকি, তার। এই আমার সন্ধির পতাকা।

একবার কপোলে সেই ফুল বুলোলো তাহমিনা। তারপর ফারুককে দিয়ে হেসে বলল, আশা করি পতাকার অমর্যাদা হবে না।

সে ভয় নেই তাহমিনা।

ওরা গিয়ে থামল মতিঝিলের মাঠে। সবুজ ঘাসের ওপরে এক কোণে গিয়ে পা ছড়িয়ে বসলো দুজনে। সন্ধ্যে নামছে আস্তে আস্তে; পথে এখনো বাতি জ্বলে নি। দূরে দু'একটা ফ্ল্যাটে শুধু আলো দেখা যাচ্ছে। আর একটা অস্পষ্ট কোলাহল— মানুষ আর যানবাহনের— সুদূর ঢেউয়ের মত এসে তাদের চারধারে ছড়িয়ে পড়ছে। কেউ তারা বলছে না কোন কথা। যেন চুপ করে থাকাই ভালো এখন। ভায়োলেট রংয়ে আঁকা সারাটা সুনীল এখন। ফারুক বলল, জানো তাহমিনা, এই সন্ধ্যের মন-কেমন-করা এক আবছা গান আছে। কী যেন শুধু বলতে ইচ্ছে করে। করতে সাধ হয়।

কী ? মৃদু কম্পিত গলায় বুঝি তাহমিনা উত্তর করল।

ঠিক কী যে বলতে চাই তা নিজেও জানিনে।

ও হাসল। মিষ্টি করে হাসল। নিস্তব্ধ দুজনে। অনেকক্ষণ পরে ফারুক উচ্চারণ করল, দেড় বছর ধরে আমরা আলাপিত। এমনি কতদিন আমরা বেরিয়েছি বেড়াতে। হেঁটে গেছি অনেক দূর অবধি। কোনদিন রমনায়। কোনদিন সেই দয়াগঞ্জের রেল লাইন ধরে, পায়ের নিচে শহরতলির বাজার রেখে অনেক দূরে। কথা বলেছি। আমার সব কথা বলেছি তোমাকে।

তাহমিনা ভ্যানিটি ব্যাগের স্ট্র্যাপ নাড়তে নাড়তে জমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি চাও ফারুক ?

আমি তোমাকে ভালবাসি তাহমিনা।

আর সে কথা বলল না। কিছুই বলল না। শুধু তার বুকের ভেতরে যেন ছড়িয়ে পড়ল মিঠে ব্যথার মত একটা অনুভূতি। ফারুক চুপ করে থেকে তাহমিনার নীরবতাকে অনুভব করতে চাইল। অনেকক্ষণ পর মুখ ফিরিয়ে বলল, জানো তাহমিনা, আজ আমার অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কেন যেন মেলা বকতে ভালো লাগছে।

তুমি বলো ফারুক। আমি কোনদিন তো না করিনি।

দেড় বছর কেটেছে আমাদের স্বপ্নের মত। কিন্তু জানো কথাও একদিন ফুরিয়ে যায়। বলবার শোনবার কিছুই আর বাকি থাকে না। তখন মুখোমুখি শুধু। আর কী জানো এমন একটা দাবি গড়ে ওঠে, আরো কাছে তাকে পাবার জন্য। তোমাকে আমি আরো ঘনিষ্ঠ করে একান্তভাবে চাই তাহমিনা। আর কতদিন কাটবে ?

কী জানি!

কিন্তু তুমি আমার হও তাহমিনা। তোমাকে আমি পরিপূর্ণ করে পেতে চাই মিনু।

এই প্রথম তাকে ও ডাকল মিনু বলে।

দূরে বাঁশের বেড়া দেয়া ছোট ছোট রেস্তোরাঁয় বাজছে গ্রামোফোন। মিহি আবছা সুর আসছে ভেসে। দুপুরে আকাশ ছিল সিলভার গ্রীন। একটু আগেই কোমল ভায়োলেট। আর এখন সেখানে প্রুসিয়ান ব্লু। দু'একটা সোনালি তারার ডট্। ফারুক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো তার পাশে। অনুভব করতে চাইল তার দেহের উত্তাপ। সান্নিধ্য। অনেকদূরে ইঞ্জিনের বাজল সিটি। নারায়ণগঞ্জ থেকে বুঝি ছ'টা চল্লিশের লোকাল আসছে। তাহমিনা আবছা গলায় উচ্চারণ করল, আমি বড় নিঃসঙ্গ ফারুক। তুমি আমাকে একেলা থাকতে দিও না।

আরো অনেকক্ষণ তারা বসে রইল সেই অন্ধকারে সবুজ ঘাসের ভিতরে। একসময়ে উঠে এলো দু'জনে। কলোনির ভিতরে সোজা নির্জন পথের পাশ দিয়ে আমিনবাগের দিকে হাঁটতে হাঁটতে তাহমিনা বলল, এত একেলা নিজেকে আর কোনদিন মনে হয়নি। আজ সারা দুপুর আমার কেটেছে কী নিঃসঙ্গতায়।

আমার ও মিনু। বিকেলে তোমার সাথে দেখা হবে, তবু মনে মনে উন্মন এসে ভর করছিল আমার।

আমার এই নিঃসঙ্গতা তুমি মুছে দিও!

আমি তোমাকে পরিপূর্ণভাবে পেতে চাই তাহমিনা। আমাকে বড় হতে হবে! তোমাকে পেয়ে আমি বড় হবো।

তাহমিনা তার উত্তরে বলল, তুমি এমনিই বড়। তোমাকে আমি বড় করব সে সাধ্য আমার নেই। সে ভার আমাকে তুমি দিও না।

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ হাঁটল তারা। উঠলো রাস্তায়। হুহু করে বাতাস বইছে। বাতাসে কপালের কাছে চূর্ণচুল উড়ছে তাহমিনার। বাঁ হাতে আনমনা সে সরিয়ে দিল। ফারুক বলল, শেষ পরীক্ষা তো হয়ে গেল। এবার জীবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হবে। তুমি পাশে এসে না দাঁড়ালে, আমি জানি, হেরে যাব।

দূর, কী যে বলো।

হঠাৎ ফারুক বলল, সুর বদলিয়ে, এক কাজ করি কী বলো ?

কী ?

খালাআম্মাকে বলি।

কী বলবে ?

তাহমিনা গতি শ্লথ করে তাকে শুধালো আয়ত চোখ দীর্ঘতর করে।

বাঃ, কী বলব জানো না বুঝি ?

বলতে পারবে ?

কেন পারব না ? তুমি বললেই পারব। বলো না তুমি।

তাহমিনা সলাজ হেসে বলল, যাঃ ফাজিল কোথাকার! আমার লজ্জা করবে না বুঝি ? তুমি যে কী।

ফারুক একথার উত্তরে তাহমিনার হাত তুলে নিল তার মুঠোয়। হাসল। প্রথমে আস্তে। তারপর একটু জোরে। আর তার মুঠোর ভিতরে জড়িয়ে রইল তাহমিনার দীর্ঘ আঙুলের উষ্ণ কোমলতা।

।। ৬ ।।

এর প্রায় ছ'মাস পরের কথা। দীর্ঘদিন জ্বরে ভুগে স্বাস্থ্যের জন্য ফারুক গিয়েছিল কক্সবাজারে মাসখানেকের জন্যে। সেখান থেকে ফিরে এসে কথাটা শুনল। কিছুই সে জানে না। তাহমিনাও তাকে জানায়নি। তাহমিনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে সুন্দরবনের টিম্বার মার্চেন্ট আবিদ চৌধুরীর সাথে। আসছে মাসের পনেরো তারিখেই বিয়ে।

প্রথম যখন কথাটা শুনলো ফারুক, তখন কিছুই মনে হয় নি তার। কিছুই ভাবতে পারেনি। অবিশ্বাসও করেনি। যেন কথাটা তার জানাই ছিল। যেন সে সব কিছুই জানতো। কিন্তু সেদিন রাত্রে সে পরিষ্কার করে পাতা নিখুঁত বালিশ সাজানো বিছানায় গিয়ে শুতে শুতে অনুভব করল হঠাৎ কোথায় যেন কী ভুল হয়ে গেছে। স্থির একপাশে মুখ ফিরিয়ে সে ভাবল। সে কিছুই ভাবতে পারল না। তাহমিনা কেন তাকে কিছুই লিখল না ? এই কথা বারবার তার বুকের ভেতরে অশান্ত হয়ে রইল। একটা দম আটকানো শক্ত কিছু যেন গড়ে উঠলো ভেতরে, ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। সে চুপচাপ পড়ে রইল বিছানায়, অন্ধকারে।

দুদিন বেরুলো না কোথাও। যেন তার সব কাজ ফুরিয়ে গেছে, আর কিছুই করবার নেই।

বারান্দায় মিষ্টি রোদে ইজিচেয়ার টেনে বসে রইল সামনের দিকে তাকিয়ে। মা এসে একবার বললেন, কিরে এখনো ভালো লাগছে না তোর ?

কই নাতো। ভালো হয়ে গেছি আমি।

ফারুক হেসে উত্তর করল মার দিকে তাকিয়ে।

তাহলে বেরোস না যে কোথাও ?

কোথায় আর যাবো মা ? পাশ করেছি। কাজের জন্য দরখাস্ত করেছি। উত্তর না এলে আর নড়ব কোথায় ?

তোর যত সব সৃষ্টিছাড়া কথা। কেন দুদণ্ড বাইরে বেরুলে ক্ষতিটা কী ? এমন করে বসে থাকলে শরীরটা যে ভেঙে ফেলবি বাবা।

মাত্তর দু'দিন তো এসেছি। এই মধ্যেই কী বেরুবো ? যেতে দাও আর ক'টা দিন, তারপর।

মা ক্ষুণ্ন হয়ে চলে যান। ফারুক তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। পায়ের কাছে এখনো শূন্য চায়ের কাপ পড়ে রয়েছে। বিনষ্ট। রোদে দেখাচ্ছে উজ্জ্বল। কিন্তু দূরে পাঁচিলের ওধারে শিরীষের ডালে বাতাসের অগুনতি খুশি। না সে আর দেখা করবে না তাহমিনার সাথে। ভুলে যাবে তাকে। তাহমিনা যদি তার জীবনে না আসতো কোনদিন, তাহলে সে কী করতো ? ও ভাববে এখন থেকে তাহমিনা বলে কাউকে সে কোনদিন চিনত না। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হলো আত্মপ্রবঞ্চনা করছে সে।

না, এ তার আত্মসংযম— ফারুক ভাবলো। আর এমনি হাজারো ভাবনার ভেতরে একটা অনুভূতিই স্থির হয়ে রইল ব্যথাবিদ্ধ তারার মত, সে আজ থেকে একেলা। কোথাও যাবার নেই। করবার নেই। কথা বলবার কেউ নেই। সে নিঃসঙ্গ।

তারপর, যখন দুপুর হলো শিরীষ ডালের ওপর, তখন ফারুক ঠিক করল তাহমিনার সাথে সে দেখা করবে। জিজ্ঞেস করবে সব কিছু। চুপ করে সে থাকবে না।

একটু পরেই বেরুলো সে। মা বললেন, কিরে বেরুচ্ছিস বুঝি ?

হ্যাঁ, তুমিই তো তখন বলছিলে, তাই।

মা হাসলেন। ফারুক বেরিয়ে এলো।

তোপখানা রোডে প্রেসক্লাব পেছনে রেখে তার রিকশা মোড় নিল, সেই ছোট্ট বেগুনি ফুলের বিরাট গাছটার পাশ দিয়ে। পাসর্পোট অফিস পেরিয়ে সারকিট হাউসের কাছে এলো রিকশা। আর কিছুক্ষণ গেলে পরেই পৌঁছুবে সে তাহমিনাদের একতলার সামনে। এই মুহূর্তে হঠাৎ এক বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা কিংবা হয়ত শংকা তাকে ভর করল।

ছেড়ে দিল রিকশা। তারপর আবার উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

সেদিন দুপুরেই অপ্রত্যাশিতভাবে তাহমিনার সাথে মুখোমুখি হয়ে গেল ফারুক ইউকালিপটাস এভেন্যুর ওপর। ফারুক হাঁটতে হাঁটতে উদ্দেশ্যহীন এসে পড়েছে এখানে। আর তাকে দূর থেকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়েছে তাহমিনা। ভার্সিটি থেকে ফিরছিল। কোলের ওপর বই আর খাতা— লাল মলাট দেয়া। পরনে সাদা সিফনের শাড়ি। পিঙ্কের ওপর বুটি তোলা কনুই অবধি চোলি। পায়ে কর্ক-বটম স্যাণ্ডেল। মুখে তার ক্লান্তির ছায়া। অলস এলানো বেণি। চোখে সেই দীপ্তি দেখতে পেল না ফারুক।

কিছুক্ষণ তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল নীরবে। দ্রুত শ্বাসের তালে দুলে উঠল বুঝি তাহমিনার উন্নত বুক। সে পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত নিচু আর কম্পিত গলায় শুধালো, কবে এলে ?

ফারুক কিছুই বলল না। যেন একটি মুহূর্তে অতিবাহিত হলো পৃথিবীর অনন্ত উত্থান ও পতনের সংকেত। শেষ অবধি বলল, কয়েকদিন।

আমাকে খবর দিলে না কেন ?

সব কি সত্যি তাহমিনা ?

তাহমিনা বুঝি মাথা দোলাতে চাইল কী বলতে গিয়ে। থামল। তারপর বলল, এস কোথাও বসিগে। বলছি।

চুপচাপ পাশাপাশি দু'জনে হেঁটে উঠে এলো 'রমনা রাঁদেবু'তে। একটা কেবিন বেছে নিয়ে বসল। ফারুক শুধালো, কি বলব ?

যা খুশি। আমি কিছু খাবো না।

কেন ?

আচ্ছা বলো। সামান্য কিছু।

ফারুক অর্ডার দিল পটেটো চিপ্‌স আর লেমন ড্রিঙ্ক।

চিপ্‌স এলো। কিন্তু একটাও ছুঁলো না কেউ। তাহমিনার আনত চোখের দিকে তাকিয়ে রইল ফারুক। তারপর হঠাৎ ছেলেমানুষের মত বলে উঠল, আমার কথা একবার ভাবলে না মিনু ? আমি কি করব, ভেবে দেখলে না ? উত্তরের প্রতীক্ষায় সে চুপ করল। কিন্তু তাহমিনা কিছুই বলতে পারল না। ফারুক নিজের হাত টেনে নিয়ে গলা খাদে নামিয়ে বলল, তুমি আমার দিকে তাকাও তাহমিনা। জানি, তুমি তাকাতে পারবে না।

তাহমিনা এবার চোখ তুলল। তাকাল তার পরিপূর্ণ স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে। বলল, সব সত্যি ফারুক। কিন্তু আমি কী করব ? আমাকে দুঃখ দিও না।

তুমি কিছুই করতে পারতে না ?

কী করতে পারতাম ?

তাহমিনা!

আমার কোন উপায় ছিল না ?

ছিল, তুমি সব করতে পারতে।

তাহমিনা চোখ নিচু করল। পেন খুলে খাতার ওপর হিজিবিজি কাটল খানিক। তাকিয়ে রইল সেদিকে। তারপর উচ্চারণ করল, দোষ আমাকে দিতে চাও, দাও। আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু আমাকে তুমি বোকো না ফারুক। উপেক্ষা করতে চাও, কোরো। ভুলে যেতে চাও, যেও। কিন্তু আমাকে তুমি ঘৃণা কোরো না।

বেশ, করবো না।

আমি কী করতে পারতাম বলো ? বাবা ভারী দুঃখ পেতেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি কোন কথা বলতে পারি নি। বাবাকে আমি অসুখী করব কি করে ? আমি কী করব ? এ আমার হয়ত আত্মহত্যা, তুমি বুঝতে পারবে না ফারুক।

এইখানে আর বলতে পারল না সে। ঝুপ করে টেবিলে রাখা দু'হাতের ভেতর মুখ নামিয়ে নিল। কান্নার মুদ্রায় কেঁপে উঠল তার পিঠ, কাঁধ। ফারুক বাঁ হাতের তেলোয় ন্যস্ত করল তার কপালের ভার। একটু পরে বলল, মিনু মুখ তোলো। সকলে কী ভাববে ? ওঠ।

মুখ তুলল তাহমিনা। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুছে নিল এক ফোঁটা অশ্রু। সরিয়ে দিল কপালের ওপর পড়ে থাকা একগুচ্ছ চুল। চিবুকের ভাঁজ একবার কেঁপে উঠল। গালে তার ছোট্ট টোল উঠেই মিলিয়ে গেল।

সামান্য কিছু চিপ্‌স মুখে দিয়ে সরিয়ে রাখল চিপ্‌সের রেকাবি। ফারুক টেনে নিল লেমনের গ্লাশ। দীর্ঘ ফিনফিনে কাচের গ্লাশে স্বচ্ছ সবুজ ড্রিঙ্ক। ছোট ছোট বুদবুদ উঠছে। ভেতরে কাচের গায়ে লেগে রয়েছে। দু'একটা এখুনি মিলিয়ে গেল। আর কী অদ্ভুত স্বচ্ছতা। মসলিন জমিনের মত। ফারুক হাত রাখল গ্লাশের পিঠে। আর সেই পানীয়ের শীতলতা মুহূর্তে প্রবাহিত হয়ে গেল তার স্নায়ুর গভীরে। সে অসম্ভব জোর দিয়ে গ্লাশটা আঁকড়ে ধরে বলল, অদ্ভুত শিশুকণ্ঠে, আমি তোমাকে বিয়ে করব তাহমিনা।

সে আর হয় না ফারুক।

কেন হয় না ?

ওকথা শোনাও আমার পাপ এখন। তুমি বোল না।

তুমি বলতে পারলে মিনু! কিন্তু আমি যে কোনদিনই তা ভাবতে পারব না। আমি তোমাকে—

তোমার পায়ে পড়ি ফারুক।

ফারুক গ্লাশ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল।

তাহমিনা ভাবল, আমাকে তুমি ভুলে যেও ফারুক। আমাকে তুমি. তোমার ঈশ্বরের মত জড়িয়ে ধরে রাখতে চেয়ো না। আমি জানি তুমি কষ্ট পাবে। কিন্তু আমি কী করব ? আমি কী করতে পারতাম ফারুক ? বিশ্বাস করবে না তুমি, আমি কত অসহায়, কত রিক্ত! যদি আমাকে ঘৃণা করেও তোমার মুখ বালিশে নিদ্রামগ্ন থাকতে পারে তবু ভালো, কিন্তু আমাকে বাসনা করে যেন বিনিদ্র না থাকো। তাহমিনা মুখে শুধু বলল, তুমি রাগ করেছ ফারুক।

না রাগ করব কার ওপর ? কিন্তু জানো তাহমিনা, সত্যি করে বলছি, তোমার হাত ছুঁয়ে বলছি, তুমি যেখানেই থাকো যার কাছেই যাও, চিরকাল তোমার কথা আমি মনে করব। কোনদিন ভুলব না।

তুমি মনে কর তোমাকে আমি ভুলে যাবো ?

কী জানি।

না আমি ভুলব না ফারুক।

তুমি ভুলে যাবে তাহমিনা। না মিনু, যে মনে রাখা পাপ, তা ভুলে যাওয়াই ভালো।

দুজনেই চুপ করে ভাবল খানিক। এক সময় তাহমিনা বলল, এখন কেমন আছো ?

ঠিক তেমনি।

ফারুক নির্লিপ্ত সুরে অন্যমনে উত্তর করল তার।

কক্সবাজারে গিয়েও ভালো হলো না ?

কিছুটা। কিন্তু ওকথা তুমি শুধিও না তাহমিনা।

কেন ফারুক ?

তুমি কি তা বোঝো না ?

বুঝি। এ অধিকারও তুমি আমার মুছে দেবে ?

আমি তো কেউ নই মিনু।

তাহমিনা কোনো কথা বলল না এর জবাবে। শুধু মাথা নিচু করল একবার, উবু হয়ে ঝুঁকে পড়ে ঠিক করে নিল স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপ। কেউ তাকে বুঝবে না। তারপর আবার সেই নিস্তব্ধতা। নিশ্চল দু'জনে। যেন দু'জনের কথাই ফুরিয়ে গেছে। চুপ করে থাকা ছাড়া যেন আর কোন ভাষা নেই। তাহমিনা আর ফারুক মুখোমুখি তেমনি গভীর নীরবতায় ডুবে রইল বহুক্ষণ সেই কেবিনে। ফারুক মাথা তুলে বলল, আমি কোনদিন ভাবিনি এমন হবে। প্রথম এসে যখন শুনেছি তখন যে আমার কী হয়েছিল তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না তাহমিনা। আজ গিয়েছিলাম দেখা করতে তোমাদের ওখানে। কিন্তু মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছি। কেন জানো ? তোমাকে আমি বিব্রত করতে চাইনি, তুমি যে আমার আপন। দৈবে দেখা না হলে হয়ত আর কোনদিন আমাদের দেখা হতো না। ফারুকের স্বর শোনাল ফিসফিস, যেন স্বগত উচ্চারণ করছে সে। এখানে সে একটু থামল। তারপর বলল, তুমি আমাকে কিছুই লিখলে না কেন তাহমিনা ?

তাহমিনার গলা ভারী হয়ে এলো। উত্তরে বলল, তুমি মনে কর এ বিয়েতে আমি খুশি হয়েছি ?

ফারুক চুপ করে রইল।

তোমার যা খুশি মনে করতে পার ফারুক, দুঃখ রইল, বুঝলে না। আমি কী করে তোমায় লিখতাম ? কী করতে পারতাম ? আর সে কিছুই উচ্চারণ করতে পারল না। চোখ নামিয়ে নিল।

পর্দা সরিয়ে এলো বেয়ারা। নিয়ে গেল রেকাবি আর গ্লাশ। তাহমিনা বারেক চোখ বুঁজলো। ফারুক এতক্ষণ পরে একটা সিগারেট ধরালো। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে অ্যাসট্রেতে ডুবিয়ে দিল কাঠিটা। বলল, যাবার সময় হয়ে এল তাহমিনা। তুমি ভুল বুঝবে না। দোষ আমি কাউকে দেব না। তুমি কি করতে পারতে ? সে আমি জানি। চল উঠি।

হ্যাঁ।

এই হয়ত আমাদের শেষ দেখা।

তাহমিনা চোখ নিচু করে বই ভ্যানিটি ব্যাগ গুছোলো। তারপর বলল, একটা কথা তোমায় বলব ?

বলবে।

আমার কথা তুমি মনে রেখ। কোনদিন যে চিনতে সে কথা মনে রেখ।

সেও আমার পাপ। এ অন্যায় মিনু।

আর, যদি কোনদিন আমাদের দেখা হয়, তাহলে বলো মুখ ফিরিয়ে নেবে না।

আমি কিছুই বলতে পারছি না তাহমিনা। আমি কিছুই বলতে পারছি না।

একটু পরে ও বলল, মা তোমাকে ডেকেছিলেন। একবার যেও। শুনেছেন তুমি শীগগীরই ফিরবে।

কেন ?

জানি না।

এরপর আর কোনো কথা হয় নি তাদের। দু'জনে যখন উঠে দাঁড়িয়েছে তখন হঠাৎ পরস্পর থমকে দু'জনের মুখের দিকে অপলক তাকিয়েছে। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। আর সেই এক পলেই যেন কেটে গেল এক বিশাল সময়। তাড়াতাড়ি পা বাড়ালো তাহমিনা। পেছনে এলো ফারুক। আর তারা কথা বলল না। আর কেউ কারো দিকে তাকাতে পারল না।

কয়েকদিন পরেই সে গিয়েছিল তাহমিনাদের বাসায়। তাহমিনা ছিল বাসাতেই। কিন্তু সমুখে আসেনি। মালেকাবাণুও প্রথমে কিছুই বলেন নি ওর বিয়ের কথা। ঠিক আগের মতই আদর করে চা করে এনে দিলেন ফারুকের জন্য। বসে বসে এটা সেটা জিজ্ঞেস করছিলেন। আর তার অসুখের কথা।

ফারুক জানতো একসময় সেই কথা উঠবে, আর তখন সে কি পারবে নিজেকে ধরে রাখতে ?

বিয়েতে এসো ফারুক। আসবে তো ?

এত মিষ্টি করে তিনি বলেছিলেন যে তা আজো সে ভুলতে পারবে না। আর তার স্বর এত স্নেহগভীর যে সে বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু উত্তরে মিছে করে বলেছে, ঢাকায় সে তখন থাকবে না। সিলেটের এক চা বাগানে কাজ পেয়েছে, এ মাসেই জয়েন করবে। মালেকাবাণু আর কিছু বলেন নি ওকে। তাঁর কাছ থেকেই ফারুক শুনলো, তাহমিনা অনার্স ছেড়ে দিয়ে পাস দিচ্ছে। আর শুনলো আবিদের কথা।

সুন্দরবনের টিম্বার মার্চেন্ট আবিদ চৌধুরী, তার দাদার সময় থেকে এই কারবার ছিল বার্মায়। বাবা তার সম্প্রসারণ করেছিলেন সুন্দরবন অবধি। বিয়াল্লিশের বোমার পর বার্মা ছেড়ে তিনি চলে আসেন। আবিদ রেঙ্গুনে তখন এম.কম পড়ত। সমস্ত পরিবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বোমায়। শুধু তারা দু'জন পালিয়ে এসেছিল বাঙলা মুলুকে। সেই শোকের ভার সইতে পারেন নি বৃদ্ধ আবিদের বাবা। দেড় বছর পরেই একমাত্র ছেলে আবিদের হাতে কয়েকলাখ টাকা আর বিরাট ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে মারা যান তিনি। তারপর সাত বছর কেটে গেছে। দিনরাত অমানুষিক খেটে সেই ব্যবসা দিনে দিনে বাড়িয়েছে আবিদ। একদিনের জন্য বিশ্রাম নেয় নি। দেশের এ মাথা ও মাথা চষে বেড়িয়েছে সে কারবারের জন্যে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মজুরদের তদারক করেছে। বন্দরে গেছে। কোম্পানির প্রায় প্রৌঢ় ম্যানেজার আশরাফ মাঝে মাঝেই অনুরোধ করেছে, এমনি করে আর কতদিন, এবারে তার সংসারি হওয়া দরকার। সে কথায় সে কান দেয় নি। হেসে উড়িয়েছে। তারপর বছর দু'এক বাদে আশরাফ গোঁ ধরে বসেছে, এবার তাকে বিয়ে করতেই হবে। সে নিজে সব ঠিক করবে, তার কিছু ভাবতে হবে না।

এবারে আবিদ না করতে পারেনি। আশরাফ ব্যবসা সূত্রে ঢাকায় আসা যাওয়া করত। সেই থেকে জাকির সাথে আলাপ তার ফার্মে। তারপর আশরাফ আর আবিদ এসেছিল তাহমিনাকে দেখতে। সেই দিনেই বিয়ের কথা ঠিক হয়ে যায়। এত তাড়াতাড়ি যে হয়ে যাবে তা কেউ ভাবতে পারে নি।

মালকাবাণু উঠে গিয়ে আবিদের ছবি এনে দেখালেন।

তারপর তিনি আবার বললেন, ফারুক বিয়ের সময়ে ঢাকায় থাকলে খুশি হতেন। কিন্তু ফারুক উত্তর সেই একই দিয়েছে।

উঠে আসবার সময় পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে এসেছে ফারুক। দোয়া করুন তিনি, চাকরিতে যেন তার ভালো হয়। মালেকাবাণু প্রাণ খুলে প্রার্থনা করলেন আল্লার দরগাহে। গেটের কাছে এসে ফারুক অনুভব করতে পারল অন্ধকার বারান্দায় তাহমিনা এসে দাঁড়িয়েছে। সে আর তাকাল না।

।। ৭।।

হপ্তা দেড়েক আগে সেদিন বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছিল আবিদ। তাহমিনা সেদিনও বাধা দিয়েছিল, না আজ যেও না। কিন্তু নিষেধ সে শোনেনি। বেরিয়ে গিয়েছিল। আর বিকেলেই সবাই ধরাধরি করে নামিয়ে এনেছে অচৈতন্য আবিদকে। হরিয়াল টিপ করেছিল ও। আর সেই হরিয়াল ডানা লুটিয়ে ঝুপ করে পড়ে গিয়েছিল নদীতে। এত বড় সুন্দর হরিয়াল নাকি সচরাচর মেলে না।

উত্তেজনায় ওটা ধরবার জন্য নিজেই যখন সে নদীতে নেমেছে তখন একটা কুমির জলের অতল থেকে ভেসে এসে ওর পা কামড়ে ধরেছিল। আর সে কী যমে মানুষে টানাটানি। চোখের পলকে যে কী হয়ে গেল তা কেউ ঠাহর করে উঠতে পারে নি। মেমসায়েবের কপাল ভালো, সায়েবের হায়াত দারাজ; অবশেষে আর্দালী আর মাঝিরা মিলে অসাধ্য সাধন করেছে। ডান পা দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে তখন। খুবলে নিয়েছে মাংস। আর আবিদ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

একটা বার্নিশ করা প্রশস্ত খাড়াপিঠ চেয়ার টেনে দিয়েছে আবিদের বেয়ারা আবদুল। খুলে দিয়েছে বাংলোর জানালার শার্সী। সেখানে রাত্রি চোখে আসে। ফারুক পিঠ সোজা করে খানিকটা উবু হয়ে ঝুঁকে পড়ে কথাগুলো শোনে। আর একটা হারিকেন জ্বালতে জ্বালতে আবদুল বলে চলেছে, অজ্ঞান হয়ে ছিলেন অনেকক্ষণ। বাংলোতে নিয়ে এসে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেয়া হলো পা। সন্ধ্যেয় একবার জ্ঞান ফিরেছিল। কিন্তু রাত্রে এলো বেহুঁশ জ্বর। এমন সে জ্বর যে ধান দিলে খৈ হয়ে যায়। আর ভুল বকতে লাগলেন শুধু। —এইখানে একটু থেমে দেশলাই নেভাতে নেভাতে সে বলল, শুধু মেম সায়েবকে বকতে লাগলেন প্রলাপে, খুন করে ফেলেন আর কী।

ফারুক শুধালো তারপর ?

তারপর, সকালে মেমসায়েবকে নিয়ে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছি। এখন আল্লা মালেক।

ফারুক একটু আড় হয়ে বসলো চেয়ারে। তাকিয়ে রইল বাতাস দোলানো হারিকেন শিখার দিকে।

হাসপাতালে আবিদকে রেখে সেদিনই সন্ধ্যেয় তাহমিনা ফিরে এসেছে বাংলোয়। কাল আবার খবর পেয়ে গেছে সদরে। এখনো ফেরেনি। আবদুলের হারিকেন জ্বালানো শেষ হলো। সলতে একটু উঁচিয়ে নিয়ে ও বেরিয়ে গেল একটু সামনের দিকে ঝুঁকে।

ফারুক তেমনি বসে রইল অনেকক্ষণ। বাইরের প্রান্তর কেমন অদ্ভুত আবছা লাগছে। কেন সে এসেছে এখানে ? অরণ্যের বাংলোতে ? প্রেতের ডানার রং যেন চারদিকে। ফারুকের সমস্ত কিছু মিলিয়ে গেল, মিশে গেল। যুক্তি বুদ্ধি বিশ্বাস সবকিছু। শুধু কি এরই জন্য তাহমিনা তাকে ডেকে এনেছে এতদিন পরে ঢাকা থেকে ? কেন সে ডাকল না তার ভাইকে, যদি আবিদের বিপদটাই মুখ্য হয় ? —ফারুক তাকে কী দিতে পারে ? —কী করতে পারে সে ? —সে ভাবল।

গোটা পৃথিবীতে যেন কেউ নেই। তাহমিনা নেই, আবিদ নেই। কেউ না। একেলা এই বাংলোয় সে একা। একেলা এক অরণ্যের রাত্রি নিঃসঙ্গতায় পূর্ণ। এ বাংলোয় বুঝি আর কেউ থাকে না। আর কারো সাড়া নেই। এ অরণ্যে বুঝি মানুষ থাকে না। ফারুকের মন ভয়ে ভরে উঠল। ঠিক ভয় নয়, সূক্ষ্ম একটা উদ্বেগ মাত্র। আর সেটাই তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল এখন। এইমাত্র যে আবদুল ছিল তার সমুখে দাঁড়িয়ে তাও কেমন অবিশ্বাস্য মনে হলো। ফারুক মুখ ফিরিয়ে নিল জানালা থেকে। এমন সময় আবদুল ফিরে এল, হুজুর।

কে, আবদুল ? ও।

আসুন হাত মুখ ধুয়ে কাপড় বদলাবেন না ? বাথরুমে পানি দিয়ে এসেছি।

ফারুক চুপ করে রইল। আবদুল বলল, মেমসায়েব কাল ভোরেই এসে যাবেন। আপনি কিছু ভাববেন না। এখন আসুন।

আবদুল, আমি এখুনি ফিরে যাচ্ছি।

হুজুর! বিস্মিত হলো আবদুল তার এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে।

হ্যাঁ এখুনি। একটা নৌকো ডেকে দাও ঘাটে লঞ্চ পাবোই। আর তোমার মেমসায়েব এলে আমার সালাম দিও।

হুজুর অসুবিধেটা কি, ঠিক—

না, না, তার জন্যে নয়।

সায়েবের একটা কিছু খবর না নিয়ে—

আবদুল তবু ধরে রাখতে চাইল। কিন্তু ফারুক বাধা দিল। উঠে দাঁড়াল। বলল, বোধ হয় বাংলো ফেলে তুমি যেতে পারবে না। কাছে ভিতে কোনো লোক থাকলে সাথে দাও।

তার দরকার হবে না। আমি নিজেই আসছি। কিন্তু এই রাত বিরেতে না বেরিয়ে থেকে গেলেও পারতেন হুজুর!

একটা সিগারেট ধরিয়ে ফারুক উত্তর করল, সে হয় না আবদুল।

আবদুল নীরবে সুটকেশগুলো হাতে তুলে নিল। দরোজায় লাগিয়ে দিল তালা। তারপর মুখে বলল, বেশ চলুন।

কিন্তু ডান দিকের করিডর ঘুরে সামনের বারান্দার ভাঁজে এসে স্তব্ধ হয়ে গেল ফারুক। যেন ভীষণ একটা কিছু সে দেখেছে। এক পাও নড়তে পারল না। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দুর্বোধ্য দু'একটা শব্দ গড়িয়ে পড়ল শুধু।

নিচে, তাহমিনা উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। পেছনে কে একজন। সম্ভবত মাঝি কিংবা খানসামা কেউ হবে। তাহমিনা পেছন পানে তাকিয়ে উঠতে উঠতে বলছে, বাতিটা একটু

ভালো করে ধর গফুর। পা হড়কে যেতে পারে। কে আবদুল ?

ফারুক প্রার্থনা করল অন্ধকারের সাথে মিশে যাবার জন্যে। কিন্তু কিছুই সে করল না। শুধু একটুখন পরে উচ্চারণ করল অত্যন্ত নিচু গলায়, আমি তাহমিনা।

নিস্তব্ধতা।

ও। তুমি।

তাহমিনা মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। হারিকেনের মৃদু আলোয় তাকাল পরিপূর্ণ গভীর চোখে। তারপর তার দৃষ্টি হয়ে এল শূন্য। ফারুক সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল না। কেউই নিল না। তিন বছরে আরো সুন্দর হয়েছে তাহমিনা। নেবেছে আশ্চর্য ডার্ক আইভরির মসৃণতা। আর তাহমিনার সেই চঞ্চলা দেহে এখন মন্থরতা। চিবুকের সেই কোমল ভাঁজ এখনো রয়েছে। তেমনি ঈষৎ উত্তোলিত তার ভ্রু-ভঙ্গ। কুয়াশা লাল ঠোঁট। উন্নত গ্রীবা। আরো একটু বয়স হয়েছে তাহমিনার— স্নিগ্ধ লাবণ্যের ছায়া পড়েছে মুখের আদলে। আর অলসতর তার শ্রোণীভার। ফারুক দেখল। ফারুক সম্মোহিত হলো। কিন্তু তাহমিনা দাঁড়াল মুহূর্তের জন্য। তারপর পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে বলল, ফিরে যাচ্ছিলে ? কতক্ষণ এসেছ ?

এ প্রশ্নের উত্তর নেই। আবদুল নীরবে ফিরে গিয়ে তালা খুলল। তাহমিনা এক পা ভেতরে গিয়ে তারপর ঈষৎ আনত পেছন ফিরে শুধালো, ভেতরে আসবে না ?

ফারুক আবার গিয়ে ঠিক সেইখানে সেই চেয়ারে বসলো। এবারে দেখা দিল নতুন একটা সমস্যা। এতক্ষণ তবু তাহমিনা ছিল না, এখন সে এসেছে— ফারুক তার অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারল তীব্র করে। সে স্থির হয়ে, হয়ত কিছুটা বিসদৃশভাবে, বসে রইল। দূরে দাঁড়িয়ে আবদুল। আর তারো কিছুটা পেছনে তাহমিনা প্রায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। ফারুক তার পায়ের তলায় অনুভব করল কার্পেটের কোমলতা। আর শুনল তাহমিনা বলছে, পেট্রোম্যাক্স জ্বালো নি আবদুল ?

না মেম সায়েব। আপনি নেই তাই আর ওটা জ্বালি নি। জ্বালব কী ?

না থাক, এখন আর দরকার নেই। এইখানে সে তাকাল ফারুকের দিকে। ফারুক একটু পরে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন উনি ?

তাহমিনা প্রশ্নের দৃষ্টিতে একবার ফারুক তারপর আবদুলের দিকে তাকাল। সংশোধনের হাসি হেসে বলল ফারুক, হ্যাঁ, ওর কাছ থেকেই শুনেছি।

তাহমিনা উত্তর করল, কিছুটা কম্পিত স্বরে, প্রায় আগের মতই। কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ডাক্তার কী বললেন ?

এ প্রশ্নের কোন উত্তর পেল না ফারুক। তা না পাক। উত্তর তাহমিনার মুখেই লেখা ছিল। তাই আর সে কোনো প্রশ্ন করল না। তাহমিনা কোনো কথা না বলে রূপসীর মত মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। অপসারিত হলো মেঝে থেকে তার দেহছায়া। আবদুলও চলে গেল প্রায় সাথে সাথে।

আবদুল ফিরে এসে বলল, মেম সায়েব শুধোচ্ছিলেন— খাবার কথা।

খাবার ইচ্ছে নেই আবদুল। তুমি বরং ওকে ডাকো।

কিন্তু জিজ্ঞেস করলেন কি খাবেন জেনে আসতে।

সন্ধ্যের আগেই খেয়ে নিয়েছি। এত রাতে মিছেমিছি কষ্ট কোরো না।

সেকি কথা হুজুর!

অবশেষে ফারুক বলে দিল শুধু চায়ের কথা। আবদুল বলল, তার আগে চলুন হাত মুখ ধুয়ে নেবেন।

ফারুক উঠতে যাচ্ছিল। এতটা পথ স্টিমার আর লঞ্চে এসে অনেকটা শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল সে। ঘুমে ভারী হয়ে আসছিল চোখ। আঠার মত সারা গায়ে যেন ট্রাউজার আর শার্ট সেঁটে আছে। সেগুলো না ছেড়ে রাখা অবধি কিছুতেই স্বস্তি আসবে না। এমন সময় সিঁড়িতে বাইরে কার পায়ের আওয়াজ আর গলা শোনা গেল, আবদুল, আবদুল।

আবদুল প্রায় ফিসফিস স্বরে ফারুককে বলল, আশরাফ সায়েব আসছেন— হুজুরের ম্যানেজার সায়েব।

ও।

বলেই সে বাইরে এগিয়ে গেল।

এমন একটা বিশ্রী অবস্থায় ফারুক যে এত শীগগীর এমনভাবে পড়ে যাবে তা সে এর আগে ভাবতেও পারে নি। সে আশা করে নি এত তাড়াতাড়ি বাইরের কারো সামনে তাকে আসতে হবে। কি দেবে তার পরিচয় ? আর কেনই বা সে এখানে এসেছে, তার জবাবেই বা কি বলবে ? কিছু না জেনেও তার স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেছে যে তাহমিনার চিঠির কথা কাউকে সে বলতে পারবে না। এই সময়ে চকিতে তার চোখের সামনে আরেকবার ভেসে উঠল চিঠিটা— দ্রুত হস্তাক্ষরে বাঁকা দুর্বল লাইনে লেখা তাহমিনার চিঠি। আর সে যেন স্পষ্ট শুনতে পেল তাহমিনার স্বর— "যদি কোনোদিন আমাকে তুমি তোমার একান্ত বলে ভেবে থাকো, তাহলে এ চিঠিকে তুমি উপেক্ষা করবে না, এ আমি জানি।" ফারুক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চেয়ারে নিঃশব্দে আবার বসে পড়ল। ভ্রমণের ক্লান্তি যেন তাকে এখন ছুঁয়ে গেল গভীরতর। উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

বাইরে থেকে আশরাফের গলা শোনা গেল, কিরে আবদুল, তোর মেমসায়েব ফিরলেন নাকি এখন ?

হ্যাঁ।

আবিদের খবর কী ?

একই রকম তো বল্লেন। আর কিছু শুনিনি এখনো।

কাল তো ফেরার কথা ওর। আজকেই ফিরল যে ?

কী জানি।

আশরাফ একটু কাশলো। তারপর আবার বলল, হঠাৎ কড়ানাড়ার শব্দ, তারপর অনেকক্ষণ পরে আবার ঘাট থেকে আলো দেখে ভাবলাম দেখে আসি একবার। ঘুমোস কত যে অমন করে দরজা ধাক্কাতে হয় ? চল, চল, ভেতরে চল শুনি।

আবদুল গলা একটু নামিয়ে বলল, ফারুক তবুও শুনতে পেল, নতুন এক সায়েব এসেছেন, তিনিই কড়া নেড়েছিলেন।

কে সায়েব রে ?

ফারুক স্থির হয়ে বসল। আবদুল উত্তর করল, ঢাকা থেকে এসেছেন। আর মেমসায়েব তো এলেন এইমাত্র।

আশরাফ একটুখন চুপ করে রইল। তারপর শুধালো, তোর মেমসায়েব কোথায় ?

উনি তো ভেতরে।

হুঁ।

এরপরেই আশরাফ এসে দাঁড়াল দরোজায়। ফারুক চোখ তুলে তাকালো। আশরাফের আসল বয়স বিয়াল্লিশের বেশি হবে না। কিন্তু চট্ করে দেখলে ঠাহর করা যায় না। আরো বেশি মনে হয়। কপালে দুটো ভাঁজ পড়েছে। তীক্ষ্ণ নাক। আর স্ফুট চোয়ালের হাড়ে দৃঢ়তার ছাপ। প্রশস্ত কাঁধ। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট কি তারো বেশি হবে। দীর্ঘকাল অরণ্যে কাটিয়ে মজুর খাঁটিয়ে চেহারাটা তার কঠিন হয়ে এসেছে অস্বাভাবিক রকমে। এখন পরনে তার ভাঁজ দুমড়ানো পাঞ্জাবি পাজামা। বাঁ হাতে দু'ব্যাটারির ছোট্ট তীব্র টর্চ। ডান হাতে রাইফেল। ফারুক একটু অস্বস্তি বোধ করল, বিব্রত হলো। তারপর উঠে দাঁড়াল। আশরাফ হেসে বলল, আরে বসুন, উঠছেন কেন ? এ অরণ্যে ভদ্রতার বালাই আমরা রাখিনি। সব ক-বে ভুলে মেরে দিয়েছি।

বলেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল আশরাফ। ফারুক প্রথমে বিস্মিত হলো. তারপর নিচু গলায় সেও হাসিতে যোগ দিল। তার সম্বন্ধে যে ধারণা সে প্রথমে করেছিল এক মুহূর্তে তা কেটে গেল।

ঢাকা থেকে আসছেন বুঝি ?

হ্যাঁ। ফারুক শুকনো গলায় বলল।

আবিদের ব্যাপারটা শুনেছেন তো ? বড় বিপদে পড়ে গেছি সবাই। এ সময়ে আপনি এলেন। ভালো কথা, আপনার পরিচয়টা আমার জানা হোলো না।

ফারুক কিছু একটা বলবার আগেই দরোজার কাছ থেকে— এই মাত্র সে এসে দাঁড়িয়েছে— তাহমিনার উত্তর এলো, ও আমার মার সম্পর্কে ভাই হয় আশরাফ সায়েব।

দু'জনেই প্রায় একসাথে তার দিকে ফিরে তাকাল, আপনি দেখেন নি ওকে। অনেকদিন থেকেই আসতে চেয়েছিল এখানে বেড়াতে। তারপর তাহমিনা ফারুকের দিকে তাকিয়ে বলল, আর ইনি আমাদের ফার্মের সব, আশরাফ আহমদ।

তাহমিনা শান্ত স্বরে প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ভেতরে এসে বসল। হাত মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে এসেছে ও। অনেকটা স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে ওকে। ফারুক একবার তার দিকে তাকাল। ঘরে কিছুকাল তীব্র নিস্তব্ধতা। অবশেষে আশরাফ প্রথমে বলল, ও' তারপর বলল, ঘাটে আলো দেখে ভাবলুম তুমি এসেছ। তাই উঠে এসেছি। খবর কী ?

ভালো। —ভালোই।

ডাক্তার কী বললেন ?

উনি তো আশা রাখছেন এখনো।

*পা কি বাঁচানো যাবে ?*

তাই তো বলছেন।

যাক তবু ভালো। আমার একবার যাওয়া দরকার আবার দেখতে। কিছু বলেছে নাকি আমার কথা?

তাহমিনা একটু অন্যমনা হয়ে পড়েছিল। চকিতে চমক ভেঙে বলল, না, বলে নি।

নতুন কয়েকটা বড় অর্ডার এসেছিল, তাই বলছিলাম। দেখি কি করা যায়।

তাহমিনা কোনো কথা বলল না। আশরাফ হঠাৎ ফারুকের দিকে তাকিয়ে বলল, এ সব কাজ বুঝলেন ঝামেলার একশেষ। একা কুলিয়ে ওঠা যায় না। এসেছেন, সবি দেখবেন আস্তে আস্তে।

ফারুকের একটা কিছু বলা দরকার, সে অনুভব করল, তাই বলল, সে তো নিশ্চয়ই।

দেখছেন তো কাঠের কারবার, কিন্তু ধারণা করতে পারবেন না কী কাঠখড় এর পেছনে পোড়াতে হয়।

ফারুক একটু হাসল শুধু। তাহমিনা তার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কাপড় বদলালে না? আবদুল চা নিয়ে আসছে এখুনি।

হুঁ, বদলাচ্ছি।

আশরাফ বলল, তাই তো, আপনার এসব এখনো হয় নি। আমার খেয়ালই ছিল না। রাত তো অনেক হয়েছে। আচ্ছা তাহমিনা, আমি তাহলে যাই। আসি আমি, কাল সকালে আপনার সাথে আলাপ করব।

আশরাফ উঠছিল। ফারুক বাধা দিল, বসুন চা খেয়ে যাবেন।

খেপেছেন! এই রাতে চা খেলে ঘুম হবে মনে করেছেন? তার ওপর বাসায় ও আবার জেগে রয়েছে।

এমন কিছু দেরি হবে না আপনার একটু বসলে। তাছাড়া চা খেলে রাতে ঘুম হয় না কে বলল?

তাহমিনা বলল, বসুন না। এক কাপ চা-ই তো। আবদুল, আবদুল।

আচ্ছা।

আশরাফ চেয়ারে একটু আড় হয়ে বসলো। আবদুল এলে পর তাহমিনা বলল, যাও ওঁকে বাথরুম দেখিয়ে দাও। যাও তুমি।

আবদুলের সাথে করিডর ঘুরে পেছনের বারান্দার শেষ প্রান্তে বাথরুমে ঢুকলো ফারুক। আবদুল হারিকেনটা এগিয়ে দিল। টাবে পানি তোলা রয়েছে কানায় কানায়। র‍্যাকে পরিষ্কার টাওয়েল রাখা। দেয়ালে লম্বা আয়না। আর তার নিচেই কেসে রাখা নতুন সাবানের শুভ্র কেক। সমস্ত মেঝে সদ্য ভিজে। আর কেমন একটা চেনা মিষ্টি সুবাস বাতাসে। শিরশির করা। ফারুক কেকটা তুলে নিল।

সমস্ত কিছুই তার কাছে কেমন রহস্যময় আর অবিশ্বাস্য বলে মনে হলো। ক'দিন আগেও সে কি ভাবতে পেরেছিল তাকে এখানে আসতে হবে? তাহমিনার সাথে দেখা হবে? আর ওর ব্যবহারটা অদ্ভুত ঠেকল তার কাছে। চিঠি পেয়ে, এমন কী এখানে এসে অবধি আকাশ

পাতাল অনেক কিছু মনে হয়েছিল তার। কিন্তু তাহমিনা অস্বাভাবিক রকমে শান্ত স্নিগ্ধ আর উজ্জ্বল। কত সহজে সে তার পরিচয় নিজে দিল আশরাফের কাছে। ও কেন লুকালো তার আসল পরিচয় ? কী হয়েছে তাহমিনার ? আবিদের দুর্ঘটনা যে এর কারণ নয় তা সে বুঝতে পারল। তাহলে কী ? চোখের সমুখে একবার তাহমিনার চেহারাটা মনে করতে চেষ্টা করল সে।

ফিরে এল যখন, তখন নিজেকে অনেকটা হালকা মনে হোলো তার। আবদুল এর মধ্যেই সব কিছু সাজিয়ে ফেলেছে। রেকাবিতে রাখা পুডিং আর রূপোর চামচ। ট্রের ওপর ঢাকনা দেয়া কেটলি। চা ঢেলে দিল তাহমিনা। তিনজনে হাতের ওপর টেনে নিল সোনালি বর্ডার দেয়া নীল ফুল তোলা সোনালি পানিয়ের কাপ।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে আশরাফ গল্প করতে লাগল— বার্মার গল্প, ইরাবতী তীরের কথা। কথাটা উঠল আবিদের দুর্ঘটনা থেকে। তখন আশরাফ আবিদের বাবার সাথে ইরাবতীর তীরে নতুন জঙ্গলের ইজারা নিয়ে ঘুরছে। কাটা হচ্ছে গাছ। হাতি দিয়ে গড়িয়ে নদীর কিনারে নিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে ভেলা বেঁধে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে কুলিরা। আশরাফ দাঁড়িয়ে তদারক করছিল। সেই সময় মাঝ নদীতে এক কুলি পড়ে যায় হঠাৎ। একই দুর্ঘটনা ঘটেছিল তারো। তবে কুমির নয়, কুমিরের সগোত্রই এক জলজ জন্তু কামড়ে ধরেছিল তার পা। আর সেকি তার বুক ফাটা আর্তনাদ! শেষ অবধি যখন তাকে তীরে তুলে নিয়ে আসা হলো তখন স্রোতের মত ধারায় রক্ত পড়ছে। আশরাফ এরপর একটু থেমে বলল, অবাক হয়েছি সবচে, বুনো লতাপাতা খেয়ে-বেঁধে লোকটা সেরে উঠেছিল। অনেকদিন আগের কথা, এখনো স্পষ্ট আমার মনে আছে। কাজেই ভয়ের কিছু নেই তাহমিনা। আচ্ছা, এবার তাহলে, আমি চলি।

আশরাফ ফারুকের দিকে মৃদু হেসে উঠে দাঁড়াল। তুলে নিল টর্চ আর রাইফেল। একবার রাইফেলটা ঝাঁকাল, তারপর চলে গেল। ফারুক তার পেছনে পেছনে তাকিয়ে রইল। আবদুল আস্তে আস্তে সব নিয়ে গেল। এখন শুধু নিস্তব্ধতা। কেউ কোন কথা বলল না। কেউ কারো দিকে তাকাল না। হঠাৎ যেন স্তব্ধ স্পন্দনহীন হয়ে গেছে সবকিছু এক নিমেষে।

তাহমিনা।

বলো। স্বর তার কেঁপে গেল।

আমি কিছুই বঝুতে পারছি নে।

তাহমিনা আয়ত গভীর চোখ মেলে তাকাল তার দিকে। ফারুক হঠাৎ তার কথার খেই হারিয়ে ফেলল যেন। এবারে বলল, ফিসফিস করে, আশরাফের কাছে আমার মিথ্যে পরিচয় দিলে কেন ? যদি ও জানতে পারে, যদি আবিদ জানে, তাহলে কী হবে ? তোমার কী হবে ?

তুমি চলে যেতে চাও ? তাহলে এলে কেন ?

ফারুক হঠাৎ চুপ করে গেল একথায়। মাথা নিচু করল।

আমি ক্লান্ত। তোমার ঘর ঠিক করে দিয়েছি। আবদুল বিছানা করে রেখেছে। আমি যাই।

তাহমিনা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেল। তার পায়ের নরোম শব্দ মিলিয়ে গেল একটু পরে। আবদুল এসে হারিকেনটা হাতে নিয়ে বলল, আসুন।

হ্যাঁ, চল।

পাশের কামরাতেই শোবার ব্যবস্থা হয়েছে তার। অনেকটা লম্বা আর কম প্রশস্ত কামরা।

একধারে পাতা নিচু পালং। পুরু তোষকের ওপর নীল বর্ডার দেয়া ধবধবে চাদর পাতা। অনেক বড় দুটো বালিশ— সাদা চিকন লেস আঁকা। ঠিক যেমন ভালোবাসে ফারুক। আর এ ধারে দেয়ালে ঝোলানো জলরংয়ের ল্যাণ্ডস্কেপ। বাঁ হাতে দৈর্ঘ্যের দিকে দুটো জানালা। ছবির ফ্রেমের মত দেখতে। শার্সির ওপরে একটু বাতাসে কাঁপছে সিলভার সবুজ পর্দা।

ফারুক অবসাদে এলিয়ে দিল তার সারা শরীর। আবদুলের পদশব্দ দূরে নেবে হারিয়ে গেল। আর কিছুই সে ভাবতে পারছে না, সমস্ত অনুভূতি যেন তার অবশ হয়ে গেছে। শুধু ঘুম পাচ্ছে। এক সময়ে আধো ঘুম আধো জাগার ভেতরে সে শুনতে পেল কিছুটা কাছেই, অথচ কাছেও নয়, একটা দরোজা বন্ধ হয়ে গেল। তার ঝাঁকুনিতে বুঝি একটু শিরশির করে উঠল কাঠের দেয়াল। হারিকেনের ছোট্ট সলতেয় কামরার ভেতরে দীর্ঘ চিকন কাঠের প্লাঙ্কের অসংখ্য সমান্তরাল রেখায় ছায়ার ভাঁজ পড়েছে। অন্ধকার লাগছে তাব ক্রীমরঙ পেন্ট। ফারুক ঘুমিয়ে পড়ল ধীরে ধীরে।

অনেক রাতে কী করে যেন ঘুম ভেঙে গেল তার। কী একটা ধ্বনিতে, কিসের একটা নরোম শব্দে সে জেগে উঠল। এমন কিছু নয়, খুব মিহি, তবু তার ঘুম ভাঙলো। প্রথমটায় তন্দ্রা, তারপর চোখ মেলে তাকাল ও। ওপরে সিলিংয়ে শুধু পুঞ্জীভূত অন্ধকার।

চোখ সয়ে এলে পর কান পাতলো শোনবার জন্য। কে যেন হাঁটছে তার কোমল পা ফেলে, সাবধানে আর ধীরে। বুকের ভেতরে গিয়ে সেই পদশব্দ যেন ঢেউ তুললো। রক্তে তার নামলো আশ্চর্য অনুরণন। আর জাগলো বিচিত্র একটা অনুভূতি। থেমে গেল সেই শব্দটা। ফারুক উঠে বসলো। জানালার পাশে দুধ-সুপুরির একটা উন্নত ডালে বাতাস উঠলো শিরশিরিয়ে। সেও সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো।

রেলিং ধরে একেলা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল তাহমিনা। সে এসে দাঁড়াল ঠিক তার পেছনে। রাত্রির অতল থেকে গড়ে উঠেছে যেন তাহমিনার শুভ্র দেহ। শিথিল শাড়ি সরে গেছে মাথার ওপব থেকে। একরাশ চুল কাজল মেঘের মত অথবা এই অরণ্যের মত বিস্তৃত তার পিঠের ওপরে। আর তার মিহি সৌরভ বাতাসে। বাইরে বেলে জোছনা। এমনি কোনো চন্দ্ররাতে হরিণ আর হরিণীরা বুঝি টের পায় কিসের আভাস। নির্জন তাদের বাসা ছেড়ে ঘাসের ভিতর দিয়ে পরস্পর নদীর জল শোঁষে। ফারুক অনুভব করল এক আকর্ষণ। সে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। তাহমিনা চকিতে মুখ ফিরিয়ে তারপর শ্বাস ফেলে উচ্চারণ করল, ও , তুমি।

ফারুক বলল, এখনো ঘুমোও নি তাহমিনা?

তাহমিনা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল অন্ধকারে। কোনো কথা বলল না। একটু চুপ কবে থাকল ফারুক। তারপর এত নিচু গলায় বলল যে তার কথা প্রায় শোনা গেল না, আমি চলে গেলেই ভালো ছিল। শুধু শুধু আমাকে ধরে রাখলে। এমন হবে জানলে আমি আসতাম না।

কী জানলে?

আমি বলে বোঝাতে পারছি নে।

তুমি যেতে চাইলে আমি বাধা দেবার কে?

সে কথা নয় তাহমিনা, একটু থামল, ও নেই, তাই বলছিলুম।

তুমি পাগল। তুমি ঘরে যাও।

ফারুক দূরে ঘন ঝোপের দিকে তাকিয়ে রইল খানিক। তারপর সেদিকে চোখ রেখেই বলল, তোমার ভয় করে না? এক বাংলোর নিচে একেলা আর একজনের সাথে থাকতে তোমার ভয় হয় না?

তাহমিনা হাসল মৃদুস্বরে। একটু সরে গেল রেলিংয়ে।

তাহলে তোমাকে থাকতে বলতাম না।

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যেই ফারুক একটুখন পর বলল, তোমার চিঠি পেয়ে এক মুহূর্ত আমি দেরি করিনি। সমস্ত কাজ ফেলে এসেছি তোমার কাছে।

আমি জানতাম।

হঠাৎ আমাকে তুমি আবার লিখলে কেন তাহমিনা?

একটু যেন চমকে উঠল ও। মুহূর্তের জন্য বুঝি ম্লান হয়ে গেল তার মুখ। উন্নত বুক তার স্ফীত হয়ে উঠল। কয়েকটা দৃঢ় টোল পড়ল গালে। ছায়াভাঁজ। মিলিয়ে গেল। কী যেন সে বলতে চাইল। অথচ পারল না। চলে যেতে চাইল। ফারুক স্পর্শ করল তার বাহুতে। তুলে নিল মুঠোয়। বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে গেল সেই স্পর্শ পরস্পরের ভিতরে। বলল, শোনো, তুমি চলে যাচ্ছ?

তাহমিনা দাঁড়াল, কিন্তু সরিয়ে দিল না তার স্পর্শ। অদ্ভুত তীক্ষ্ণ এক দৃষ্টি মেলে তাকাল তার দিকে। ফারুক বোকার মত হাত সরিয়ে নিল, আমি দুঃখিত তাহমিনা, একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার এখন ঘুম পাচ্ছে।

।। ৮ ।।

সকালে চায়ের পেয়ালায় দুধ ঢেলে চিনির পট হাতে নিয়ে অত্যন্ত সহজ সুরে, যেন কিছুই হয়নি এমনি কণ্ঠে শুধালো তাহমিনা, ক'চামচ চিনি দেব?

একটা।

এখনো চিনি কম খাও? আশ্চর্য।

কিশোরী-কুমারীর মত সুন্দর হাসি মাখল ও সারা মুখে। রিনটিন চুড়ি বাজলো চিনি নাড়তে গিয়ে। বুকের শাড়ি একটু নত হল সমুখের দিকে।

ফারুক বিস্মিত হলো। গত রাতের সমস্ত কিছু, বিশেষ করে মাঝরাতের সেই ঘটনা, এখন তার কাছে বিরাট এক অবাস্তব স্বপ্ন বলে মনে হলো। দিনের আলো বড় উজ্জ্বল আর প্রখর। দিনের আলোয় কত সহজ হয়ে এসেছে পৃথিবী। আর তাহমিনারও যেন কিছু মনে নেই, সব ভুলে গেছে। হাসছে। যেন এই প্রথম দেখা হলো। যেন এই হঠাৎ তাদের মুখোমুখি।

খাবার ঘরে টেবিলের দু'প্রান্তে দুজন বসে। মাথার ওপরে সৌখিন রংবাতির ঝাড়। কালো কাচে ঢাকা সমস্তটা টেবল-টপ। তার মাঝামাঝি ছায়া উল্টো হয়ে এসে পড়েছে রংবাতির। উবু হলে মনে হয় নিমেষে পায়ের তলায় যেন সারা সিলিং চলে এসেছে। তাহমিনা চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে দেখল তারো এক অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পড়েছে টেবিলের ওপর। ফারুকেরটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

তাহমিনা ভাবল, ফারুক কি ভাবছে এখন ? একবার তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আঁচ করতে চাইল কিছু। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। ফারুক নিশ্চিন্ত মনে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। একবার ভ্রু তার কুঁচকে এলো। কি হলো ? না, কিছু না। তিন বছরে বলিষ্ঠতর হয়েছ তার দেহ। দিনের আলোয় সে দেখল, মুখে তার আত্মবিশ্বাস আর পৌরুষত্বের রেখা। তার নিজের চিঠির কথা মনে পড়ল। ভীষণ লজ্জা হলো। ছি, ছি, ফারুক হয়ত কী না কী ভেবেছে। এতটা উন্মাদ সে হয়ে গিয়েছিল কী করে। তারপর কি ভেবে তাহমিনা মন থেকে এখন মুছে ফেলতে চাইল এই ভাবনা। সে দৃঢ়া হলো। ফারুক বলল, কি ভাবছ ?

কই, কিছু নাতো। এমনি। ঢাকার খবর কী ?

ভালো।

অনেকদিন যাইনি, একবার যেতে ইচ্ছে করছে।

গেলেই তো পার।

কই আর পারি!

তাহমিনা হাসল। তারপর বলল শেষ যেবার ঢাকা গিয়েছিল সেই গল্প। ফারুক ধরালো সিগারেট। তাহমিনা শুধালো, আমাদের ওখানে যাও ?

না।

ও।

অন্যমনা সুরে অনুমোদন করল তাহমিনা।

তুমি আজকাল কি করছ ? তোমার মা ?

ভালোই আছেন। তবুও বুড়ো মানুষ তো ?

সেতো ঠিকই। আর তুমি ?

জার্নালিজম করছি।

তাই নাকি ? তোমার তো ওদিকে ন্যাক ছিলো। কোন কাগজে আছো ?

ইংরেজি কাগজে। সম্পাদকীয় লিখি। ফারুক দৈনিকের নামটা বলল। তারপর একটু পরে, ছুটি নিয়ে এসেছি। এর আগে ছুটি নেবার বড় একটা দরকার হয় নি। —বলেই বিসদৃশভাবে কথাটা গুটিয়ে নিল। এ-কথা তো তাহমিনা শুনতে চায় নি। তাহমিনার দিকে চোর চোখে সে তাকাল। তারপর মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য বলল, ও গুলোই বুঝি সুন্দরী গাছ, না ?

বাইরে, দূরে যেখানে কাল রাতে অন্ধকার দেয়ালের মত মনে হয়েছিল, এখন সেখানে লম্বা মাথা উঁচু গাছের সার চোখে পড়ল। তবুও এমন কিছু ঘন নয়। প্রায়ই কেটে ফেলা হয়েছে। অনেকদিন আগে-কাটা গুঁড়ির মুখ চকলেটের মত তামাটে হয়ে গেছে। আর ভেতর দিয়ে চলে গেছে পথ। তাহমিনা সেদিকে তাকিয়ে তার উত্তর করল, হ্যাঁ। বোধহয়।

আর রাস্তাটা ?

অনেকদূর চলে গেছে ভেতরে। আমি একবারই মাত্র গিছলুম— দু'মাইল হবে। বারান্দায় দাঁড়ালে দেখতে পেতে ওই পথের ওপরে কাছেই আশরাফ সায়েবদের বাড়ি।

ও। বেশ লোক কিন্তু।

হুঁ।

তোমাদের আবদুলটি কিন্তু বিনয়ের অবতার।

তাহমিনা একটু হাসল, হুঁ তাই। চব্বিশ পরগনায় দেশ ছিল। রিফ্যুজি হয়ে এসেছে। অত্যন্ত নিচু কাটা কাটা সুরেলা সুরে কথা বলছে ও। নিজের কানেই বড় ভালো লাগছে সেই সুর। সে এবার শুধালো ঘাড় একটু বাঁকিয়ে কানের লতিতে মৃদু চাপ দিয়ে, কেমন লাগছে তোমার জায়গাটা ?

ভালো, খুব ভালো।

কিন্তু তারপরেই ফারুকের মনে হোলো বড় কম বলা হোলো। তাই আবার বলল অদ্ভুত এক ধরনের ভাঙা আর গভীর গলায়, নতুন পৃথিবীতে এসেছি যেন! এত সবুজ, আর এতো আলো আমি আর কোনদিন দেখিনি। আমার কেমন ভালো লাগছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে, ফারুকের এই কথা উচ্চারণ করবার পর, দ্রুত শূন্য দৃষ্টিতে তাহমিনা উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। চকিতে বিরাট ছায়া পড়ল টেবিলের ওপর তার নাভিমূল অবধি। ডাকল আবদুল,আবদুল।

'জি মেমসাব।

আবদুল অদৃশ্য সাবানে হাত ধুতে ধুতে এসে দাঁড়াল।

টেবিল সাফ করো। চলো, তুমি না বাংলো দেখতে চেয়েছিলে ভোরে। এসো আমার সাথে। ফারুক উঠে দাঁড়াল। তারপর সামনের প্রশস্ত বারান্দা হেঁটে ডান দিকের করিডর পেরিয়ে পেছনের বারান্দায় এলো। পাশাপাশি, কিছুটা সমুখে তাহমিনা। মসৃণ সুডৌল শঙ্খসাদা পায়ে কালো চিকন ফিতের চটি। হাঁটবার ভঙ্গিতে মন্থর ঢেউ উঠছিল সারা শরীরে। মিলিয়ে যাচ্ছিল। ফারুক বলল, কাঠের বাংলো এতবড় হয়, এর আগে আমি জানতাম না।

হ্যাঁ তা বড় বৈকি ?

সত্যিই যথেষ্ট বড় বাংলো। লাল রং টিনের ছাদ দেয়া। সমুখে সবটা দৈর্ঘ্য জুড়ে বিশাল প্রশস্ত বারান্দা। বাঁ দিকে একটা সরু প্যাসেজ আছে। আর ডান দিকে আরো কিছুটা চওড়া করিডর। সিঁড়ি দিয়ে উঠলে প্রথমেই তাহমিনাদের কামরা। তারপরে ডাইনিং হল। বসবার ঘর। তার এক কামরা পরে ফারুকের শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এর পাশ দিয়ে করিডরটা ভেতর দিকে চলে গেছে। শেষ প্রান্তে বাথরুম। তারপরেই বাঁ হাতে ঘুরলে ভেতর দিকের বারান্দা। এদিকে সমুখের দুটো কামরার প্রশস্ত জুড়ে একটা কামরা। তালাবন্ধ। তারপরে খাবার ঘরে ঢুকবার দরজা। তারপর আবার তাহমিনাদের কামরা করিডরের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। এই পেছনের বারান্দা থেকে সরু শেড দেয়া প্যাসেজ চলে গেছে দূরে রান্নাঘরে। ওর পাশেই ছোট ছোট দুটো কুঠিতে খানসামাদের থাকবার ব্যবস্থা।

আগাগোড়া বাংলোর বার দিকটা বটল গ্রীন রংয়ে পেন্ট করা। ভেতরে ক্রীম। তাহমিনা প্রায় সবকটা কামরাই দেখাল। টুকরো টুকরো মন্তব্য করল মাঝে মাঝে ফারুক। তারপর পেছনের বারান্দায় দাঁড়াল ওরা একটুখন। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে রান্নাঘরে কয়েকজন বাবুর্চি রান্না করছে। আবদুল মাঝে মাঝে গিয়ে তদারক করছে তাদের। সবশুদ্ধ বুঝি প্রায় পাঁচ ছ'জন হবে। ফারুক তাহমিনার দিকে তাকাল আশেপাশের সবুজ আর রৌদ্র থেকে চোখ ফিরিয়ে। বলল, এত উঁচু উঁচু সব থামের ওপর বাংলোটা। বেশ লাগে।

শুধু বেশ লাগার জন্যে নয়। দরকারও। বরষার দিনে নদী বাড়লে তখন পানি প্রায় এদিকটায় এসে পড়ে। তাছাড়া জংলা জায়গা।

বাঘ থাকে বুঝি এদিকে ? সাপ ?

থাকে, থাকে বৈকি ? ওসব কথা বোলো না। আমার ভয় করে বড্ড।

দিনের বেলাতেও ?

তবু।

আমি তো আছি। বন্দুক চালাতে জানি, ভরসা রেখো।

তাহমিনা তখন একটা কামরা খুলে বলল, আব এইটে আবিদের বসবার ঘর।

ওইটে বুঝি ওর ছবি ?

দেয়ালে একটা বাঁধানো ফটোর দিকে তাকিয়ে ফারুক শুধালো।

হ্যাঁ।

ঢাকায় একবার দেখেছিলুম। অদ্ভুত তীক্ষ্ণ চেহারা।

তাই নাকি ?

হাসলো তাহমিনা। জানালা খুলে দিল। সে হাসির বাঁকা ধ্বনি স্পর্শ করে গেল ফারুককে। সারাটা সকাল এমনি করে ঘুরে ঘুরেই কাটল। সমস্ত বাংলো দেখাল তাহমিনা তাকে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল তারা ঘাট অবধি। ফিরে এসে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে তাহমিনা বলল, তুমি বোসো, বাইরে ডেকচেয়ার পেতে দিচ্ছি। আমি আর এক পট চা বলি তোমার জন্যে।

না থাক। শোনো—

কী ?

একটা জিনিস তুমি আমাকে দেখালে না কিন্তু।

কী ফারুক ?

তাহমিনা ওর দিকে তাকাল। যেন চোখের ভেতরে কিছু আবিষ্কার করতে চাইল।

আবিদের শিকারের কিউরিও।

তাহমিনা হঠাৎ চমকে উঠে, শঙ্কিত গলায় বলল, কে তোমাকে বলেছে ?

আবদুল— আবদুল বলেছে।

না, সে চাবি আমার কাছে নেই। না, নেই।

সে চলে গেল। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারল ফারুক, চাবি তাহমিনার কাছেই আছে। তাহমিনা দেখাতে চায় না বুঝি কামরাটা। কিন্তু কেন ? কি আছে ওখানে ? কেন, ও এমন করল ? অনেকক্ষণ কেটে গেল। তবু তাহমিনা ফিরল না।

আবদুল ডেক চেয়ার পেতে দিয়ে গেছে বাইরের বারান্দায়। ফারুক সেখানে বসে তাকিয়ে রইল দূরে।

।। ৯ ।।

আশরাফ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, আরো সকালে আসা উচিত ছিল আমার। দেরি হয়ে গেলো।

সে-কী। আসুন।

আশরাফ নিজেই ভেতর থেকে আরেকটা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে পাশে বসলো। বলল, কেমন লাগছে এই এলাকা ?

খুব ভালো।

আপনারা শহুরে মানুষ তাই। আমাদের চোখে এর সব বিউটি মরে গেছে। উপমা দিলে বলতে হয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এর সব দেখেছি আর কোনো গোপন রহস্য নেই।

বলেই উচ্চকণ্ঠে হাসল আশরাফ।

যাকগে সেসব কথা। আঠারো বছর বনে বনে ঘুরে খাস বুনো হয়ে গেছি। আপনাদের এখনো ভালো লাগবে।

ভালো আমার লেগেছে। সকালে ঘাট অবধি গিছলুম।

ও তাই নাকি ?

ও দিকে ঘুরে দেখবার ইচ্ছে আছে।

বেশ তো, চলুন না। দাঁড়ান, তার আগে তাহমিনার সঙ্গে দুটো কথা বলে আসি। কী যে বিপদ হয়েছে আমার!

কী রকম ?

এই ফার্ম নিয়ে। আপনি বসুন, আমি চট করে আসছি।

আচ্ছা।

আশরাফ চলে গেলে পর ফারুক আবার ডুবলো তার ভাবনায়। কাল নিস্তব্ধ গভীর রাতের সেই ঘটনার কথা সে ভাবল। একই ছবিকে বারবার ঘুরিয়ে দেখতে লাগল নানান কোণ থেকে। আশরাফ শোবার ঘরের দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকল, তাহমিনা।

বিছানার ওপর উবু হয়ে শুয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে ছিল তাহমিনা। হাতে ছিল বই, কিন্তু চোখ ছিল না সেদিকে। ডাক শুনে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। বুকের ওপর শাড়ি ঠিক করতে করতে বলল, আপনি!

হ্যাঁ, কথা ছিল। তোমার সময় হবে ?

তাহমিনা দোরপর্দা সরিয়ে ডাকল, ভেতরে আসুন।

না ঠিক বসব না।

বলতে বলতে আশরাফ ঘরের কার্পেট মাড়িয়ে একটা নিচু চেয়ারে এসে বসলো। তাহমিনা কাছে এসে শুধালো, কি বলবেন ?

কাল রাতে সেই যে নতুন অর্ডার ক'টার কথা বলেছিলাম—

হ্যাঁ।

বেশ বড় অর্ডার সব ক'টাই।

তাহমিনা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল।

ছ' নম্বর প্লট থেকে সাপ্লাই দিতে হবে। সেখানে আমার যাওয়া দরকার। নইলে কাজ হবে না।

তাহমিনা দূরে একটা চেয়ারে বসে বলল, বেশ তো।

তুমি বলছ যাব ?

কেন যাবেন না, যা ভাল হয় তাই করবেন।

কিন্তু এদিকে সব একেলা ফেলে ? আবিদও হাসপাতালে, ওরই বা কী হয়, সেও একটা ভাবনা। তোমাকে এ সময়ে রেখে যাই কী করে তাই ভাবছি।

আপনি যান, আমার জন্যে ভাববেন না। কবে যাবেন ?

গেলে আজকেই। সন্ধ্যেয় বেরুলে কাল প্রায় ভোরে গিয়ে পৌঁছুবো।

আপনি তাই করুন।

কিন্তু বেশ কয়েকদিন দেরি হবে যে।

হোক না। আপনি যান। আবদুল ওরা তো রইল।

বলতে গিয়ে তাহমিনার স্বর একটু কাঁপল। কিন্তু সে অতি সামান্য। আশরাফ বুঝতে পারল না ঠিক। বলল, উনি কতদিন আছেন ?

কে ? ফারুক ?

হ্যাঁ।

তাহমিনা চমকে উঠল। ও কথা শুধালো কেন আশরাফ ? না কি সব কিছু জেনে গেছে, তাকে সন্দেহ করছে ? তাহমিনা আড়চোখে মুহূর্তের জন্য তাকালে তার দিকে।

কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। দ্রুত কোলের ওপর চোখ নামিয়ে সে বলল, চলে যাবে শীগগীরই। দু'একদিনের মধ্যেই। একটু থেমে বলল, দুর্ঘটনার কথা শুনে অবধি থাকতে চাইছে না।

ও।

আশরাফ যেন কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল এইটুকু কথা বলে। কিছুটা চিন্তিত দেখাল ওকে। শেষে বলল, এক কাজ করো না, আফিয়া এসে ক'টা দিন থাক এখানে। তুমিও একেলা হবে না তাহলে. কী বল ?

কেন ?

তাহমিনার মুখ থেকে হঠাৎ প্রশ্নটা গড়িয়ে পড়ল। আশরাফ তার দিকে তাকাল, অবশ্যি তুমি যদি দরকার মনে না কর, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। এমনি বলছিলাম।

তাহমিনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তাহলে আশরাফ ওরকম কিছু ভেবে বলেনি। আশরাফ উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে বলল, ভালো কথা, বোট আমি নিয়ে যাচ্ছি। তোমার যদি সদরে যেতে হয় ?

সে ব্যবস্থা হবে একটা।

আচ্ছা। কোনো খবর পেলে দেরি করো না, সদরে যেও। কী থেকে কী হয় বলা যায় না। অবিশ্যি আমার যদ্দুর মনে হয় ভয়ের কিছু নেই। আর ভয়েরই বা কী। তুমি ভেবো না ওসব।

তাহমিনা ম্লান হাসল শুধু প্রত্যুত্তরে।

আশরাফের পেছনে পেছনে তাহমিনা এলো বাইরের বারান্দায়।

আশরাফ সমুখে আসতে আসতে বলল, আসুন ফারুক সাহেব, বেরুবেন বলছিলেন।

হ্যাঁ চলুন। কথা হলো ?

হ্যাঁ। আজ বিকেলেই কাজে চলে যাচ্ছি— এই সন্ধ্যেয়— ফিরব ক'দিন পর।

ও।

থেকে যান না ক'দিন। আমি ঘুরে আসি। ও-ও ভালো হয়ে আসুক। সারা সুন্দরবন আপনাকে চিনিয়ে দিতাম। তাহমিনার দিকে ফিরে বলল, বলো না ওকে থেকে যেতে।

ফারুক তাহমিনার দিকে আধো চেয়ে উত্তর করলো, পারলে থাকতাম বৈকি। আবার আসব।

আশরাফ এবার বলল, তাহলে দুপুরে আমার ওখানেই খাবেন আজকে।

শুধু শুধু আপনি আমাকে টানছেন। তারচেয়ে চলুন। ফারুক সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল।

আশরাফ বলল, কি বল তাহমিনা ?

তাহমিনা প্রায় কিছুই বলল না এর উত্তরে। ফারুক ঠিক রাজি হতে পারল না। অবশেষে বিকেলে চা খাবে এই ঠিক হলো। আশরাফ শেষে বলে গেল, তুমিও এসো তাহমিনা। একসাথেই এসো।

আচ্ছা। আসব। ফারুক, দেরি করো না কিন্তু। কাল রাতে কিছু খাও নি।

এই তো এখুনি এসে যাবে।

আশরাফ ফারুকের হয়ে উত্তরটি দিল।

বাংলোর আশেপাশে কাছাকাছি ঘুরে বেড়াল ওরা। মাঝে মাঝে দু'এক ঘর বসত। তার পরেই আবার অরণ্য। এর ভেতর দিয়েই মানুষ তার পায়ে চলার পথ করে নিয়েছে। আশরাফ গাছ চিনিয়ে দিচ্ছিল। বলছিল কী করে তা কাটা হয়, চালান হয়। হাঁটতে হাঁটতেই তার কাছে সে শুনলো সব কিছু। আঠারো বছর আগে কী করে আশরাফ আবিদের বাবার ফার্মে ঢোকে, সে গল্পও করল। এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে বেলা হলো বেশ কিছুটা। ফারুক ফিরে এলো। তাহমিনা বলল, দেখলে ?

দেখলাম।

নাও এবার গায়ে পানি দিয়ে এসো। গরম করে দিইছি, নইলে নতুন পানি, গায়ে বসে যাবে।

পায়ে শ্লিপার গলিয়ে ফারুক একটু হেসে, একটু থেমে, বলল, স্বাস্থ্য বলে যে একটা কিছু আছে আজ তা মনে পড়ল। তুমি না থাকলে তো ঠাণ্ডা পানিই গায়ে দিতাম।

এই করেই তো শরীরটা নষ্ট করলে।

কেন, খুব ভেঙে গেছে নাকি ?

কই, না একটু।

তাহমিনা চলে যেতে যেতে বলল। তারপর নিজেই অবাক হলো, ও কথা বলতে গেল কেন ? তিন বছরে ফারুক আরো সুন্দর হয়েছে, আরো দৃপ্ত হয়েছে। কিন্তু সে কথা কি বলা যায় ?

ফারুক কী ভাববে ?

খেতে বসে ফারুক বলল, এই বুনো জায়গায় এ সব যোগাড় করলে কোত্থেকে বল তো ?

কেন, আমরা কি লতাপাতাই খেয়ে থাকি মনে করেছ ?

না, তা কেন ? আশা করিনি।

তুমি তো রান্নাঘরে যাওনি। গেলে দেখতে ঢাকার যে কোনো বড় হোটেলের সাথে পাল্লা দেয়া যেতে পারে।

আশ্চর্য!

ওই চপটা নিও। ফেলে রেখো না।

তাহমিনা সমুখে প্লেট এগিয়ে দেয়। একটু পরে বলে. দুপুরে ঘুমুবে তো ?

কেন ?

শুধোচ্ছি। বিকেলে আবার ওদের চায়ে যেতে হবে না ?

না— দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যেস নেই। খবর কাগজের লোক আমরা, আমাদের ঘুমের কি আর টাইম বেটাইম আছে ?

তাহমিনা ওর মুখের দিকে একবার চোখ তুলে পিরিচের ওপর নামিয়ে নিল। ফারুক তাকে একটু খুশি করবার জন্যেই যেন বলল, তাহোক, ঘুমিয়ে পড়লে ডেকে দিও তাড়াতাড়ি।

আচ্ছা।

আবদুল গ্লাশে স্বচ্ছ ঠান্ডা পানি জাগ থেকে ঢেলে দিল। হাত ধোবার গরম পানি এগিয়ে রাখল সমুখে।

বেলা প্রায় দুটো এখন। চারদিক স্তব্ধ। কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই। শুধু দূর-সবুজ রোদে পুড়ে যাচ্ছে। হলুদ শীটের মত রোদ এসে ছড়িয়ে পড়েছে যদ্দুর দেখা যায়। ফারুক বিছানায় শুয়ে ছিল। তন্দ্রা নামছে তার চোখের ভিতরে। এই অরণ্যের সবুজের আঘ্রাণ যেন সে নিতে পারে, এত সূক্ষ্ম এখন তার অনুভূতি। আকাশ পাতাল সে ভাবতে লাগল আধো তন্দ্রার ভিতরে। এমন সময় পায়ের শব্দ। মুখ ফিরিয়ে সে শুধালো, কে, আবদুল ?

জি হুজুর, ঘুরে যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে। কিছু বলবেন ?

আবদুল দোরপর্দার ওধারে এসে দাঁড়িয়ে শুধালো।

এক গ্লাশ পানি।

গ্লাশে ঠোঁট ছুঁইয়ে ফারুক বলল, লেবু কেটে দিয়েছ পানিতে না ? তোমার মেম সায়েব কী করছে ?

ঘুমুচ্ছেন।

ও।

আচ্ছা আবদুল-- ফারুক আধো উঠে বসলো, তোমার সায়েবের শিকার ঘর কোন দিকে জানো ?

কেন ? ডানহাতে পেছনের প্রথম ঘরের পরেরটাই তো। আপনি দেখেন নি ?

না। আমাকে দেখাতে পারো ?

খুব।

মেম সায়েবকে বলে দরকার নেই। ঘুমুচ্ছে। চুপ করে চাবি নিয়ে আসতে পারবে ? বকশিস দেব।

আবদুল একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ফারুক মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে দেখবেই কি আছে ওই কামরায়, যাকে তাহমিনার এত ভয় ?— যার জন্যে সে মিছে অবধি বলেছে, চাবি নেই ? ফারুকের বিশ্বাস হয় নি। আবদুলকে চুপ করে থাকতে দেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ও ঘর তুমি কোনোদিন খোলো নি ?

খুলেছি হুজুর।

চাবি কোথায় জানো না ?

জানি।

তাহলে ভাবছ কেন ? আমি শুধু দেখব বৈতো নয় ? যাও। ফারুক নিচু গলায় প্রায় তার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল। তারপর শ্লিপিং শার্টের বোতাম ধরে অপেক্ষা করল উত্তরের।

কিন্তু—

কিন্তু কী আবদুল ? উনি কিছু বলবেন না। আমি বলে দেব।

আচ্ছা আমি নিয়ে আসছি।

কিছুক্ষণ পরে আব্দুল এসে বলল, আসুন। ও ঘরের আরেকটা চাবি আমার কাছেই থাকে।

যেন এক রহস্যের রাজ্যে যাচ্ছে, একটু সাড়া পেলেই সব মিলিয়ে যাবে শূন্য বাতাসে; যেন এক অরণ্য-হরিণের শিকারে যাচ্ছে সে, একটু শব্দ উঠলেই সেই ঘাইমৃগী পালিয়ে যাবে— এমনি সাবধানে, সন্তর্পণে পা ফেলল ফারুক। আব্দুল পাশে পাশে ফিসফিস করে বলল, সায়েব আমাদের এ এলাকার সবচে নামজাদা শিকারী। একটা টিপও ফসকাতে পারে না ওঁর হাত থেকে, এমনি। আর সে কী শিকারের নেশা। দিন নেই রাত নেই শুধু বনে বনে শিকার আর শিকার।

ফারুক একবার দাঁড়িয়ে কান পাতল তাহমিনা জেগে উঠেছে নাকি। না। সে এবার শুধালো, শুনেছি, আগে নাকি এরকম ছিল না।

হ্যাঁ হুজুর। এই অল্পদিন হলো মাত্র— প্রায় এক বছর হবে। এর আগেও যেতেন, খুব কম। তখন বাঘও মেরেছেন। কিন্তু এ বছর চোখে যা পড়েছে, তা আর নিস্তার পায় নি। আসুন।

ফারুকের চোখের সামনে অদেখা এক রাজ্যের তোরণ যেন খুলে গেল। মাথার ওপরে স্কাইলাইট। অনেক ওপরে। লাল আর নীল কাচের বর্ণালি ছায়া এসে পড়েছে চারদিকে। কখনো কখনো সম্পাত হয়ে সৃষ্টি করেছে বেগুনি আভা। সাঁঝের রঙে যেন ভরে গেছে সমস্ত কামরা। ধূসর আর ম্লান। অদ্ভুত ঠাণ্ডা। বাইরের ঝলসানো রোদের পাশে অবিশ্বাস্য রকমে শীতল। একধারে দীর্ঘ পরিচ্ছন্ন এবং বার্নিশ করা আলমিরায় কয়েকটা বন্দুক খাড়া করে রাখা। ঝকঝক করছে। নীল নীল একটা দ্যুতি বেরুচ্ছে। ইস্পাত কী ঠাণ্ডা। আর ঘরের মাঝখানে বিরাট টেবলের ওপর কার্টিজ শূন্য স্ট্র্যাম্প পড়ে রয়েছে। কেউ হয়ত ছুঁড়ে ফেলে গেছে। আর তুলে রাখা হয়নি। দেয়ালের নিচু চারটে প্রশস্ত র‍্যাকে রাখা চারটে কুমির।

ভেতরে খড় পোরা। মেঘের মত ঘোলা উদাস চোখ তাদের। আর মাথার ওপরে বুনো মোষের মাথা। টনি রঙের পশমওলা। এখুনি হয়ত শিং নেড়ে অন্ধের মত তেড়ে আসবে। ফারুক সম্মোহিত তাকিয়ে রইল। বাঘের পুরু সোনালি ছালটা কী কোমল! ব্যাবিলনের কোনো রাণীর ঘাড়ের ওপরে উজ্জ্বল এমনি চিতার ছাল বুঝি জড়ানো থাকতো শুভ্র মসৃণ পিঠ অবধি। একদিন আবিদের গুলি খেয়ে লাফিয়ে উঠেছিল আকাশে আক্রোশে, ধনুকের ছিলা ভাঙা মুদ্রায়। তারপর পাকা ফলের মত ঝুপ করে পড়ে গেছে নিঃসাড় হয়ে। মাথার ওপরে খানিকটা গুলির ছেঁড়া চিহ্ন। মাথাটা নিচের দিকে ঝুলছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন মুখ লুকিয়ে হাসছে অরণ্যের সম্রাট।

ফারুকের সারাটা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। আবদুল কী যেন বলছে, হয়ত শিকারের ইতিহাস বলছে, ভালো করে কানে আসছে না তার। যেন প্রতিহত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। যেন সে রূপোর কাঠিতে ঘুমিয়ে পড়া এক হিংস্রতার নীল দেশে দাঁড়িয়ে।

আলমিরার পাল্লা খুলে ধরল আবদুল। একটু শব্দ উঠল তীক্ষ্ণ। একটা নখ তুলে ধরল সে। বেড়ালের চোখের মত রঙ তার। ভারী অথচ তীক্ষ্ণ। বাঘের নখ হুজুর।

কিন্তু ফারুক অবচেতন মনে অনুসন্ধান করে চলেছে আরো কিছু। সে উদঘাটন করতে চায় সেই রহস্য, যার জন্য তাহমিনা তাকে এ ঘরে আনে নি। বোবা সে তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক। আবদুল ওটা রেখে দিয়ে এবারে কুমিরের একজোড়া দাঁত তুলে নিল হাতে। আর এমন সময়ে, ঠিক এমন সময় আর্ত, ভীত, মিহি, দুর্বোধ্য চিৎকার শোনা গেল তাহমিনার, আবদুল!

ঘুমে সারামুখ থমথমে ভারী হয়ে গেছে তার। কপালের ওপর সেঁটে রয়েছে একগুচ্ছ চুল। আলুথালু শাড়িতে দুপুর ঘুমের ভাঁজ। মুহূর্তকাল তীব্র স্তব্ধ হয়ে রইল তাহমিনা। তারপর ফেটে পড়ল, হাঁপাতে হাঁপাতে উচ্চারণ করল, কোত্থেকে চাবি নিয়েছ? কে তোমাকে বলেছে? বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। বেরিয়ে যাও বলছি আবদুল।

আবদুলের সারা শরীর কেঁপে উঠল। ধরাগলায় একবার মাথা নিচু করে বলল, মেমসাব।

কোন কথা শুনব না, বেরিয়ে যাও।

আবদুল বেরিয়ে গেল। তাহমিনা এসে দাঁড়াল ফারুকের সমুখে। তাহমিনার চোখে ভয়াবহ শূন্যতা। সে পাগলের মত, ভূতগ্রস্তের মত, বলে চলল, কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে? কী দেখতে এসেছো? বল, বল।

ফারুক চুপ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল বিহ্বল হয়ে। তাহমিনা কি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে? এমন করছে কেন? সে দুহাতে ওর বাহু মূল ধরে ঝাঁকি দিয়ে ডাকল চাপা স্বরে, তাহমিনা, তাহমিনা।

হাত সরিয়ে নিল ও।

চলে যাও এ কামরা থেকে।

কিন্তু গেল না সে। একটু থামল তাহমিনা। তারপর নিমেষে কী যে হয়ে গেল তা ফারুক বুঝতে পারল না। তাহমিনা দু'হাতে আলমিরার সমস্ত নখ আর দাঁত ছুড়ে ফেলল মাটিতে। বাঘের সেই উজ্জ্বল ছাল ধরে টান দিল! একটু নড়ে স্থির হয়ে গেল ওটা। তারপর কর্ড ছিঁড়ে মেঝের ওপর ভাঁজ হয়ে লুটিয়ে পড়ল। আর তাহমিনা বলে চলেছে— দ্যাখো, দ্যাখো, এইসব দেখতে এসেছ। দ্যাখো, দ্যাখো তুমি।

ফারুক এবার তাকে আঁকড়ে ধরল। উচ্চারণ করল একবার তার নাম। একটু পরে সহসা শান্ত হয়ে এলো তাহমিনা। বুঝতে পারল সে কি করছে। ফারুকের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিজের বিছানার ওপর গিয়ে লুটিয়ে পড়ে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগল। ছোট ছোট তরংগের মত দেহ তার কেঁপে উঠল। সে অনুভব করতে পারল ফারুক এসে দাঁড়িয়েছে কামরায়। ঠিক তার পাশেই। মুখ লুকিয়ে রেখেই কান্নাগলায় বলল, আমি কী করব ফারুক ? আমার এ-কী হোলো ? কেন আমার এমন হোলো ? কেন ? কেন ?

তাহমিনা, আমি এমন হবে জানলে ওখানে যেতাম না। অজান্তে তোমাকে আঘাত দিইছি। আঘাত তোমাকে আমি দিতে চাইনি।

না, ফারুক না।

কী না, তাহমিনা ?

তাহমিনা বালিশ থেকে তবুও মুখ ফেরাল না।

ফারুক অপেক্ষা করল আরো কিছুক্ষণ। কোন কথাই বলল না ও। শেষ অবধি একটু ইতস্তত করে বলল, তাহমিনা শোনো, আমি তারচে' চলে যাই।

কেন ফারুক ?

চলে যাওয়াই আমার ভালো। আমি যাই।

তাহমিনার সারাটা শরীর শুধু কান্নার অভিঘাতে কেঁপে উঠল আরো। মুখ ডুবিয়ে নিল বালিশের আরো গভীরে। ফারুক কি করবে কিছুই ভেবে পেল না। তাহমিনা জোরে জোরে দু'বার শ্বাস নিল। আর সে ভয় পেয়ে কাছে এসে তার পিঠের ওপর আলতো হাত রেখে শঙ্কিত গলায় শুধালো, কি হলো তোমার তাহমিনা ?— তাহমিনা!

আমার কোন দোষ নেই, আমি কোনোদিন মা হতে পারব না ফারুক। বালিশের ভেতর থেকে এই অস্পষ্ট উচ্চারিত বিজড়িত কথাটি তীক্ষ্ণ হয়ে এসে বিঁধল ফারুককে। সে চমকে উঠল। একি বলছে তাহমিনা ? সে কি উন্মাদ হয়ে গেছে ? নিজের কানকে সে যেন বিশ্বাস করতে পারল না ? পাথরের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আর তাহমিনাও যেন বিশ্বাস করতে পারল না নিজের কানকে। যে কথা সে আজ এক বছর হোলো টের পেয়েছে, যে কথা সে বলবার জন্য ফারুককে কাছে চেয়েছে, যে কথা কাল ফারুক আসা অবধি তাকে মৃদু অবিরাম আগুনে পুড়িয়েছে— তা সে উচ্চারণ করেছে। এই প্রথম উচ্চারণ করেছে। আর তার দ্বিধার অবকাশ নেই। আর তার ফেরবার পথ নেই। তাই নিমেষে তার কান্না আর ফোঁপানো থেমে গেল। স্থির হয়ে তেমনি উবু হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে নিস্পন্দ পড়ে রইল।

ফারুকের চোখে পড়ল নিমেষের এই পরিবর্তন। গোটা পৃথিবী ধোঁয়ায় ধূসর অস্বচ্ছ অবাস্তব হয়ে এল তার সমুখে। সমস্ত বোধ তার শিথিল হয়ে গেল। আস্তে আস্তে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে এল তাহমিনার চিঠি লেখা থেকে এই মুহূর্ত অবধি প্রতিটি ব্যবহার, প্রতিটি কথার অর্থ। টুকরো টুকরো ঘটনা যা অসংলগ্ন বলে একটু সময় আগেই মনে হয়েছিল, এখন তার সূত্র সে যেন উদ্ধার করতে পারল। বিদ্যুতের মত কাল থেকে আজ অবধি তাহমিনার প্রতিটি মুখ ভেসে উঠল। তার মনে হোলো ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে সে পারবে না। তার ভীষণ ভয় করলো। সে একটু পর পালিয়ে এলো নিজের কামরায়।

বিকেল যখন হয়ে এলো তখন শুয়ে থেকে তাহমিনা ভাবল, আশরাফ বলে গেছে যেতে— না গেলে ভালো দেখাবে না। তাছাড়া আজ দুপুরের ঘটনাটা যদি তার কানে যায় আর সে না যায় চায়ে, তাহলে দুয়ে মিলে একটা কিছু হতে পারে। তা হতে দেবে না তাহমিনা। আর সে না গেলে ফারুক যে একেলা যাবে, তারই বা কী মানে আছে ?

অবশেষে বিছানা ছেড়ে উঠে— তারপর এই প্রথম উঠল— বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে পানি দিয়ে এলো ভালো করে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল রগড়ে। প্রসাধন করল। পরল ফিকে সবুজ জমিনের ওপর পাড় দেয়া শাড়ি আর সাদা সার্টিনের ব্লাউস। আবদুলকে ডেকে বলল, ফারুককে তৈরি হয়ে বেরুবার জন্যে খবর দিতে। না, সে সঙ্কোচ করবে না।

দুজনের দেখা হোলো। কথা বলল না। চুপচাপ নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে তারা। হাঁটতে লাগল। পথের দু'পাশে বেতের কচি সবুজ পাতা। ইতস্তত শাল আর সুন্দরী। এদিকে বন ঘন নয়। এদিকে মানুষের বসতি আছে। সব কেমন যেন চুপ এই মুহূর্তে। গাছের পাতাও নড়ে না। পাখিও ডাকে না। যে বনে পাতা পড়ে কুলো হয় সেখান থেকে কোনো আওয়াজও আসে না। সমস্ত এলাকাটা শুধু স্তব্ধ। দু'একটা বসত বাড়ির উঠোন কী অসম্ভব রকম তকতকে, ঠাণ্ডা আর নিঃশব্দ। দু'জনেই যেন বধির হয়ে গেছে এমনি চুপচাপ, তাদের যেন আর কিছু ভাবার নেই এমনি নিশ্চিন্ততায় পরস্পর হেঁটে চলল।

ফারুকের মনে এখন নেই আতঙ্কের স্বাদ, নেই ভীত অনুভূতি। তাহমিনার ভাবনা এখন খর নদীর স্রোতের মতন।

দুজনের স্তব্ধতা এখন মুখোমুখি।

তারা এসে পৌঁছুলো। আশরাফ তখন তৈরি হয়ে নিয়েছে, ওদের সাথে চা খেয়ে একসাথে বেরুবে। ওরা বাংলোয় যাবে। আর সে বোটে করে ছ'নম্বর প্লটে। আশরাফ দূর থেকে দেখেই এগিয়ে এল। বলল, আসুন, আসুন। এসো, তাহমিনা। খোকা, তোর আম্মাকে খবর দিয়ে আয় তো।

ওরা যখন গিয়ে বসলো বসবার ঘরে, তখন আফিয়া এলো। অত্যন্ত কম আসবাবে সাজানো প্রসস্ত কামরা। নিচু আর গভীর বসবার আসন। একধারে আলমিরায় কিছু বই। দেয়ালে একটা চিতল হরিণের ছাল ঝুলিয়ে রাখা। ফারুক আর তাহমিনা সেদিকে তাকাল, নামিয়ে নিল দুজনেই দৃষ্টি। তারপর ফারুক চোখ ফেরালো আফিয়ার দিকে। ভারী, গোলগাল, স্নেহময়ী মানুষটি। গালের গভীর টোল আর ঠোঁটের নিঃশব্দ হাসি লেগেই আছে। উজ্জ্বল ফর্সা রংয়ের সাথে চাঁপা রংয়ের শাড়িটি মানিয়েছে অপূর্ব। পান খেয়েছেন কখন, এখনও ঠোঁটজোড়া স্বচ্ছ লাল হয়ে আছে। দেখলে শ্রদ্ধা হয়, দু'দণ্ড বসতে ইচ্ছে করে।

আফিয়া তাহমিনাকে শুধালো উদ্বিগ্নস্বরে, কী হয়েছে তোমার বলো তো ?

কই, কেন, কিছু নাতো।

কিন্তু মুখ কেমন ভারী দেখাচ্ছে দেখছি।

ফারুক অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। তাহমিনা উত্তর করল, দুপুরে শুয়ে শুয়ে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি তাই।

ও।

কিছুটা শঙ্কিত স্বরে আফিয়া অনুমোদন করলো।

তারপরেই সহজ হয়ে এলো আবহাওয়া। বিকেলের চায়ের নামে আফিয়া যা করেছে তাকে ফারুক আর বিকেলের চা বলতে সাহস পেল না। হাতে তৈরি তিন রকম মিষ্টি থেকে শুরু করে, পরোটা, কিছুটা ঝাল আর নিখুঁত করে বানানো চা। বসে বসেই ফারুক শুনলো ওদের সংসারের গল্প। বড় দু'ছেলে চাটগাঁয়ে আছে। বোর্ডিং থেকে পড়ছে। আশরাফ চায় না ওরা এই বুনো ব্যবসা ধরুক। তারপর এক মেয়ে ছিল, সে নিউমোনিয়ায় মারা গেছে। সে কথা বলতে গিয়ে আফিয়ার চোখ কিছুটা ভিজে উঠলো আজো। দেয়ালে সেই মৃতা কন্যার ছবি। কিশোরী তনুতে সে সখ করে পরেছে বার্মিজ দেহাভরণ। আর তাইতে লাজুক দেখাচ্ছে আরো। তারপরে এই ছেলে। ওদের সাথেই এখনো আছে। আফিয়া দু'বেলা পড়ায়। বড় হলে তাকেও পাঠিয়ে দেবে চাটগাঁ কী ঢাকায়।

এই ছোট্ট সংসারের কথা শুনতে শুনতে ফারুক ভাবল, তাহমিনা কি ভাবছে এখন ? সে আড়চোখে তাকাল তার দিকে। গভীর আগ্রহ নিয়ে, যেন নতুন কোন গল্প শুনছে এমনি তন্ময়তায় সে শুনছে। আর তার উন্নত বুক ছোটখাট ফুলে উঠছে মৃদু নিঃশ্বাসের দোলায়।

অবশেষে উঠবার সময় হোলো। আফিয়া বলল, তাহমিনা থাক। অনেকদিন আসেনি। আমরা দু'জনে গল্প করি। আবদুল এসে নিয়ে যাবে। আর আপনি আর একবার আসবেন।

ফারুক এইখানে হেসে বলল, দেখি। তরপর বলল, আসব নিশ্চয়ই।

আশরাফ বলল, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি ভেতর থেকে আসছি। এক সাথেই বেরোই।

সবাই চলে গেলে ফারুক একেলা বসে রইল সেই কামরায়। শুধু মাত্র সে। এই মুহূর্তে সে অনুভব করতে পারল তার সত্ত্বাকে, তার পৌরুষত্বকে। সেই শঙ্কা যা সারা বিকেল তাকে ভর করে ছিল, এখন তা নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল। অনুভব করল সাহসের স্বাদ। সে কিছুতেই তাহমিনাকে এমনি করে একটি নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষার মত মরে যেতে দেবে না। না— তাকে সে মরতে দেবে না। আস্তে আস্তে এই সিদ্ধান্তের অনুরনণ যেন ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার সারাটা শরীরে। তার চোখ স্থির নিবদ্ধ হলো মেঝের একটি বিন্দুতে। সে ভাবল। সে তাহমিনার কথা ভাবল। তাহমিনা কত বদলে গেছে তবু সে তার সেদিনের তাহমিনা। পার হয়ে এসেছে তারা দীর্ঘ একটি সময়ের ব্যবধান তবু এই ব্যবধান— আজ এক মুহূর্তে এমন কি অকারণে, এই কামরায়, বিলীন হয়ে গেল। অদ্ভুত এক ভাবনা তাকে মৃদু বিস্মিত করলো— যেন সে এ কামরায় আজ নতুন আসেনি, বহু দিন বহু কাল ধরে আসছে, আবিষ্কার করেছে ঠিক এই কামরায় এই একই চেয়ারে ঠিক এমনি ভঙ্গিতে বসে মেঝেতে চোখ রেখে হৃদয়ের একেকটা উপলব্ধি, যেন জন্মান্তর থেকে এখানে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে আসছে, আজো নিয়েছে। এমনি সহজ, এমনি ঋজু। কোনো অভাবনীয়তা নেই। কোনো সংশয় নেই। একদিন সে তাকে ভালবাসতো। হঠাৎ সে আবিষ্কার করেছে আজো তাহমিনাকে সে ভালবাসে। আরো আপন করে, আত্মার মুখোমুখি তাকে সে ভালবাসে।

একটু পর আশরাফ এলো। ও চমকে উঠে দাঁড়াল দ্রুত পায়ে। শুধালো, আপনার জিনিস পত্র ?

আগেই বোটে চলে গেছে।

ও।

আশরাফকে সে এগিয়ে দিয়ে এলো ঘাট অবধি। আস্তে আস্তে বোট ছেড়ে দিল। পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে আশরাফ হাত নাড়ল। সেও প্রত্যুত্তরে হাত নাড়ল। বোটমাঝি গফুর হাত তুলে সালাম করল তাকে।

ফারুক অবসাদের ভঙ্গিতে হাত নামালো। মুখ ফেরাল বাংলোর দিকে। আবদুল পেট্রোম্যাকস জ্বেলেছে। উজ্জ্বল আলো তার চোখে আসছে এখান থেকেই। প্রথম সন্ধ্যে। আকাশে দু'এক টুকরো মেঘ। একটি বড় তারা। দুদিকে শাল আর সুন্দরী গাছ দূরে দেয়ালের মত সিধে ওপরে উঠে গেছে। আর তারি পাতা বিছানো পায়ে চলা ফিরতি পথ ধরল ও। রক্তের ভিতর অনুভব করল— অরণ্যের এক অদ্ভুত রহস্যময় আকর্ষণ আছে। সে শুধু কাছে টানে। কাকে যেন টানে। জড়িয়ে ধরতে চায় অমোঘ অলস মৌতাতের মত। ইচ্ছে হয় এখানে এই ভিজে ছায়ায় শুয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে। অথবা হারিয়ে যেতে এই অরণ্যে। এখানে যারা আসে, তাদের কোনো দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, বাধা নেই, সংকোচ নেই। কিছুই নেই। সমস্ত মুখোশ খুলে আদিম নগ্ন মানুষ হয়ে ওঠে তারা। ফারুকের রক্তের ভিতরে অণুতে অণুতে প্রবাহিত হয়ে গেল এই গান।

।। ১১ ।।

পেট্রোম্যাক্স নিভে গেছে। এখন তাহমিনার ঘরে জ্বলছে রাত দশটার বেডল্যাম্প। নিঝঝুম হয়ে গেছে চারদিক। শুধু দূর দিগন্ত থেকে কিসের একটা একটানা ধ্বনি আর নদীর জল বয়ে যাবার ঝাপসা আওয়াজ। কোথাও কেউ নেই। তাহমিনার দীর্ঘ কামরার দূর কোণায় বেডল্যাম্পের আলো ভালো করে পৌঁছায় নি। সেখানে প্রায় অন্ধকার। খাটের উপচ্ছায়া। ফারুক দূরে বসেছিল একটা মখমল ঢাকা সোফায়। খোলা জানালা দিয়ে অস্পষ্ট রাত্রি। ফারুক ঘরের দূরতম কোণে চোখ রেখে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল, তুমি এ বিয়েতে সুখী নও তাহমিনা ?

তার গলার স্বরে এত অবসাদ যে প্রশ্নটা প্রশ্ন বলে মনে হোলো না। স্বগত উক্তির মত শোনাল।

তাহমিনা বসেছিল খাটের ওপর। বাঁ হাতে হেলান দিয়ে। শুভ্র সুন্দর নিটোল বাহু তার এসে বিছিয়ে পড়েছে কোলের ওপর। মুখরেখা গড়ে উঠেছে মিহি আলোয়। এখন সে একবার মুখ তুলে তাকাল। উজ্জ্বল চোখ তার দেখাল কাচের বাটিতে রাখা স্বচ্ছ পানির মত। বলল, তোমাকে ঢাকা থেকে ডেকে এনেছি বলে তুমি অবাক হয়েছ, তাই না ? ফারুক চুপ করে রইল।

কিন্তু তুমি জান না এই এক বছব আমি কী করে কাটিয়েছি। তোমার মনে আছে ফারুক ? একবার বিয়ের আগে তোমায় বলেছিলাম এ হয়ত আমাব আত্মহত্যা।

হ্যাঁ।

সে কথাই যে সত্যি হয়ে দাঁড়াবে, তা আমি ভাবিনি।

তুমি আশা করছিলে, তুমি সুখী হবে ?

তাহমিনা যেন লজ্জিত হলো।

হ্যাঁ।

তোমার ভালোবাসা?

সেও সত্যি ছিল।

তাহলে?

আমি কিছুই বুঝতে পারি নি সেদিন।

আমিও পারি নি। তাহমিনা, তোমাকে আমি আজও ভালবাসি।

তাহমিনা কোনো কথা বলল না। ফারুক বলল, মনে পড়ে, তুমি একদিন বলেছিলে, ওকথা শোনাও তোমার পাপ?

ফারুকের দিকে চোখ তুলে তাকাল তাহমিনা। স্পষ্ট দেখতে পেল তাকে। বিরাট কামরার ভেতরে একটু ছোট দেখাচ্ছে ওকে। দূরে আয়নায় আরো ছোট হয়ে পড়েছে ওর প্রতিচ্ছবি। ফারুকের কপালে টলটল করছে কয়েক ফোঁটা ঘাম। শুকনো হয়ে গেছে ঠোঁটজোড়া। তাহমিনা জানে তার নিজের কথা। তার নাকের সমুখে এখন সূঁচের চোখের মত ছোট ছোট ঘাম জমছে। আর কানের পেছনে। যে কোনো মুহূর্তে গড়িয়ে পড়তে পারে। সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করল তাহমিনা। কিন্তু পড়ল না। অবশেষে বলল, আজ স্বীকার করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই ফারুক। তারপর একটু থেমে বলল, একটা কথার জবাব দেবে ?

কী?

আমাদের জীবনে আমরা কী চাই?

ফারুক একটু একটু করে প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে বলল, বিশ্বাস, শান্তি আর ঐশ্বর্য।

আমিও তাই চেয়েছিলুম ফারুক। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার।

অনেকক্ষণ থেমে ফারুক শুধালো, আজ দুপুরের সে কথা কি সত্যি তাহমিনা?

হ্যাঁ। আবিদ আমাকে তা দিতে পারে না।

কী করে জানো?

তাহমিনা অদ্ভুত হেসে বলল, আমি জানি।

তাহমিনা—

কি হবে আমার ঐশ্বর্য দিয়ে? কী লাভ—

হঠাৎ তাহমিনার চিবুকে সেই ঘামের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল। সে থামল। যে কথা সে উচ্চারণ করেছিল তা কামরাময় ঘুরে বেড়াল। প্রতিধ্বনি হয়ে জেগে রইল। আর ফারুক জানতে পারল এখুনি সে বলবে— সব কিছু বলবে তাকে। সে অপেক্ষা করে রইল।

প্রথম সন্দেহ হয়েছিল বছর দেড়েক আগে। তাহমিনা জিজ্ঞেস করেছিল আবিদকে। আবিদ হেসে উড়িয়ে দিয়েছে কথাটা। কিন্তু একবার যখন প্রশ্নটা উঠেছে, তখন সন্দেহ তার মনেও গভীর হয়ে উঠল। তখন থেকেই শুরু। তাহমিনা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারপর একদিন আবিদ চলে এসেছে ঢাকায়। সবচে' বড় ডাক্তার দেখিয়েছে। রিপোর্ট তিনি লিখে দিলেন, ভালো হবার কোনো আশা নেই। আবিদ যখন ফিরে এলো তখন তার চেহারা দেখেই সব অনুমান করে নিতে পেরেছিল তাহমিনা। কিন্তু জিগ্যেস করলে আবিদ বলেছে, ওটা একটা সাময়িক ব্যাপার। ওষুধ দিয়েছে, কোনো ভয় নেই।

তুমি লুকোচ্ছ নাতো ?

আবিদ জোর করে হাসি টেনে উত্তর করেছে, তোমার কাছে লুকোবো মিনু ?

একদিন পরেই তাহমিনার কাছে সব উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। একদিন আবিদের সেফ ড্রয়ার কী কারণে খুলেছিল। সেখানে রাখা ছিল সেই মেডিক্যাল রিপোর্ট। কিছুই সে করে নি। ভাঁজ করে ওটা আগের জায়গাতেই রেখে দিয়েছে। আবিদ সন্ধ্যের সময় এলে পর, তাহমিনার গম্ভীর মুখ দেখে শুধিয়েছে, কী হলো আবার তোমার ?

তুমি আমার কাছ থেকে লুকোলে কেন ?

আবিদ চিৎকার করে চেঁচিয়ে উঠল. সেফড্রয়ার খুললে কেন তুমি ?

আমার অধিকার আছে বলেই। কেন তুমি লুকোতে গেলে ?

সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে নাকি ?

হ্যাঁ।

না, তোমাকে দেব না।

চিৎকার করে কথাটি উচ্চারণ করে উন্মাত্তের মত আবিদ তার সমুখে থেকে চলে গিয়েছে।

তারপর থেকেই দুজনে অসম্ভব দূরে সরে গেল এক মুহূর্তে। এক বিছানায় শুয়েও যেন দুজন দু মহাদেশের অধিবাসী। আবিদ উন্মাদ হয়ে গেল তার বন্দুক নিয়ে। দিন রাত অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে তার ব্যর্থ পৌরুষত্বের শোধ নিতে লাগল। চোখের দৃষ্টিতে তার হিংসা। আর দিনে দিনে আতঙ্কিত হয়ে উঠল তাহমিনা। ব্যর্থ কান্নায় সে ডুবে গেল। সমস্ত ঐশ্বর্য তার কাছে তুচ্ছ।

সেদিন যখন আহত হয়ে আবিদ ফিরে এল জ্ঞানশূন্য অবস্থায়, তখন ভয়ে তার দম বন্ধ হয়ে এসেছে। সমস্ত বোধ তার লুপ্ত হয়ে গেছে। তাহমিনা প্রার্থনা করল মরে যাবার জন্যে। প্রার্থনা করল এই হিংস্রতা আর আঁধি দেয়ালের দেশ থেকে তার মুক্তির জন্যে। তখন যদি আবিদের মৃত্যুও হোতো তার চোখের সমুখে, তবুও তার এতটুকু বিকার দেখা দিত না। ঘৃণায় ধিক্কারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল তাহমিনা।

ফারুকের সোফার পাশেই ছিল রেডিও সেট। ব্যাটারি থেকে লাল আর নীল সরু তার উঠে এসেছে। তাহমিনা উত্তেজিত অথচ ফিসফিস স্বরে যখন বলে যাচ্ছিল এই ইতিহাস, তখন ফারুক চোখ নিচু করে রেডিওটার দিকে তাকিয়ে ছিল সারাক্ষণ। একসময়ে অন্ করে দিল সে। আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে দেখল সমস্ত স্টেশন। বিচিত্র দুর্বোধ্য স্বচ্ছ জল অভিঘাতের নিচু শব্দ উঠতে লাগল। তাহমিনা একটু থামল। তারপর বলল, সকালে ওকে সদরে রেখে আসবার পর কী করে যে সময় আমার কেটেছে. তা তোমাকে কী করে বোঝাই!

তারপর তুমি আমার কাছে লিখলে ?

হ্যাঁ। তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে মুক্তি দিতে পারবে না ফারুক। তুমি আমাকে ঠেলে দিও না।

হঠাৎ সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ল সুর মূর্চ্ছনা। মিহি তার ধ্বনি ভাসিয়ে দিল কামরার রুদ্ধ বাতাস। অলস গড়িয়ে গেল মেঝের ওপর। ফারুক ভল্যুম কমিয়ে দিল। শুধু অনুভব হয়ে রইল সেই সংগীত। রক্তের ভেতরে জাগালো এক রিমঝিম। ফারুক বলল, পলিনেশিয়ার মোআনা মেলডি বাজছে।

তাহমিনা একটুখন চুপ করে রইল। মৌতাতের মত জড়িয়ে ধরল তাকে সেই সংগীত। সে উচ্চারণ করল, তুমি কি বোঝো না?

আমি বুঝি তাহমিনা। কিন্তু আবিদ রয়েছে যে।

আমি ওকে আর ভয় করি না।

সে কী করে হয়?

তুমি কাপুরুষ।

তাহ্মিনার স্বর শোনাল সেই অর্কেস্ট্রার একটা মিষ্টি যন্ত্রের ধ্বনির মত।

আমাকে ভাবতে দাও।

আর কবে?

তবু।

না।

বলতে বলতে তাহমিনা শুভ্রশয্যায় এলিয়ে চোখ বুঁজলো। মেঝের লাল কার্পেট আগুনের মত জ্বলে উঠল ফারুকের চোখে।

পলিনেশিয়ার প্রবাল কি এমনি লাল? সেখানে সেই পাম আর রবার বনে আজ নীল জোছনা। সাদা শীটের মত সমুদ্র আর বালিয়াড়ি। সেখানে উদ্দাম নৃত্য ভঙ্গিমায় শৃঙ্গারের মুদ্রা আজ। কুরঙ্গের মত গতি সেই নর্তক আর নর্তকীদের। আর ইউকেলেলির বুক স্পর্শ করা ঝংকার। অ্যাকর্ডিয়নের একক ধ্বনি তরংগ। কখনো সেই সুরতরংগ অলস মন্থর হয়ে আসছে, তারপর পরমুহূর্তেই একরাশ উজ্জ্বল শুভ্রতার মত চূর্ণ চূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত ছিটিয়ে পড়ছে। রক্তের জোয়ারকে আহত করছে ক্রমাগত। পলিনেশিয়ার জোছনা কি নীল? তার বালুকা বেলা কি শুভ্র? তার রবার বনে স্বপ্ন মর্মর?

ফারুক সেই মূর্চ্ছনায় ভেসে গেল। বিস্মৃত হলো। সে বলল, আমি আর ভাবি না তাহমিনা। তাহমিনা একটুও নড়ল না। তেমনি চোখ বুঁজে পড়ে রইল। কিছু বলল না। সে কি শুনতে পায়নি ফারুকের স্বর? আজ সে সব বলেছে, আর তার কোনো ভাবনা নেই। সে মুক্ত। সমস্ত ভার তুলে দিয়েছে ফারুকের কাছে। এই সুরতরংগ শুধু অনুভব করা যায়। এখানে শুধু নিমগ্ন হয়ে যাওয়া যায়। ধীরে ধীরে একটা সুর স্পষ্ট হয়ে রইল তার কাছে— জড়িয়ে ধরল— বুঝতে পারল তার নাম ফারুকের সান্নিধ্য।

তার এক মুহূর্ত আগেই বুঝতে পেরেছে ফারুক। কোমল শব্দ উঠল সোফা থেকে। তাহমিনা স্বপ্নের ভিতর থেকে শুনতে পেল তার পদশব্দ। সে শুনলো।

ক্ষণকাল সে নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে সে ঠোঁট খুলল। মুখ নামিয়ে আনল ফারুক। এক হাতে নিভিয়ে দিল ল্যাম্প। অনেকক্ষণ। ফারুকের হাত তার খোঁপার গভীরে। আর একটা হাত তার পিঠের আড়ালে। অনেকক্ষণ পড়ে রইল তারা। মোআনা মেলডি যেন হাজার মাইল দূর থেকে ভেসে আসছে এই অন্ধকার কামরায়।

চোখ মেলল তাহমিনা। হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল তারা খাটের কেন্দ্রে। ফারুকের কপালে স্বেদবিন্দু। চোয়ালের হাড় ফুটে বেরিয়েছে। কঠিন হয়ে গেছে। সে তাকে বাহুবন্ধনে বাঁধল। আর তারপর তাহমিনা তার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখল অন্ধকার সিলিং। কাঠের বিমগুলো

দূরে, প্রায় একটি বিন্দু থেকে, দ্রুত সমুখে এগিয়ে এসেছে— এসে তার দেহের দু'দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ফারুকের কাঁধে চিবুক ঠেকিয়ে— তার চিবুকের নিচে সিফনের মত যে বঙ্কিমতা— তাহমিনা অনুভব করল এক আশ্চর্য নদীর হঠাৎ প্রবাহ। গেল। কিন্তু তাকে কৃতজ্ঞ করে দিয়ে গেল। যা সে পায়নি, এতকাল, পায়নি এমন কি যা পাবার আশা সে ছেড়ে দিয়েছিল, তা যেন হঠাৎ কেউ তাকে দু'হাত ভরে দিয়ে গেল। কৃতজ্ঞতায়, তৃপ্তিতে, মুক্তিতে, বিশ্বাসের অসীমতায় মুহূর্তকাল আগে কঠিন হয়ে আসা শরীর তার কোমল কোমলতর হলো কেবলি। এমন কী তার মনে হলো, ঠিক এমনি করে, এই রাত্রি এই সময়ের অনন্ত পেরিয়ে, সে কেবলি রূপান্তরিত হবে কোমলতায় বিচ্ছিন্ন— বিচ্ছিন্নতর হবে কোমলতায়— প্রসারিত হবে সমস্ত অনুভূতি শাসিত মহাদেশে এবং তখন তার এই অস্তিত্ব থাকবে না, কিন্তু থাকবে তার অলৌকিক বিশাল কোমলতার মত এই কেবলি ছড়িয়ে পড়া, বিস্তৃত হওয়া— একটি অস্পষ্ট কিন্তু সীমাহীন বিস্তৃতি।

এর বহুক্ষণ পরে নিজেকে মুক্ত করে উঠে বসলো তাহমিনা। কানের ঝুমকো ঠিক করতে করতে তাকাল ফারুকের দিকে। পাশেই সে শুয়ে। মাথার পেছনে তার হাত জোড়া করে রাখা। চোখ অলস মোদিত। কপালে সেই স্বেদ বিন্দু ঘন হয়ে দেখা দিয়েছে। তাহমিনা জানে তার কানের পেছনেও আঁকাবাঁকা রেখায় স্বেদ এখন গড়িয়ে যাচ্ছে। দুজনে তারা পরস্পর তাকিয়ে রইল। ফারুক জড়িত গলায় বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি তাহমিনা।

তারপর ওকে আবার আকর্ষণ করে, বক্ষের সন্ধিস্থলে চুমো আঁকল। তাহমিনা মৃদু দোলায় এগিয়ে এলো আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে। সে তার উত্তাপ, তার ভালোবাসাকে অনুভব করতে চায়। নিঃশেষ করে দিতে চায়।

নিঃশব্দে দরোজা খুলে পায়ের পাতার ওপর ভর করে বেরিয়ে এলো ফারুক আর তাহমিনা। তাকাল ইতস্তত করে। অন্ধকারে আবদুলের ঘরেও বাতি নেই। বাতাস বইছে পাতার ভিতর দিয়ে। হিম হিম বাতাস। ভালো লাগা বাতাস। ফারুক ফিসফিস করে শুধালো, কেউ জেগে নেই তো ?

দূর।

আবদুল ?

কখন ঘুমিয়েছে। তা ছাড়া শোনা যায় না।

আমার খেয়াল ছিল না।

আমারও না।

ল্যাম্প হাতে করে তাহমিনা বাথরুমে ঢুকে দরোজাটা আস্তে শুধু ভেজিয়ে দিল। ফারুক বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারে। একটু পরে কানে এলো তার সাবধান পানি ছিটানোর শব্দ। তারপর সাবান ফেনায় হাত ঘসবার মসৃণ আওয়াজ। আর একটা মৃদু মিষ্টি গুনগুন। তারপর থামিয়ে তাহমিনা শুধালো গলা বের করে, তোমার ভয় করছে নাতো ?

উহুঁ।

ঠিক করে বল।

নাঃ। আর করলেই বা।

ফারুক বুঝতে পারল। দরজা ঠেলে সে ভেতরে ঢুকলো। তাহমিনা টাওয়েল দিয়ে সারা শরীর চট করে ঢেকে বলল, ছেলেমানুষের মত, উম্‌, না না, এসো না।

আমার ভয় করছে বাইরে।

মিথ্যেবাদী। দ্যাখো, দ্যাখো, পড়ে যাব যে।

তাহমিনার গায়ে পানি ঢেলে দিল ফারুক। হেসে উঠল ও। আর সেই হাসির সাথে সাথে বুক থেকে কয়েক ফোঁটা পানি ছিটিয়ে পড়ল। শুকনো একটা টাওয়েল নামিয়ে ফারুক ওর পিঠ ঘষতে লাগল জোরে জোরে।

না, না, মরে যাব। যাঃ লাগছে। ছাড়ো।

চুপ।

দুজনেই যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। সব কিছু যেন ভুলে গেছে। শুধু এখনকার এই মুহূর্ত যেন সত্যি আর সব অবাস্তব। ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে শীতল হয়ে এলো তাদের সমস্ত দেহ। সজীব হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে পানি ঢালল। সবকিছু যেন ধুয়ে মুছে গেছে। ঝরঝরে আর হালকা লাগছে। বাতাসটা কী মিষ্টি! নতুন করে দুজনকে চিনল যেন এখন ওরা। ফারুক শুধালো টাওয়েল দিয়ে তাহমিনার দেহ মুছিয়ে দিতে দিতে, কেমন লাগছে মিনু ?

এই তিন বছর বাদে ফারুক প্রথম ডাকল তাকে মিনু বলে। তাহমিনা ঘাড় ফিরিয়ে প্রায় ওর মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে প্রতিবাদ করল, দূর, আমাকে মিনু বলে ডেকো না।

কেন ?

মনে হয় এখনও ছোট্ট রয়ে গেছি।

খুব বড় হয়েছ, না ?

তাছাড়া কী ?

একটুও না।

বলেই হেসে ফেলল ফারুক। হাসল তাহমিনা। তারপর হঠাৎ থামল। স্পর্শের ভাষায় কী কথা যেন সঞ্চারিত হয়ে গেল দুজনের ভেতরে। তারা তাকিয়ে রইল দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে নিতে। ফারুক ওকে জড়িয়ে ধরে গভীর চুমো আঁকল নতুন করে। তারপর আবার তাকিয়ে রইল পরস্পর।

এক হাতে আঁচল ঠিক করতে করতে অন্য হাতে বেডল্যাম্প নিয়ে বেরিয়ে এলো তাহমিনা। থামল। বলল, রাত অনেক হয়েছে। এবার শুতে যাও।

## ।। ১২ ।।

দূর থেকে দেখেই খোকা দৌড়ে এলো। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, এই, এই, আম্মা ডাকছে। তাহমিনা প্রায় হাঁটু গেড়ে বসে বলল, এই কিরে বাবু ? এই কি ? আপা বলতে পারিস না! দাঁড়াও তোমার আম্মার কাছে বলে দিচ্ছি।

আশরাফের ছোট্ট ছেলে খোকা এবার লজ্জিত হলো। ছাড়িয়ে যেতে চাইল তাহমিনার আদর বাহুবন্ধনকে। সে উঠে দাঁড়িয়ে সুন্দর গ্রীবাভঙ্গি করে শুধালো, যাবে নাকি ?

যাবে ? চল।

বিকেলে বেরিয়েছিল ফারুক আর তাহমিনা। বাংলোর সমুখ দিয়ে যে পথ গেছে সেই পথ ধরে। আধমাইলটাক গেলে পর হাট পড়ে। সেই হাটে যাবে।

পড়তি দুপুর বেলায় যখন ফারুক পেছনের বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল তখন তাহমিনার সাথে দেখা। একটু গড়িয়ে মুখে চোখে পানি দিয়ে ফিরছিল ও । পিঠের ওপর এলিয়ে দেয়া চুল চিকচিক করছে একটু। শাড়ির আঁচল সারা গায়ে আঁট জড়ানো। ও বলেছে, হাট দেখতে যাবে নাকি ? বলছিলে যে তখন।

চল না, বেশ হয় তাহলে। কখন ?

আর একটু পরে। তৈরি হও তুমি।

তাহমিনা পড়ল রূপোলি তারা বসানো সাদা শাড়ি-রূপোলি বর্ডার দেয়া। আর ফারুক পরল তার সবচে হালকা পোশাক— গলা খোলা পাঞ্জাবি আর পাজামা। জরির কাজ করা স্যাণ্ডেল জোড়া পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এলো। তাহমিনা বলল, যাই বলো, চিরকাল তুমি সৌখিন মানুষ।

নাকি ?

ফারুক হাসলো। তারপর কেমন ধীরে ধীরে দুজনে ধরল পায়ে চলা পথ। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর ফারুক বলল, এক মধুপুরের গড় ছাড়া অরণ্য আমি কোনোদিন দেখিনি।

সুন্দরবন তোমার ভালো লাগবে। তোমার মনের মত জায়গা।

কেন বলো তো ? ফারুক শুধালো।

তাহমিনা ভ্রু নাচিয়ে উত্তর করল, অরণ্যের প্রতি তোমার আশ্চর্য দুর্বলতা আছে। মনে পড়ে কবিতা লিখেছিলে ?

হাসল ফারুক। বলল, ভুলিনি। একটা মজার কথা মনে পড়ল। হাক্সলি একবার কি লিখেছিলেন জানো ? ওয়ার্ডস্বার্থকে যদি ঘন ট্রপিক্যাল ফরেস্টে ছেড়ে দেয়া হতো, তাহলে তাঁর কাব্যিপনাও নিমেষে শিকেয় উঠে যেত।

প্রত্যুত্তরে তাহমিনা মৃদু হাসি ছড়ালো সারা মুখে।

আরো কিছুক্ষণ চলবার পর ফারুক বলল, কাল রাতে আমার মন কেমন করছিল।

কখন ?

শুতে এসে।

কী হয়েছিল ?

কেউ যদি জেনে ফেলত ?

তাহমিনার গতি শ্লথ হয়ে এলো। একটু পরে সোজাসুজি তাকিয়ে কোমল স্বরে শুধালো, তুমি অনুতপ্ত ?

না, তাহমিনা।

তারপর নীরব হয়ে গেল দুজনেই। আরো কিছুক্ষণ চলবার পর তাহমিনা বলল, ওখানে না গেলেই নয় ?

কী এমন।

তাহলে থাক। আরো অনেকটা হাঁটতে হবে। এরচে' একটু বসিগে কোথাও।

কোথায় বসবে ?

ফিরতে হবে কিছুদূর, ফেলে এসেছি পেছনে। একটা চেনা জায়গা আছে আমার।

চল। কাজ নেই তাহলে।

আবার ওরা ফিরতি পথ ধরলো। হাটমুখে চলেছে দু'একজন লোক। কাঁধে তাদের হাটের পশরা। একজনের কাঁধে বাঁকের দুধারে সাবানের বাক্স ঝোলানো। ফারুক জানে মনোহারি জিনিসে এটা সেটায় ভর্তি বাক্স দুটি। চার পয়সা দামের গোল আয়না থেকে শুরু করে ছ'আনা দামের বিরহ-মিলন পত্রাবলী অবধি। কাঁচা ঝিয়াড়ীর মনকাড়া কাঁচের চুড়ি আর শস্তা সুগন্ধ। গ্রামের হাটে বিক্রি হতে চলেছে। লোক কজন তাহমিনাকে দেখে সালাম করল। তাহমিনা দিল তার প্রত্যুত্তর মিষ্টি হেসে। একজনকে শুধালো, ভালো আছো ?

ফারুক বলল, তোমাকে ওরা চেনে দেখছি।

বাঃ চিনবে না। তারপর বলল, ভারী সরল মানুষ ওরা। তোমরা শহরে লোক তা ধারণাও করতে পারবে না।

পথ থেকে নেমে ডান হাতে কিছুদূর এগিয়ে এলে— এদিকে খুব বেশি কেউ যাতায়াত করে না— একটা ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ে। একটা নিচু জমিতে জমেছে পানি। তারি খাড়াইয়ে একটা বিরাট বুনো গাছ। আর তারি ছায়ায় বসলো দুজনে।

একটা ছোট্ট মেঠো ফুলের গাছ তুলে ফেলতে ফেলতে ফারুক শুধালো, এর পরে কী করবে তুমি ?

আমাকে কেন সে কথা জিগ্যেস করো।

তবুও।

আর তবুও না ফারুক।

এতটুকু আবেগ নেই তাহমিনার বলনে। অত্যন্ত একটা সাধারণ কথা যেন বলছে এমনি তার সুর। ফারুক তার মুখের দিকে তাকাল। তাহমিনা বলল, আর কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

ফারুক কোনো উত্তর করল না।

তোমার ভয় করছে ফারুক ?

না।

তুমি সব শুনেছ। সব তোমাকে বলেছি। জোয়ার যখন আসে তখন ভয় করলে চলে না। আমি তুলে দিইছি আমার সবকিছু তোমার হাতে। তুমি আমাকে বাঁচাও। আমাকে ভালোবাসা দাও।

আমি ভালবাসি তাহমিনা।

চল আমরা চলে যাই।

কোথায় ?

যেখানে খুশি। ঢাকায়।

তাহমিনা!

আমাকে তুমি নিয়ে যাও। না কোরো না। তোমাকে পেয়ে আমি বাঁচতে চাই।

ফারুক এতদূর ভাবে নি। তাহমিনা যে তার সাথে যেতে চাইবে, তা সে ভাবতেও পারেনি।

কিন্তু তাহলেও সে ফিরতে পারত না। এখন ফেরবার আর পথ নেই। একেলা সে ফিরে যেতে পারবে না। আর কী করেই বা যাবে? তাহমিনার কষ্ট হোক, তাহমিনা তিলে তিলে মরে যাক, সে সহ্য করতে পারবে না। তাছাড়া যদি কিছু হয়? তাহলে?

আর তাহমিনা শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে কিছুই ভাবতে পারল না। এমন জীবন সে চায়নি। আবিদের কথা একবারও তার মনে হোলো না। যেন কোন দিন তাকে সে চিনতো না। ফারুক কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না। সে দেবে না। সে তার ভয় ছিনিয়ে নেবে।

দূরে কারা হেঁটে গেল। তাদের স্বর শোনা গেল। হয়ত হাট থেকে ফিরছে মানুষেরা। ফারুক ভাবলো, না সে তাকে ফেলে যাবে না এই দেয়ালের দেশে। কিন্তু কী করে ফিরে যাবে ঢাকায়? তার মা, মা রয়েছেন। কোথায় উঠবে তার ? মালেকাবাণু, জাকি, লাবলু, ওদের কথা না হয় ছেড়ে দিল। তার নিজের মাকে সে গিয়ে কি বলবে? ফারুক আস্তে আস্তে বলল, আবিদ— আবিদ যদি কিছু করে।

তাহমিনা উত্তরে বলল, তুমি পাগল। আবিদকে আমি চিনি।

ঢাকায় কোথায় উঠবো আমরা?

এতবড় শহরে এতটুকু জায়গা হবে না? হবে চল ফারুক, আর দেরি করো না। তাহলে কোনদিনই আর হবে না। তারপর একটু থেমে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, কাল সকালেই আমরা যাব।

কাল?

হ্যাঁ কাল।

নিস্তব্ধতা।

আমাকে সাহস দাও ফারুক।

ফারুক ওর শুভ্র কপোলে সংক্ষিপ্ত ঠোঁট ছুঁইয়ে গাঢ় স্বরে বলল, হ্যাঁ আমরা কালই যাবো।

বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিল আফিয়া। খোকা একদৌড়ে তার কাছে গিয়ে বলল, এসেছে আম্মা।

ধরে আনলি, না? তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে বলল, না ডাকলে আসতে নেই বুঝি? এদিক দিয়েই তো যাচ্ছিলে।

আসব না কেন? আসতুম। জানেন খোকা আমাকে গিয়ে এই এই বলে ডাকছিল।

খোকা লজ্জায় পালিয়ে গেল। আফিয়া সেদিকে তাকিয়ে বলল, দুষ্টু। তারপর ফারুকের দিকে তাকিয়ে, বেড়াতে বেরিয়েছিলো বুঝি?

জি। আপনাদের এদিককার হাট দেখবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পা রাজি হোলো না খানিক দূর গিয়ে।

তাই বুঝি ফিরে যাচ্ছিলেন? শহুরে মানুষের কিন্তু ওই এক দোষ, হাঁটতে পারে না। ওমা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ভেতরে আসুন।

ফারুক ভেতরে যেতে যেতে বলল, এ অনুযোগ আপনার মিথ্যে। আমি না হয় শহুরে মানুষ,

আপনারা তো নন। ওরো তো একই অবস্থা।

দ্যাখ দিকি, মেয়ে মানুষ কি হেঁটে অভ্যেস ?

ফারুক আর আফিয়া এবার হেসে উঠলো। তারপর হঠাৎ আফিয়া উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, যাই একটু চা বলে আসিগে।

উহুঁ। ফারুক বলল, খেয়ে এসেছি।

তাহমিনাও কি তাই বলবে নাকি ?

আপনি শুধু শুধু কষ্ট করছেন।

ভারী তো কষ্ট। দরদ থাকে কষ্টের ভাগ নাও না ?

আফিয়া বলতে বলতে হেসে ফেললেন। হাসতে গিয়ে গালে টোল পড়ল। তাহমিনাও হেসে বলল, অত দরদ আমার নেই। যান, চট্ করে আসুন।

ফারুক বলল, অবাক হই, এই পাড়াগাঁয়ে জঙ্গলের ভিতরে এত চা'র জোগাড় কী করে করেন। আশ্চর্য কিন্তু।

আশ্চর্য আবার কী! আর এটা বুঝি বুনো পাড়াগাঁ ?

তাছাড়া কী ?

বেশ, বেশ। ঢাকায় আছে নাকি আপনাদের তাহমিনাদের মত বাংলো। মেলাই তো সব দালান কোঠা শুনি!

তা নেই।

তবে ?

তাহমিনা আফিয়া যখন যাচ্ছিল তখন বলল, খোকাকে নিয়ে আসবেন ধরে। ডেকে এনে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এমন দুষ্টু ছেলে।

একটু পরেই ফিরে এলো আফিয়া। সারা মুখে গৃহিনী সুলভ একটা তৃপ্তির ছায়া ছড়ানো। ঘরের কোণ থেকে নিচু টেবিল মাঝখানে সরিয়ে আনতে আনতে বলল, খোকা তোমার এলো না। লজ্জা পেয়েছে।

তাই বুঝি ? দাঁড়ান আমি নিয়ে আসছি। কই ও ?

ওইতো বাইরে।

তাহমিনা বেরিয়ে গেল। ফারুক তাকিয়ে রইলো চলে যাওয়া তার দিকে। একটুখন পরে খোকাকে প্রায় কোলে করে ফিরে এলো সে। বলল, কই কেমন লজ্জা করছে দেখি। কিরে ? আপা বলবিনে।

খোকা মুখ ফিরিয়ে নিল।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে গল্প করল ওরা এটা সেটা। আফিয়া অনুযোগ করল, আর একটু পুডিং নিক না ফারুক। তাকে নিতেই হলো। তাহমিনা প্রায় কিছুই নিল না। শুধু চা। পুডিং সবটা দিল খোকাকে।

একসময়ে আফিয়া তাহমিনাকে শুধালেন, সদর থেকে আর কোন খবর পেলে ওর ?

তাহমিনা একমুহূর্ত নীরব থাকল। তারপর হাত থেকে পেয়ালা নামিয়ে বলল, পেয়েছি। কেমন আছে এখন ?

আফিয়ার উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, ভালোই! কাল সকালে আমাকে যেতে হবে।

আফিয়া কিছুই বলল না, শুধু সেই উদ্বিগ্নতা আঁকা রইল সারামুখে। আর ফারুকের হৃদস্পন্দন যেন হঠাৎ থেমে আবার শুরু হলো। মনে পড়ল একটু আগে তাদের দুজনার কথা, কাল তারা পালিয়ে যাবে সেই কথা। তাহমিনা মিছে কথা বলল, কিন্তু স্বর তার কাঁপল না এতটুকুও। এত তাড়াতাড়ি এত সহজে অমন সোজা একটা পথ যে বেরিয়ে যাবে তা ওর ধারণাতীত। কাল সকালেই যে কী করে ওরা বেরুবে, সেটাই ওর একটু আগে ছিল ভাবনা। এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। আফিয়া শুধালো, কাল সকালেই যাচ্ছো ?

হ্যাঁ।

আর উনি ?

ফারুকের দিকে চকিত চোখ তুলে আফিয়া শুধালো, ও-ও আমার সংগে যাচ্ছে। ঢাকা যাবে।

তাই নাকি ? এদিকে আমি কিছুই জানিনে। শুনেছিলুম, কিছু দিন নাকি থাকবেন।

না, কালকেই যাচ্ছেন।

ফারুককে শুধালো, তাই নাকি ?

হ্যাঁ তাই। আবার এসে কিছুদিন থেকে যাবো।

আফিয়া সহসা গম্ভীর হয়ে গেল। একটু আগেই হেসে হেসে কথা বলছিল, এখন মন তার ভারী হয়ে এলো। তিনজনেই চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। এমন কি খোকাও। তারপর তাহমিনা বলল, এবারে যেয়ে ফিরতে দেরি হবে ভাবী। ওকে হয়ত সাথে নিয়েই ফিরব তাই।

ও।

তাহমিনা আঁচল থেকে ছোট্ট একটা চাবির ছড়া খুলল। বলল, এটা আপনার কাছে রইল। খোকার বাবা কাল পরশু ফিরতে পারেন। হয়ত কাগজপত্রের ঘর খুলতে হবে।

তাই বলে—

আপনার কাছেই থাক। আর কার কাছে দিয়ে যাব ? যদি একদিন দেরি হয় তখন ? সে ভয়ানক অসুবিধে হবে। তারচে' থাক।

আফিয়া চাবির ছড়াটা হাতে নিলেন। বলল, কেন জানি, মন কেমন করছে আমার। ভালোয় ভালোয় ওকে নিয়ে ফিরে এসো।

তাহমিনা বলল, আবদুল এসে আপনার এখানে থাকুক উনি না আসা অবধি। বাংলোয় আরো সকলে থাকবে, কিছু হবে না। আমি আসি তাহলে ভাবী।

তাহমিনা উঠে দাঁড়ালো। ফারুকও। বিদায় নিল সে আফিয়ার কাছ থেকে। আফিয়া আবার তাকে আসতে বলল। তাহমিনা বেরিয়ে এসে খোকার পাশে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, কিরে আপা বললিনে ? একবার বলত আপা।

একটু পরে খোকা তার কানের কাছে মুখ রেখে বলল, আপা। সাথে সাথে তাহমিনা ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরে আদর চুমু দিল। তারপর বেরিয়ে এলো।

পথে এসে অনেকক্ষণ পরে যখন আশরাফদের কুঠি আর দেখা গেল না তখন তাহমিনা বলল, শেষ সম্পর্ক চুকিয়ে এলাম।

তালা লাগাবে কী করে ?

সব টিপ-তালা। বাংলোর চাবি আবদুলের কাছেই থাকবে। বড় বিশ্বাসী লোক। ফারুক একটু পর শুধালো, সেফড্রয়ার, আয়রন চেস্টের চাবি ?

সেগুলো কি নিয়ে যাবো ভেবেছ ? তাহমিনা উত্তর করল, তোষকের তলায় রেখে গেলেই ও পাবে।

সেদিন সারারাত দুজনের কারুরই ঘুম এলো না চোখে। শুধু অরণ্যের বিচিত্র শব্দ আর স্রোত বয়ে যাওয়ার একটানা ধ্বনি। আকাশ পাতাল ভাবল দুজনে দু'কামরায় শুয়ে থেকে এপাশ ওপাশ করে। তাহমিনা আবদুলকে সন্ধ্যেয় ইয়াসিন মাঝিকে খবর দিয়ে রাখতে বলেছে। সকালে সে যেন আসে। ফারুক গুছিয়ে রেখেছে তার জিনিসপত্র। অনেকরাত অবধি বাতি জ্বলেছে তাহমিনার ঘরে। মাঝখানে ঘরে রাখা কাচের কুঁজো থেকে দু'বার পানি গড়িয়ে খেয়েছে ফারুক। তারপর আবার শুতে গেছে বাতি ছোট করে। কিন্তু ঘুম আসে নি। কারা যেন কী ষড়যন্ত্র করছে কোথায়, ফিসফিস করে কথা কইছে— ফারুকের মনে হতে লাগল–রাত্রির মিলিত ধ্বনি এমনি রহস্যময়। কান পেতে সে শুনেছে কেবলি।

অবশেষে একসময়ে কিছুই যখন তার ভালো লাগল না, যখন শুধু ইচ্ছেটুকু রইলো— তখন সে আস্তে আস্তে উঠে এলো। তারপর তাহমিনার উষ্ণতাকে নরোম বলের মত বুকে তুলে ঘুমিয়ে পড়ল ফারুক।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন ভোর রাত। আকাশে শেষ রাতের শেষ তারা। পুব আকাশে কালচে লাল প্রহর। ইয়াসিন এলো। আবদুল উঠল একটু পরেই। বেশি কিছু কথা বললো না কেউই। তালা লাগিয়ে তাহমিনা মুখ ফিরিয়ে বলল, সাবধানে থাকিস আবদুল ? রাতে খোকাদের ওখানে থাকবি।

আচ্ছা। কবে ফিরবেন ?

কয়েকদিন পরে।

বলতে গিয়ে কেমন গলা কেঁপে উঠল তার। তাড়াতাড়ি সে পা বাড়ালো। বলল, ওগুলো হাতে নে আবদুল, ওরা যাক। তারপর ফারুকের দিকে ফিরে বলল, চল।

।। ১৩ ।।

কিন্তু এ কাহিনীর শেষ এখানেই নয়। তেঁতুলিয়ার শাখা নদীর উজানে ইয়াসিন মাঝির নৌকোয় পলাতক দুজনকে যাত্রা করিয়ে হয়ত এ কাহিনীর সমাপ্তি টানা যেত কিন্তু দেড় বছর পরের আর একটি কথা যদি না লিখি তাহলে গোটা কথাই থেকে যাবে অসম্পূর্ণ। এর প্রস্তুতি হিসেবে গোটা কয়েক ছোট ঘটনা বলা দরকার।

ছ'নম্বর প্লট থেকে আশরাফের কাজ শেষ হোলো দিন পাঁচেক পরে। সদরে সামান্য কাজ আছে, তাছাড়া আবিদকে একবার তার দেখে আসা দরকার।

নৌকোঘাটায় বোট বাঁধল গফুর। আশরাফ নেমে এলো। হাসপাতালে ঢুকতেই বারান্দায় দেখা আবিদের সাথে। একটা লাঠি ভর করে রেলিংয়ের কাছে সে দাঁড়িয়েছিল। আশরাফ এগিয়ে এসে শুধালো, কেমন আছ এখন ? বেরিয়েছ দেখছি।

আবিদ ম্লান হেসে উত্তর করল, হ্যাঁ। ভালো, অনেকটা ভালো। স্টিক ভর করে চলতে পারছি কাল থেকে।

আর কদ্দিন লাগবে ?

প্রায় তো ভাল হয়েই এলুম। তবে ডান পা বোধ হয় দুর্বল থেকেই যাবে। স্টিক ছাড়া হাঁটতে পারব বলে আর মনে হচ্ছে না।

তবু ভালো।

তারপর ওর কাঁধে স্নেহের ভঙ্গিতে হাত রেখে বলল একটু পরে, কী বলছ তুমি। কিছুদিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আবিদ একহাতে ওকে ধরে বেডের দিকে এগুতে এগুতে বলল, দাঁতটা বসিয়ে ছিল জোর। এমন কোনদিন আর হয়নি। ভাবলে এখনো মনে হয় বুঝি রক্তপাত হবে। কদিন এত যন্ত্রণা ছিল যে শুধু ভেবেছি, আবদুল যখন গুলি করল তখন কুমিরের গায়ে না লেগে আমাকে বিধলে ভালো হোতো।

থাক ওসব কথা। বেশি কথা বোলো না।

আবিদ বেডে এসে শুয়ে পড়ল। পাজামা তুলে পা'টা দেখাল একবার। তারপর চুপ করে পড়ে রইল। সারা কামরায় শুধু শুভ্রতা। আর ওষুধের একটা ঝাঁঝালো মিশেল গন্ধ। ধবধবে পর্দা টাঙানো দরোজায়, জানালায়। বেডের পাশে একটা ছোট টেবিলের ওপর রাখা ফুলদানিতে কয়েকটি ফুল। আজ সকালেই বদলানো হয়েছে। আবিদ একটা ফুল তর্জনী আর মধ্যমার ভেতরে রেখে দোলাতে দোলাতে শুধালো. সোজা সদরেই এলেন ?

না, দিন পাঁচেক আগে বেরিয়েছি। গিছলাম ছ'ম্বর প্লটে। কয়েকটা বড় অর্ডার ছিল, সে ব্যাপারে দেখাশোনা করতে। সেখান থেকেই সোজা ফিরছি।

কোন ফার্ম থেকে ?

চাটগাঁর সেই বড় পার্টি।

আবিদ একটুকাল ভ্রু কুঁচকে ভাবতে চেষ্টা করল তারপর বলল, ও।

আশরাফ চাদরের একটা ভাঁজ নখ দিয়ে মিলিয়ে দিতে দিতে বলল, তাহলে ভালোই আছো এখন। তাহমিনা আর আসে নি ?

না

ও।

কেমন আছে ওরা ?

ভালো সবাই।

আবিদ তাহমিনার মুখ মনে করতে চেষ্টা করল। এ কদিন কি করেছে ও ? তারপর আর একবারও এলো না সে —আবিদ ভাবল। আবিদ এত অপেক্ষা করেছে তার জন্যে। আশরাফ বলল, তাহলে আজকেই তোমাকে নিয়ে যাই।

আমিও তাই ভাবছি।

আশরাফ বুঝল আবিদ বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভালো লাগছে না তার হাসপাতালে। তাই আর সে কোনো কথা না বলে ঐ কথা বলল। তারপর উঠে গেল সার্জেনের কামরায়। একবার ভেবেছিল ফারুকের কথা বলে আবিদকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভেবেছে, এখন বেশি বকানো ভালো হবে না। তাই আর কিছুই বলেনি।

সার্জন যা বললো, এক কথায় তার মানে দাঁড়ায় এই যে,— এখন অবশ্যি আর কোন ভয় নেই, ঘা প্রায় শুকিয়ে আসবার পথে, তবে শরীর বড় দুর্বল। আর কিছুদিন রাখতে পারলে ভালো, তবে নিয়ে গেলে কোনো ক্ষতি হবে না— প্রেসক্রিপসন ফলো করলেই চলবে। তিনি সময় পেলে মাঝখানে নিজে একবার গিয়ে দেখে আসবেন। আশরাফ ধন্যবাদ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলে গেল, বাইরে কাজ সেরে আজ বিকেলেই ওকে নিয়ে যাবে।

নৌকোঘাটায় আবিদ স্টিকে ভর করে আস্তে আস্তে নেমে এলো আশরাফের সাথে। অ্যাশ শেড উলেন ট্রাউজার পরনে। আর মেরুন রঙের শার্ট। ক্রোম মেটালিক স্টিক হাতে। আগের মতই দীর্ঘ, সবল, আর উদ্ধত। দেখে চট্ করে বোঝা যায় না যে এতবড় একটা বিপর্যয় তার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। ভেতরে ঢুকে বলল, গফুর, আমি একটু শোবো।

ঘাটে এসে যখন নৌকা ভিড়ল তখন প্রায় সন্ধ্যে। এখন শুধু স্টিকে ভর করে আবিদ হাঁটতে পারল না, আশরাফের কাঁধে সে হাত রেখে ভর করল। যেতে যেতে জিগ্যেস করল, আলো দেখছিনে বাংলায়? এখনো জ্বালে নি নাকি?

জ্বলবে হয়ত।

এতক্ষণে তো পেট্রোম্যাক্স জ্বলার কথা।

হ্যাঁ। তোমার অসুবিধা হচ্ছে নাতো?

না। একটু।

বাংলোর কাছে এসে অবাক হলো আশরাফ। সারাটা বাংলো ঘিরে এক অশুভ নির্জনতা। আলো নেই। কেউ নেই। কেমন থোকা থোকা অন্ধকার ছড়িয়ে আছে ইতস্তত। সে বলল, গফুর টর্চটা তুই ধর। আমি ওকে নিয়ে ওঠেছি।

গফুর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল টর্চ নিয়ে। জ্বালালো। আশরাফ আর আবিদ উঠে এলো বারান্দায়। আবিদ বলল, কারো সাড়া পাচ্ছিনে, কি ব্যাপার?

কী জানি। আমার ওখানে যায়নি তো!

ভেতরের বারান্দা ঘুরে যেতে সে আবদুলের নাম ধরে দু'বার ডাকল।

আবদুল হারিকেন হাতে প্রায় ছুটে এলো। হুজুর এসেছেন?

আশরাফ শুধালো, মেমসায়েব কই? উনি কই?

তিনি তো আজ তিনদিন হলো সদরে গেছেন!

আর প্রায় সাথে সাথে আবিদ উত্তেজিত স্বরে জিগ্যেস করল, কে? উনি কে?

সাথে সাথে প্রলয় ঘটে গেল যেন। আবদুল একে একে বলে গেল সব কথা। ফারুকের আসবার কথা থেকে তাহমিনা আর তার ভোরে চলে যাবার দিন অবধি। আশরাফ হতভম্ভ হয়ে গেল। আবিদ স্তম্ভিত হয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। এক মুহূর্তের জন্য কিছুই সে ভাবতে পারল না। কিছুই করতে পারল না। কেবল একটা অদ্ভুত বিস্মৃতি এসে তাকে আচ্ছন্ন, অবশ করে ফেলল যেন। সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে ভালো করে তার মুখ দেখা গেল না। সে আশরাফের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল, কেন আপনি চলে গেলেন এখান থেকে ? কি হ'ত আমার অমন দু'দশটা অর্ডার নষ্ট হলে ? আমাকে কেন জানালেন না ফারুকের কথা ? কী ভরসায় রেখে গেলেন সব একলা ফেলে ? কেন ? কেন ?

আবিদ তুমি থামো।

ততক্ষণে আবিদ তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

তাহমিনা নেই। আবদুল, তুই যেতে দিলি কেন ?

হুজুর।

আবিদ, থামো। অসুখ বেড়ে যাবে তোমার। আমি দেখছি সব।

আর কী দেখবেন আপনি ?

বলতে বলতে আস্তে আস্তে থেমে গেল আবিদ। যেন আর কিছু তার বলবার নেই। সে কী যেন বুঝতে পারল। ঠোঁট কাঁপল কিছু বলবার জন্য, কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না। আশরাফের দিকে, আবদুলের দিকে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

আবদুল শোবার ঘরের তালা ভেঙে ফেলল একটু পরেই। জ্বালল পেট্রোম্যাক্স। আশরাফ দুজন খানসামাকে ডেকে আফিয়াকে নিয়ে আসতে পাঠালো। সাথে গেল গফুর। আরো বলে দিল, খোকাকেও যেন নিয়ে আসে। আজ রাতে এখানেই হয়ত থাকতে হবে। আশরাফের সমস্ত ব্যাপারটা লাগছিল দুঃস্বপ্নের মত। তাহমিনার ওপর ভীষণ রাগ হলো তার। সমস্ত স্নেহ আর মমতা নিমেষে মুছে গেল তার ওপর থেকে। কেন সে এমন করল ? কেন সে ফারুকের সাথে পালিয়ে গেল ? কিসের অভাব ছিল তার ? নিজে দেখে তাহমিনার সাথে বিয়ে ঠিক করেছিল সে, তাই নিজেকে আজ বড়ো অপরাধী বলে মনে হলো তার। পর মুহূর্তে ভাবল, এমন তো নাও হতে পারে। কিন্তু সে দুরাশা শুধু মুহূর্তের জন্য। এ হচ্ছে এমন কিছু যা দুরাশারও অতীত।

আবদুল শোবার ঘরে নিয়ে গেল পেট্রোম্যাকস। আবিদ আর আশরাফ ঢুকলো তার পেছনে পেছনে। আবিদ প্রথমত ভয়ে তারপর যেন ঘৃণায় ভালো করে তাকাল না কোনদিকে, কী জানি কি চোখে পড়ে যায়। চুপ করে সে ঠায় বসে রইল। তারপর এক সময়ে তার বিস্ফারিত চোখ ঘুরে বেড়াতে লাগল তার অজান্তে কামরার সর্বত্র। খাটের বালিশে এখনো মাথা রাখবার গভীর ভাঁজ। চাদরটা এলেমেলো হয়ে পড়ে আছে। তাহমিনা ভোরে উঠে যেমন রেখে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি। আলনায় এখনো তার তাল পাকানো ছেড়ে রাখা কয়েকটা শাড়ি লুটিয়ে পড়ে আছে। আর কয়েকটা ধোয়া শাড়ি, চোলি আর ব্রা। এখনো ভাঁজ ভাঙা হয়নি তার। তাহমিনা পরেনি। নিচে কয়েক জোড়া স্যাণ্ডেল আর চটি— তাহমিনার পায়ের ভারে কোনটায় আঙ্গুলের আবছা দাগ পড়েছে আবিদ তা জানে। আজ হঠাৎ তার মনে হলো কখন সে সব কিছুই জেনে ফেলেছে— গাঁথা হয়ে রয়েছে তার মনে। আলমিরায় থরে থরে

সাজানো তার কাপড়। কোনটায় তাকে মানাতো এখন স্পষ্ট হয়ে মনে পড়ল। আর মনে পড়ল ভীষণ লাল সেই চোলির কথা— আঁটসাঁট বাঁধা পড়ত যাতে তার সুগৌর সুন্দর স্বাস্থ্য। সবচে মানাত তাকে ওই চোলিতে। সেটা বুঝি আলমিরাতেই রাখা। যে সোফায় সে বসে রয়েছে সেখানে হয়ত শেষবার বসেছিল তাহমিনা। ছোট্ট টেবিলের ওপর তাহমিনার ফটো কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। আর তার পাশে নিভিয়ে রাখা, কিছুটা ধোঁয়ায় ম্লান হয়ে যাওয়া বেডল্যাম্প। আর বাতাসে যেন তাহমিনার গাত্রসৌরভ— মিহি প্রসাধনের ভারী ঘ্রাণ। সমস্ত ঘরে প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে আছে তার স্পর্শ। শুধু সে নেই। অবিশ্বাস্য বলে মনে হলো তার। মনে হলো এখুনি সে ফিরবে। তাহমিনার চিবুকের ভাঁজটি পর্যন্ত তার মনে আছে। আর ওই জানালায় তাহমিনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখত। টুকরো টুকরো ছবির মত সমস্ত চিত্র এসে উদ্ঘাটিত হলো তার সমুখে। মিলিয়ে গেল। আর চারদিকে তাহমিনার স্পর্শ এত গাঢ় যে বুঝি হাত দিয়ে ধরা যায়। আবিদের এখন ইচ্ছে হলা হো হো করে উচ্চস্বরে হেসে উঠে বিকট বিভৎস একটা হাসিতে সব কিছু ডুবিয়ে দিতে। কিন্তু তার ভয় হলো। মনে হোলো সমস্ত শক্তি যেন তার লুপ্ত হয়ে গেছে। তার সাহস হারিয়ে গেছে।

তোষকের নিচে পেল চাবি আর একটা চিঠি। তাহমিনার চিঠি। আশরাফ দুর্বল হাতে ভাঁজ খুলে পড়ল; তাহমিনার সুন্দর হাতের অক্ষরে গোটা গোটা করে লেখা, "আবিদ, তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। যদি পারো আমাকে ভুলে যেও। ইতি, তোমার তাহমিনা" কোন তারিখ নেই। আর কিছু লেখা নেই। কাগজের উল্টোপিঠ শাদা।

চাবি হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে নিঃশব্দে চিঠিটা এগিয়ে দিল আবিদের সামনে। ঘরের ভেতরে জ্বলছে উজ্জ্বল শুভ্র আলো। আবিদ চিঠিটা মেলে ধরল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না সে। সমস্ত কিছু যেন এক দুর্বোধ্য ভাষায় লেখা রয়েছে, কিছুতেই তার অর্থ উদ্ধার করা যাবে না।

এমন সময়ে বারান্দায় পায়ের শব্দ উঠলো। আবিদ উৎকর্ণ হয়ে তাকাল। আশরাফ বলল, আফিয়াকে নিয়ে আসতে পাঠিয়েছিলাম। বোধ হয় এলো। আবদুল কফি আছে ?

আছে হুজুর।

এক কাপ কফি কর আবিদের জন্যে।

আবিদ প্রতিবাদ করল। উত্তরে আশরাফ বলল, তোমার দুর্বলতা কেটে যাবে। —বলে দে আবদুল।

আফিয়ার কাছ থেকেই সব খবর পাওয়া গেল। আশরাফ খাটের ওপর বসে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনল। আবিদ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। আফিয়া চাবি খুলে দিল আঁচল থেকে, কান্নাধরা গলায় বলল, যাবার সময় দিয়ে গিছল রাক্ষসী।

আর কোন কথা বললো না কেউই। যেন পাথরের মত নিশ্চল নিস্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই। সবাই ভাবছে গভীর মাথা ঝুঁকিয়ে। আবদুল কফি করে নিয়ে এলো।

বাইরে এসে আশরাফ আফিয়াকে বলল, তুমি কি কিছুই বুঝতে পারনি ?

আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তাহমিনা যে এমন করে চলে যাবে, কেলেঙ্কারী করবে, তা কে জানতো ?

আশ্চর্য।

আমার মন কেমন করছে।

আজ রাতে এখানেই থাকো। আবিদের এমন দুর্বল শরীর কখন কী হয়, কী করে বসে, কে জানে ?

সেই ভালো।

তুমি ওকে একটু বোঝাও। নইলে ও সইতে পারবে না।

আফিয়া বিছানা পেতে দিল আবিদের। ছেলেমানুষের মত ধরে শুইয়ে দিল। আবিদ যেন বোবা হয়ে গেছে! আর কোন কথা বলে নি তারপর থেকে। একবার শুধু আফিয়ার হাত ধরে বলেছে, ভাবী, তাহমিনা কিছুই বলে যায় নি ?

আফিয়া মুখ ফেরাল চাপা কান্নায়। আবিদ বালিশে মুখ ফিরিয়ে আপন মনেই যেন আরেকবার বলল, তাহমিনা চলে গেছে ভাবী!

আফিয়া স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি এখানেই থাকো। আমি ও ঘরে খোকাকে নিয়ে আছি।

অনেকক্ষণ পর আবিদ পাশ ফিরে দেখল আশরাফ পাশে বসে আছে।

আপনি যান নি ?

তুমি ঘুমোও।

হ্যাঁ. আমি ঘুমোবো।

তোমার খারাপ লাগছে খুব ?

না।

তুমি ঘুমোও তারপর আমি যাবো।

আবিদ কষ্টের একটা বিকৃত মুখভঙ্গি করল। আশরাফ একটু এগিয়ে এলো, ব্যথা করছে ?

না, এমনি।

আশরাফ বুঝল। একটু পর সে স্নেহের সুরে বলল, তুমি ভেবো না, ও ফিরে আসবেই।

আর সে আসবে না।

তাহমিনা না এসে পারে না। আমি তাকে ফিরিয়ে আনবো। এখনো ও ছেলেমানুষ। তুমি ভেবো না। তুমি ঘুমোও।

আপনি জানেন না। আমি জানি, ও আর ফিরবে না।

তুমি ঘুমোও।

আবিদ পাশ ফিরে শুলো। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল আস্তে আস্তে। তখন সে দরোজা ভেজিয়ে পাশের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। অনেক রাতে আবিদের মনে হলো তাহমিনা যেন পাশে শুয়ে। সে চমকে উঠে দেখল, ভুল। বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। ব্যর্থ পৌরুষত্বের প্রতি ধিক্কার এলো। ঘুম তার এলো না। তাহমিনা নেই, সে ভাবতে পারল না। বিরাট শূন্যতা যেন আজ তার চারদিকে। তাকে যেন গ্রাস করে ফেলবে।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আবিদ। পেট্রোম্যাক্স তখনো জ্বলছে, কেউ নিভিয়ে দিয়ে যায়নি। আবিদ কাপড় রাখা আলমিরার কাছে, আলনার পাশে, গিয়ে দাঁড়িয়ে স্পর্শ বুলোলো ত' শাড়ির ওপরে। অনেকক্ষণ ধরে। তাল পাকানো ছেড়ে রাখা শাড়িটাকে তুলল কিছু

মুঠোর ভেতরে। নিল তার আশ্চর্য ঘ্রাণ অনেকক্ষণ ধরে। তাহমিনা যে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াত, তারপর সেখানে এসে দাঁড়াল। স্পর্শ করল তার সূক্ষ্ম ঝালর দেয়া পর্দা। আবিদ প্রেতাত্মার মত সমস্তটা কামরায় বিস্ফারিত চোখে কম্পিত হৃদয়ে জেগে রইল।

সে রাতে নাও বাইতে গিয়ে দু'একজন দেখেছে আবিদের নিশুতি বাংলোর শার্সীতে অনেক রাত অবধি উজ্জ্বল আলো থামের মত নেমে এসে বাইরের মাটি স্পর্শ করে আছে।

এরপর থেকে আবিদ শান্ত হয়ে গেছে অসম্ভব রকমে। আর কোনোদিন সে শিকারে বেরোয়নি। সব সময়ে সারামুখে কেমন একটা স্তব্ধতা, ক্লান্তির ছায়া ছড়ানো। কথা বলে খুব কম। ব্যবসার কাজে প্রায় বেরোয় না বললেই চলে। আশরাফ নিজেই এখন সব দেখে। আর মাঝে মাঝেই অনুযোগ করে, তুমি এমন করে থাকলে, শরীর যে টিকবে না।

আবিদ উত্তরে হাসে। ম্লান হাসে। এ সব প্রশ্নের কোনো উত্তর সে দেয় না।

কোনো কোনো সকালে তাকে দেখা যায় দীর্ঘ দুপুর অবধি বারান্দায় ডেক চেয়ার পেতে বসে থাকতে দূর অরণ্যের দিকে। দিনের খবরের কাগজ পাশেই পড়ে থাকে, পড়ে না। কিংবা হয়ত বিকেলে বসে চেক-বোর্ড নিয়ে। একেলাই খেলে। অনেক রাত হয়ে যায় তবুও ওঠে না। মাঝে মাঝে অনেক রাত্তিরে তাকে দেখা যায় ডান পা একটু টেনে টেনে বেডল্যাম্প হাতে বাংলোর প্রত্যেকটি কামরা ঘুরে বেড়াতে।

কয়েকদিন একেলা বেরোয় সমুখের পথ দিয়ে। অনেকদূর অবধি চলে যায়। আফিয়া তার জানালা দিয়ে দেখে, কিন্তু ডেকে বসাতে সাহস পায় না। মনে হয় মানুষটা যেন কাচের তৈরি, সামান্য স্পর্শেই চুর চুর হয়ে যাবে। কোনো কোনোদিন আফিয়া আসে বাংলোয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তত্ত্ব নেয় আবিদের। আবদুল আর খানসামাদের মৃদু তিরস্কার করে কোনো ভুলের জন্য। বারবার করে বলে যায় ভালো করে লক্ষ্য রাখবার জন্য। দাঁড়িয়ে থেকে ঘর গুছিয়ে দিয়ে যায়। বদলে দিয়ে যায় ফুলদানির ফুল।

কিন্তু তবু বাসি ফুলের মত হয়ে থাকে যেন সারাটা আবহ। আফিয়ার দুঃখ হয়, রাগ হয়। স্বামীকে সে তিরস্কার করে, তাহমিনার খোঁজ না নেয়ার জন্যে। উত্তরে আশরাফ বলে, আবিদ তাকে কিছুতেই যেতে দিতে চায় না। আফিয়া বলে, তাই বলে কি সে চুপ করে থাকবে নাকি? একটা কিছু করা দরকার।

আশরাফ একদিন এসে আবিদকে বলল, কাল আমি ঢাকা যাচ্ছি।

কেন?

এমন করে আর কদ্দিন চলবে?

আবিদ তার হাত ধরে বাধা দেয়, না, দরকার নেই। তাহমিনা সুখে থাক, তাকে ফিরিয়ে আনবেন না।

এ তোমার পাগলামো। কোন মানে হয় না এর।

তাহমিনা আসবে না।

তাই বলে চুপ করে বসে থাকবে নাকি? আমি কালই যাচ্ছি।

আশরাফ আজ ঠিক করেই এসেছিল যে আবিদকে সে রাজি করাবেই। একটা কোন খবর নেয়া হবে না, এ কী রকম কথা?

অবশেষে আবিদ একে একে তাকে বলল সব কথা। বিয়ের বছর খানেক পর থেকে শুরু সেই সন্দেহের কথা। ডাক্তারের রিপোর্টের কথা। সবকিছু। এই প্রথম সে জানালো আশরাফকে। বলল, তাহমিনা ঠিকই করেছে। আমার কাছে থেকে কী সে পেত? আমি ওকে কী দিতে পারি যে ওকে ফিরিয়ে আনতে যাব? আমার কি আছে, ওকে ফিরিয়ে আনি?

একথা তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন?

তাতেও কিছু হোতো না।

তবুও।

সারবার কোনো আশাই ছিল না।

তুমি নিজেও বুঝতে পারনি বিয়ের আগে?

না।

আশরাফ চুপ করে রইল। তার বলবার আর কিছু নেই। নতুন করে অর্থময় হয়ে উঠলো তাহমিনার প্রতিটি আচরণ। স্পষ্ট হলো তাহমিনার আর ফারুকের ঘনিষ্ঠতার কারণ। তার মনে হলো, তার মুঠো আলগা হয়ে গেছে। ঝুর ঝুর করে ফ্রেম ধ্বসে ভেঙে পড়ছে। আবিদ বলল, একটা কথা আমার রাখবেন?

কী?

আমি যেমন আছি, তেমনি থাকতে চাই। তাহমিনাকে কোনোদিন আপনি ফেরাবেন না। যাবেন না। আমি মনে করবো, তাহমিনা মরে গেছে।

।। ১৪ ।।

বাসা নিয়েছে ফারুক। মাকে সে জানায়নি, ব্যথা পাবেন। ভেবেছে, কিছুদিন পর আস্তে আস্তে সব কিছু জানাবে তাঁকে, বুঝিয়ে বলবে। আপাতত বলে এসেছে যে, নতুন কাজ পেয়েছে, বাইরে বাইরে থাকতে হবে। তাহমিনা ফারুক যখন মায়ের কাছে, এক রেস্তোরাঁয় বসে ছিল। ফারুক যখন ফিরে এলো, তখন সে উজ্জ্বল চোখ মেলে শুধালো, কি হলো?

মাকে বলে এলাম তাই।

অমন না বলে খোলাখুলি বললেই পারতে। আমি তো নিজেই যেতে চেয়েছিলাম, তুমি মানা করলে। মাকে আমি পায়ে ধরে বুঝিয়ে বলতাম। আমাকে তিনি ঠেলে দিতে পারতেন না।

তবু চট করে না বলাই ভালো। কিছুদিন যাক, মা দেশে যাবেন বলছিলেন, অনেক দিন যান না— বেশ কিছুদিন থাকবেন, ফিরে আসুন, তখন দুজনেই যাব।

আর কী বললেন?

কিছু না।

এমনি করে ধীরে ধীরে সব কিছু গুছিয়ে এনেছে তারা। তাহমিনা সাজিয়েছে তার ছোট্ট সংসার। ফারুক সেই খবরের কাগজেই আছে। তাহমিনা দুটো টিউশানি নিয়েছে। ফারুক বাধা দিয়েছে তাকে, তুমি কী বলো তো? তোমার আবার টিউশানি করবার কী দরকার ছিল?

কেন বসেই তো আছি। তবু দু'বেলা কিছু কাজ জুটলো। তাছাড়া কটা টাকা এলে তো আর ফেলনা যাবে না। লাগবে।

এতেই তো বেশ চলছিল মিনু।

তুমি থামো তো।

ফারুক আর কিছু বলেনি। সকালে একটা টিউশানি, বিকেলে আর একটা। সকাল বেলা তাহমিনা বেরোয় দীর্ঘ দুটি বেণি করে বুকের ওপর ফিরিয়ে একটা সাদাসিদে শাড়ি পরে। যাবার সময় ফারুককে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। তার আগেই সে চা করে রেখেছে। তারপর দুজনে মিলে চায়ে চুমুক দেয়। কত কতদিন ফারুক অনুযোগ করে, এত ভোরে উঠে সে বেরিয়ে যায় কিছু তার ভালো লাগে না। তাহমিনা হাসে, বলে, পয়সা জিনিসটে যত খারাপই হোক, আদতে কিন্তু সবচে জরুরি। সেটা ভুললে চলবে কেন ? কোন কোনদিন ফারুকের খুনসুটি সহ্য করতে না পেরে আরো কিছুক্ষণ বসতে হয়। দেরি করতে হয়। খাটে পা ঝুলিয়ে তার এই বাড়তি সোহাগ নিতে ভালোই লাগে।

সকালে ঘণ্টা দেড়েক পড়াতে হয়। ক্লাস এইটে পড়ে মেয়েটি— তাকে। তারপর ক্লান্ত হয়ে যখন সে ফেরে তখন বেলা সাড়ে নটা কী দশটা, মুখের স্বল্প প্রসাধন হয় ম্লানতর। একটা তৃপ্তিকর ক্লান্তির ছায়া ছড়িয়ে থাকে সারামুখে। সেই শাড়ি পরেই সংসারের কাজে হাত দেয়। তারপর দুপুর বেলা দুজনে জানালার ধারে উবু হয়ে শুয়ে বই পড়ে। কিংবা তাহমিনা পড়ে, ফারুক শোনে। এমনি। ঘর গুছোয়। টবে ফুলের লালন করে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ও বাড়ির বৌটির সাথে আলাপ করে খুচরো। বিকেলে দুজনে বেরোয় একসাথে। তাহমিনা যাবে টিউশানিতে আর ফারুক তার আপিসে। তাহমিনা এখন গোল করে খোঁপা বাঁধে। সেই চপল বেণি আর নেই। সকালে ছিল আঁটসাঁট, এখন অলস এলিয়ে দেয় শাড়ির ভাঁজ। মুখ সাবানে মেজে শুভ্র করে তোলে। বেরিয়ে হাঁটতে থাকে তারা। নবাবগঞ্জের এদিকে তেমন ভিড় নেই শহরের। কেমন বিরলতার আবহ চারদিকে। বেড়াতে বেড়াতে যখন আকাশ মিহি লাল হয়ে আসে, তখন তারা সেই বাড়ির ফটকের সমুখে যেখানে তাহমিনার বিকেল ট্যুশানি। মেয়েটি ম্যাট্রিক দেবে, পাশ করবে বলে মনে হয় না, তবু চেষ্টা করতে দোষ কী ? তাই তাহমিনাকে রাখা। সকালে নাকি আর একজন টিউটর আছেন, তিনি অঙ্ক করান। এখানে সে পড়ায় জিরিয়ে জিরিয়ে। তাড়াহুড়ো করে না।

ফিরে যখন আসে, তখন ঝি রান্নাবান্না শেষ করে রেখেছে। তাকে বিদেয় করে তাহমিনা নিজে খেয়ে নিয়ে বেশ বদলিয়ে যখন স্থির হয় তখন রাত কিছুটা বেড়েছে। ফারুক তখনো আসে নি। সে আসে এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকে আপিস থেকে। কোনদিন একটায়। বলে, সারা দুনিয়ার লোকের সকাল বেলার চা উপভোগ করবার বন্দোবস্ত করে এলুম।

কী লিখলে আজকে ?

ফারুক প্রত্যুত্তরে সম্পাদকীয়ের শিরোনামটা জানায়। দু'একটা মজার খবরের কথা বলে খেতে খেতে। তাহমিনা শোনে। তারপর হয়ত, আচ্ছা মিনু, ভোর সকালে কাগজ বেরুবার নিয়ম কে আবিষ্কার করেছিল বলতে পার ?

কী জানি।

যেই বের করুক, ভাল করেনি। কী ট্যাজেডি বলোত ? শহরে নিশাচর বলতে এক পাহারাওয়ালা আর খবরের কাগজের লোক।

আর চোর বাটপাড় ?

তারাও এ দুদলের মধ্যেই পড়ে।

বলেই ফারুক হেসে ওঠে। একটা সিগারেট ধরায় আয়েস করে।

তাহমিনা বলে, এতই যখন তখন খবরের কাগজে কাজ না করলেই পার ? অন্য কোথাও দেখ না।

উঁহু। অন্য কাজে পয়সা আছে, তৃপ্তি নেই। তবু তো সারারাত আমায় থাকতে হয় না। তাহলে যে কী করতে!

কিন্তু সবদিন এমন যায় না। কোনোদিন ফারুক ফেরে, একটু অন্যমনা দেখায়। কী যেন ভাবে, কথা বলে না। বললেও ভাল করে বলে না। তার কাছাকাছি সরে এসে খুব কাছে মুখ রেখে তাহমিনা জিগ্যেস করে, কী হয়েছে তোমার ?

কই কিছু নাতো।

তাহমিনার বুক কেঁপে ওঠে। সুন্দরবনের দীর্ঘ অরণ্য যেন বুকের ভেতরে মাথা কুটতে থাকে।

তবে চুপ করে রয়েছ কেন ?

এমনি।

মিছে কথা। ভাবছ তাই না ? কী ভাবছ ?

ফারুক তার চোখের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বলে, আমি ভাবছি নে' মিনু।

কিন্তু ফারুকও জানে, তাহমিনাও জানে, এ মিছে কথা! ফারুকের মনে এখন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয়। সে আর তাকাতে পারে না তাহমিনার দিকে। তাহমিনা ওর হাত ধরে স্পর্শ থেকে অনুভব করতে পারে তার মনের কথা। বলে, তুমি আমাকে ভালোবাসো ?

কেন, মিনু ?

সত্যি বলো।

এরচেয়ে বেশি কি বলব। তুমি কি জানো না, তোমায় আমি কত ভালোবাসি ?

তাহমিনার দুঃখ হয়। খুশি হয় না। ক্ষুণ্ণ হয়। বলে, তাহলে তোমার দ্বিধা কেন ?

না, না।

বলে ফারুক দু'হাতে ওকে আকর্ষণ করে বুকের উত্তাপে বাঁধে। তাহমিনা শিথিল স্বরে নিচু পর্দায় উচ্চারণ করে, আমার দিকে তাকাও —আমার চোখের দিকে— আমার— জড়িয়ে আসে, কিছুটা অর্থহীন হয়ে আসে তার কথা। কিন্তু বুঝতে পারে ফারুক, কী ও বলতে চায়। মৃদু গলায় বলে, তুমি আছো, আমি সব ভাবনার ইতি করে দিয়েছি।

তাহমিনা তার সমস্ত শরীর শিথিল করে সাহস সঞ্চারিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে অনেকক্ষণ।

সেদিন ছিল ছুটি। ফারুককে আপিসে যেতে হবে না। তাহমিনার শুধু সকালের টিউশানি। বিকেলেরটায় ছুটি তারো। দুপুরে তাহমিনা বেরিয়ে গেল একেলা। বলে গেল ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরবে। ফারুক সে সময়টা শুধু শুয়ে ঘুমিয়ে কাটালো।

ফিরে যখন এলো তখন ফারুক জানালার কাছে চেয়ার টেনে বসে বলল, এলে ?

হুঁ। কোথায় গিছলাম বলোত ?

তুমি না বললে জানব কী করে, বাহ্।

আমিন বাগে।

তোমার মার কাছে ? হঠাৎ কী ব্যাপার ?

সব সম্পর্ক চুকিয়ে এলাম।

ফারুক ঘুরে ওর মুখোমুখি হলো। কেন যেন ভয় পেল। কেন যেন তাহমিনাকে সে সমর্থন করতে পারল না মনে মনে।

শাড়ির আঁটসাঁট ভাঁজ শিথিল করে অলস ভঙ্গিতে খোঁপা আলগা করে দিতে দিতে তাহমিনা ছোট্ট হাই তুলে বলল, তোমাকে বলিনি। মা জানতে পেরেছিলেন সব। ভেবেছিলুম জানাবো না। এখনকার জন্যে নয়, বিয়ের ওপরই দুঃখ হোতো তার। সেটাও আমি চাইনে। লাবলু একদিন এসেছিল সন্ধ্যের পর। মা এক পাও নড়তে পারেন না, নইলে দেখতে নিজেই চলে আসতেন। তাছাড়া বোধ হয় আমাকে ঘেন্নাও করেন, নইলে আসতে কি ?

লাবলু কী বলেছে ? জাকি ?

জাকি ভাই অফিসিয়াল কাজে করাচি গিছলেন, আজকেই ফিরেছেন। এখনো আপিসে। দেখো আজকেই না এসে পড়ে এখানে।

কেন ?

দেখো, আসবেই। মাকে সব কথা বলেছি, না বলে উপায় ছিল না। তোমাকে বলিনি, তুমি ব্যস্ত হয়ে পড়বে তাই। কী আশ্চর্য জানো, মা আমাকেও অবাক করে দিয়েছেন। একটুও কাঁদলেন না, কিছু না, শুধু চুপ করে রইলেন।

মা আঘাত পেয়েছেন।

কী জানি। আর বাবা, বাবা আমার নাম অবধি শুনতে চাননি। আমি তার কাছে মরে গেছি। দুঃখ শুধু, কেউ বুঝলো না ফারুক। তারপর একটু পর, একটু থেমে তাহমিনা মাথা ঝাঁকিয়ে সেই আবহ কাটিয়ে দিতে দিতে বলল, মা শুধু বললেন, কবে মরে যাই তার ঠিক নেই, আমাকে ফেলে যাবি ?

তাহমিনা উত্তরে কী বলেছে ফারুক তা শুধালো না। তাহমিনাও বলল না। চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ তাহমিনা মাথা ঝাঁকিয়ে সেই আবহ কাটিয়ে দিতে দিতে বলল, চল বেরোই। আজ না সিনেমায় যাব।

তাহমিনা অনুমান করেছিল ঠিকই যে জাকি আজকেই আসবে। এলো তাই। তাহমিনা মালেকাবাণুকে বলেছিল, লাবলুও জানতো, তারা কোথায় বাসা করেছে, সেই নিশানা ধরে। কিন্তু পেল না কাউকে। ঝিকে জিগ্যেস করে জানলো সিনেমায় গেছে। মরিস নিয়ে আবার

সে বেরিয়ে গেল। ফিরে যখন এলো তখনো ওরা ফেরেনি। ঝি ওপরের ঘর খুলে দিলে পর সে বসে রইল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তাহমিনা বলল, ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। ঝিটার আক্কেল দেখো। বাসায় এক দণ্ড না থাকলে এমনি করতে হয়!

কোন দরকারে হয়ত জ্বেলেছে।

এমনি কথা বলতে বলতে ওরা ওপরে এসে দোরপর্দা সরিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল। তাহমিনা চোখ নিচু করল কিছুটা। ফারুক তাকিয়ে রইল সোজাসুজি। জাকি একটা খাড়া পিঠ চেয়ার টেনে বসে আছে। তাহমিনা ঢুকতে ঢুকতে বলল, জানতুম তুমি আসবে। কিন্তু সব কথা আমি মাকে বলে এসেছি।

জাকি একটুকাল নিঃশ্বাস বন্ধ করে থেকে তারপর বলল, আমার সাথেও তোমার কথা হওয়া দরকার। তাই এসেছি।

বেশ। যা বলবে আমাকেই বলবে, ফারুককে কিছু বলতে পারবে না। আমার ওপর তোমার অধিকার আছে মনে করেই এসেছ, কিন্তু ওর ওপর যে নেই এটা মনে রাখলে খুশি হব। বল।

তাহমিনা খাটের পাশে এসে বসলো। তার কথাগুলো শোনাল দৃঢ় আর অনমনীয়। এমনভাবে শুরু করলো যেন এখুনি সে শেষ করে ফেলতে চায় সব কথা। সময় নষ্ট হতে দিতে চায় না। ফারুক সরে গেল সেখান থেকে।

জাকি নরম সুরেই শুরু করল, তুমি যে এমন করবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

আমিও না।

তাহমিনার উত্তর শুনে চমক ভাঙ্গল জাকির। প্রশ্ন করলো, কেন?

নতুন করে বলবার ইচ্ছে নেই, নইলে বলতাম। মার কাছ থেকেই শুনে নিও।

কিছু হলে আমাকে তোমার বলা উচিত।

তোমরা আমার ভালোর জন্যেই সব করেছিলে। সে ভালো সইলো না। তাই নিজের ভালো নিজেই বেছে নিয়েছি।

আমাদের মুখে চুন কালি দিয়ে?

আমি ছোট্ট আর নই, আমি সব বুঝি।

তবুও?

হ্যাঁ।

জাকি থামল। তারপর সুর চড়িয়ে বলল, আবিদ চুপ করে থাকবে না, তা জানো?

তার যা খুশি করতে পারে।

ও।

কিছু করতে হলে সে-ই করবে। তোমাদের করবার কিছু নেই।

হয়ত নেই। আশরাফের চিঠি পাবার পর অন্তত বোন হিসেবে আমার যা করবার আছে তা করতে চেয়েছি। সেটা কি অনুচিত?

না। আমার যা বলবার সব মাকে বলেছি।

শুনেছি।

তারপর না এলেও তোমার চলত। সেই আমার শেষ কথা। তুমি এখন যাও।

এত শীগগীর যে তাহমিনা যবনিকা টানবে তা জাকি আশা করে নি। নরম সুরে হোক, চড়া সুরে হোক সে একটা বিহিত করতেই এসেছিল। কিন্তু তাহমিনার মুখোমুখি এসে সে যেন কেমন খেই হারিয়ে ফেলেছিল। তাছাড়া এরপর, সে ভাবল, আর কিছু বলা বৃথা। উঠে দাঁড়াল। বলল, বেশ আজ থেকে মনে করবো আমাদের কোন বোন ছিল না। আমি চললাম।

তাহমিনা কোনো উত্তর করল না। যখন ও দরোজার কাছে গেল, তখন বলল, এরপর বাসায় বোধ হয় আমাকে যেতে দেবে না ?

সে তোমার ইচ্ছে।

জাকি সিঁড়ি বেয়ে দু'ধাপ নামল। পাশে আলো জ্বলছে। জাকিকে একটু বেঁটে দেখাল ওপর থেকে।

মার খবর পাবো না ?

তোমার দরকার কি ?

আমার মার খবর দেবে না ? যেতে দেবে না ?

এ মুখ দেখিও না তাকে।

জাকি নেমে গেল। তাহমিনা দাঁড়িয়ে রইল সিঁড়ির ওপরেই। একটু পরে সে শব্দ শুনল বেবি মরিস স্টার্ট নিচ্ছে।

একদিন সকালে ফারুক আবিষ্কার করল তাহমিনা কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। আশ্চর্য মন্থরতা তার চলনে। আর চোখ জোড়া আয়ত উজ্জ্বল। ফারুকের দিকে তাকাতে গিয়ে বারবার চোখ নামিয়ে নিল। বলনে কেমন চাপা খুশি, ফারুক লক্ষ্য করল। দুপুরে প্রায় সে ভুলেই গেল কথাটা। আর তার মনে রইল না।

রাতে যখন ফারুক ফিরে এলো তখন তাহমিনা এলিয়ে ছিল বিছানার ওপর। কাপড় বদলাতে বদলাতে ফারুক শুধালো, খেয়েছ ?

না।

আজ দেরি যে বড় ?

ভালো লাগছে না। তুমি খেয়ে নাও।

ফারুক খাটের কাছে এসে বসে বলল, কী হলো তোমার ?

কিচ্ছু না।

তবে ?

নাগো না, অসুখ করেনি। একদিন কি খারাপ লাগতে নেই ? কী যে তোমার বুদ্ধি। যাওতো এখন।

ফারুক খেয়ে এসে শুয়ে পড়ল তার পাশে। তাহমিনা এপাশ ওপাশ করল খানিক। একবার গলায় বাহু জড়িয়ে দিল তার। মুখ লুকালো। পড়ে রইল অনেকক্ষণ, তারপর আবার মুখ তুলে নিল। ফারুক শুধালো, কিছু বলছ না মিনু।

উঁ।

আজ তোমাকে— ; কি হয়েছে তোমার ?

তাহমিনা বালিশে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল। ফারুক ওর চিবুকে হাত রেখে তাকাল। আবছা আলোতেও দেখতে পেল তার ঠোঁটে মিহি হাসির রেখা— অদ্ভুত একটা ভাঁজ। সহসা তার মনে বিদ্যুতের মত নিমেষের জন্য একটা কথা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তার হাত কাঁপল একটু।

তবে কি তাই মিনু ?

হুঁ।

কবে টের পেলে ? কিছু বলোনি ?

আজকেই।

কী করে বুঝলে ?

ও তুমি বুঝবে না।

তারপর তাহমিনা তাকাল ফারুকের চোখে চোখে অন্ধব । ফারুক তখন চোখ বুঁজেছে কিন্তু তা দেখতে পেল না তাহমিনা। সে তাকিয়ে রইল

।। ১৬ ।।

তাহমিনা চলে যাবার দেড় বছর পর আবিদ এলো ঢাকায়। এই দীর্ঘ দেড় বছর সে কোথাও বেরোয় নি। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেছে। ব্যবসারও সমস্ত কাজ প্রায় ছেড়ে দিয়েছে আশরাফের হাতে। ভালো মন্দ সে যা করছে তাই ভালো। মাঝে মাঝে জরুরি কাগজপত্রে সই করে ও শুধু। আর মোটা টাকার দরকার হলে চেকে। তার উচ্ছল প্রাণ বন্যায় একটা পাথর চাপা পড়ে রুদ্ধ হয়ে গেছে। নিরানন্দ দিন আর নীরব মুহূর্ত। ডেক চেয়ারে বসে থাকাটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তার। খেতে খেতে কোনদিন মুখে গ্রাস তুলে হয়ত চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ। আবদুল অস্বস্তি বোধ করে পাশে দাঁড়িয়ে। তবু হয়ত সে তেমনি চুপ করে ভাবছে। তারপর হঠাৎ চমক ভেঙে দ্রুত খাওয়া শেষ করে ন্যাপকিনে মুখ মুছে উঠে আসে। আবদুলের দেখে শুনে ভালো লাগে না। কোন কোন দিন আশরাফকে সে ক্ষোভের সাথে বলে, হুজুর, এরচে' আমাকে বিদেয় দিন, চলে যাই।

কিন্তু তাই বলে সত্যি সত্যি সে চলে যায় না। সব সময় ছায়ার মত আবিদের সাথে সাথে থাকে। অনেক রাতে উঠে আবিদের কামরা দেখে আসে।

আশরাফও ভাবছিল এমন করে আর কদিন ? দিনে দিনে আবিদের শরীর ভেঙে পড়ছে। অথচ জিগ্যেস করলে, বললে, কানই দেয় না। স্পষ্ট সে বুঝতে পেরেছিল, এমন করে বেশি দিন চললে একটা কিছু হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া কি নিয়ে ও বেঁচে থাকবে ? কি তার অবলম্বন ? এমন স্তব্ধ পাথর জীবন সে বইবে কী করে ? একদিন আশরাফের মনে হয়েছে— যদি সে আত্মহত্যা করে। আফিয়াকে সে বলেছিল কথাটা। সেও সায় দিয়েছে, কিছুই বিচিত্র নয়। পরদিন আশরাফ বাংলোয় গিয়ে সব বন্দুক কিওরিও ঘরে রেখে তালা বন্ধ করে চাবি

নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। শুধু একটা বন্দুক দিয়েছে আবদুলকে।

এটা তোর কাছে রাখবি। কাছছাড়া করবি না আর বাংলোয় আনবি না কখনো, তোর কামরাতেই রেখে দিস।

আবদুল একটু বিস্মিত হয়ে বলেছে, আচ্ছা।

কয়েকদিন পর আবিদ আশরাফকে বলেছে, রাইফেল সব বন্ধ করে চাবি নিয়ে গেছেন, না ? তবে কি আবিদ সত্যি সত্যিই আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল ? আশরাফ চমকে উঠল। বলল, হ্যাঁ।

আবিদ একটু কাল তার দিকে তাকিয়ে তারপর হাতের বই ওলটাতে ওলটাতে বাইরের দিকে চোখ রেখে শান্ত গলায় বলেছিল, আপনার ভয়, আত্মহত্যা করব। না করব না। এইখানে একটু হাসল সে, তাহলে অনেক আগেই করতুম। যে মরেছে সে আবার মরে না।

মরে না ঠিকই, আবিদও হয়ত মরতে চায় না, তবুও আশরাফ দেখেছে দিনের পর দিন যে অযত্ন আর বিশৃঙ্খলা চলেছে তাতে মন্দ একটা কিছু হবার আশঙ্কা আছে পুরোপুরি। তাই একদিন আফিয়া আর খোকাকে সে নিয়ে এলো এ বাংলোয়। তারপর থেকেই আবিদের পুরোপুরি ভার আফিয়ার ওপর। ধীরে ধীরে সে ফিরিয়ে আনলো সংসারের শ্রী আর শৃঙ্খলা নিপুণ হাতে। আবিদের নাওয়া খাওয়ার ধরাবাঁধা সময় হলো। ইচ্ছেমত ডেকচেয়ারে বসে আকাশ পাতাল ভাববার তার আর অবকাশ বইল না। সে সময় আফিয়া কাছে এসে গল্প করতো। তাকে ভুলিয়ে রাখতে চাইতো। বার থেকে দেখলে মনে হতো ঠিক আগের মতই আবার সব কিছু চলছে, শুধু একটু কাছে এলেই আজো অনুভব করা যায় সেই শূন্যতা। আফিয়া মাঝে মাঝে কথা তুলত। কিন্তু আবিদ আর আগের মত উড়িয়ে দিত না ম্লান হেসে, শুধু চুপ করে থাকত। তার এই নীরবতা দেখে একটু আশান্বিত স্বরে আফিয়া হয়ত বলে, তাহলে কবে যাবে বলো ? নাকি খোকার আব্বা যাবে ?

আমার ভালো লাগছে না ভাবী। আমি কিছু ভাবতে পারছিনে। একটু পরে আবিদ নিজেই শুরু করে, আচ্ছা ভাবী, তোমরা তো মেয়ে— ওর কি একবারও আমার কথা মনে পড়ে না ?

পড়ে বৈকি ? দেখো, তুমি গেলেই আসবে। এদ্দিনে ভুল বুঝতে পেরেছে ও।

না, পড়ে না। আর ভুল বলছ কাকে ? তুমি তো সব শুনেছ। না, না, ভুল ও হয়ত করে নি।

আফিয়া ইঙ্গিতটি বুঝতে পারে। নীরব হয়ে যায়। এরপরে তার আর কিছু বলবার থাকে না। আবিদ উদাস সুরে প্রায় নিজেকেই বলে, তুমিও পারলে না। বলো, এরপরেও আসবে ? ও যেমন আছে তেমনি থাক, আমি গিয়ে অন্তরায় হবো না। হতে চাই না। আমি এমনিই বেশ আছি।

তোমাকে একটু কফি দিই, না ?

দাও।

আফিয়া একটি ছল করে কিছুক্ষণ দূরে সরে থাকতে চায়।

কাগজের একটা বিশেষ সংখ্যা বেরুবে। ফারুক তাই কদিন হলো আপিসে অত্যন্ত ব্যস্ত। দুপুরেই চলে যায়, আসে অনেক রাতে। সারা দুপুরটা তাই একেলাই কাটে তাহমিনার। তবু একেলা নয়। অনভিজ্ঞ নতুন মা-র হাজারো ব্যস্ততায় সময় তার গড়িয়ে যায় কখন। মাত্র চার মাস বয়স হয়েছে বাবুর— ছেলেকে তারা আদর করে ডাকে বাবু— তবু তারি দস্যিপনায় তাহমিনা অস্থির। দেখতে হয়েছে ঠিক তার মত। তেমনি গৌর, তেমনি নাকের গড়ন। সব কিছু তাহমিনার মতই। মাঝে মাঝে অপলক চোখে বাবুর দিকে তাকিয়ে এই সাদৃশ্য দেখে তাহমিনা।

আজ দুপুরে বাবু জেগে রয়নি তাকে বিরক্ত করবার জন্যে। কাঁদে নি। মাই খেতে খেতে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন দোলনায় শুইয়ে দিয়েছে তাকে। তারপর সেই ফাঁকে সেরে নিয়েছে নিজের নাওয়া খাওয়া। দুপুরে যাবার সময় ফারুক আয়নার সামনে শেষবার চিরুনি চালাতে চালাতে চাপা হাসি গলায় ডেকেছে, বাবুর মা, ও বাবুর মা।

বারান্দায় কী একটা কাজ করছিল তাহমিনা। হঠাৎ করে এমন একটা ডাক শুনে তার বুকের ভেতরে রক্ত ছাৎ করে উঠেছে। বলেছে, যাঃ।

আহা, শোনোই না ইদিকে।

ডাকটা নতুন আর কেমন মিষ্টি লেগেছিল তার কাছে। আর একবার শুনতে তার সাধ হলো। এসে বলল, কী বলছ শুনি ?

আরো কাছে এসো।

কাছে আসতেই ফারুক একেবারে আড়কোলা করে তুলে বুকের সাথে চেপে ধরেছে।

দিন দুপুরে একি! ছাড়ো, ছাড়ো বলছি।

ফারুকের এই খামকা ব্যবহারে তাহমিনা সত্যি সত্যি একটু বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু সে ছাড়ে নি তবুও। চেপে ধরে গালের ওপর একে দিয়েছে অনেকক্ষণ ধরে চুম্বনচিহ্ন

নাওয়া খাওয়া শেষ করে ঘরে এসে আয়নার সামনে সে দাঁড়িয়ে দেখল, এখনো সেখানে ফিকে লাল আভা। ছি, ছি, ফারুকটা কী। এমন করে নাকি কেউ ? বারান্দায় এসে সারা মুখ রগড়ে ধুয়ে ফেলল আবার। এরচে' সারামুখ লাল দেখাক, তাও ভালো। তারপর বুলোলো একটু পাউডার প্রলেপ সেটা ঢাকবার জন্যে। তারপর বাবুর দোলনার পাশে বেতের একটা চেয়ার টেনে বসলো ছোট্ট একটা সেলাই হাতে করে। বাইরে ম্লান হলুদ রোদে মন্থর প্লাবিত পথ। দু'একটা বাড়ির ছাদে বাতাসে কাঁপছে শাড়ি। আর কেমন নিস্তব্ধতা। ঠিক স্তব্ধ নয়, তবুও শব্দ নেই যেন কোনোখানে। টেবিল ক্লকে তিনটের ঘর পেরিয়ে গেল ঘণ্টাব কাঁটা। তাহমিনা একবার অলস চোখ তুলে সময় দেখলো।

ঝি এসে বলল, আপামণি।

কিরে ?

কে একজন ভদ্রলোক বাইরে নিচেয় দাঁড়িয়ে।

কে ভদ্রলোক ? কাকে চায় ?

জাকি নয়ত ? লাবলু নয়ত ? কে এলো এখন! ফারুকের কাছে তো কেউ আসে না বড় একটা। আর এমন উদ্বিগ্ন হলো কেন সে খামোকা ? ঝি উত্তর করলো, আপনার কথাই বললেন।

আমার কথা ? নাম বললেন ?

না।

হয়ত নাম শুনে আসবার জন্যে ঝি দরোজার দিকে পা বাড়ালো, এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে কার উঠে আসবার শব্দ শোনা গেল। তাহমিনা উঠে বারান্দায় এসে দেখলো আবিদকে। আবিদ একটা ধাপের ওপর পা রেখে দেখল তাহমিনাকে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল তারা। তাহমিনা অস্ফুট স্বরে বলল, তুমি!

আবিদ কিছু একটা বলতে গিয়ে পারল না। একবার মাথা ঝুঁকালো শুধু অস্পষ্ট ভঙ্গিতে।

তাহমিনার মনে হয়েছিল প্রথমে, এই যে মানুষটা তার চোখের সমুখে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে সে কোনদিনও চিনতো না। দীর্ঘ সেই মানুষটার দেহ কী এক ক্লান্তির ভারে নুয়ে এসেছে যেন ঈষৎ। পরনে ছাই ছাই স্যুট— তাতে আরো ম্লান আরো বিষণ্ণ দেখাচ্ছে তাকে। আর কী অসম্ভব স্থবির তার উপস্থিতি। বাঁ হাতে শিরা ফুটে উঠেছে— দৃঢ়তায় নয়, দৌর্ব্বল্যে। হয়ত তাই। একটা রেখার মত, একটা অবাস্তব অথচ অনস্বীকার্য উপস্থিতির মত, পৃথিবীর আতঙ্কের মত ওই মানুষটার আশ্চর্য উপস্থিতি।

তাহমিনা তেমনি অস্ফুটস্বরে, কেন না এর চেয়ে উঁচু পর্দা তার এখন এলো না, উচ্চারণ করল, এসো।

কিন্তু শোনা গেল না বুঝি তার সেই স্বর। কেননা আবিদ এতটুকু নড়ল না তার অবস্থান বিন্দু থেকে। পরে তাহমিনা এক পা পেছুলো, মুখ করলো তার কামরার দিকে। আর তখন আবিদ উঠে এলো একেকটা সিঁড়ি অনেক সন্তর্পণে মাড়িয়ে, রেলিংয়ে বাম করতাল ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে। নিঃশব্দে দুজনে গিয়ে ভেতরে বসলো। চৌকাঠে পা রেখেই আবিদের চোখ পড়েছিল দোলনার ওপরে। সে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এক মুহূর্তের জন্যে। প্রথমে কিছুটা বিস্ময়, তারপর একটা চাপা হিংস্রতা যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এক ধরনের তীব্র হিংসায় নীল ধ্বক ধ্বক করল তার চোখ।

আর তাহমিনা হয়ত সে সময়ে আর্ত চিৎকার করে উঠতো। কিন্তু ওঠেনি। সে চাইল বাবুকে তার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখতে। ভীষণ একটা ভয় ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে তার ভিতরে ছড়িয়ে পড়ল। ভাবল, আবিদ কি করবে এর পর ? এদ্দিন বাদে কেন সে এলো ঢাকায় ? যদি কিছু একটা অনর্থ বাধিয়ে ফেলে আজ, এখুনি! তাহলে কী সে করবে ? দেড় বছর ধরে যে সাহস ছিল তার চোখে এখন এক মুহূর্তে তা ভীরু হয়ে গেল। আবিদ যদি কোনদিন তার মুখোমুখি হয়, সে ভেবেছিল, কিছুই সে হতে দেবে না। হার মানবে না। অথচ আজ সামনাসামনি দাঁড়িয়ে শুধু অসহায় লাগল তার নিজেকে। একটু আগেই সে আবিদের চোখে দেখেছে হিংসার নীল আভা; সে কথা ভেবে পর মুহূর্তেই কঠিন হয়ে এলো তাহমিনা। ঋজু শান্ত ভঙ্গিতে আবিদকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল একটু দূরে।

আবিদের সহসা ভীষণ তীব্র একটা সাধ হলো বাবুকে দেখবার। তার মনে হলো দোলনার ওপর শুধু ঘুমিয়ে থাকা এক শিশু নয়, তার চেয়ে আরো কিছু বেশি এবং অন্য কিছু সে

দেখতে পাবে। তাহমিনার গর্ভে যে সন্তানের জন্ম, তার মুখের আদল কেমন, তা সে দেখতে চায়। কিন্তু তাহমিনার সেই ঋজু ভঙ্গি তাকে বিহ্বল করে দিল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে বসলো চেয়ারে। তারপর শরীর এলিয়ে দিল অলস ভঙ্গিতে।

সমস্ত কামরায় এখন তীব্র নিস্তব্ধতা। কেউই শুরু করল না প্রথমে কোনো কথা। কিন্তু দুজনেই যেন বুঝতে পারল এ ভারী অশোভন হচ্ছে। তাই দুজনেই চাইল একটা কিছু বলতে। অনেকক্ষণ পরে, প্রথমেই তাহমিনা, কবে এসেছ?

কামরার দূর প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাহমিনা। তার স্বর যেন তীরের মত বিদীর্ণ করল সহসা এই স্তব্ধতাকে। আবিদ চোখ তুলে উত্তর করল, কাল। যেন যথেষ্ট বলা হল না, এই ভেবে সে আবার বলল, কাল ভোরে। হোটেলে উঠেছি।

ও।

তাহমিনা উচ্চারণ করল না, একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল। তারপর সেও বসল একটা চেয়ারে আস্তে আস্তে পিঠ ধরে। আবিদেব বসে থাকা ভঙ্গি দেখে সহসা তার মনে হলো যেন লাফ দেবার পূর্ব মুহূর্তে একটা বাঘ ওঁৎ পেতে বসে আছে। যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে অন্ধের মত। তাহমিনা বলল, কেন তুমি এলে?

আবিদ এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। একটু পরে ধীরে ধীরে বলল, এমন করে চলে এলে কেন তাহমিনা? আমাকে বললে না, কাউকে বললে না। ফারুকের কথা আমি জানতামও না। আমি হাসপাতালে, শেষবার দেখাও করলে না।

আবিদের প্রত্যেকটা বাক্যের ভেতরে বেশ কিছুটা করে যতি। অনেক বড় কোন কথার যেন মাঝখান থেকে তুলে তুলে সে বলে গেল। তবু তাহমিনা বুঝতে পারল স্পষ্ট, কী সে বলতে চাইছে।

সে শান্ত গলায় বলল, আমার এ ছাড়া কোনো পথ ছিল না।

আবিদ একটুকাল তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তারপর, 'কিন্তু আমার সাথে তোমার বিয়ে হয়েছিল। আমি তোমার স্বামী।' কথাটা বলে নিজেই যেন চমকে উঠল সে। নতুন কথার মত শোনাল তার নিজেরই সংলাপ। আর এখন তাহমিনার দিকে ভালো করে তাকিয়ে সে অনুভব করল, তাহমিনা তার কত দূরে সরে গেছে। তাকে সে আর স্পর্শও করতে পারবে না। এমনি দূর।

তাহমিনার কানে এই 'আমি তোমার স্বামী' বাজলো একটা তীব্র ধাতব সংঘাতের মত। সে চুপ করে রইলো। আবিদ হঠাৎ আঙ্গুল তুলে শুধালো, খোকা?

হ্যাঁ।

কী নাম?

বাবু।

ও কোথায়?

আপিসে।

তাহমিনা অপেক্ষা করছিল, হয়ত আবিদ এখুনি দোলনার কাছে এগিয়ে যাবে। তার মনে হলো হয়ত একতাল মোমের মত দু'হাতে তুলে পিষে ফেলবে বাবুকে। একটা তীক্ষ্ণ শংকা

তাকে বিদ্ধ করল। কিন্তু আবিদ উঠলো না, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল দ্রুত। তাহমিনা আশ্চর্য রকমে ব্যথিত হলো। সে যদি তা করত, তাহলে কি সত্যি সত্যি সে খুশি হতো? হঠাৎ আবিদ স্বর পালটে নরম গলায় বলল, তাহমিনা, একটা কথা তোমায় বলব?

বলো।

কেন তার কণ্ঠ এমন কোমল হলো? না— না। নিজেকে মনে মনে অভিশাপ দিল তাহমিনা। অবিশ্যি জানিনে বলবার মত দাবি আমার এখনো আছে কিনা, তাই প্রথমেই জিগ্যেস করে নিলুম।

আবিদ কী কথা বলতে চায় যে যার জন্যে এত ভূমিকার প্রয়োজন? প্রথমে যে দুর্বলতা তাকে ভর করেছিল, এখন আর তা নেই। মনে মনে কঠিন হলো সে। বিন্দুমাত্র সহানুভূতি জাগল না তার মনে। অথবা জাগলেও তা এত ক্ষীণ যে সে বুঝতে পারল না। তার চোখে ফুটে উঠল চাপা উপেক্ষার বিদ্যুৎ।

এমন করে আর কদ্দিন তাহমিনা? নিজের বৌ চলে গেলে লোকে কত কথা বলে, সেটা ভাবলে না? এমন করে তুমিই বা কী করে থাকবে? সমাজের স্বীকৃতি ছাড়া? আমি তোমাকে কোনদিন কি ভালোবাসিনি? তোমাকে আমি আজো ভালোবাসি। দেড় বছর ধরে শুধু ভেবেছি, শেষ অবধি দেখেছি তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না। তুমি চল।

আর ফিরবার পথ নেই আমার।

নেই?

না। আর সমাজের কথা বলছ? ইচ্ছে হলে আইনে যেমন করে হয় ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেই খুশি হব।

সেতো দেড় বছর আগেই হয়ে গেছে। আইন আর এদ্দিনে আমি তুলবো না। তাছাড়া মনের একটা নিজস্ব আইন আছে। তাকে সম্মান করতে জানি।

তাহমিনার মনে হলো একটা সম্পূর্ণ নতুন মানুষের সঙ্গে সে কথা বলছে যেন। এমনকি কথা বলবার ভঙ্গি কত বদলে গেছে আবিদের। সে উৎকর্ণ হয়ে শুনলো তার সংলাপ। আর কী আশ্চর্য, এমন কী তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, এই বাচন ভঙ্গির পরিবর্তন তার মনে এক শিশু-কৌতূহলের জন্ম দিল। সে ভালো করে তা বুঝতে পারল না, যেন এই কৌতূহলের একটা নিজস্ব সত্তা আছে, আপনা আপনি একটি সুন্দরের মত তা গড়ে উঠল।

তাহমিনা প্রশ্ন করল, তাহলে কেন তুমি এলে?

তোমাকে নিয়ে যেতে।

আমি এখন মা, আর তা হয় না। যদি আমাকে কোনদিন ভালোবেসে থাকো তাহলে বাবুর জন্যে তুমি পাকাপাকি বিচ্ছেদের ব্যবস্থা কোরো। তুমি এসেছ, না হলে হয়ত নিজেই লিখতুম তোমাকে।

লিখতে? আমাকে?

হ্যাঁ। বাবুর ভবিষ্যৎ আমি ভাববো না?

আবিদ কোনো কথা বলল না। সে জানল, তাহমিনার সন্তান আজ তার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহমিনা কোন দিন এমন করে বলতে পারে তা সে ভাবতেও পারেনি। দুরাশা ছিল, হয়ত

মুখোমুখি দাঁড়ালে সে আর না করতে পারবে না, ফিরে আসবে। সে কথা আফিয়াও বলেছিল, দেখো তুমি নিজে গেলে, ও কিছুতেই না এসে পারবে না। হাজার হোক তুমি ওর স্বামী তো।

উত্তরে সে বলেছিল, কিন্তু যদি সে না আসে, তাহলে আমি ছোট হয়ে যাব যে ভাবী। এখন তবু প্রায় ভুলে গেছি, আর কিছুদিন পরে হয়ত মনেই থাকবে না, সেই ভালো। মাঝখান থেকে চোখে দেখে ক্ষতটাকে বাড়াতে চাইনে ভাবী।

আফিয়া মনোযোগ দিয়ে শুনে তারপর বলেছে, এ তোমার মিছে ভাবনা। ও আসবেই, না এসে পারে না।

না, না।

আফিয়া এবার অভিমান করে স্নেহের রাগে গলা ভিজিয়ে বলেছে, আমি তোমার সংসার কদ্দিন দেখব ? আমি মরে গেলে ?

মরবার বয়স আপনার হয়নি।

তবুও তো। তোমার নিজের লোক থাকতে তুমি এমন করে কষ্ট করবে কেন ?

আবিদ উত্তর করেছে, কষ্ট আমার কিছু নেই, বেশ আছি। আর আপনি যেতে চাইলে আমি ছাড়ব কেন ?

না, না, তুমি ঢাকায় যাও। তুমি ওর সাথে দেখা করো।

আবিদও কিছুদিন হলো কথাটা ভাবছিল। নতুন করে অনুভব করেছিল তাহমিনার অনুপস্থিতি আর বুকের শূন্যতা। তীব্রতর হয়ে উঠেছিল তাকে কাছে পাবার বাসনা। প্রতিটি মুহূর্ত, তাহমিনা নেই এই কথা গুমরে মরেছে তার ভিতরে। নিজেকে মনে হয়েছে আরো অসহায়। প্রথম সেই আঘাতের পর জোর করে কিছু দিন তাকে ভুলে ছিল, কিন্তু শেষ অবধি তা পারে নি। আফিয়া যতক্ষণ কাছে কাছে থাকে, ততক্ষণ কিছুই মনে হয় না তার। কিন্তু সে একটু দূরে সরে গেলেই তার একাকীত্ব সে অনুভব করতে পারত ভয়াবহভাবে। সে জানে তাহমিনা কেন চলে গেছে, কি সে পায়নি; তবু অভিমান হতো সে কেন চলে গেল বলে। সে কি থাকতে পারত না ? তার নিস্ফল নির্বীজ জীবনে যে সামান্য শেষ ভালোবাসাটুকু ছিল সম্বল, তাকে সে উপড়ে দিয়ে গেল কেন ? শুধু তাকে, সে ভালোবাসতে পারত না ? সমস্ত অভিযোগ সব অভিমান দলা পাকিয়ে বুকের ভেতরে ভারী হয়ে কণ্ঠনালী রুদ্ধ করে দিতে চাইত।

সবাই যখন শুয়ে পড়ে, তখন শোবার ঘরে আবিদের ঘুম আসে না কিছুতেই। বিরাট খাটের শূন্যতার ওপর এপাশ ওপাশ করে শুধু ও। আনমনে, কিংবা দুরাশায় চোখ বুঁজে পাশে হাত বুলোয়, হয়ত তাহমিনার দেহস্পর্শ ঠেকবে এই ভেবে। কখনো কখনো শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। খালি পায়ে পায়চারি করে কার্পেটের ওপরে। নিরর্থক তাকিয়ে থাকে ছোট করে রাখা বেডল্যাম্পের দিকে। তারপর জানালার কাছে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে চোখ মেলে দেয়। সহসা মুখ ফিরিয়ে বলে তুমি কেন গেলে তাহমিনা ?

যেন তাহমিনা এ কামরাতেই আছে শুনতে পাবে।

দিনে দিনে তাহমিনার অভাব তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল তার কাছে। সে বুঝেছিল, তাহমিনাকে ছাড়া তার বেঁচে থাকা নিরর্থক। তার ভালোবাসা তার কাম্য। সে তাহমিনাকে ফিরিয়ে আনবেই।

ঢাকায় এসে জাকিদের বাসায় ওঠেনি। হোটেলে গেছে। মালেকাবাণুর সাথে দেখাও করে নি। দুপুরে গেছে জাকির আপিসে। বাইরে সেই মরিস দাঁড়িয়ে আবিদের মনে পড়েছিল বিয়ের পর সে আর তাহমিনা এই কারে করেই গিছল নারায়ণগঞ্জে। স্টিমারঘাট অবধি এগিয়ে দিতে এসেছিল সবাই। পাশে ছিল লিলি। জাকি ড্রাইভ করছিল। আর লাবলু তার পাশে। কামাল সাহেব আর মালেকাবাণু বাড়িতেই ছিলেন। আর মনে পড়ল স্টিমারের ডেকে বসে অন্ধকার আকাশে দুজনের তারা দেখার কথা। একটা তারার ভুল নাম বলেছিল সে। তাহমিনা শুধরে দিয়েছে, ওটা কাল-পুরুষ।

জাকি ওকে যেন ঠিক আশা করতে পারেনি। দেড় বছর হয়ে গেল যে আসেনি, চিঠি দিয়েছে খুব কম, সে যে এমন করে হঠাৎ এসে পড়বে তা সে ভাবতে পারেনি। প্রথম দেখার উচ্ছ্বাসটা জাকির কমে এলে পর আবিদ নিজেই জিগ্যেস করেছে তাহমিনার কথা। উত্তরে ও বলেছে, যা হয়ে গেছে তারপর থেকে ওকে আমি নিজের বোন বলে আর স্বীকার করতে পারিনি। আমরা মনে করি, তাহমিনা মরে গেছে।

আবিদ চুপ করে শুধু পেপারওয়েট আঙুলে ঘুরিয়েছে টেবিলের রেকিসন জমিনে। তারপর জাকি একটু থেমে বলেছে বেশ কিছুদিন আগে একটা খবর পেয়েছিলুম ওর নাকি— ওর নাকি ছেলে হবে। কাউকে বলিনি বাসায়। শুনলে মা আরো দুঃখ পেতেন।

ও অবাক হয়ে প্রতিধ্বনি করেছে, ছেলে!

তারপর নিজেই মাথা নেড়েছে— না অবাক হবার কী আছে।

সেই জাকির কাছ থেকেই নিয়েছে সে ঠিকানা। তাহমিনা সন্তানবতী. এদ্দিনে হয়ত সে মা। কেমন নতুন নতুন ঠেকল কথাটা। তাহমিনা যখন মা, তখন তাকে দেখাবে কেমন ?

দেখতে সেই দেড় বছর আগের মতই। শুধুমাত্র পরিবেশটা ভিন্ন। কিন্তু ভেতরে যে কতখানি বদলে গেছে, সম্পূর্ণ সে আলাদা হয়ে গেছে, তা বুঝতে পারল যখন তাহমিনা উচ্চারণ করল — বাবুর ভবিষ্যৎ আমি ভাবব না ? এখন তার আর তাহমিনার মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে ফারুক নয় বাবু। আবিদ উচ্চারণ করল, আমার কথা তুমি ভাববে না ? একটু থেমে, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি তাহমিনা। তুমি কি কিছুতেই যেতে পার না ?

এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে তাহমিনা ? এ কথার কোনো উত্তর দেয়া যায় না। তাহমিনা তাই চুপ করে বসে রইল। তার চোখ আনত হলো কোলের ওপর।

আবিদ আসবার সময় ভেবেছিল যেমন করেই হোক তাহমিনাকে সে ফিরিয়ে আনবেই। কিন্তু এসে অবধি সেই দৃঢ়তা সে তার স্বরে, তার ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলতে পারল না। শুধু একটি অবোধ্য আকুতি হয়ে রইল তার সমস্ত কথা। এখন সে শুধু তার দিকে তাকিয়ে রইল।

।। ১৮ ।।

জানালার পর্দা সরানো কিছুটা। একটুকরো আকাশ, কয়েকটা বাড়ির মাথা দেখা যায়। দূরে একটা ছাদে শাড়ি শুকোতে দিয়েছে কেউ। আর পাতাবহুল নিমের ঘন ডাল। এতক্ষণ রোদে চিকচিক করছিল নতুন পাতাগুলো। এখন পড়তি রোদের ম্লান কোমল আলোয় শুধু বেগুনি হয়ে রয়েছে। আবিদ সেদিকে মুখ ফেরালো। তারপর উঠে গেল জানালার ধারে। সরিয়ে

দিল পর্দাটা একপাশে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে সিগারেট ধরালো। প্রথম কাঠিটা নিভে গেল জ্বলে উঠেই। ধরলো দ্বিতীয়টা।

বাবু ঘুম থেকে উঠেছে অনেকক্ষণ। তাকে কোলে করে বারান্দায় এসেছিল তাহমিনা। তারপর শান্ত করবার জন্যে মাই দিয়েছিল খানিক মোড়ায় বসে। এতক্ষণ আবিদ বসে ছিলো ভেতরে। বার থেকে কোনো শব্দ পাওয়া যায় নি তার। চেয়ার টানবার কী গলার কোনো আওয়াজ শোনা যায় নি। চট্ করে বোঝা যাবে না যে ভেতরে কেউ আছে। তাহমিনারা ও কেমন মনে হয়েছিল, আবিদ যেন আদৌ আসে নি। শুধু একটি মুহূর্তের জন্য বারান্দায় বসে মাই ওর মুখে তুলে দিতে গিয়ে অদ্ভুত একটা দুরু দুরু লজ্জার কাঁপন লেগেছিল তার সারা শরীরে। এমন কোনো দিন হয়নি। বাবু হবার পর একদিনও না। আজ হঠাৎ সে অনুভব করেছিল, সে মা। আজ সেই অনুভবটুকু শিথিল করে দিয়েছে তার সমস্ত শরীর। তাহমিনা যেন এক নিমেষে বদলে গেছে।

তারপর বাবুর অস্পষ্ট ভুরুতে দিয়েছে গভীর কাজলের রেখা। ঘরে এসে পাউডার দিয়ে বুলিয়েছে তার ছোট্ট কোমল শরীর। তারপর নিচেয় নেমে ঝির কোলে দিয়ে বলেছে ও বাসায় বেরিয়ে আসতে। পাশের বাড়ির বৌটির দিনে অন্তত একবার বাবুকে কোলে নেয়া চাইই। অন্য দিন হলে তাহমিনা নিজেই যেতো। হয়ত গল্প করত খানিক। কিংবা হয়ত বৌটি আসতো নিজেই। আজ বাবুকেই পাঠিয়ে দিল সে। আর কেন যেন সেই মুহূর্তে ভাবলো, ও বাসার বৌ যেন আজ ঈশ্বর করুন না আসে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসে কামরায় দাঁড়াতেই তাহমিনার মনে হলো, কেন সে সবাইকে বাইরে পাঠিয়ে দূরে সরিয়ে একেলা হতে চাইলো ? আর এখন আবিদের মুখোমুখি এই একেলা হওয়াটা কী ভীষণ! সে অনুভব করল। সে ভাবলো। চুপ করে রইলো।

আবিদ তখনো সেই জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। তাহমিনা সেদিকে স্থির তাকিয়ে— চোখ তার আবিদকে ছাড়িয়েও তারো দূরের শূন্যতায়। হঠাৎ যেন কী একটা ক্ষরিত হয়ে যাওয়ার অদৃশ্য শিহরণ জাগলো তার আত্মায়। যেন একটা শক্তি অপসারিত হলো তার চেতনা থেকে। একটা একটা করে আশেপাশের একই চোখে দেখা বস্তুগুলো মিলিয়ে গেল দৃষ্টির অতীতে। তাহমিনার শরীর কেঁপে উঠল থরথর করে।

একি হলো তার ? না— না— ওকথা নয়। এ সে কিছুতেই হতে দেবে না। কোন মূল্যে কোনদিনই নয়।

তাহমিনা জোর করে চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইল আবিদের শরীর থেকে। কিন্তু পারল না। আগের চেয়ে, এই প্রথম তার চোখে যেন পড়ল, অনেক কৃশ হয়ে গেছে আবিদ। আর ওর ডান পায়ে কি সেই দুর্ঘটনার চিহ্ন এখনো আছে ? ও কেন একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে ? ক্ষোভ হলো ঈশ্বরের ওপর, কেন তিনি ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিলেন না ?

হঠাৎ চমক ভাঙল তার, এ কি ভাবছে সে ? এ কথা তো স্বপ্নেও সে কোনদিন ভাবতে চায় নি। চিরদিনের মত সে ভুলে যেতে চেয়েছিল সেই ব্যর্থ দিনগুলোর ইতিহাস। কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইলো তার আত্মা। আত্মার গভীর থেকে কে যেন কেবলি অশান্ত পাশ ফিরছে তাকে আরো অশান্ত করে দিয়ে।

একটু কেঁপে ওঠা গলায় জোর করে সে উচ্চারণ করল, তুমি চলে যাও। চলে যাও।

ঘুরে দাঁড়াল আবিদ। যেন সে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে এই কথারই অপেক্ষা করছিল।

না— না তোমার পায়ে পড়ি আবিদ—

আর সে বলতে পারল না, কিম্বা বলবার হয়ত এরপর কিছুই নেই তার। তাহমিনা ছুটে গিয়ে বিছানায় বালিশে মুখ লুকোলো। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। কেন— কেন সে তাদের দুজনকেই ভালোবাসতে পারে না? ফারুক আর— আর আবিদ। তার সমস্ত হৃদয় যেন কথা হয়ে তার অবাধ্য এই কণ্ঠের আশ্রয় মিনতি করলো— আবিদ, তোমাকে আমি ভালোবাসি। আবিদ, আমি তোমারই। একটুপর এক আশ্চর্য নির্ভরতার মত তাহমিনা তার কান্নাশরীরে অনুভব করলো আবিদের কম্পিত করতল।

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা
মার্চ ১৯৫৬



# এক মহিলার ছবি

নাসিমা ভাবলো, এখন নাইতে পারলে অনেকটা সুস্থ অনেকটা হাল্‌কা বোধ করতে পারত সে। যখনি সে গেছে যেখানে, নাইবার সুবিধে না থাকলে টিকতে পারেনি এক মুহূর্ত। পালিয়ে এসেছে। পালিয়ে এসেছে সারাটা গায়ে অদৃশ্য কাদার, থুতুর আলপনা নিয়ে। পালানো, শুধু পালানো। এক শহব থেকে অন্য শহরে, এক মানুষ থেকে অন্য মানুষ, তৃষ্ণায় শুধু তৃষ্ণায়।

থুতু আর থুতু। গান নেই, প্রীতি নেই। কাদা আর কাদা।

আরজু ঢাকায় থাকলে তাকে সে কপালে চুমো খেত তার এই বাসার জন্যে, যেখানে তুমি নাইতে পারো ঘণ্টার পর ঘণ্টা— হাত পা প্রচুর এলিয়ে, কুয়াশা কাচের ভেতর দিয়ে আসা দুধ-রোদে সারাটা শরীর ডুবিয়ে—ঠাণ্ডায়, আরো ঠাণ্ডায়।

কিন্তু ঘণ্টা দু'য়েকও হয়নি সে দিনের দ্বিতীয় অবগাহন সেরে ফিরেছে। তাছাড়া সময়টাও শীতের মাঝামাঝি। তাই তৃতীয়বার তাকে এই লোভনীয় শীতলতা টানলেও নাসিমা দ্বিধা করলো। তবু নাসিমা আবার নাইতে গেল। ফিরল যখন, তখন টেবিল ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেছে।

নতুন করে আবার প্রসাধন করতে বসলো সে।

আরজুর রুচি আছে, আছে রুচি মেটানের জন্যে উদার স্বামী। ইউনিভার্সিটির ক্লাশ পড়ানো ছাড়াও যার আরেকটা কাজ আরজুকে ভালোবাসা।

আচমকা গলায় হাত থেকে পাউডারের তুলিটা কেঁপে গেল।

মতির মা দরোজার কাছে উঁকি দিয়ে বলছে, চা দেব ?

প্রশ্নটা আবার করে মতির মা। কোরে, মিষ্টি মিষ্টি হাসে। এ হাসিব অর্থ প্রথম দিনেই জানা হয়ে গেছে নাসিমার। বলতে চায় কৌতুকে—আবার নেয়েছ তুমি?

নাসিমা আখতার, ডুব দাও আরো অতলে।

আজ আটদিন হলো ঢাকায় আরজুদের এখানে সে উঠে এসেছে। আর সে পৌছুবার ঠিক পরদিনই কক্সবাজার চলে গেছে আরজু, তার স্বামী আর বাচ্চা মেয়েটা। নাসিমা এসেছিল হঠাৎ কোনো খবর না দিয়ে, তাই আরজুদের বেরুনোর তারিখ বদলানো সম্ভব হয়নি। আরজু বলেছিল, তুই থাক, আমরা দিন দশেকের বেশি থাকব না। তারপর গল্প করা যাবে, কী বলিস? তুইতো আমাদের এমন ভুলে গেছিস যে তিন বছরে একটা খবরও নিসনি। না, না, তুই যেতে পারবিনে। ঢাকায় এসেছিস, আমার এখানেই থাকবি। আগে জানলে আমরা না হয় দু'দিন পরেই যেতাম। উনি সব টিকিট-ফিকিট কিনে ফেলেছেন। একলা থাকতে পারবি না?

আরজুও জানে, নাসিমাকে প্রশ্নটা করা শুধু কিছু একটা বলার জন্যেই। একাকীত্বে যার জন্ম-সহোদর এ প্রশ্ন তার কাছে অর্থহীন। তবু সে বলেছে, পারব। কেন পারব না ?

বরং এতে খুশিই হয়েছিল নাসিমা। এই ভালো হলো। সারাটা বাড়িতে একটা সাজানো সংসারে সে একা থাকবে— হোক মাত্র কয়েকদিনের জন্য—এই ভালো হলো, এই মুক্তিই সে তার ঈশ্বরের কাছে চেয়েছিল আজ— করাচি থেকে তার প্লেন যখন লাফিয়ে উঠেছিল আকাশে, সেই তখন থেকে। সমস্ত বাড়িঘর পৃথিবী আর ঘাস পায়ের তলায় বিন্দুলীন হয়ে যেতে যেতে তাকে যেন পাঠিয়ে দিচ্ছিল এমনি একটা পরিবেশে, যেখানে কেউ তাকে জানবে

না, যেখানে যারা চেনা তারাও যাবে চলে, যেখানে তাকে একটা একটা করে সমস্ত কিছু ক্লান্ত দু'চোখ দিয়ে আবিষ্কার করে নিতে হবে।

নাসিমা তখন চোখ ভরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরজুর সারাটা সংসার দেখার প্রেরণা অনুভব করেছিল। যে দ্রুত আকাশযান তাকে নিয়ে এসেছে এই দীর্ঘপথ ঠিক তারই মত অনায়াস একটা ধাতবগতি সঞ্চারিত হলো তার অনুভূতিতে— সে অনুভূতি চলেছে দ্রুত কিন্তু তার প্রেক্ষিত অপসারিত হচ্ছে মেঘমন্থর রীতিতে।

ডুব দাও অতলে, আরো অতলে।

এরোপ্লেন আকাশপথে তার দিশারী নীলরেখায় পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সিটবেল্‌টা খুলে ফেলল নাসিমা আখতার। অদ্ভুত একটা শিরশির সুরভি জড়ানো ঠাণ্ডা হাওয়া সারাটা প্লেনের গহ্বর আচ্ছন্ন করে আছে। আর একটানা একটা ধ্বনি, নাসিমার হৃদস্পন্দনের মত ধুকধুক, নিয়মিত, দায়িত্বশীল।

নাসিমার পাশের সিটে বসেছে বছর এগারোর একটা ছেলে। মাথায় বাদামি রঙ চুলের দুষ্টুমি ছেলেটার রক্ত উজ্জ্বল সারাটা মুখের সঙ্গে প্রীতিময় হয়ে আছে। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, চোখ ফিরিয়ে নেয়া যায় না। এয়ারপোর্টে ছেলেটাকে তুলে দিতে এসেছিল বোধ হয় কোন নিকট আত্মীয়। অনর্গল কথা বলছিল ছেলেটা তার সঙ্গে। সেই তখনই নাসিমার চোখে পড়েছিল। এখন বসেছে ঠিক তার পাশে। আত্মীয়টি তাকে টফি কিনে দিচ্ছিল আর মাথায় আঙ্গুল দিয়ে ব্রাশ করছিল তার। নাসিমা একটা মোচড় অনুভব করছিল তার বুকের ভেতর। ছেলেটার দ্রুত দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলা টফির সিলোফেনের মত তার হৃদয়ের পর্দাগুলো যেন কোথাও একটা অদৃশ্য হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল।

প্লেনে ওঠবার যখন সময় হলো তখন, না তখন নয় তার কিছু আগেই, ছেলেটা কেমন নিভে গেল। আত্মীয়টি আধো উবু হয়ে তার কানের কাছে মুখ রেখে বলল, ডোন্ট ক্রাই বব, ইউ আর গোয়িং টু ইওর ড্যাড— উওর নিউ মম্—ইওর ফাদারস বিগ ব্রাদারস গার্ল—দে আর ওয়েটিং ফর ইউ। ডোন্ট ক্রাই, ডোন্ট ক্রাই।

ছেলেটার চোখে আঙটির পাথরের মত অশ্রু টলটল করছে।

নাউ বি এ ব্রেভ বয়। সে গুডবাই। নাউ—ডোন্ট লুক ব্যাক—গো অন।

ভিড়ের ভেতরে ডুবে যেতে যেতে নাসিমার মনে হলো, ছেলেটা কি পেছনে তাকিয়েছিল? কিন্তু ফিরে সে দেখল না। ডোন্ট লুক ব্যাক। নাসিমা প্লেনের গহ্বরে চলে যেতে যেতে একবারও তাকায়নি পেছনে। আমরা কেউ কখনো তাকাই না অতীতের অন্ধকারের দিকে। কিন্তু অতীত তার দুই গভীর চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে আমাদের চলমান মিছিলের দিকে। বিন্দু বিন্দু ঘাম নাসিমার কপালে একসার ফৌজের মত স্থির হয়ে থাকে। প্লেন তখন টেক-অফ্ করছে। সারা শরীরে হঠাৎ একটা শূন্যতা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাসিমা মুহূর্তের জন্য নিজেকে যেন ফিরে পেল। মনে হলো, এমন একটা শূন্যতার বিনিময়ে সে আজ তার সমস্ত দুয়ার খুলে দিতে পারে। এই অতল শূন্যতা দিয়ে বাহিত হয়ে যাওয়া অনেক ভালো, মাটিতে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণার তীরে রক্তাক্ত হওয়ার বদলে।

নাসিমা আখতার আবিষ্কার করে এই বিরাট্ ধাতব পাখির প্রাণ-যন্ত্রের সঙ্গে তার হৃদস্পন্দন

এখন এক, অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেছে। এ এক অদ্ভুত আত্মীয়তা, এর কোনো ইতিহাস নেই, আজই যেন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হলো এই আত্মীয়তার সূত্র। চলছে, এগিয়ে চলছে। হ্রদে ঢেউয়ের মত চলছে তারা। সমস্ত যান জুড়ে কাঁপছে একটা মৃদু তরঙ্গ। আর তেমনি তরঙ্গ কাঁপন তুলছে আমার চেতনায়। এখন, এই মুহূর্তে, যদি সে থেমে যায় তাহলে নির্বাপিত হবো আমিও। আমি বিশ্বাস দিয়েছি এই আকাশযানকে।

কিন্তু দিয়েছে কি সবাই? প্রতিটি যাত্রী? সুখী মসৃণ মানুষের ভিড়। নাসিমা দৃষ্টি করে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি, যেখানে মুঠোর মত প্যাসেজটা সরু হয়ে এসেছে।

নাসিমার মনে হলো একপাল ভিন্ জাতের প্রাণীদের ভেতরে কেউ তাকে জোর করে পুরে দিয়ে দরোজা দিয়েছে সেঁটে।

একমাত্র পাশের ছেলেটা কী সূত্রে তার মনের কাছে আপন হয়ে উঠেছে তা সে নিজেই জানে না। ছেলেটা তখন জানালা দিয়ে অপসৃয়মাণ নিচের পৃথিবীকে তাকিয়ে দেখছে টফি খেতে খেতে। নাসিমার মনে হলো পৃথিবীর সুন্দরতম একটা ড্রয়িং ঈশ্বর ধরে রেখেছেন। পাশ দিয়ে হোস্টেস যাচ্ছিল। নাসিমা তাকে ডাকলো। পলকে সুন্দর মুখখানা ফিরিয়ে স্বচ্ছ গলায় শুধালো একটু ঝুঁকে পড়ে, ইয়েস মাদাম। নিড এনি হেল্প।

নাসিমা তাকে আদৌ ডেকেছিল কি? আর যদি ডেকেই থাকে, তাহলে হয়ত সে শুধোতে চেয়েছিল, সে ভাবলো— যদি প্লেনটা হঠাৎ জ্বলে ওঠে, আগুন ধরে যায়, তাহলে— তাহলে— কী হবে হোস্টেস?

তাহলে তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে এই অসীম মনে রাখার দায় থেকে, আর পাথরের মত এক মুহূর্তে জমে কঠিন হয়ে যাবে রক্তঝরার অদৃশ্য সেই উৎস।

মনের ভাবনাটা কখন কথা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে নাসিমা বুঝতে পারেনি। বিস্ফারিত চোখে সে শুধু দেখল, সে হোস্টেসের দুই বাহুমূল শক্ত মুঠোয় ধরে আছে। আর সেই সবুজবসনা নত হয়ে আস্তে আস্তে তার পায়ের কাছে বসে শুধোচ্ছে, ডিড ইউ সে সামিং মাদাম?

নো। নো আই হ্যাভ্ন।

নাসিমার ঠোঁট কাঁপতে থাকে। একটু পরে বলে, আই নিড স্লিপিং ট্যাবলেট্স— দ্যাটস অল। ক্যান ইউ গেট মি সাম?

ইয়েস, অফকোর্স।

পায়ের তলায় পৃথিবীর একশো আশি ডিগ্রী *ব্যাপ্তি* কেবলি পেছনে সরে যাচ্ছে। আর আমার ফুসফুসে যন্ত্রের বানানো বাতাস। ধাতব পাখির যে অবিরাম গর্জন ছিল যাত্রার শুরু থেকে তার সহচর, একটু আগে তা কোন জাদু বলে যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। হোস্টেস চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই গর্জনটা যেন দ্বিগুণ হয়ে চিতাবাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল নাসিমার শ্রুতিতে।

পাশ থেকে ছেলেটা হঠাৎ শুধালো বাদামি চোখ চঞ্চল করে, আর ইউ স্কেয়ার্ড?

হাসলো নাসিমা। হাসির রেখা তার মুখাবয়বকে নতুন করল।

নো, আই অ্যাম নট, ডার্লিং।

বাট শি সেড্— ছেলেটা মুখ ঘুরিয়ে স্লিপিং ট্যাবলেট নিয়ে আগতা হোস্টেসকে ইঙ্গিত করল— ইউ আর।

নাসিমা ধন্যবাদ জানিয়ে ট্যাবলেট আর পানি নিল হোস্টেসের হাত থেকে। তারপর হোস্টেস চলে গেলে ফিসফিস করে বলল, শি লাইজ।

ছেলেটা কৌতুকে হেসে উঠলো। নাসিমা শুধালো, বাট ইউ আর নট স্কেয়ার্ড।

হঠাৎ একটা দায়িত্ব ফুটে উঠলো ছেলেটার কণ্ঠে, নো। মাই আঙ্কল সেড্ আই অ্যাম এ ব্রেভ বয়।

বাট ইউ আর, ডার্লিং।

তাহলে লোকটা ওর চাচা, কিংবা মামা, কিংবা ফুফাও হতে পারে। আস্তে আস্তে কথা জমে উঠলো ছেলেটার সঙ্গে নাসিমার। ডাক নাম— বব, ভালো নাম আসাদ রেজা চৌধুরী। ববের বাবা ঢাকার নামকরা ব্যারিস্টার। সেই ইনে থাকবার সময় বিয়ে করে এনেছিলেন বিদেশিনীকে। কিন্তু দেশে ফেরার বছরখানেকের মধ্যেই প্রকট হয়ে উঠল একটা ফাটল-চিহ্ন দিনে দিনে। লন্ডনে ফিরে গেল ববের মা দু'বছরের ববকে নিয়ে। বিদেশিনী এবার বিয়ে করলো তার স্বদেশেই। আট বছর বয়সে বব এলো করাচিতে আঙ্কলের কাছে। তার বাবার চাচাতো ভাই। নতুন ড্যাড তাকে একটুও ভালোবাসত না। কিন্তু মা পাঠাতে চায় নি ব্যারিস্টার চৌধুরীর কাছে, কেননা সেও ততদিনে দ্বিতীয়বার স্ত্রী নিয়েছে। অবশেষে করাচির নিঃসন্তান আঙ্কল কোলে তুলে নিয়েছে ববকে।

নাসিমা বুঝতে পারে, বাবা তাকে আজ ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে ধরে রাখতে পারেনি। বব বলল, আই উইল কাম ব্যাক টু মাই আঙ্কল। আই হেট মাই ফাদার। আই হেট হিম। অভিমানে ববের চোখ সজল হয়ে উঠলো। চোখ নামিয়ে সে সমুখের ছাইরঙা কুশনে লাথি ছুঁড়তে লাগলো আস্তে আস্তে।

আর নাসিমা তার পায়ের দিকে তাকিয়ে পাথরের মত বসে রইলো। একটু পরে বব সিটে হেলান দিয়ে নাসিমার উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে রইলো এতটুকু একটা পাখির মত।

ঘুম এলো না নাসিমার। দু'চোখ ভ'রে শুধু ঘুমের আর্তি। আর কিছু নয়। চব্বিশ বছর বয়সে যখন তার বিয়ে হয়েছিল সেই লোকটার সঙ্গে, তখন থেকে ঘুমের ওষুধ তার অভ্যেস হয়ে গেছে। আজকাল তিনটে ট্যাবলেট না হলে নাসিমার ঘুম আসে না। কিন্তু হোস্টেস দিয়ে গেছে একটা। শুধু একটা। এতে এমনকি তন্দ্রাও এলো না তার। কেবলি পেছনে ফেলে আসা। গ্রাম, ফসল, শহর আর পার্কের বৃক্ষবীথি আর ক্লিফটনের বালুকাবেলা। বব, ইউ আর এ ব্রেভ বয়— বব, ইউ আর গোয়িং টু ইওর ড্যাড—বব—বব।

বব। ডাকলো নাসিমা।

তাকিয়ে দেখল বব নিস্পন্দ পড়ে আছে। শিথিল হয়ে এসেছে তার সারাটা শরীর। সমস্ত মুখে একটা অভিমান ফসিল হয়ে আছে।

চোখ বিস্ফারিত হয়ে এলো নাসিমার। তলিয়ে গেল এঞ্জিনের গর্জন। তার হৃদপিণ্ড কে যেন ছুঁড়ে ফেলে একতাল বরফ গুঁজে দিল বুকের ভেতর। নাসিমা চিৎকার করে উঠল, বব ইজ ডেড।

ঝনঝন করে চারদিকে বেজে উঠলো সেই কণ্ঠ .

যাত্রীদের সচকিত চোখ উৎস খুঁজে বের করার আগেই ছুটে এলো হোস্টেস।

হি ইজ ডেড্। আস্‌ক দেম টু স্টপ দ্য ফ্লাইট'।

ববের বুকে হাত রেখে হোস্টেস ধীর কণ্ঠে উচ্চারণ করল, দ'বয় ইজ স্লিপিং।

তারপর ববকে আরো ভালো করে শুইয়ে ডান হাত তার পাঁজরের চাপ থেকে বের করে বুকের ওপর বিছিয়ে দিয়ে হোস্টেস সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, আই অ্যাম সরি, ইউ নিড রেস্ট, মাদাম।

হ্যাঁ, আমার বিশ্রাম প্রয়োজন। আর বিস্মৃতি। কিন্তু স্মৃতি ছড়িয়ে পড়ে অন্ধকারের মত— বিন্দু বিন্দু করে সমস্ত কিছু সে তার লোমশ ধূসর থাবায় তুলে নেয়।

থুতু আর কাদা। তবু তৃষ্ণা।

আমাকে ভুলে যেতে দাও। আমি বড় ক্লান্ত। জীবন নয়, মৃত্যু নয়— আমি আর কিছুতেই বাঁচি না। আমি শুধু প্রবাহিত হতে পারি এই দীর্ঘ বাতাসের করতালি পেরিয়ে, বাসনার চতুরালিকে তুচ্ছ করে— অথবা না পেরিয়ে, অথবা তুচ্ছ না করে, কেননা কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

আরজুর সংসার আবিষ্কার করার কাজটা টিকে ছিল মাত্র একটা দিন। ওদের চলে যাওয়ার পর দিনটাই শুধু। সেই একটা দিনে দেখা হয়ে গেছে সব— ভেতর বার, অন্তরংগ, ইতস্তত সব কিছু। এমনকি এ বাসার প্রতিটি কোণ তার চেনা হয়ে গেছে। পুরনো হয়ে গেছে। মনে হয়েছে যেন তার জন্মের পর থেকে আজ এই বত্রিশটি বছর সে কাটিয়ে দিয়েছে এখানে। অথচ একাকীত্বের প্রথম মুহূর্তটা মনে হয়েছিল হঠাৎ পাওয়া একটা গিনির মত।

আরজু তার মেয়েকে নিশ্চয়ই আদর করে মাত্রারও বেশি, নইলে এত কাপড় থাকে অতটুকু চার বছরের মেয়ের? আর এত খেলনা? কাপড়গুলো আলনায়, এখানে সেখানে স্তূপ স্তূপ হয়ে আছে পাঁচমিশোল রঙের ছোপের মত। দূর থেকে চোখে পড়ে। আর কী ঠাণ্ডা! একবার হাতে করে দেখেছিল নাসিমা। একটা গোলাপি ফ্রক এত মুড়মুড়ে সিল্কের তৈরি যে, আলতো করে হাতে তুলতেই খসখস করে পড়ে গেছে মাটিতে। আবার আরেকটা সবুজে চুমকি বসানো চাঁদের অনুকরণে। আরেকটা কাচের মত স্বচ্ছ আর অনুভব কাগজের মত। লাল, রক্তিমাভ, ভায়োলেট। আরো, আরো, আরো।

খেপে ওঠা দু'হাতে নাসিমা সবগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে জড়ো করেছিল মেঝের মাঝখানে। কী সে বিতৃষ্ণা তাকে ভর করেছিল কে জানে। কেবলি থেকে থেকে কে যেন মনের ভেতর বলছিল— নোংরা, বিশ্রী, জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে ফ্যালো। কেন?— কেন থাকবে এখানে এগুলো? কিন্তু কোথায় যে হবে তার স্থান, তাও স্পষ্ট নয় তার কাছে।

কাপড়গুলো একটার ওপর আরেকটা পড়ে যেন কিলবিল করতে থাকে নাসিমার চোখের সমুখে। তারপর কী মনে হয়, আগের চেয়েও দ্রুত দু'হাতে সব গুছিয়ে রাখে আলনায়। একটা ক্লান্তি, শরীর থেকে শক্তির একটা অপচয় অনুভব করতে করতে নাসিমা পড়ে থাকে বারান্দায় আরাম চেয়ারে।

তারপর থেকে মনটা যেন মরে গেছে ওই আলনায় রাখা কাপড়গুলোর জন্যে। যেন আর চোখেই পড়তে চায় না নাসিমার।

সেদিন নাইবার জন্য প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। সেদিন সময়টা ছিল ভর সন্ধ্যে। মনের অরণ্যে যে বিরাট গাছ তার সহস্র শেকড় প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে হোঁচট খেলে তার ত্বক শিরশির করে ওঠে। তখন নাইতে হয়। ঠাণ্ডা পানির ধারায় নিজেকে শীতল করে তুলতে

হয়। এক সময়ে যখন আর কোনো স্পর্শের বোধ থাকে না তখন সে উঠে আসে।

সেদিন নেয়ে এসে নিজের কাপড় বাছতে বসলো। কোনটাই টানলো না তাকে। তখন উঠে এলো আরজুর ওয়ার্ডরোবের কাছে। বেছে বেছে বার করল মাখনের মত নরোম, মুঠো করলে এতটুকু, দুধ শাদা, পাড়ছাড়া একটা শাড়ি। মনটা যে হঠাৎ শুদ্ধ সুন্দর হয়ে উঠেছে, তার প্রতীক করে পরলো শাড়িখানা। কোমল ভেলভেটের লাল চটি দিল পায়ে। বাতাসের মত লঘু গতিতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল নাসিমা।

আহ, কী সুন্দর ফুল ফুটেছে আজ ওই লতানো গাছটায়! আরজুর যে ফুলের শখ তা কি জানতো নাসিমা? হয়ত এই তিন বছরের অসাক্ষাতের ব্যবধানে এই শখটা হয়েছে আরজুর। মনে আছে— সেই তারা যখন কলকাতায় পড়ত কলেজে, কী এলোমেলো কাঠ-কাঠ ছিল মেয়েটা। প্রথম দিন এসে হস্টেলের ডরমিটরিতে থাকতে হয়েছিল আরজুকে। চাদরটা ময়লা ছিল ওর, নাসিমা তার নিজের ফুলতোলা চাদর ট্রাঙ্ক থেকে বের করে দিয়েছিল। সেইদিন থেকে ভাব। আরজু বলেছিল চোখ গোল করে, এত বড় ফুল চাদরে? কে করেছে ?

কে আবার? আমি করেছি।

কথাটা মিথ্যে। বউবাজার থেকে শখ করে কিনেছিল সে একদিন।

ততক্ষণে আরজু শুয়ে পড়েছে বিছানায়। নাসিমা শুধিয়েছিল চোখে কৌতুক নাচিয়ে, কী, পিঠে ফুটছে?

উহুঁ।

ফুটলোই বা। ফুল তো। তোমার ফুল ভালো লাগে না?

না।

সত্যি মেয়েটার সখ বলতে কিছু ছিল না তখন। ফুটপাথ থেকে কতদিন রিকশা থামিয়ে নাসিমা কোলভরে ফুল কিনে এনেছে। তার থেকে কয়েকটা স্তবক হয়ত শোভা পেয়েছে আবজুর শিথানে, কিন্তু সে নিজে কোনদিন সাগ্রহ হয়নি ফুলের জন্যে। বরং নাসিমা যখন বলত, একদিন ফুল না হলে, জানিস আরজু, মনে হয় কী একটা যেন হারিয়ে ফেলেছি। ভিতরটা কেমন হাহাকার করতে থাকে সব সময়। লোকে মদ খায়, রেস খেলে, আর আমার নেশা ফুল।

তখন একটু বাড়াবাড়ি ঠেকত আরজুর।

আজ আরজুর লতানো গাছে ফুল ধরেছে, শাদা শাদা ফুল। শাদা শাদা সুগন্ধের অস্পষ্ট কুচি। বুক ভরে ঘ্রাণ নিল নাসিমা।

মতির মা এসে বলল, একটা চেয়ার পেতে দেব আপামণি?

দে, আর ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিস।

আলো নিভিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে ভিজে গেল বারান্দা। আর শাদা শাড়িটা ম্লান হয়ে এলো কুয়াশার মত।

মনের ভেতরে সাবেকি মেঘের যেন ঢল নেমেছে।

বসে বসে গল্প করতে ইচ্ছে করছে মতির মা-র সঙ্গে। একটা মধুর বাঙালপনা তাকে পেয়ে বসছে আস্তে আস্তে। আজ আমার নতুন জন্ম, এক মুহূর্ত আমি বাঁচবো, তারপর আবার আমি মরে যাবো।

নাসিমা আবছা গলায় বলল, মতির মা, ফুল ফুটেছে দেখেছিস? ছিঁড়ে দিবি ক'টা?

রাতে ফুল ছিঁড়তে বারণ যে।

থাক বারণ, তুই দিবিনে? না বাপু, ঝগড়া করতে পারিনে।

অগত্যা মতির মা-কে উঠতে হয়। একমুঠো ফুল চয়ন করে হাতে দিয়ে বলে, এই নাও। বেশ বাস ছড়িয়েছে।

কয়েকটা ফুল ওর হাতে নিয়ে নাসিমা বলে, মাথায় পরিয়ে দে।

আর বাকিগুলো দু'হাত ভরে কোলের কাছে রাখে। শরীর বেয়ে লতিয়ে উঠতে চায় ঘ্রাণ। ভীষণ প্রস্তুত মনে হয় তার নিজেকে। আমাকে তুমি তোমার দৃষ্টি দিয়ে স্পর্শ কর, আমি আজ ফলসম্ভবা। যোজন দূর থেকে তুমি আজ আমাতে সঞ্চারিত হও।

মতির মা স্তব্ধতা ভেঙে বলল, আপনার সোয়ামি নাই আপামণি?

তোর কী মনে হয়?

নাই।

থাকলে বুঝি তার কাছে হাত ধরে আজ পাঠিয়ে দিতি আমাকে?

রসিকতায় মুখর হয়ে ওঠে মতির মা। সত্যি বলছ আপামণি, নাই?

স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে বেঁচে, বিষে জর্জর মন নিয়ে সার্কাস-রো-তে এসে নাসিমা ছিল কিছুদিন। সার্কাস রো-তে থাকত তার বড় ভাই হামেদ। তখন একটা শহরের জন্যে মনটা ভীষণ রকমে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল— যে শহর হবে অনেক বড়, যেখানে থাকবে অনেক আলো, আর অনেককাল আগের পুরনো সব চেনা মানুষ। কলকাতায় তাই এক সকালে এসে হাজির হলো নাসিমা আখতার।

আসামের লাবু চা বাগান থেকে কলকাতা। শেয়ালদায় নেমে নাসিমা রক্তের ভিতর গতির একটা উন্মাদনা, শুধু কণ্ঠ আর শব্দের প্রপাত অনুভব করেছিল।

নাসিমা জানতো না হামেদ কঠিন অসুখে ভুগছে। থেকে থেকে রক্তবমি করে আর পেটে তীব্র একটা ব্যথা।

ছ'মাস হলো বিয়ে হয়নি এরই মধ্যে কোনো জানান না দিয়ে নাসিমাকে আসতে দেখে হামেদ বিস্মিত হয়। অসুস্থতায় কোটরাগত দু'চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে প্রশ্নে, চলে এলি যে? বেড়াতে?

না। বেড়াতে আসিনি। তোমার অসুখটা বেড়েছে আমাকে জানাও নি তো?

হামেদ বিছানা থেকে আধো উঠে বসে বলে, জানিয়েছিলাম। চিঠি পৌঁছোয় নি হয়ত। কিন্তু তুই এলি কেন?

জানিয়েছিল? তাহলে সে চিঠি তাকে দেয়া হয়নি। লাবু চা বাগানের ম্যানেজার, তার স্বামী— *সে চিঠি তার হাতে দেয়নি। হঠাৎ পুরনো কথাটা মনে পড়াতে নাসিমার সারা শরীর* ঘৃণায় শিহরিত হয়ে উঠলো। জিভটা অশান্ত হয়ে উঠতে চাইল— তুমি একটা পশু— উচ্চারণ করবার জন্যে। নাসিমা মুখে বলল, ভাবী কই? দেখছিনে।

রায়টের জন্যে চুঁচড়োয় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আর আনা হয়নি।

আর একা তুমি অসুখে এখানে মরছ?

এতক্ষণে ম্লান হাসলো হামেদ। বলল, একা কই? তাছাড়া আমার ট্রিটমেন্ট দরকার, তাই কলকাতায় পড়ে আছি।

চাকর বাকর কেউ নেই?

আছে, থাকবে না কেন? নূরুকে তুই বোধ হয় দেখে গিয়েছিলি। ও-ই আছে।

বলতে বলতে হয়ত ব্যথাটা উঠে থাকবে হামেদের। ঠোঁটের দু'পাশে শক্ত একটা কুঞ্চন পড়ল এক মুহূর্তের জন্যে।

নাসিমার হাসি পেল— হামেদও একা থাকতে চায়। তুমি আমার সহোদর। আজ নতুন করে তোমার সঙ্গে আমার নাড়ির যোগ হলো।

নাসিমা বিছানার পাশ থেকে উঠে আসতে আসতে বলল, এখন থেকে আমি কলকাতায় থাকব। তোমার এখানে।

বিকেলে বেরিয়ে নাসিমা খুঁজে খুঁজে প্রথমেই পেল বিনতাকে। বিনতা আজো তেমনি সুন্দর আছে, তেমনি গৌর, সজ্জায় তেমনি নিপুণ। একটা লাল পেড়ে মিলের শাড়ি পরেছে। মাথায় একটু সিঁদুরের আভাস। আর খালি পা দু'খানা মেঝের সঙ্গে প্রীতিময় হয়ে আছে। সব মিলিয়ে বিনতার অপূর্ব শ্রী মুগ্ধতাকে আহরণ করল।

বিনতা তাকে দেখে খুশি হয়ে উঠলো। মোড়ায় বসে মাই দিচ্ছিল খোকাকে, কাপড় টেনে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ওমা, বেঁচে আছিস তুই?

তুই কি মনে করেছিস, মরে গেছি! তোর খোকা?

মাই টানছে দেখতে পাচ্ছিস না!

বিনতা খোকার দিকে স্নেহদৃষ্টি করে। প্রশ্ন করে, তোর বুঝি হয়নি?

না।

লাবু চা বাগানে ফেলে আসা ঘৃণা তাকে শিহরিত করল আবার। স্খলিত কণ্ঠে একটু পরে সে যোগ করল, আমি চাই না। — তারপর তোর কী খবর বল।

ভালো। সব ভালোই।

গান?

আজকাল আর গাই না।

তারপর একটু হেসে খোকাকে মেঝেয় বসিয়ে বলল, গাইব কী? এই নিয়ে তিনটে হলো, এখন এরাই আমার আর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যেন ডাক্তার শুনছে রোগীর বিবরণ এমনি একটা মনোযোগ ধরে রাখে নাসিমা। বলে, তাই বলে গান ছেড়ে দিবি?

দিলাম।

সহজ কণ্ঠে বিনতা কথাটা বলে। বলে হাসতে থাকে।

সুবোধবাবু— সুবোধবাবু কিছু বলেন না?

সুবোধকে অনেকদিন আগে দেখেছিল নাসিমা। চেহারাটা স্পষ্ট করে মনে নেই। কেবল মনে আছে নাকের নিচে একটা কালো তিল ঢাকবার জন্যে ভদ্রলোক মোটা করে গোঁফ রাখতেন।

সেই নিয়ে বিয়ের পর বিনতার কৌতুকের অন্ত ছিল না।

বিনতা বলে, সুবোধবাবু কী বলবেন? দোষটা কি তারই নয়?

কেন?

একটা স্পষ্ট আশঙ্কা কালো হয়ে ওঠে নাসিমার চোখে।

কেন আবার? ওর জ্বালাতেই তো এত দুর্ভোগ। নইলে থাকতাম ঝাড়া হাত পা। এত কষ্ট করে বাবা গান শিখিয়েছিলেন, শেষ অবধি দেখতাম।

নাসিমার তবু মনে হয় বিনতা অসুখী নয়। যে বিনতা এককালে এত ভালো গান গাইত, যার গান শুনে ইউনিভার্সিটির ছেলেরা ভিড় করত এক সময়ে চারপাশে, সেই বিনতা গান ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দেয়ার খেদ যতটুকু আছে কণ্ঠে, মনে তার ছায়াটুকুও নেই।

নিঃশ্বাস ছেড়ে নাসিমা বলল, বেশ আছিস তুই।

আর তুই? চা বাগানে যেতে আমার এত শখ। নিয়ে যাবি একবার?

বলতে পারে না নাসিমা, আমি আর কোনদিন সেখানে ফিরে যাবো না, বিনতা।

বিনতা বলে, বাইরেই বসে থাকবি নাকি? চল, ভেতরে চল। আমার শেষ রেকর্ডখানা তুই বোধ হয় শুনিসনি। শুনবি চল।

নাসিমা ওর সঙ্গে উঠে আসে শোবার ঘরে। খোকা তার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দুর্বোধ্য 'ম্-ম্-ম্' করতে থাকে। বিনতার কাঁধ লালা দিয়ে বার্নিশ করে দেয়। ভারী দুষ্টু হয়েছে তো!

কী নাম রেখেছিস ওর?

চপল।

বাপের মত হয়েছে দেখতে?

কী জানি।

চোখ আর থুতনিটা কিন্তু তোর মত।

তাই নাকি?

ঘরের ভেতরে ঢুকে নাসিমা বলে. বেশ সাজিয়েছিস তো।

কী আর এমন! একটা ভালো বাসাই পেলাম না আজ অবধি।

এটাই বা মন্দ কী।

দূর। বাসা হবে বাসার মত— ছবির মত। চোখভরে দেখতে ইচ্ছে করবে। বোস চেয়ারটায়। খোকাকে একটু নিবি?

নাসিমা হঠাৎ লজ্জিত হয়ে যায়। সাপটে ধরে চপলকে কোলে নিতে গিয়ে টাল খেয়ে পড়ে। বিনতা গ্রামোফোনে চাবি দিতে দিতে বলে, দেখিস হিসু করে না দেয়।

দিলেই বা।

চপল কোল থেকে নেমে যায়। নেমে গিয়ে মেঝেতে হামাগুড়ি দেয়। হঠাৎ ধাবিত হয় এক টুকরো কাগজের দিকে।

বিনতা কাঁটা বসাতে বসাতে কাঁধ তুলে বলে, শোন।

ভক্ত কবিরের গান।

আমার হৃদয়কে আমি তুলে ধরেছি তোমারই গানে। আমার আর কোনো সাধ নেই। স্বপ্ন নেই, আমি তোমাতেই।

মিথ্যে, সব মিথ্যে। কখন যে সে ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল বুঝতে পারে নি। বিনতার কণ্ঠস্বরে সে চোখ তুলে তাকাল। বিনতা বলছে, কেমন শুনলি, বললি না কিছু?

ভাবছি, গান ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছিস মস্ত।

হবেও বা।

ঘরের কোণে বিনতার তানপুরো ঠেস দিয়ে রাখা। মমতা দৃষ্টিতে সেদিকে বিনতা একবার তাকাল। পরে বলল, এসে অবধি আমাকে নিয়েই পড়েছিস তুই। তোর কিছু বল।

কিছু বলার নেই, তাই।

হঠাৎ গভীর চোখে বিনতা তাকে দৃষ্টি করে। বলে, তোর কী হয়েছে বলতো? এত রোগা হয়ে গেছিস।

কই, কিছু না। চিরকাল মানুষ এক রকম থাকে নাকি।— বাইরে যাস না আজকাল?

খুব কম।

চল, আমার সঙ্গে বেরুবি। দু'জনে মিলে মজা করে বেড়ানো যাবে। কলকাতা এত নতুন ঠেকছে, কেউ সঙ্গে না থাকলে হয়ত পথই হারিয়ে ফেলব।

সুবোধবাবু ফিরলেন একটু পরেই। নাসিমাকে দেখে মুখর হয়ে উঠলেন। নাসিমার মনে হলো অনেকদিন পরে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে যেন সে। আর পেছনে পেছনে বিনতার বড় মেয়েটা আর মেজ ছেলে।

তারা যখন বেরুচ্ছিল, সুবোধবাবু বললেন, আজ আমার এখানেই খাবেন। বিনতা, তুমি ওকে ছেড়ে দিয়ো না যেন।

বিনতা মুখে ঢেউ তুলে বলে, আসবে, আসবে। আমার মাছের ঝোল ও যা ভালোবাসতো। মনে করেছ ও কি ফেলে যাবে? কি বলিস? ফেরার পথে তোর দাদা আর বৌদিকেও নিয়ে আসবো।

বৌদি তো নেই। চুঁচড়োয়। আর দাদার খুব অসুখ।

নাকি?

নিভে যায় যেন বিনতা।

সুবোধবাবু আবার বলেন, ওকে নিয়ে এসো কিন্তু। আজ প্রবীরও খেতে আসবে বলেছিল।

বিনতা থমকে দাঁড়িয়ে মুখ গোল করে বলে, আজ নোটিশ না দিয়ে যে! দেখা হয়েছিল বুঝি? বাবু যে রাজকর্ম নিয়ে থাকেন।

তোমার কাছে প্রবীরের আবার নোটিশ লাগবে নাকি?

ততক্ষণে ওরা পথে নেমে এসেছে।

প্রবীর সুবোধের ছোটভাই।

বিনতার কণ্ঠ যখন গ্রামোফোনে প্রথম কথা কয়ে উঠেছিল তখন নাসিমার মনে হয়েছিল

বিনতা দু'জন। একজন যার কণ্ঠ গান হয়ে উঠেছে, আরেকজন তার সমুখে দাঁড়িয়ে আছে চিবুক নিচু করে। কোথাও তাদের মিল নেই। দু'জন সম্পূর্ণ আলাদা।

আমাদেরও কি এমনি করে প্রতিটি মুহূর্তে মরে গিয়ে নতুন জন্ম নিতে হয়? একেকটা মুহূর্ত আমি পেরিয়ে আসি, আর পেছনের আমাকে মনে হয় অন্য নারী— তার জীবন, তার আত্মা, তার পরিবেশ আমার নয়। আমি অনেক 'আমি'— এই কথা আর কেউ জানবে না। আমি যে নাসিমা নই, কোনদিন তা জানবে না বিনতা— সুবোধবাবু, প্রবীর, কেউ না।

আমার মৃত্যু হয়েছে। আজকের যে আমি— তার জন্ম হয়েছে কিছুক্ষণ আগে, কলকাতায়— বিনতার বারান্দায়। আমাকে কি তৈরি হতে হবে আরো অসংখ্য মৃত্যুর জন্যে?

নাসিমা তার শীর্ণ বাহু বিনতার কাঁধে রেখে শুধালো, সুবোধবাবু তোকে খুব ভালোবাসেন, না?

তুই কি দেখলি?

অনেক ভালোবাসেন তোকে।

ছেলেমানুষের মত রক্তাভ হয়ে ওঠে বিনতার মুখ।

একেক সময় কি মনে হয় জানিস? মনে হয়, এত ভালোবাসার বদলে আমি ওকে কিছুই দিতে পারলাম না।

এটা তোর বাড়াবাড়ি।

মুখে এই কথাটা বলে নাসিমা, কিন্তু মনে মনে ভাবতে থাকে, তোমার আপনতমকে দান করে আজ তুমি নিঃশেষিত, অদেয় কিছু নেই আর। তবু আরো দিতে হবে। তাই এ বেদনা?

নাসিমা মুখ ফিরিয়ে বলে, চল নিউ মার্কেটে যাই। কতদিন যাইনি।

কিছু কিনবি?

না এমনি।

চল, আমিও বেরোইনি অনেকদিন। আমার ভালো লাগছে বেশ। আমি ভাবতেই পারিনি তোকে নিয়ে এমনি বেড়াতে পাবো।

দু'জনে এলো মার্কেটে।

বিনতা চঞ্চল দৃষ্টি করে শাড়ি দেখতে লেগে যায়। আবার চলতে থাকে। আপন মনে একশো একটা কথা কয়ে চলে নাসিমার সঙ্গে। তারপর ওদিকের গোল বাঁকটার কাছে এসে বলে, কিরে তুই যে কথা বলছিস না বড়।

তুই বল। আমি শুনবো বলেই তো তোকে নিয়ে এলাম।

বিনতা স্বচ্ছ একটা হাসি পাঠিয়ে দেয় বাতাসে। নাসিমা বলে, ভাবছি ফুল কিনবো। কতদিন ফুল কিনিনি।

কোল ভরে রজনীগন্ধা কিনে নাসিমা বেরিয়ে আসে। এসে রিকশা নেয়। বিনতা বলে, ফুলের জন্যে তুই চিরকাল পাগল হয়ে রইলি।

নাসিমা বুক ভরে ঘ্রাণ নেয় রজনীগন্ধার। সারাটা শরীর যেন ফেটে পড়তে চায় তার সৌরভে।

তোর হিংসে হয়, বিনতা?

আজ রাতে বিনতা অবসাদে বিভোর ঘুমোবে। নাসিমা আজ অনেক রাত অবধি বিছানায় ছটফট করবে, তারপর ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে কলকাতার বিশাল বুকে।

নাসিমা চুপ করে এইসব ভাবছিল।

বিনতার তখন সাবেকি কথা মনে পড়েছে। বিনতা শুধালো, সেই ছেলেটিকে তোর মনে আছে?

কে? কার কথা?

নাসিমা নিজেই অবাক হয়ে যায় যতটুকু সচকিত হওয়া তার উচিত ছিল এই প্রশ্নে ততটুকু সে হলো না বলে।

আনিসকে ভুলে গেছিস নাকি?

হৃদয়ের যে স্রোতোধারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আবার তা বইতে শুরু করল। নাসিমা উত্তর করল, ওহ্ আনিস? না, ভুলে যাবো কেন? সাপকে কেউ ভুলে যায় কখনো?

আনিস বিয়ে করেছে।

কাকে?

জানি না।

বউ দেখেছিস? কেমন, রাঙা টুকটুকে?

হয়তো। আমি দেখিনি।

নাসিমা ভাবলো, আনিস মরে গেছে। মরে গিয়ে নতুন জন্ম নিয়েছে। এই অসংখ্য মৃত্যুর বিয়োগ থেকে জীবনকে আমি কবে শুদ্ধ করে তুলবো? বিনতা বলে চলেছে, মাসখানেক আগে এসেছিল প্রবীরের সঙ্গে। বলে গেল। — রাগ করলি নাকি? আগে জানলে বলতাম না।

নাসিমা কি অসতর্ক হয়ে পড়েছিল? জোর করে লঘু কণ্ঠে সে বলল, রাগ করবো কেন?

খেতে বসার আগে নাসিমা বালতি বালতি পানি ঢেলে এলো গায়ে। বিনতার ফর্সা তোয়ালে দিয়ে গা মাথা মুছলো। খোলা এলোচুল ছড়িয়ে দিল পিঠের ওপর। ভিজে ভিজে। কালো, শীতল। স্নিগ্ধতায় শ্রীমতি হয়ে উঠলো তার মন।

ঠিক তখন প্রবীরের সঙ্গে দেখা। প্রবীর বারান্দার থামে হাত রেখে হেসে বলল, অনেক দিন পরে দেখলাম। কেমন আছেন?

ভালো। আপনি?

ভালোমন্দ কিছুই বুঝতে পারি না।

বেশ তো।

নাসিমার ভালো লাগল প্রবীরকে। স্বচ্ছ, বোধগম্য। বলল, বিয়ে করে এবার বউ আনুন।

বউ? আপনাকেও বৌদির রোগে পেল নাকি? ওই ভয়ে তো বাড়ি ছেড়েছি।

তাই নাকি?

রান্নাঘর থেকে বিনতা বলল, নাসিমা একটু গল্প কর তুই। আমার মাছটা হতে যা দেরি।

সুবোধবাবু আবার এই রাতে বেরিয়েছেন রাবড়ি আনতে।
প্রবীর হঠাৎ কুয়াশা গলায় বলল, আপনাকে দেখলাম হঠাৎ। দেখে কেন যেন ভালো লাগল— কিছু মনে করেন নি তো?
প্রীতিময় হয়ে উঠল নাসিমা।
না, না। মনে করবার কী আছে? আপনি বেশ কথা বলেন।
কতদিন থাকবেন কলকাতায়?
কী জানি।
আসামে থাকতেন, কী হলো সেখানে?
চলে এসেছি। আর যাওয়া হবে না।
বলেই গভীর চোখে তাকাল প্রবীরের দিকে।
প্রবীর থাম থেকে হাত নামিয়ে সোজা হয়ে বলল, বৌদির কাছে চলুন। আমি এসে পড়ে আজ বেচারির রান্না বাড়িয়ে দিয়েছি।
আমিও।
দু'পা এগিয়ে, থেমে, পেছন ফিরে তাকাল প্রবীর। নাসিমার শরীরটা শিরশির করে উঠলো। না প্রবীর, আনিসের কথা তুমি বোলো না।
আনিসের কথা সে বলল না। বলল, কাল রোববার। বেড়াতে যাবেন?
আশ্বস্ত হলো নাসিমা। উত্তর করল, কোথায়?
যেখানে খুশি। —- গঙ্গার পোলের দিকে অনেকদিন যাইনি। যাবেন?
মনে মনে নাসিমা উচ্চারণ করল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, প্রবীর। আমার মমতার উৎস তুমি খুলে দিয়েছ। মুখে বলল, যাবো।

বিনতার ছেলেমেয়েরা এরই মধ্যে এত ভক্ত হয়ে উঠেছে নাসিমার যে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল।

হামেদ তখন ঘুমিয়ে ছিল। নাসিমা অপলক অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। আমিও কি বিবর্ণ হয়েছি এমনি? ক্ষীণ নিঃশ্বাস পড়ছে হামেদের। পৃথিবীর সঙ্গে জীবনের ক্ষীণ সূত্র। তুমি আমার সহোদর। আমি বেঁচে থাকতে চাই। খাটের পাশে আস্তে আস্তে নিঃশব্দে বসল নাসিমা। আমি বেঁচে থাকতে চাই। মমতায়, প্রীতিতে, সংগ্রামে, সৌন্দর্যে আমি বেঁচে থাকতে চাই। তোমাকে বিশ্বাস করেছি আজ শিশুরাত্রিতে। অসংখ্য আরো মৃত্যুর জন্যে তুমি আমাকে আর প্রস্তুত কোরো না, প্রবীর।
হামেদের কপালে হাত রাখলো নাসিমা।
এসেছিস?
এখন তুমি কেমন আছো?
ওই রকমই। ব্যথাটা বিকেলে আর আসেনি। বোধহয় ভালো হয়ে যাবো। তারপর একটু থেমে হামেদ চোখ বুঁজে বলল, তোর ভাবীকে আনিয়ে নিবি?

নাসিমা এ প্রশ্নের কোনো উত্তর করলো না। তোমার মৃত্যু শুধু তোমারই। অসুস্থতা কি কেটে যাচ্ছে হামেদের? বদলে নাসিমা বলল, বিনতার সঙ্গে দেখা হলো। আর প্রবীর।

অনেকদিন দেখিনি ওদের। এলো না?

আসবে।

তুই তাহলে কলকাতায়ই থাকবি?

কলকাতা থেকে চলে গেলে আমি দম আটকে মরে যাবো। নাসিমা অস্পষ্ট হাসতে হাসতে বলল, বড় ভালো লাগল কলকাতা। আমি এখানেই থাকব। আর মনে মনে সে বলল, আমাকে বাঁচতে দাও। আজ আমি বহু দিন পরে নরক মুক্ত হয়েছি। প্রীতির আবিরে আমি এখন আচ্ছন্ন।

বিশাল কলকাতা উদার একটা মানুষ। তার উদ্দেশে নাসিমা সমস্ত রজনীগন্ধা সমর্পণ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

বুধবার বিকেলে কলকাতায় বৃষ্টি নামলো।

তখন নাসিমা আর প্রবীর চৌরঙ্গির এক রেস্তোরাঁয় বসে।

আস্তে আস্তে চুপ হয়ে গেল চারদিক, কেবল বেঁচে রইলো বৃষ্টির শব্দ। প্রবীর টেবিলের ওপর দু'কনুই রেখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। আর নাসিমার বাঁ হাতের করতলে রাখা কপোল, ডান হাত অন্যমনস্ক খেলা করছে প্রবীরের দেশলাই নিয়ে। নাসিমা দেশলাইটা দূরে সিগারেট প্যাকেটের ওপর সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলল, আমি আমার মত করে বাঁচতে পাবো না, এইটেই বোধহয় পৃথিবীর সবচে বড় দুঃখের, তাই না?

প্রবীর কোনো কথা বলল না।

আমি কার কাছে কী এমন অপরাধ করেছিলাম যে আমাকে এমনি করে কষ্ট পেতে হবে?

কেন আপনার এত কষ্ট?

কেন?

ছায়া ছায়া হাসলো নাসিমা। যেন বিষাদ বৃষ্টি হলো। বলল, একেক জন বুঝি এমনি কষ্ট পাবার অসীম ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। বিনতার গান গাইবার মত হয়ত আমারও এ কষ্ট পাবার প্রতিভা। নইলে এমন হয় কেন?

নাসিমাকে আজ যেন পেয়ে বসেছে। বাইরের অবিবল বৃষ্টি ধারার মত তার মনের দুয়ার খুলে গেছে।

প্রবীর আস্তে আস্তে আঙ্গুল স্পর্শ করে নাসিমার।

নাসিমা তার স্পর্শ সরিয়ে দেয় না। হয়ত তার বাইরের ইন্দ্রিয়গুলো এমন স্তব্ধ হয়ে গেছে যে সে বুঝতে পারেনি প্রবীর কখন তাকে স্পর্শ করেছে। প্রবীর কি নাসিমার ভেতরে এই স্পর্শ দিয়ে সঞ্চারিত করে দিতে চায় তার আত্মিক শক্তি?

নাসিমা অনেকক্ষণ পরে উত্তর করে, মানুষ এত নীচ হয় কেন বলতে পারেন?

প্রবীর উত্তর দিল না।

— এত নীচ, এত অসুস্থ কেন মানুষ, বলতে পারেন প্রবীর বাবু?

প্রবীর কোনো কথা বলে না। মাথা নিচু করে নাসিমার আঙ্গুল নিয়ে অস্পষ্ট খেলা করতে থাকে।

নাসিমা এবারে হাত টেনে নেয়। বলে, জানি এ সব প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না, জিজ্ঞেস করে শুধু শুধু আপনাকে বিব্রত করলাম।

আমি আপনার প্রশ্নটাই ভাবছিলাম। আসলে আমরা হয়ত সবাই খুব স্বার্থপর, নিজের দিকটাকে বড় করে দেখতে গিয়ে অহেতুক আরেকজনকে ছোট করে ফেলি, তাকে কষ্ট দি— তার কষ্ট বুঝতে চাই না।

আর অসুস্থতা?

কিসের? শরীরের না মনের?

শরীরের অসুখ অনেক ভালো প্রবীরবাবু। স্বার্থপরতাও কি একটা অসুখ নয়? এ অসুখটা আরেকজনকে শুদ্ধু কবরে নিয়ে যায় যে।

প্রবীর কোমল হয়ে ওঠে।

আপনি অনেক আঘাত পেয়েছেন জীবনে। আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। বলবো?

বলুন— কী কথা?

আমার কী মনে হচ্ছে জানেন, কারো অসুখ তবে আমরা ঘৃণা করি না— ওষুধ দিয়ে তাকে সারিয়ে তুলি। মনের অসুখ হলে কেন তাকে ঘৃণা করবো তাহলে?

আমি তো কাউকে ঘৃণা কবিনি, প্রবীরবাবু।

এই উত্তরটা মুখে দিলেও, মনে মনে নাসিমা প্রবীরের কথাটা নিয়ে বিশদ ভাবতে থাকে। প্রবীর বলে চলেছে, আমি জানি, আপনার মত মানুষ কাউকে ঘৃণা করতে পারে না। মনের অসুখটাকে কি আমরা সবাই মিলে সারিয়ে তুলতে পারিনে? মনের অসুখটাও তো সাময়িক। একটা মুহূর্তের বিকার মাত্র?

হয়তো। কিন্তু এ অসুখটা যার হয় সে অসুখটাকে ভালোবাসে বলেই হয়।

নাসিমা এতক্ষণে প্রবীরের গোড়ার প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে পায়।

আপনি বলছিলেন না, মনের অসুখ হলে তবে ঘৃণা করব কেন? প্রবীরবাবু, আপনি কখনো কাউকে ভালোবেসেছেন?

না।

ভালোবাসেন নি?

নাসিমা আবার প্রশ্ন করে। করেই প্রবীরের চোখের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যোগ করে, — ভালোবাসার দরকার হয় না, এমনিতেই বুঝতে পারা যায়— মনের অসুখ আর শরীরের অসুখ এক নয়, প্রবীরবাবু।

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর কখন ভাবনায় রূপান্তরিত হয়ে যায় তার। শরীরের এমন একটা নিয়ম আছে ওষুধ তাকে মানতেই হবে, যদি জীবনীশক্তি ব্যয়িত হতে হতে তার শেষ লগ্নে তখনো না পৌছে থাকে। কিন্তু মন? মনের ভেতরে চলেছে নিয়ত নিয়মের এক দ্বিমুখী সংগ্রাম। সেখান থেকে কি মুক্তি আছে কারো? আমার মনের যে শুদ্ধ নিয়ম তাকে দিয়ে সৃষ্টি করি বাইরের পৃথিবীকে, আর আরেক দিকে বাইরের পৃথিবী তার নিয়ম দিয়ে শাসন করতে চায়

আমাকে। বার থেকে এমন কোনো শক্তি নেই মনের অসুখ সারিয়ে তোলে। আত্মাকে দৃঢ় করতে পারলে আর ভয় নেই। এই দ্বিমুখী সংগ্রামের শেষ হবে কবে? কবে আমি পারবো থুতু আর কাদাকে ভয় নয়, উপেক্ষা করতে, প্রবীর?

অনেকক্ষণ কথা বলেনি নাসিমা। হঠাৎ সেটা লক্ষ্য করে সে বলল, সহজ, শাদা একটা মানুষ আজ অবধি আমার চোখে পড়ল না।

আমরা সবাই কত একা।

প্রবীর তাকাল তার চোখের দিকে।

বাইরে বৃষ্টি ধরে গেছে। আর কোনো শব্দ নেই বৃষ্টিপতনের।

প্রবীর বলল, আরো বসবেন, না বেরুবেন?

চলুন বেরোই। বৃষ্টির পরে শহর খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, না?

নাসিমা উঠবার আগেই দাঁড়িয়ে পড়ল প্রবীর। উঠতে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল সে। মনে হলো, প্রবীর অদৃশ্য হয়ে গেছে, বদলে সিল্কের একটা হাওয়াই শার্ট আর চকোলেট উলেন ট্রাউজার ঝুলছে তার সমুখে।

আরজুর আয়নাটা নগ্ন, নিষ্ঠুর।

নেয়ে আসবার পর আসল চেহারাটা যেন বেরিয়ে এসেছে শ্যাওলা ছাড়ানো পৈঠার মত। কানের দু'পাশ দিয়ে লতিয়ে নেমেছে চুলের গুচ্ছ, হয়ত সেখানে খুঁজলে একটা দুটো শাদা চোখে পড়বে। আমি পুরনো হয়ে যাচ্ছি। এই পুরনো হয়ে যাওয়াটা বড় অদ্ভুত; মনে হয়, অনেক দূরে সরে গেছি পৃথিবী, পৃথিবী ছাড়িয়ে যা কিছু সমস্ত থেকে।

বত্রিশ বছরের পুরনো মুখটাকে আয়নায় নাসিমা দেখতে থাকে।

কালো— হ্যাঁ, কালো বই কি— কালো ছিল বলে ছোট বেলায় মা-র আফশোসের অন্ত ছিল না। বিকেল বেলায় কোলের কাছে বসিয়ে, আজো মনে আছে নাসিমার, দুধের সর দিয়ে মেজে দিতেন তার মুখ। মসৃণ হয়েছে, কমনীয়তা এসেছে, কিন্তু রঙ কাটে নি। অত শত বুঝতো না নাসিমা। মায়ের দুঃখটা আবছা করে মনে থাকতো শুধু। তারপর যখন শাড়িতে সে শ্রীমতি হয়ে উঠলো তখন অনেকটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তার মুখশ্রী। নিজের বর্ণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে থাকাটা কোনদিন তার স্বভাব ছিল না। সামান্য একটু প্রসাধন, একটু সাবান-তোয়ালে তা-ই যথেষ্ট। আনিস বলত, তোমার মুখ আকাশের মত।

কৈশোর পেরুনো সেই প্রথম বয়সটাই অদ্ভুত একটা অহংকার সঞ্চারিত করে দিত যেন এই প্রশংসাটুকু। করাচির সেই দু'কামরার ফ্ল্যাটে ডাক্তারের ওখান থেকে ফিরে আসবার পর তার এই কথাটা অনেকক্ষণ ধরে মনে পড়েছিল। জওয়াদ ট্যাকসির ভাড়া দিয়ে ওপরে ওঠে এলে পর তার মনে হয়েছিল— প্রাণের সমস্ত দরদ ঢেলে কেউ যদি আজ গান গেয়ে উঠে তবু এই দূরত্ব ভরে উঠবে না। এত দূর— এত দূরত্ব আমার। কে যেন বলেছিল আমার মুখ আকাশের মত। বাইরের রঙটাই শুধু নয়, আমার মনও যে তেমনি সুদূর হয়ে গেছে, আনিস কি তা বুঝতে পেরেছিল? না কি জওয়াদও বুঝতে পারে এ কথা? আমি যে আকাশের মত দূর থেকে প্রীতিতে নত হয়ে তোমাদের মিছিল দেখে চলেছি আজীবন দিনগুলি।

আকাশের মত নাসিমার মুখ।

আজ সে মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে বার থেকে। ফ্যাকাশে ছাই ছাই একটা আভা এসেছে। গালের হাড় স্পষ্ট হয়ে ওঠায় দু'চোখের তীক্ষ্ণতা যেন বেড়ে গেছে, আর রেখা রেখা জ্যামিতিক চেহারায় ওই বৃত্ত দুটো যেন বিদ্রোহ করে আছে সারাক্ষণ। সারাটা মুখে কোনো সঙ্গতি নেই। একেই কি বলে বীভৎসতা? বত্রিশ বছরের ফসিল এই মুখ এতকাল পৃথিবীর কোন গোপনে লুকোনো ছিল, অনেক নাসিমার মৃত্যুর পর সে তার সময় বুঝে বেরিয়ে এসেছে বিবর থেকে।

মতির মা-র কণ্ঠস্বরে হাতটা কেঁপে গেল গলায়। পাফ্‌টা ডিবেয় রাখতে রাখতে সে উঠে দাঁড়াল।

আজ আবার সে আরজুর শাদা শাড়িটা পরেছে। যেন অদৃশ্য রূপোর রেকাবি থেকে উত্থিত গাঢ় ধুপরেখা বাতাসে স্থির হয়ে আছে।

মুখ ফেরাতে গিয়ে কেমন সংকোচ হলো নাসিমার। মতির মা তার এই বারবার নাওয়াটাকে মোটেই যে ভালো চোখে দেখতে পারছে না, এ সে প্রথম দিনেই বুঝে নিয়েছে তার হাসি থেকে। এখন যেন হঠাৎ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে নাসিমা।

কিন্তু আজ আমাকে স্নিগ্ধ রাখতে হবে আমার মন। আরজুর বারান্দার শাদা শাদা ফুলের মত, কলকাতার ফুটপাতে কেনা রজনীগন্ধার টিউবের মত।

নাসিমা ঘুরে দাঁড়াল।

না, এখন আমি চা খাবো না। পরে দিবি।

উনুনে পানি দিয়েছি যে।

তোর কি আর কোনো কাজ নেই, মতির মা? আরজু বলে গেছে বলে আমাকে নিয়ে এমনি করে পড়তে হয়? পানি ফেলে দে'গে যা, চ্যাঁচাস নে।

চ্যাঁচালাম কই আপামনি, জিজ্ঞেস করছিলাম শুধু।

তারপর একটু থেমে, — ওই সাহেব আসবার কথা আছে বুঝি?

নারী হলেই কি অনুভূতি এত প্রবল হতে হয়?

সেদিন মতির মা-কে দিয়ে ফুল পাড়ানোর কুফল ভুগতে হচ্ছে নাসিমাকে, শুনতে হচ্ছে ইঙ্গিত, দেখতে হচ্ছে চাপা হাসির বিচ্ছুরণ। মনে হলো ঠাস্‌ করে একটা চড় বসিয়ে দেয় মতির মা-র গালে।

আর একটু পরে বেবি আসবে তার উজ্জ্বল দুই চোখ নিয়ে। তার মসৃণ করে কামানো তরুণ গালে সন্ধ্যের আলো এমন একটা নীল আভার সৃষ্টি করবে যে বারবার ইচ্ছে করবে সেখানে আল্‌তো করে একটা চুমো দিতে।

বেবি আসবে। আমার জন্যে সে আসবে। বেবি আসবে। বেবি এক্ষুণি আসবে।

রাতে প্লেন এলো ঢাকা বিমান-বন্দরে।

জানালা দিয়ে অনেক আগে থেকেই দেখা যাচ্ছিল বিন্দু বিন্দু আলো—নিচে, অন্ধকার শহরে।

বব জানালা থেকে ক্লান্ত চোখ ফিরিয়ে শুধালো, ইজ দ্যাট ডাউন দেয়ার হোয়ার উই গো?

ইয়েস, ডার্লিং।

সংকেত।

নাসিমা ববের সিট বেল্ট লাগিয়ে দিল। তারপর নিজেরটা। ববের মাথা ব্রাশ করে দিল খানিক আঙুল দিয়ে। বব বলল, আই স্লেপ্ট লং।

ইউ ডিড।

হ্যাভ আই মিস্ড এ্যানি ফান?

নাসিমার হৃদস্পন্দন মুহূর্তের জন্যে দ্রুত হয়ে আবার স্বাভাবিকতা ফিরে পেল। আমি মনে করেছিলাম, তুমি মরে গেছ, বব। আমি বোধহয় চিৎকার করে উঠেছিলাম। সবাই মুখ টিপে হাসছিল অনেকক্ষণ। শুনে তুমিও কি হেসে উঠবে, বব? না, কোনদিন তুমি জানবে না।

নো ডিয়ার, ইউ হ্যাভন্ মিস্ড এ্যানিথিং— দেয়ার ওয়াজ ক্লাউড অ্যান্ড সান অ্যাণ্ড ক্লাউড এগেন— অ্যাণ্ড ইউ কুডন্ সি ডাউন বিলো— রিয়ালি দেয়ার ওয়াজ নো ফান।

মাটির স্পর্শ শিহরণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা প্লেনে। দৌড়ুতে থাকে রানওয়ে দিয়ে। দু'দিকে পাল্লা দিয়ে যেন অন্ধকার আর গাছ ছুটে চলেছে। আর বাতাস যেন বদলে গেছে হঠাৎ।

নাসিমার মন তখন বিষণ্ন হয়ে আসছে। যে উত্তেজনা নিয়ে করাচি ফেলে এসেছিল সে কখন যে সেটা অন্তর্হিত হয়েছে তা বুঝতে পারেনি। আবার তাকে আবিষ্কার করে নিতে হবে দ্বীপ। আবার কি তাকে পালাতে হবে?

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ববকে হারিয়ে ফেলল নাসিমা।

চারদিকে আকুল হয়ে খুঁজেও ববকে যখন পেল না তখন মনে হলো একটা শক্তি অন্তর্হিত হয়ে গেছে তার শরীর থেকে। মৃত্যুর শীতলতা সে অনুভব করতে পারলো হৃদপিণ্ডে।

কাস্টমসের পাল্লা চুকিয়ে হলে এসে দাঁড়াতে চোখে পড়ল ববকে। বব হৈহৈ শুরু করে দিয়েছে এরি মধ্যে ছোট ছোট তিনটে ছেলেমেয়ের সঙ্গে। ওর বাবা, নতুন মা দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। হাসছে।

পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো নাসিমা।

বব যেন আমাকে দেখতে না পায়।

বৃষ্টির পরে সারা কলকাতা নতুন একটা পয়সার মত ঝকঝক করছে। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা সন্ধ্যেটাকে আবাহন জানাল। মনে মনে। তারপর কার্জন পার্কে গিয়ে পাশাপাশি বসলো দু'জন। এতক্ষণ কেউ কোনো কথা বলেনি, বলল না। নাসিমা এতটা অন্তরঙ্গ বোধ করছে আজ প্রবীরের সঙ্গে যে শব্দের আদান-প্রদানটাই বাহুল্য মনে হচ্ছে তার কাছে। প্রবীরকে বিশ্বাস করেছে সে, এর চেয়ে বড় আর কী হতে পারে? আমার শরীরে আজ কোনো জ্বালা নেই, আমি হয়ত আজ ঘুমোতে পারব ঘুমের ওষুধ ছাড়াই।

প্রবীর বসে বসে সিগারেট টানছে। আলোয় ধিকিধিকি জ্বলে উঠছে তার চোখ। কখনো কখনো মাথা ফিরিয়ে দেখছে নাসিমাকে, তারপর আবার দূরে দূরে মানুষ, মানুষের ওপরে আকাশকে। নাসিমা মনে মনে বলল, আমি তোমাকে আজ বৃষ্টির মুহূর্তে চৌরঙ্গির রেস্তোঁরায় সৃষ্টি করেছি।

বাসায় পৌঁছে দিল প্রবীর। তখন অনেক রাত। প্রবীর বলল, আজ ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না, কী করি বলুন তো।

আমি কি ফিরিয়ে দিচ্ছি আপনাকে?

আহা তা কেন? বসবো কিছুক্ষণ? একটু চা খাওয়াবেন?

খাবেন? আসুন।

বলতে বলতে দু'জনে গিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকলো। বাতিটা জ্বেলে দিতেই অন্ধকারে-বিশাল কামরাটা ছোট হয়ে এতটুকু হয়ে গেল যেন।

প্রবীর সোফায় বসে টিপয়ের ওপর পা তুলে দিয়ে ক্লান্তিতে আড়মোড়া ভাঙ্গল। পরে বলল, অনেকক্ষণ পরে হাত পা ছড়িয়ে বসতে পেয়ে যেন মুক্তি পেলাম।

কৌতুক-অভিযোগে স্বচ্ছ হয়ে এলো নাসিমা।

এতক্ষণ তাহলে শুধু শুধু আমার জন্যে কষ্ট পেয়েছেন বলুন।

কষ্ট? তা পেলামই বা। এই কিছুক্ষণ আগে ছেলেমানুষের মত একটা প্রতিজ্ঞাও করে ফেলেছিলাম মনে মনে।

কী রকম?

আপনার জন্যে মনে হচ্ছিল আমি যে কোনো কষ্ট করতে পারি।

তাই নাকি?

যেন কিছুটা অভিমান ভরা কণ্ঠে প্রবীর বলল, ঠাট্টা মনে করলেন?

প্রবীরের এই অভিমানটুকু মধুর লাগল নাসিমার। প্রবীর নিচু হয়ে সিগারেট ধরালো আরেকটা। নাসিমা বলল, চা খাবেন বলছিলেন? আপনার চা করে আনি।

অনেকক্ষণ পরে খালি হাতে ফিরে এলো নাসিমা। বলল, কপাল মন্দ আপনার, অতিথিকে যত্ন করতে পারলাম না। চা পাতা নেই ঘরে। কী করবেন?

থাক, না হলেও চলবে।

তাহলে বসুন আরো কিছুক্ষণ।

আসলে নাসিমার ফিরতে দেরি দেখে প্রবীর উঠে ঘরময় পায়চারি করছিল। নাসিমা তার মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বসলো অবশেষে।

বসবেন না? দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?

বসে থেকে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গিয়েছিল। হাঁটছি খানিকটা।

দাদাকে দেখে এলাম, ওখানে দেরি হয়ে গেল।

কেমন আছেন উনি?

ওই রকমই। একটু বেড়েছে মনে হলো।

ব্যথা?

হ্যাঁ। ডাক্তার সন্ধ্যেয় ইঞ্জেকশান দিয়ে গেছে শুনলাম। এখন ঘুমোচ্ছে।

রাত বেশ হলো, না? আজ সারাটা দিন কাটালাম আমরা। বলতে বলতে প্রবীর এসে বসলো তার সমুখে। বলল, কথা বলুন। কিছু বলুন।

কী বলব?

আপনার কথা। আপনার সব কথা আমাকে বলুন, আমি শুনবো।

কষ্ট পেতে চান?

প্রবীর অস্পষ্টভাবে নাসিমার হাতে হাত রাখলো।

চাই।

হামেদকে যখন দেখতে গেলাম, নাসিমা ভাবল, তখন সে কত অসহায় হয়ে ঘুমোচ্ছিল। প্রবীরের চোখের দিকে তাকাতে পারল না নাসিমা। হঠাৎ নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো তার। দুর্বল একটা হাসি ছড়িয়ে ভাঙ্গা গলায় বলল, তারচে গল্প শুনুন, কিসের গল্প বলবো? প্রবীর কোনো কথা বলল না। স্পর্শ সরিয়ে নিল না।

— আমি তখন খুব ছোট। আমার মনে আছে একদিন খুব বড় বড় শিলাবৃষ্টি হলো। ছোটবেলার গল্প শুনতে আপনার ভালো লাগে? আমাদের দেশের বাড়িতে সবকটা ঘরই টিনের।

প্রবীর এবার তার মনিবন্ধে তার রাখলো।

নাসিমার কণ্ঠ হঠাৎ দ্রুত দুর্বল হয়ে এলো--- টিনের ছাদে কখনো শিল পড়ার আওয়াজ শুনেছেন? শোনেননি? ইংরেজি রেকর্ডের সোলা ড্রাম পিসের মত— আরো জোরে আরো তীব্র। বীভৎস, বুক স্তব্ধ করা।

প্রবীরের হাত কী উষ্ণ। কাঁপছে, প্রবীর তোমার হাত কাঁপছে।

ভয়ে নাসিমা উঠে দাঁড়াল, যেন কেউ তাকে জোর করে উঠিয়ে দিল আসন থেকে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল প্রবীর পাহাড়ের ঢালে গড়ানো একটা পাথরের মত। নাসিমা বন্ধ করতে পারল না তার কথা। যেন এ সমস্ত কথা সে নিজে উচ্চারণ করছে না; অন্য কেউ তার ভেতর থেকে করছে, তার কোনো হাত নেই।

— এত ভয় পেয়েছিলাম সেদিন—নাসিমা হাসতে চেষ্টা করল— যে খাটের তলায় গিয়ে লুকিয়েছিলাম।

প্রবীর, তোমার চোখে আগুন।

প্রবীর তাকে দু'হাতে বুকের পাথরে পিষে ফেলল।

না—না—প্রবীর।

কিন্তু আমি কেন স্তব্ধ হতে পারছি না? আমি কেন বলে চলেছি— বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরও বেরোইনি। এত ভয়।

প্রবীর ঠোঁট দিয়ে খুঁজলো তার ঠোঁট। আমি ঠোঁট সরিয়ে নেব, আমাকে কথা বলতে হবে। কথা— কথা।

— শেষে আব্বা আমাকে জোর করে টেনে বের করেছিলেন খাটের তলা থেকে। বলেছিলেন—

প্রবীর তার বাঁ হাত দিয়ে ব্লাউজের মুক্তি খুঁজছে।

নাসিমা চিৎকার করে উঠলো এই প্রথম — প্রবীর।

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তাকে। প্রবীরের মুখ অবাস্তব হয়ে উঠেছে। তাকে চিনতে পারলো না নাসিমা। আমি তোমাকে কোনদিন দেখিনি।

যান, চলে যান আপনি। আমার জন্যে কাউকে আর কষ্ট পেতে হবে না।

মিথ্যে, শুধু মিথ্যে।
পালাও, নাসিমা, পালাও।
এই স্তব্ধতা কি এক মৃত্যু থেকে আরেক জন্মের মধ্য-শূন্যতা?
নাসিমা অনেকক্ষণ ধরে গোসল করল। তবু যেন কণামাত্র মুছে ফেলতে পারল না প্রবীরের স্পর্শ।

চারদিন পরে হামেদ মারা গেল তার ঘুমে। তার মৃত্যু যেন একটা মুক্তি এনে দিল নাসিমাকে। একমুহূর্তে সমস্ত ক্ষোভ আর ক্লেদ মুছে গেল আত্মা থেকে। আমার অনুতাপ নেই, প্রতীক্ষা নেই, আমি নির্মল একা। গোরস্তান থেকে ফিরে এসে হামেদের শূন্য বিছানায় বসলো সে। একটা মানুষ মরে গেলে তার কামরা সহসা এত বিশাল হয়ে যায় কেন?
শূন্যতা কেন স্পন্দিত হয়ে উঠতে চায় বারবার?
সেই বিশালতায় দাঁড়িয়ে নাসিমা মনে মনে উচ্চারণ করল, আমি তোমাকে করুণা করি, প্রবীর। এবারে আমি চলে যেতে পারি।

বেবি যখন এলো তখন ছ'টা বেজেছে। আর আকাশের পশ্চিমে নিবিড় একটা অন্ধকার ভায়োলেট হয়ে নেবে আসছে আস্তে আস্তে। তার পদপাত অনেকটা বেবির মত। প্রায় বোঝা যায় না, কিন্তু অস্থির, একমুখী।
বেবি এসে বলল, দেরি করে ফেললাম। অনেকক্ষণ বসেছিলে?
ছিলাম। দেরি হলো কেন? তোমার জন্যে এখন অবধি চা খাইনি আমি।
বেবি একটু অপ্রতিভ হলো।
আর দেরি করবো না।
কোরো না। কক্ষনো কোরো না। কেউ বসে থাকলে তার কষ্ট হয় না?
হঠাৎ নাসিমা হেসে ফেলে— ইস, আজ তোমাকে খুব করে বকতে ইচ্ছে করছে।
কেন?
কেন আবার? মানুষ বকে কেন? দোষ পেলেই বকে।
বেবি বাতাসের কাঁপনের মত মৃদু মৃদু হাসে। তার যেন কোনো সত্যি সত্যি ভয় নেই নাসিমার কাছ থেকে এখন, এই কথাটা বুঝতে পেরে দু'হাতের তালু বাজাতে থাকে অস্পষ্ট করে। নাসিমা বলে, মতির মা চা নিয়ে আসুক, কেমন? না কি ঘরে খাবে?
ঘরের প্রসঙ্গে উঠতেই বেবির আগ্রহ যেন বিবর্ণ হয়ে যায়— কেননা, বেবি যে আরজুর স্বামীর ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে, এই কথাটা মনে পড়ে গেছে হঠাৎ। কী একটা অপরাধবোধ সচকিত হয়ে ওঠে ভাবনায়। বলে, না, বারান্দাতেই ভালো। কী বলো?
যা বলো তুমি।
মতির মা চা আর নাশতা এনে রাখলো। নাসিমা ফেরার পথে কিছু শাদা সুগন্ধ ফুল মুঠো করে এনে বেবির হাতে দিল।
পকেটে রেখো। বাসায় ফিরে আমার কথা মনে পড়বে।

বেবি বলে নাকের কাছে ছুঁইয়ে, বেশ ঘ্রাণ। বলতে বলতে ওপর পকেটে রেখে দেয়। যোগ করে, আমার টেবিলে রাখবো।

তারপর দু'জনে মুখোমুখি বসে চা খেতে থাকে।

চা খেয়ে বেরোয়।

প্রীতিতে মন আচ্ছন্ন হয়ে আসে নাসিমার। এতক্ষণ ধরে আরজুর আয়নার নগ্নতা আর শরীরের নামহীন সেই অস্বস্তিটা তাকে দগ্ধে দগ্ধে মারছিল। বাইরে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তার আর চিহ্নমাত্র রইলো না।

রিকশার দোলায় বেবির শরীর ছুঁই ছুঁই হয় নাসিমার সঙ্গে। বেবি সঙ্কুচিত হয়ে এতটুকু হয়ে যায় যেন। মধুর লাগে নাসিমার। মুখে বলে, এত লাজুক তুমি!

কই না?

বদলে বেবি আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, রক্তিমাভা ছড়ায় সারা মুখে। অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায় না। কিন্তু নাসিমা জানে— ওর মুখ এখন করতলের মত রক্তিম হয়ে উঠেছে। আরো একবার তার নাম ধরে ডাকে নাসিমা, বেবি, বেবি।

প্রায় ফিসফিস তার কণ্ঠস্বর।

কী, বলো না? বলবে কিছু?

না, এমনি।

বেবি আবার হাসলো। তেমনি কাঁপন তোলা ওর পুরনো মৃদু মৃদু হাসি। এক মুহূর্তের জন্যে নাসিমার ভালো লেগেছিল তার নাম ধরে ডাকতে— নাম উচ্চারণের ভেতর দিয়ে এই নাম যার তাকে নিশ্চয় করে অনুভব করতে। হঠাৎ এক ঝলক তীব্রতার মতো নাসিমার মনে দ্রুত প্রবাহিত হয়ে গেল একটা অন্ধকার— যে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আকাশের অনেক শূন্যতা থেকে কে যেন বলেছিল, ই- দ্যাট ডাউন দেয়ার হোয়ার উই গো?

ইয়েস, ইয়েস।

মনের ভাবনাটা কখন অস্পষ্ট উচ্চারণ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে। বেবি উন্মুখ হয়ে তাকাল তার দিকে। বলল, কী?

এই অতল অন্ধকারে কি আমার যাত্রার শেষবিন্দু? না, আমি তো কিছু বলিনি। ইয়েস, ইয়েস। বেবি, আমি কিছু বলিনি তোমাকে— কিছুই বলিনি।

তবু কেন এমন হবে আমার কণ্ঠের ওপর থাকবে না আমার কোনো শাসন? কেন আমার ভাবনাগুলো আপনা থেকেই বেছে নেবে বাইরে বেরুবার শরীর? উচ্চারিত হবে?

নাসিমা এইসব ভাবলো বেবির ছোট্ট প্রশ্নের পর। বিব্রত, ক্ষুদ্র বোধ করল নিজেকে। বলল, ঢাকায় এই প্রথম এলাম আমি।

জানি।

তোমাকে নিয়ে বেরুলাম শহরটা চিনবো বলে— আর তুমি কিনা চুপ করে রইলে?

কই?

কথা বলো। এত অন্ধকার কেন, বেবি? আলো নেই, মানুষ নেই, একী রকম শহর?

এত বিনষ্ট মনে হলো শহরটাকে নাসিমার, রিকশা থেকে বাইরে দৃষ্টি করে বুকের ভেতর সে একটা দম আটকানো ব্যথা অনুভব করল। কেমন বিচ্ছিন্ন, উদ্বেগহীন, কম্পিত এই শহর। একটা কালির ফোঁটাকে মাইক্রোস্কোপের ভেতর দিয়ে দেখলে যেমন—ইজ দ্যাট ডাউন দেয়ার ? ওখানে ? ওখানেই কি ? আমি জানি না, নাসিমা ভাবলো; নাসিমা আরো ভাবলো, অথচ এখানেই।

বেবি বলল, এই পথটা আগে এত সরু ছিল! এখন যা দেখছ ঠিক তার আদ্ধেক। আর দু'ধারে পঞ্চাশ পাওয়ারের বাল্ব জ্বলা সব দোকান। উনিশ শ'পঞ্চাশের পর এইসব হয়েছে। আরো হবে।

তাই নাকি ?

শহরটা বাড়ছে। এত তাড়াতাড়ি বাড়ছে যে, সাতদিন আগে কোথায় কী ছিল মনে রাখা যায় না। এখানে, হ্যাঁ এখানেই হবে, সেই গাছটা ছিল—একটা সিগারেটের দোকান, ওইখানে মাঠ আর ওধারে বোধহয় সিনেমা হলটা । কী জানি, ঠিক মনে পড়ছে না।

নাসিমা চোখ বুজঁলো। ভাবনাগুলো চোখের পাতার মতো নিঃশব্দে নেবে এলো। আমিও আর কিছু মনে রাখতে চাই না। কোনো স্মৃতি, কোনো সঞ্চয়, কিছু না। শুধু আমার শরীরে দাগ দেখে কেউ হয়ত কোনদিন মনে করতে চেষ্টা করবে —না!

আবার ফিরে এলো। আনিস, জওয়াদ, লাবু চা বাগান। ওরা কারা? হামেদ আমাকে বিশাল করে দিয়ে গেছে।

আনিস বলেছিল, আকাশের মত আমার মুখ। আমি কি অপূর্ণ থাকব ? করাচির অপারেশন টেবিলে কি আমার শেষ মৃত্যু হয়ে গেছে? বেবি পাশে বসে উস্‌খুস করেছিল, সেটা হঠাৎ চোখে পড়ল নাসিমার।

কিছু বলবে?

কোথায় যাবে তাই শুধোচ্ছিলাম।

কোথাও না। এমনি।

মনে মনে বলল, আমার নতুন জন্ম, নতুন শহর। তুমি আমার আনন্দ, তুমি আমার সুন্দর। মুখে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে বলল, চল, এখানেই নেবে পড়ি। হাঁটব আজকে।

রিকশা থেকে নেবে বেবি পয়সা দিতে গেল কিন্তু নাসিমার জন্য সম্ভব হলো না। খুচরো পয়সা ফিরিয়ে নিতে নিতে তরলকণ্ঠে বলল, খুব বড়লোক হয়েছ, না? বাড়ি থেকে বুঝি পাঁচশ টাকা করে অ্যালাউন্স দিচ্ছে?

তবে কী!

বেবিও কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পরে যোগ করে, বাঁচালে আমাকে।

বাসা থেকে বেরুবার সময় অনেক খুঁজে-পেতে বেবি পনেরো টাকা পকেটে নিয়ে বেরিয়েছিল।

নাসিমা আচমকা প্রশ্ন করে, তুমি সিগারেট খাও, না?

কেন?— মানে —খাই তো।

ডেঁপো কোথাকার। আমার সমুখে বলতে লজ্জাও করলো না? আছে? না, কিনতে হবে? না থাকলে কিনে নাও।
বলতে বলতে নাসিমা ব্যাগ থেকে টাকা বার করলো।

বেবির সিগারেট ধরানো অনভ্যস্ত ভঙ্গিটি লক্ষ্য করে নাসিমা না হেসে পারলো না। বেবি ফস করে ঠোঁট থেকে সিগারেট নাবিয়ে শুধালো, হাসলে যে ?
কদ্দিন হলো সিগারেট খাচ্ছো শুনি?
কেন?
শুধোচ্ছি।
বেবি তখন ভারী লজ্জা পেয়ে গেল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দূরে সাইন আলোর দিকে তাকিয়ে উত্তর করল, আগে খেতাম না। এই ইউনিভার্সিটিতে উঠে।
তাই বলো।
নাসিমার কণ্ঠের স্বচ্ছতা বেবিকে এমন করে স্পর্শ করে যে তখন তার মনে হয় সে একেবারে এতটুকু হয়ে গেছে। নিজেকে জোর করে দু'পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখবার চেষ্টাটা কেমন ব্যর্থ হয়ে যেতে থাকে। এমন কি খুব অস্পষ্ট করে একটা অভিমান গড়ে উঠতে থাকে তার বুকের ভেতরে। কিন্তু নাসিমার পরের কথা তার শ্রুতিতে এসে কাঁপন তোলার সঙ্গে সঙ্গে মনটা আবার প্রসন্ন হয়ে যায়।
নাসিমা বলছে, রাগ করলে নাকি?
না—না।
ওরা তখন হাঁটতে থাকে রমনা পোস্টাফিসের সমুখ দিয়ে। কেমন আঁধার আঁধার, আর তারি ফাঁকে ফাঁকে মানুষ, টাঙ্গাইল যাবার বাস আর টিমটিমে লালচে আলো ফেরিদোকান থেকে। দীর্ঘ বাসগুলো যেন একেকটা অনুভূতির মত স্তব্ধ হয়ে আছে। তাদের হলুদ রঙ মৃতের মত পাণ্ডুর দেখাচ্ছে। আর গাছ। আর শাদা মসজিদটা শাদা।
নাসিমা বেবির ডান হাত তুলে নেয়। আঙুলে আঙুল ছুঁইয়ে হাঁটতে থাকে। আঙুলের উষ্ণ স্পর্শে নাসিমা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে, সে এই পৃথিবীর কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। আছে, শুধু আছে— এই বোধ তার এত প্রয়োজন।
আস্তে আস্তে আলোয় এসে পড়ে ওরা। একটা স্বচ্ছন্দ স্রোতোধারায় অনায়াসে যেন তারা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে।
এই মুহূর্ত যে কত পবিত্র তা পৃথিবীর কেউ জানবে না। নাসিমার মনে হয় জীবনে সমস্ত থুতু আর কাদার সাম্রাজ্য থেকে তার শুভনির্বাসন ঘটেছে। সে মুক্ত। অনুরাগে তার মন গান হয়ে উঠতে চাইলো।
বাঁদিকের ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে স্টেডিয়ামের দিকে মোড় নিল ওরা। এখানটায় এত আলো, এত কণ্ঠ যে নাসিমার মন বিশুদ্ধ রকমে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলে, বেবি, রোজ আমি এখানে আসব।
বেশতো। আমিও থাকবো।

থাকবে, থাকবে বৈকি।

সমুখে জুতোর দোকান পড়ল। বেবি দাঁড়িয়ে বলল, দাঁড়াও।

কেন? জুতো কিনবে?

না, এমনি। দেখব। শো কেসে দাঁড়িয়ে জুতো দেখতে তোমার ভালো লাগে না? আমার লাগে।

অদ্ভুত তোমার শখ।

কিন্তু নাসিমাও তার সঙ্গে সঙ্গে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

তোমার কোনটা পছন্দ? এইটে?

দূর—এত শৌখিন যে মনে হয় গালে বুলোবার জন্যে।

বলেই হেসে ফেলে।

তাহলে ওটা?

হ্যাঁ, ওটা, ওটা ভালো। কিনছ নাকি?

দেখছি।

কিনবে তো চলো না?

বলে নাসিমা একটু আমতা আমতা করে। বেবি, আমাকে তুমি বলতে পারো না? আমার কাছে চাইতে পারো না? একটা ব্যথা অনুভব করে নাসিমা। কেমন বিচ্ছিন্ন অসহায় মনে হয় নিজেকে।

যোগ করে, — আমার কাছে কিন্তু টাকা আছে।

না, থাক।

তখন নাসিমা দ্বিগুণ মনোযোগ দিয়ে জুতো দেখতে থাকে সাজানো শো কেসে। আস্তে আস্তে তার মনে হতে থাকে কার্নিভালের নাগরদোলার মত জুতোগুলো যেন একটা বৃত্তপথ ধরে ঘুরছে—উঠছে, নামছে। আবার উঠছে। খুব আস্তে, এত আস্তে যে চোখে দেখা যায় না—রক্ত দিয়ে অনুভব করতে হয়। রক্তের ভেতর দোলা অনুভব করে নাসিমা আখতার। স্থির, আরো স্থির। দ্রুত, আরো দ্রুত। হঠাৎ এক সময়ে চাবি ছেড়ে দেয়া স্প্রিংয়ের মত মুহূর্তে তার ভাবনার টানটান সরলরেখা শিথিল হয়ে আসে, ঝুলতে থাকে হাওয়ায় গুড়া শুকনো লতার মত। তখন জন্ম হয় নতুন ছবির। মনে হয়, জুতোগুলো এখন অই শোকেসে সাজানো আছে কারিগরের যন্ত্রে বানানো একটা নৈর্ব্যক্তিক চেহারা নিয়ে, মাপ নিয়ে। তারপর কেউ হয়ত তাকে কিনবে, আস্তে আস্তে তার পায়ের প্রতিরূপ সৃষ্টি হবে জুতোর শরীরে। তখন আর ঐ চেহারাটা থাকবে না, তখন হবে তার— একমাত্র তার— পৃথিবীর আর কারো নয়। তখন এই জুতোজোড়াকে আলাদা করে চেনা যাবে না।

কিন্তু কেন আমি ভাবলাম এ কথা? কতক্ষণ ধরে ভাবছিলাম? বেবি তখনো জুতো দেখছে— এবারে মেয়েদের শো কেস। নাসিমা তাকে আড়চোখে দেখে নিল পলকে। — এমনি করেই কি আমরা সবকিছুকে বদলে দিই? আরোপ করি আমাকে? আমার সৃষ্টি তুমি, আর তুমিও, আর এমন কি তুমিও। আমি যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে তুমি হতে জন্মহীন একটা কুয়াশা মাত্র। আমার রূপ তোমাতে বলেই তুমি বাঁচো।

আমি তোমাকে আমার সুন্দর তৃষ্ণা দিয়ে সৃষ্টি করব, বেবি।

বেবি।

কী?

চলো যাই।

কোথায়?

মনে মনে কষ্ট ছড়িয়ে পড়ল নাসিমার।

আমি প্রশ্ন বুঝতে পারি না। যেখানে খুশি। বলেছি না, আমাকে তুমি শহর দেখাবে।

কয়েকগজ এগোতেই বামে একটা অন্ধকার পথ পড়ল। দু'দিকে উঁচু দালান— মাঝখান দিয়ে কুয়াশা অন্ধকার একটা খোলা জায়গায় পড়েছে, তার ওপারে আরেকটা পথ বাহুর মত পড়ে আছে। দু'দালানের মাঝখানে এসে বেবি বলল, এসো এদিকে। চিপ্‌স খাবে? পটেটো চিপ্‌স?

খাবো।

নাসিমার মন উন্মুখ হয়ে উঠল বেবির এই আদরটুকু দু'হাত ভরে নেবার জন্যে। প্রশ্রয় দেবার আগ্রহে কোমল হয়ে এলো তার চোখ। আবার বলল, তোমার ভালো লাগে, না?

মাঝে মাঝে। এই লোকটা সাইকেল নিয়ে রোজ সন্ধ্যেয় এখানে দাঁড়ায়। সবাই চেনে। শুধু কি পটেটো চিপ্‌স? — আরো কত কী। আমি কখনো কখনো কিনি।

লোকটা সাইকেলের ক্যারিয়ারে বাঁধা ট্রাঙ্ক থেকে চিপ্‌স ভরে ঠোঙ্গা এগিয়ে দেয়। প্রশ্ন করে, অওর দুঁ?

ব্যস, আভি নহি।

বেবি দালানের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। মুড়মুড় করে একটা দু'টো চিপ্‌স দাঁতে কাটতে থাকে। সমুখে দাঁড়িয়ে নাসিমাও।

আরো নেবে?

নাহ্। চলো এগোই।

দূর থেকে চোখে পড়ে আঁধারে আবছা হয়ে আসা স্টেডিয়াম। তার কনস্ট্রাকশনের খাড়া লোহা অজস্র জটিলতা হয়ে আছে আকাশের গায়ে— যে আকাশ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এখনো রক্তিম একটা আভা। সব মিলিয়ে খানিকটা মোবাইল স্কাল্‌প্‌চারের মত লাগে স্টেডিয়ামকে। গভীরে কোথাও কান পাতলে প্রাণস্পন্দন শোনা যাবে যেন।

বেবিকে নিয়ে নাসিমা নির্জন স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে এসে দাঁড়াল। সিঁড়ি বেয়ে উঠলো ওপরে, আরো ওপরে, বাঁধানো চওড়া চত্বরে।

কেউ নেই। এ মাথা থেকে দৃষ্টি করলে সবচে দূরের বিন্দুটি চোখে পড়ে না। হাঁটতে হাঁটতে ওরা একেবারে ওদিকটায় গিয়ে পড়ল— ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বিল্ডিংয়ের চুড়োয় লাল তারার কাছাকাছি। দূর থেকে সমস্ত শহরের কোলাহল ঢেউয়ের মত কাঁপন তুলে মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে আছড়ে পড়ছে এই সীমানায়। এত দূরে আমি এসে গেছি। চিরকাল এমনি একটা সুদূরে পৌঁছুনোর চেষ্টা চলছিল বুঝি আমার। পায়ের নিচে সিমেন্টের রুক্ষ স্পর্শ নাসিমা অনুভব

করতে থাকে স্যাণ্ডেল থেকে পদতল নগ্ন করে। আবার তারা হাঁটতে হাঁটতে প্রথম বিন্দুতে এসে পৌঁছোয়।

আস্তে আস্তে শহরটা যেন কাছে চলে আসে। যেন তারা দু'জনে স্থির, ঘুরছে তাদের চারপাশে এই দিকের আলো-মানুষ আর ওদিকের আঁধার-নির্জনতা। লাল তারাটা ছোট থেকে বড় হয়ে আবার ছোট হয়ে যায়।

দূর থেকে বেশ দেখায়, না?

কী?

তারাটা।

হ্যাঁ।

আমার হৃদয় এমনি রক্তাক্ত। নাসিমা দূরে সরে যেতে যেতে লাল তারা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে। নিচে মাঠের দিকে তাকায়। কয়েককটা লোক স্থির হয়ে বসে আছে। ওপর থেকে দেখাচ্ছে কালো পাথরের টুকরোর মত। আমিও কি ওখানে নেমে গেলে বেবির চোখে অমনি পাথর হয়ে যাবো? কালো পাথর?

দূরে সরে যাওয়ার ফলে বেবির চোখ থেকে নাসিমার মুখ অদৃশ্য হয়ে যায়। শুধু সাদা শাড়ি একটা রঙের পোঁচের মত আকাশের পটভূমিতে স্থির হয়ে থাকে। বেবির ভালো লাগে এই সাদা রঙটা থেকে এমনি দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে। অদ্ভুত, এমন কী অকারণ একটা কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে তার নাসিমার জন্যে। মনে মনে বলে, আমার কী যে ভালো লাগছে তোমার সঙ্গ পেয়ে তুমি তা জানবে না। আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না। আমাকে তুমি নাড়া দাও, ঝড়ের দোলায় অস্থির করে তোলো— আমার আর কোনো বাসনা নেই। আমাকে প্রশ্ন করো, লক্ষ লক্ষ অযুত প্রশ্ন।

নাসিমাই প্রশ্ন করল। কী ভাবছিলে?

কই কিছু না।

আমাকে বলতে তোমার ভয় করে?

নাসিমার ইচ্ছে হয় দু'হাত দিয়ে ধরে রাখে বেবির সুন্দর এখনো সবুজ মুখ। কোনদিন যেন তাকে হারাতে না হয় এমনি প্রার্থনায় কাঁপতে থাকে তার আত্মা। মমতায় নত হয়ে আসে নাসিমা। বলে, কেউ চুপ করে থাকলে আমার খারাপ লাগে।

কেন?

তুমি চুপ করে থাকলে আমার আরো খারাপ লাগে।

তখন বেবি ফস্ করে শুধোয়, তোমাকে কী বলে ডাকব?

আজ সন্ধ্যে থেকে এই সমস্যাটা তাকে পীড়িত করছিল।

বেবি গভীর প্রায় অসহায় একজোড়া চোখ মেলে তাকায় তার দিকে। নাসিমার ঠোঁট তখন নিঃশব্দ হাসির কাঁপনে ফুলে ওঠে। নাসিমা হাসে। বলে, ওই পোস্টের কাছে বসিগে চলো।

বেবি তখন একটা নিদারুণ লজ্জার হাত থেকে বেঁচে যায়।

নাসিমা তার কাঁধে হাত রেখে বসে।

কাদা তোমাকে স্পর্শ করেনি, তুমি কোনোদিন কাদায় নেবে যেও না।

নাসিমা মনে মনে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করলো বেবির জন্যে।

বেবিকে আমি ভালোবেসেছি, যেমন করে আকাশ ভালোবাসে প্রান্তরের একেলা গাছটিকে। যেমন করে পাখি তার সন্ধ্যেয় ফিরে আসে বাসাতে, তেমনি কি তুমিও ফিরে আসতে পারো না?

নাসিমার নিজেকে মনে হলো একটা শুকিয়ে ম্লান হয়ে যাওয়া বৃক্ষশাখা। বিশ্রাম কেউ নিতে পারে হয়ত, কিন্তু বাসা? বাসা কেউ বাঁধবে না।

নাসিমা বেবির চুলে যখন হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল তখন বেবির মন যেন অনর্গল একটা স্রোতধারা হয়ে উঠেছিল।

নাসিমা তার কানে কানে মুখ রেখে বলল, তোমাকে আমার এত আপন, এত ছোট মনে হয়। কথা দাও আমাকে তুমি কষ্ট দেবে না?

বেবি কিছুটা বিস্মিত হলো কিন্তু মুখে বলল না কিছু।

তখন নাসিমা বলল, আমি তোমার মা হতে চাই, বেবি। আমি তোমার মা।

বলতে বলতে উদ্বেগ যেন স্বেদ বিন্দুতে রূপান্তরিত হয়ে কাঁপতে লাগল নাসিমার কানের পিঠে, আর চিবুকে, আর কপালের ওপরে। বেবি তখন সমস্ত শরীরটাকে শিথিল করে দিল। কিছু বলল না। নাসিমা তাকে বুকের ভেতরে টেনে অসংলগ্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করল, এখানে, এখানে।

তারপর মাতাল-প্রায় কণ্ঠে বারবার—

— বেবি, বেবি, বেবি। তুমি আমার, বেবি।

যেন নিজের ওপরে আর কোনো কর্তৃত্ব নেই বেবির। আঙুলের ডগা দিয়ে সবকিছু একটা শীতলধারা হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার মনে হলো পৃথিবীর বাইরে সে চলে গেছে। কোনো কিছু দিয়েই আর সে এই অবস্থার পরিমাপ করতে পারবে না। বদলে, নাসিমা একটা প্রখর শক্তির জন্ম অনুভব করতে পারে নিজের ভেতরে।

বিছানার ওপর নিজেকে এলিয়ে দিয়ে পরম একটু স্বস্তি অনুভব করল নাসিমা আখতার। জীবন নয়, মৃত্যু নয়, ক্ষতি নয়— কিছুই আর নয়। শুধু পূর্ণতা। এই পূর্ণতা কিসের বা কেন তা তার নিজের কাছেই ঠিক বোধগম্য নয়। স্পষ্ট যা তা শুধু তার এই বিশেষ অনুভূতি।

এই পূর্ণতা আমি কতকাল প্রার্থনা করেছি আমার স্বপ্নে আমার জাগরণে কিন্তু কেবলি আঘাত।

মতির মা এসে বলল, অন্ধকারে শুয়ে আছেন, আপামণি, বাতি দেব?

দে।

বাতি জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কেউ যেন তাকে কঠিন একটা দৈহিক আঘাত করলো। মুখটা মুহূর্তের জন্যে বিকৃত হয়ে এলো; পরে বলল, কী বলবি বল?

খাবেন না?

খাবার কথা আজ মনেই নেই তার। এমনকি মতির মা মনে করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও সামান্যতম

তাগিদও সে অনুভব করতে পারল না।

দৃষ্টি তার নিবদ্ধ ছিল ঘরের কোণে রাখা টিপয়ের ওপর একটা উজ্জ্বল পদার্থের দিকে।

উঠে বসে শুধালো নাসিমা, ওটা কী?

কোনটা?

কাছে গিয়ে নাসিমার নিজেরই হাসি পেল খুব। জার্মান কাঁচিটা ওখানে পড়ে আছে। আরজু যেভাবে মেয়েকে সাজাতে শুরু করেছে তাতে করে সেলাই কল না কিনে উপায় কী? কিন্তু মেয়েটা এখনো গোছালো হলো না; আগের মতই এলোমেলো। কাঁচিটা কি তুলে রাখতে হয় না?

অন্য কোনদিন হলে নাসিমা ভয় পেত ভীষণ রকমে ওই রূপোলি তীক্ষ্ণতা দেখে। আজ সে শুধু হাত দিয়ে কাঁচিটাকে আলোর সরলরেখা থেকে সরিয়ে রাখলো। পরে মুখ ফিরিয়ে বলল, কই, খেতে দিবি নে?

যেন অপরাধটা মতির মার-ই। কিন্তু মতির মা আজ আটদিন হলো দেখে আসছে নাসিমাকে; তাই এতে সে বিস্মিতও হয় না, বিরক্তও হয় না। শুধু বলে, না বললে দিই কী করে?— ভালো কথা আপামণি, সন্ধ্যেয় আপনার জন্যে ফুল তুলে রেখেছি।

কথাটা শেষ করে মুখ টিপে হাসে। মুখটা তার চিকচিক করে ওঠে কৌতুকের তরঙ্গে। নাসিমা যেতে যেতে বলে, তরল কণ্ঠে, তুই মর মতির মা।

আজ সে তার শরীরে নতুন করে রক্তপ্রবাহ অনুভব করতে আসছে যেন। আর পৃথিবীর যেখানে যত সংকেত আছে সব কিছু যেন বোধগম্য হয়ে এসেছে। এত নির্ভরযোগ্য মনে হচ্ছে তার নিজেকে যে, নাসিমা আপন মনে হেসে ফেলল, কেউ যদি আজ তাকে বলত গান গাইতে তাহলে সে অনুরোধ রাখত।

আজ খুব করে খেল নাসিমা। খেয়ে একটা দম আটকানো ক্লান্তি অনুভব করলো। তারপর জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাত অনেক হয়েছে। পথের বাতিগুলো তাই এত উজ্জ্বল। রাস্তার এখানে ওখানে চকচক করছে অ্যাশফল্ট। আর কুকুর। আর একটা ঝড়ের মত মোটর কার।

নাসিমা এসে বসলো আরজুর আয়নার সমুখে।

তুমি আমার সন্তান। তোমাকে কেন্দ্র করে আমি বেঁচে থাকতে চাই অবিশ্বাসের এই পৃথিবীতে।

আয়নার সমুখে বসেও প্রতিফলনের দিকে দৃষ্টি নেই তার। শুধু শুধু বসা। হঠাৎ বরফ হয়ে গেল যেন সব কিছু।

আজ কি বেস্পতিবারের রাত? নইলে ওই ভিখিরিটা কেন এমনি করে নিশুতি রাতে কান্না করে যাবে পথের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি? গত বেস্পতিবার রাতে, প্রথম যে দিন এসেছিল, অমনি হয়েছিল। এত করুণ, নিষ্ঠুর আর হিম করা তার আর্তনাদ। মতির মা বলেছিল, রোজ বেস্পতিবার রাতে আসে আপামণি।

আজও এসেছে। একটা অর্ধবৃত্তের মত পথ ধরে তার আর্তনাদ শোনালো নাসিমার শ্রুতিতে।

নাসিমার মনটা চিৎকার হয়ে উঠতে চায়, হয় সে মরে যাক আর নইলে নিজে সে বধির হয়ে যাক।

হায় কই আল্লাহ্ কা পেয়ারা, নবী কা দুলারা— আন্ধা কো দো মুঠি খানা দে—এ—এ।

নাসিমা স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে কখন সে ডাক মিলিয়ে যাবে দূরে। এক সময়ে চলে গেল। কিন্তু নিজেকে আর যেন ফিরে পেল না নাসিমা।

অতলে, আরো অতলে।

কম্পিত দু'হাতে আয়নার পর্দাটা সে টেনে দিল তার প্রতিফলনের ওপরে।

দরোজার ওপরে দাঁড়িয়ে মুখ নিচু করে আবছা গলায় পারুল বলল, তাহলে তুমি সত্যি চলে যাচ্ছো।

নাসিমা তার খাটের ওপর সুটকেশ তুলে বই কাপড় গোছাচ্ছিল এতক্ষণ ধরে। কখন যে পারুল এসে দাঁড়িয়েছে সে বুঝতে পারে নি। তার কণ্ঠস্বরে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

পারুলের মুখটা কেমন ছায়া ছায়া হয়ে আছে।

এত কিশোরী তার মুখ যে দেখলে মমতা হয়। এখন সেই মুখ মেঘ ছায়া নিয়েছে। অস্পষ্ট হয়ে এসেছে মুখের রেখাগুলো। পারুল কি কেঁদে এসেছে কোনো নির্জন কোণ থেকে? নাসিমা এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখে দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিল। ব্যস্ত হলো তার গোছানোর কাজে।

পারুল যদি কাঁদতে চায় তাহলে তাকে কাঁদতে দেয়া ভালো। নাসিমা উত্তর করল, সত্যি করে বলার কী আছে? হ্যাঁ যাচ্ছি।

কিন্তু সহজ হতে পারল না নাসিমা। বিদ্ধ হয়ে রইলো পারুলের এই নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা। পারুল, তুমি চলে যাও।

যে দ্রুততা ছিল তার দু'হাতে এখন তা শিথিল হয়ে আসতে লাগল। এক সময়ে সে তাকিয়ে দেখল তার দু'হাত স্তব্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই। আস্তে আস্তে সমুখের দিকে দৃষ্টি করল নাসিমা।

এই বিন্দু থেকে কামরার তিনটে কোণ চোখে পড়ে। এইতো তার নিজের খাট। সুন্দর করে চাদর বিছানো ছিল--- নিভাঁজ, সাদা, কোমল— আজ সকাল অবধি। এখন তা ভাঁজ করে তুলে ফেলা হয়েছে। বোর্ডিংয়ের দেয়া পাতলা কাঠ-কাঠ তোষক বিশ্রী একটা শূন্যতার প্রতীক হয়ে পড়ে আছে বদলে।

আর ওই কোণে পারুলের বিছানাটা এখনো পাতা। সুন্দর করে পাতা। পারুল রঙিন চাদর পছন্দ করে। আজ দুপুরে যখন কামরায় কেউ ছিল না তখন চুপি চুপি সে পারুলের বিছানাটা শেষবারের মত নিজ হাতে পেতে রেখেছে।

সারাটা কামরায় ছিলাম আমরা দু'জন। আজ থেকে আমি থাকব না। শুধু পারুল থাকবে। তারপর হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয়ই, অন্য কেউ আসবে। নাসিমার মনে একটা বেদনার দল মেলে উঠতে চাইল। সেও কি তার নিজের মত করে ভালোবাসবে পারুলকে? তার পারুল? চকিতে ঘুরে তাকাল নাসিমা।

পারুল তেমনি স্থির দাঁড়িয়ে আছে। দরোজার ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবির মত স্তব্ধ তার শরীর। পারুলের কষ্ট হচ্ছে।

কষ্ট হলো নাসিমার।

চোখে চোখ পড়তে পারুল দৃষ্টি নাবিয়ে নিল।

তখন নাসিমা এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রাখলো, থরথর করে কেঁপে উঠলো পারুলের দেহ। নাসিমা কিছু বলল না। স্পর্শের তরঙ্গে তরঙ্গে শক্তি প্রবাহিত করে দিতে চাইল পারুলের আত্মায়। কিন্তু শক্তি নয়, প্রবাহিত হলো বেদনা। পারুলের চোখ থেকে মুক্তো পড়ল ঝরঝর করে।

নাসিমা বলল, তুই কাঁদছিস কেন? আমি কি চিরকাল থাকব? আর আমি থাকলে কষ্ট যে তোর। তোর কষ্ট আমি কী করে দেখব, পারুল? আমি—নাসিমার স্বর তার নিজের কানেই শোনালো রুক্ষ, কর্কশ সেটাকে চাপা দেয়ার জন্যেই কথা বন্ধ করলো নাসিমা।

পারুল আর পারলো না। কান্নায় বিকৃত কণ্ঠে উচ্চারণ করল, আমি কী করব? আমি এখানে থাকতে পারব না। আমাকে তুমি নিয়ে যাও।

পাগল। আমার জন্য তুই মরবি কেন? আর আমি চলে গেলেই— নাসিমা হাসতে চেষ্টা করল এখানে— কেউ কিছু বলবে না। মানুষের নীচতাকে আমি ভয় পাই, পারুল। শক্তি নেই, নইলে লড়তাম। তাই পালিয়ে যাচ্ছি।

আমারো শক্তি নেই নাসিমা আপা।

আছে।

দৃঢ়কণ্ঠে এই উত্তরটা নাসিমা বিশেষ করে উচ্চারণ করল।

— আছে, থাকবে না কেন? সবাই কি আমার মতো?

পারুলের জন্যে আমার মমতা হচ্ছে। কিন্তু আমি কী করব?

আমি চলে গেলে তোর খুব কষ্ট হবে জানি, কিন্তু আমার উপায় নেই। পারুল, শোন—

পারুল আঁচলে মুখ ঢেকে বলল, তুমি কী নিষ্ঠুর নাসিমা আপা।

নাসিমা তখন চুপ করে ভাবতে লাগল পারুলের মুখ, যা সে গতরাতেও চুমোয় চুমোয় নিবিড় করে তুলেছিল।

নাসিমার সমস্ত শরীর জ্বালা করতে লাগল। পুড়ে পুড়ে যেতে লাগল একেকটা স্নায়ু। পারুলকে একেলা ফেলে বাথরুমে এলো নাসিমা। এসে গায়ে পানি ঢালতে লাগল টাব থেকে।

পারুল বোধ হয় কাঁদছে। আমি যে মরে গেছি, একথা পারুল বুঝবে কী করে? এখন দূর থেকে শুধু ওর দুঃখটা বুঝতে পারি, কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দেয়ার শক্তি আর আমার নেই।

কলকাতা থেকে চলে এসে নাসিমা নতুন করে একটা মুক্তির সন্ধান পেয়েছিল পারুলের সান্নিধ্যে। স্কুলের সবচেয়ে তরুণী শিক্ষয়িত্রী পারুল— যে স্কুলে পড়াতে এসেছিল নাসিমা। প্রথমদিন ওর মুখ দেখে নাসিমার মনে হয়েছিল পারুল বড় অবলম্বনহীন। কিন্তু কত আপন, কত চেনা। একেকটা মুখ এমনি মিলে যায় পথ চলতে চলতে যাকে খুব চেনা লাগে— মনের কোনো একটা অস্পষ্ট মুখের সঙ্গে আশ্চর্য রকমে মিলে যায়। নাসিমা বেঁচে গিয়েছিল

পারুলকে পেয়ে। বোর্ডিং হাউসে নিজের কামরায় নিয়ে এসেছে ওকে ক'দিন পরেই। প্রথমে একটা ভয় ছিল পারুলের দিক থেকে, কিন্তু পরে দেখা গেছে, পারুলও যেন কতকাল ধরে প্রতীক্ষা করছিল নাসিমার জন্যে। পারুল বলেছিল, আমার মনে হয় তুমি না এলে আমি মরে যেতাম।

নাসিমা তখন বলতে পারেনি— পারুল, তোমাকে না পেলে মরে যেতাম আমিও।

কী পেলাম বা কী পেলাম না— এ প্রশ্ন পারুল আর তার ভেতরে জাগবে না কোনদিন। শুধু আত্মার সান্নিধ্য। শুধু উত্তাপ।

প্রবীর, আনিস, লাবু চা বাগানের সেই পশু—ওদের আঘাত করবার হাতিয়ার থেকে কত মুক্ত নাসিমার এই নতুন জীবন। ঘৃণায় অবিশ্বাসে যার মন ভরে উঠেছে তার মুক্তি কি আছে এমনি করে?

কোনো কোনো রাতে পারুল উঠে আসতো তার বিছানায়। তার উত্তাপে স্পন্দিত হয়ে উঠতো সে। পশুর উত্তাপ নয়; কোমল, শুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন একটা অনুভূতি। পারুল এতটুকু হয়ে আছে তার বুকের ভেতরে। এইসব মুহূর্তে চিরদিনের মত মরে যেতে পারত নাসিমা।

গোসল সেরেও জ্বালাটা কমলো না। ফিরে এসে দেখল পারুল ঘরে নেই। থাকবে বলে মনে মনে আশা করেছিল নাসিমা।

এখানকার সবাই তার বিরুদ্ধে চলে গেছে পারুলকে কেন্দ্র করে। কাদা ছড়িয়েছে। ছি-ছি-ছি। না, ও কথা আর মনে করবে না নাসিমা। নিজে রেজিগনেশন দিয়ে চলে যাচ্ছে— এর বেশি তার কিছু করার ছিল না। একেক সময় মানুষের উদ্যত জুতোর মুখে নিজেকে এত অসহায় মনে হয়। স্কুলের সেক্রেটারী খুশি হয়েছেন একটা ক্ষত সারানোর গৌরবে। রেজিগনেশন লেটার হাতে নিয়ে তার মুখ দেখার মত হয়ে ছিল। অতি দুঃখে, ঘৃণায় হাসি পেয়েছিল নাসিমার।

পারুল জানে, আমি বিনষ্ট কোনো বাসনার হাতে নিজেকে তুলে দিইনি। আমি কিছুতেই বোঝাতে পারব না, কাউকে না। আমার যে কত বড় আনন্দ এনে দিয়েছিল পারুল তা পারুলও জানবে না। তার জন্যে আমার দৃঢ় মুখটাই চিরকালের জন্য সত্যি হয়ে থাকবে।

যাবার আগে নাসিমা কাছে ডেকে নিল পারুলকে। বলল, তোকে মমতা দিয়ে কবর দিলাম। আমি যাই!

পারুল উত্তরে কিছু বলল না। তখন নাসিমা কণ্ঠস্বর আরো নামিয়ে প্রায় ফিসফিস কণ্ঠে উচ্চারণ করল, নিজেকে কোনদিন মরে যেতে দিস না, পারুল।

আর কিছু বলল না নাসিমা। দ্রুত মুখ ফিরিয়ে বাইরে দাঁড়ানো রিকশায় গিয়ে উঠে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখের সমুখে বিছিয়ে থাকা কাঁচা রাস্তাটাকে তার মনে হলো কত দীর্ঘ। এক বছর ধরে চেনা এখানকার দু'পাশে বাসা বাড়ি গাছ মনে হলো কত অপরিচিত।

সারারাত খুব বাতাস বইছে। সেই বাতাসের হাহাকার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল নাসিমার। পৃথিবীতে আজ এত হাহাকার কেন? কান পাতলে যেন একটা উত্তর শোনা যাবে দূর পৃথিবীর অন্তস্থল থেকে।

নাসিমা উঠে পানি খেয়ে এসে শুয়ে পড়লো আবার। বালিশটাকে আঁকড়ে ধরলো শিশুর মতো। আরজুর এই শোবার ঘর যেন আস্তে আস্তে বাতাসের ধাক্কায় বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে আসছে। প্রতি মুহূর্তে প্রসারিত হচ্ছে তাকে আরো ক্ষুদ্র করে দিয়ে। বেবির মুখ অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে চেষ্টা করলো নাসিমা। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলো না। এমন কি মুখের সামান্য একটা ভাঁজ কিংবা একটা কোণও তার মনে পড়ল না। আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না। অথচ আজ শিশুরাত্রিতে তার মুখ আমি দু'হাত ভরে তুলে নিয়েছিলাম।

নাসিমার মনে হলো সে একটা ভাসমান পাটাতনের ওপর শুয়ে আছে। দুলছে। ফুলে ফুলে উঠছে।

বেবির মুখ মনে করবার চেষ্টাটাও এক সময়ে হারিয়ে গেল। শুধু একটা শূন্যতা। আর বাতাসের ভয় । আর আরজুর কামরার বিশালতা। নাসিমা বালিশটাকে আরো আপন করে আঁকড়ে ধরলো সারাটা শরীর গুটিয়ে এনে এতটুকু একমুঠো করে।

আনিস বলেছিল তোমার মুখ আকাশের মতো। কৈশোরের সেই রক্তিম বয়সটা থেকে শুরু করে তেইশ বছর বয়স অবধি তাকে পূর্ণ করে রেখেছিল আনিস। আনিসকে তার আত্মার চেয়েও গভীর করে ভালোবেসেছিল নাসিমা। পৃথিবীকে আমার অযুত কৃতজ্ঞতা, আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই। আমার মৃত্যুর মুহূর্তেও যেন দুচোখ ভরে উজ্জ্বল হয়ে থাকে আনিসের মুখ।

কিন্তু সাপ—সাপকে কি কেউ মনে রাখে?

আনিসের অস্তিত্ব একটা সাপের মত পিচ্ছিল, ক্রূঢ় সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে এক সময়ে। তোমাকে আমার অদেয় ছিল না কিছু। তুমি আর কী চেয়েছিলে আমার কাছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর সে কোনদিন পাবে না।

শুধু একদিন সে তাকিয়ে দেখেছে— আনিস দূরে সরে যাচ্ছে। আনিস খুঁজে নিচ্ছে তার নতুন বন্দর।

হামেদ তার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছে, সিমু, তোর কী হয়েছে বলতো? কিছু না, কিছু না।

কিন্তু কণ্ঠস্বর ছিল তার বাষ্পে আকুল।

মনে আছে, হামেদ তখন তাকে খুশি করে তুলবার জন্যে কী-ই না করেছে। হামেদ তো জানতো না, আমার এ দুঃখ অন্তরে বাহিরে এমন কিছু নেই ভুলিয়ে দেয়। হামেদ তাকে সারাক্ষণ নিয়ে বেরিয়েছে সিনেমায়, রেস্তোরাঁয়, জিনিস কিনে দিয়েছে রাশ রাশ। বলেছে, তোর যা খুশি বল— আমি আছি কী করতে?— আমি এনে দিচ্ছি। একেক সময় নাসিমারও বিশ্বাস করতে লোভ হতো এমনি করে হয়ত সে পেয়ে যাবে একদিন সব ভোলানো এক বিস্মৃতি। মগ্ন হয়ে থাকতো, থাকতে চেষ্টা করতো। কিন্তু কিছুতেই যে আর কিছু হবে না, একেকটা মনের মনে রাখবার ক্ষমতা যে এমনি অসাধারণ, এটা সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল আরো অনেক পরে।

কিন্তু তখন একেকদিন খুব করে সজ্জা করে, নতুন কেনা উজ্জ্বল শাড়িটা পরে, বাইরের চলমান স্রোতে নিজেকে প্রবাহিত করে দিয়ে ভাবতো— এই আমি বেরিয়ে আসতে পারছি স্মৃতির থাবা থেকে। হয়ত তা সফলও হতো কিছুক্ষণের জন্যে, কী একটা দিনমানের জন্যে, কিন্তু যখন হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ত তখন দিনের পর দিন চোখ তুলে কারো দিকে তাকাবার শক্তিটুকু অবধি থাকতো না। নিজেকে তখন চরম একটা অবহেলা আর অযত্নের হাতে ছেড়ে দিয়ে নাসিমা শিক্ষিত করত নিজেকেই। এতটুকু কষ্ট তার সইতে পারেনি কেউ কোনদিন। হামেদও না। বার থেকে যতটুকু বোঝা যায় তার কষ্টের রূপ দেখে হামেদ ব্যথিত হতো, কিন্তু কিছুই করতে পারত না।

হামেদের আকুলতা দেখে নিজের ওপরেই আক্রোশ হতো নাসিমার। কেন আমি হামেদকে বিচলিত করে তুলছি তার মমতামূল অবধি?

একদিন সকালে উঠে সে প্রাণভরে নাইলো। নেয়ে আসবার পর নাশতার টেবিলে বসে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, আবার সে পড়বে। এম. এ. দেবে— সেটা এতদিন শুধু উৎসাহের অভাবে পড়ে ছিলো। হামেদ বলল, বেশ তো।

হামেদের স্বস্তি-সুন্দর মুখখানা তখন কী যে ভালো লেগেছিল নাসিমার।

—- পরীক্ষা দিবি এতো ভালো কথা। আমিও এদ্দিন তাই ভাবছিলাম। চল আজকেই, রি-অ্যাডমিশন করিয়ে নি, কী বলিস?

চলো আজকেই। আর কিছু বইও কিনতে হবে। আর আমাকে, ভাইয়া, পড়বার জন্যে, হালকা একটা চেয়ার কিনে দেবে কেমন?

এত স্বচ্ছ সহজ কণ্ঠে সে কথা বলতে পারছিল তখন যে তার নিজের কানেই মনে হচ্ছিল অন্য কারো সুন্দর স্বর সে শুনতে পাচ্ছে।

হামেদের তখুনি হুকুম হলো বারান্দার কোণ খালি করে দেয়ার জন্যে। ওখানে সকালের রোদে, ঘরে যদি ভালো না লাগে, নাসিমা পড়তে পারবে। আর স্ত্রীকে বলল বাক্স থেকে একটা পর্দা এনে কোণটাকে আড়াল করে দিতে।

সন্ধ্যের ভেতরেই হামেদ এত নিপুণ হাতে সব আয়োজন করে দিল যে, নাসিমার মন ভীষণ রকমে প্রসন্ন হয়ে উঠলো। অনেক রাত অবধি পড়লো সে সেদিন।

সেই মাসগুলোতে সুখ কিংবা দুঃখ কিছুই আর সে যেন অনুভব করতে পারত না। এমনি করে পরীক্ষা দেয়া অবধি। নিজেকে সে একটা কোনো বৃত্তিতে নিযুক্ত রাখতে পেরেছে এটাকে তখন অবধি মুক্তি বলে মনে করলেও পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর তা রইলো না।

আবার নিঃসঙ্গতা। আবার বরফের কুচিতে যেন সে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছে এমনি প্রাণহীন শীত। দূর থেকে কতদিন আনিসকে দেখেছে কিন্তু মুখ ফেরায়নি। আনিসের জন্যে কষ্ট পাবে কিন্তু আনিসের কাছে আর সে ফিরে যাবে না।

এই কষ্ট পাওয়ার নেশা বিস্তৃত হয়ে ছিল বিয়ের পর অবধিও। বরং আরো নিবিড় করে অনেকদিন মনে পড়েছে সেই মানুষটাকে যে তার আত্মাকে চিরকালের মত নিঃসঙ্গ করে গেছে।

আর লাবু চা বাগানের সেই মানুষটার নাম কী ছিল? আশ্চর্য তার নামও আনিস। শুধু উপাধিটা আলাদা।

নাসিমা প্রথম দিনই নাম শুনে চমকে উঠেছিল। কিন্তু বুঝতে দেয়নি হামেদকে। মনে মনে তার ভাবনা এসেছে, যেন এক নামের দুটো মানুষ — একটা সাধারণ বিন্দু থেকে পরস্পরের বিপরীতে তীরের মত দুটি রেখা ছুটে গেছে। তাদের গতিতে, দৈর্ঘে, বর্ণে কোনো মিল নেই। অস্পষ্ট একটা সহানুভূতি কিংবা সঠিক করে বললে কৌতূহল হয়ত গড়ে উঠেছিল এই নতুন আনিসের জন্যে।

লাবু চা বাগানের ম্যানেজার আনিসের বাংলো আলো করে আমি এসেছিলাম। কিন্তু সে আলো নিভিয়ে দিয়েছে আনিস নিজে।

বাংলার দু'কামরার মাঝখানে উঁচু টুলের ওপর জ্বলছিল পেট্রোম্যাক্স।

শরীরটা ছায়ায় আবৃত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছিল নাসিমা। স্লানগতি চলচ্চিত্রের মত শিথিল ভাসতে ভাসতে ছায়াটা তাকে জড়িয়ে ধরছে, শ্বাপদের আলিঙ্গন যেন।

নাসিমা জানে কে এলো। এমনি ছায়া আজ কয়েক মাস ধরে তার শরীরে পড়েছে। তাই প্রথমে চমকে উঠলেও মুখ ফেরাল অনেক্ষণ পরে, আস্তে আস্তে।

মুখ ফিরিয়ে দেখল— আনিস। খাকি ট্রাউজার এখনো পরনে, সেটা পরে সারাদিন চা বাগান ঘুরে এসেছে। কেবল উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত। হাতে হুউস্কির গ্লাস— প্রায় আদ্ধেকটা এখনো ছলছল করছে গলিত সোনার মত।

আনিস কোনো কথা বলল না। তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। নাসিমার মনে হলো একটা পাহাড় তার পেছনে বিপজ্জনক রকমে বেড়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তে। কেন কোনো কথা বলছে না আনিস?

কথা নয় পানীয় পানের শব্দ পেল নাসিমা।

গ্লাসটাকে টুলের ওপর রাখতে রাখতে আনিস বলল, আমি জানি তুমি কার কথা ভাবছ।

নাসিমা যেন জানত আনিস এ কথা বলবে তাই স্তব্ধ হলো না তার রক্তপ্রবাহ। এমন কি যখন হঠাৎ আনিস চিৎকার করে উঠল, তখনও না। আনিসের বীভৎস দ্রুত কণ্ঠস্বরে বাংলোর দেয়ালে দেয়ালে করাঘাত বেজে উঠল যেন।

আমি চাই না আমার সমুখে কেউ থাকবে। বুঝেছ? ইউ আন্ডারস্ট্যাণ্ড? —নো মেমোরি— নাথিং — আই হ্যাড এনাফ অফ দোজ।

নাসিমা কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল । চলে গেল পাশের কামরায়। স্মরণ কি পাপ? ভাগ্যের পরিহাস, দুজনেরই এক নাম।

চলে যেতে যেতে নাসিমা শুনতে পেল আনিস তার চেয়ারটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিল। তারপর আর কিছু না । অন্ধকার কামরায় গিয়ে শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে দিল নাসিমা। শুধু শরীর নয়, মনের দিক থেকেও এত ক্লান্ত লাগছে তার যে সামান্যতম প্রতিবাদেরও কোনো স্পৃহা নেই তার।

আনিস হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল দেখে একবার মনে হলো উঠে গিয়ে দেখে আসে কী হলো লোকটার?—যেন চিৎকার করে সব কিছু ছিটিয়ে ছড়িয়ে ফেললেই সে নিশ্চিত হতে পারত। তারপর বালিশে মুখ লুকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে এক সময়ে । আস্তে আস্তে মন থেকে কান্নার স্পষ্ট কারণটা অপসারিত হয়ে গেল— শুধু বেঁচে রইলো কান্না।

তুমি মদ খাও আনিস, আমি তাতে কোনদিন কিছু মনে করিনি। বরং বিয়ের পর এখানে এসে যেদিন জানলাম, মনে মনে একটা আঘাত পেলেও, বার থেকে আমার হাসিমুখ দেখে তুমি যে প্রীত হয়েছিলে সেটাই ছিল আমার সোনার মত পাওয়া।

আমি তোমাকে অবলম্বন করে পূর্ণ হয়ে উঠতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু বিপরীতে আমাকে তুমি বুঝতে চাইলে না। আনিসকে আমি ভুলে যেতে পারিনি, কিন্তু তোমাকে তো ফিরিয়ে দিই নি ? সুদূর একটা দ্বীপের মত করে কাউকে মনে রাখা কি পাপ? আনিস আমার জন্যে মরে গেছে। মৃতকে যদি ভুলে গিয়ে না থাকি তার মানে কি এই যে, জীবিতকে আমি অস্বীকার করছি? নিজেকে আমি শ্রদ্ধা করব না? আমার ফেলে আসা আমাকে?

বিয়ের পর নাসিমা মনের সমস্ত কথা খুলে বলেছিল স্বামীকে। নিজেকে নিবিড় আলিঙ্গনে সঁপে দিয়ে বলেছিল, যখন আনিস শুধিয়েছে, তোমার কথা বলো। বলবে?

বলবো।

তারপর প্রথম প্রেমের কথা বলতে গিয়ে, তার নামও ছিল আনিস।

মরে গেছে?

আমার কাছে।

তখন আনিস বুঝতে পারেনি— আনিস মরে গিয়ে কী চরম শোধ নিয়েছে তার ওপরে। তখন সে বলেছে, আমি তোমার আনিস। যে গেছে সে চলে গেছে।

যে গেছে সে চলে গেছে সত্যি, কিন্তু মনের নিয়ম মানে না কোনো যুক্তির সিঁড়ি। বিষুব রেখা পার হয়ে এলে যেমন উত্তর থেকে এসে থাকি দক্ষিণে—আর দু'চোখে থাকে না তখন উত্তরের আকাশ, তখন শুধু দক্ষিণ, মনের পৃথিবী তো তেমন নয়!

একটা ছবির ওপর আরেকটা ছবি এসে পড়ে, দুটো মিলে নতুন ছবি হয়। পেছনেরটা মুছে যায় না। পরে পরে আরো ছবি—আরো আকাশ। আঘাতের পর আঘাতে ভেঙ্গে যেতে থাকে প্রেক্ষিত। জ্বলে পুড়ে তখন ছাই হয়ে যেতে থাকে হৃদয় আর আত্মা আর স্মৃতি আর স্নায়ু আর চেতনা— যে আগুন আজ জ্বলছে নাসিমার।

সেদিন যদি তার কখনো কখনো এই মনে রাখা মেনে নিতে পারত আনিস, তাহলে কী হতো? তাহলে আমাকে বারবার মরে গিয়ে নতুন জন্মের জন্য অধীর হয়ে উঠতে হতো না : তুমি আমার, সম্পূর্ণ আমার, কমপ্লিটলি, আর কারো কথা আমি জানতে চাই না।

আনিস ঘরে এসে নতুন করে পানীয় ঢালতে ঢালতে বলল— দেয়ার মাস্ট বি নো ওয়ান। ইউ হিয়ার?

আবার কান্না পেল নাসিমার। সম্পূর্ণ করে সে দিতে চেয়েছে, দিয়েছে নিজেকে। যদি মনে পড়ে থাকে প্রথম প্রেমের কথা, তা কি তুমি সহ্য করতে পারো না? মনে মনে সে মিনতি

করল স্বামীর উদ্দেশে— আমাকে তুমি এতটুকু দাও, তোমাকে আমার কোনো অনীহা স্পর্শ করবে না, আমার মনে কোনো মালিন্য নেই— এ কথা তুমি বিশ্বাস করো একবার।

আনিস ডুবে যাচ্ছে নেশায়। শেষ পানীয়টুকু তা সম্পূর্ণ করে দিয়ে গেল। তখন যেন উদ্দাম হয়ে উঠলো সে।

দিনের পর দিন দেখে আসছি, তুমি—তুমি ভুলতে পারছ না।

নাসিমা এত বড় অপবাদ সইতে পারল না। কখনো কখনো সে স্মরণকে ফিরিয়ে এনেছে বৈকি, সেটাই অসহ্য হয়ে দাঁড়াল? বলল, তুমি ভুল করছো।

লায়ার।

সব তোমার ভুল।

ইউ বিচ।

শোনো, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না, আমি তোমারই।— ছি-ছি লোকে কী ভাববে বল তো? বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল নাসিমা। আনিসের শেষ কথাটা যেন এতক্ষণে তার কানে গিয়ে পৌঁচেছে। কয়েক মাসের মিনতির পুতুল সে আজ চূর্ণ চূর্ণ করে ভেঙ্গে ফেলে দিল। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঋজু গলায় উচ্চারণ করল, আমার ঘর থেকে তুমি বেরিয়ে যাও। যাও বলছি। একশো বার আমি মনে করব, আমার যা খুশি করব, তোমার কী তাতে?

পশু, ছোটলোক। শ্রদ্ধা নেই যার হৃদয়ে তাকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমার হৃদয় তুমি থুতু দিয়ে ভরে তুলেছ। আমি তোমাকে ক্ষমা করব কী করে?

কিন্তু আনিস নড়লো না। তখন নাসিমা নিজে বেরিয়ে এসে পাশের কামরায় খিল তুলে দিল। সারাটা শরীর তার বেতস-লতার মত থরথর করে কাঁপছে। দ্বিতীয় মৃত্যুর অনুভূতি বুঝি এমনি হয়।

অনেকরাত অবধি সেদিন লাবু চা বাগানের ম্যানেজার তার দরোজায় করাঘাত করেছে শিলাবৃষ্টির মত— আর অভিশাপ।

নাসিমা। নাসিমা। নাসি- মা-আ।

তবু সে দরোজা খোলেনি।

আই উইল কিল দ্যাট সোয়াইন। আই হেট হিম। গিভ মি মাই গান। ইউ কাম আউট, নাসিমা।

তার উঁচু পর্দাটা নেমে এসেছে। থেমে গেছে করাঘাত। তখন বিড়বিড় করে, লেট মি ইন- লেট মি ইন- লেট মি ইন।

ঘুমের মত তার কণ্ঠস্বর যেন আস্তে আস্তে তলিয়ে গেছে। আর সারাক্ষণ নাসিমা অন্ধকারে লড়াই করেছে নিজের সঙ্গে।

এর পরে তাদের আর কোনো কথা হয় নি। পরদিন বিছানা পাশের ঘরে নিয়ে এসেছে নাসিমা।

চারদিন পর। সেদিন দুপুরে ঘুমিয়েছিল তার বিছানায়। সারাটা বাংলো দুপুরের নিশুতি নূপুরে আর বাইরের চোখ ধাঁধানো রোদে নিমগ্ন হয়েছিল।

হঠাৎ কী একটা শব্দে আর নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। যেন কেউ তাকে জাগিয়ে দিল অতি সন্তর্পণে। মুখ ফেরানো ছিল জানালার দিকে। চোখ মেলেই পাহাড় আর স্তব্ধ নিবিড় আকাশ। অনুভব করল মনে মনে সেই মানুষটার উপস্থিতি। তুমি কি অনুতপ্ত? আমি আর বহন করতে পারছি না, আমার অভিমান এত বিশাল হয়ে উঠেছে। তুমি একবার ডাকো, ক্ষমা করবার জন্যে আমার মন আকুল হয়ে আছে। ধীরে ধীরে মুখ ফেরালো নাসিমা।

চোখে চোখ পড়তেই যেন বধির হয়ে গেল সে। চিৎকার করে উঠল, না– না।

আনিসের মুখ অনুতাপে নয়, লালসায় ক্ষুধায় আরক্ত হয়ে উঠেছে। ঠিক তখন সমস্ত শরীর আর মন ঘৃণায়, বিদ্রোহে, বঞ্চনায় বিদীর্ণ হয়ে গেল। একটা বমি উলটে আসতে চাইলো পাকস্থলী থেকে। জট পাকিয়ে কঠিন হয়ে গেল শরীরের প্রতিটি স্নায়ু। এ তুমি কি করলে আমার?

এরপর দু'দিন পর পর ফিট হলো নাসিমা। আনিস দৃষ্টি করলেই, মনে হতো কতগুলো কীট যেন শরীর বেয়ে উঠতে চাইছে। গোসলের জন্যে মনটা অধীর হয়ে উঠতো। মিথ্যে, সব মিথ্যে। শরীরটাকে তখন একটা ভার মনে হতো তার যা তাকে চিরকাল বইতে হবে।

কাদার আলপনা আর থুতু। কাকে আমি ক্ষমা করতে চেয়েছিলাম? আমি সাজিয়ে নেবো আমার পৃথিবী আমার জন্যে। আমার অহংকার হোক নির্মম।

আসামকে পেছনে ফেলে কলকাতায় এলো নাসিমা।

উজ্জ্বল রোদে সারা বুড়িগঙ্গা যেন সোনা হয়ে আছে। ঢেউয়ের দোলায় উঠছে পড়ছে নৌকো, ছোট বড় নৌকো। দুপাশের ছড়ানো গ্রাম আর দূরে ঘন গাছের সারি আর খেত মাঠ– জল রংয়ে আঁকা বিশাল একটা ছবির মত মনে হচ্ছে।

পৃথিবীতে এত আলো আছে, নাসিমা কি তা জানতো?

ছইয়ের পিঠে হেলান দিয়ে, শরীরের নিচে শীতল স্রোত প্রবাহ অনুভব করতে করতে নাসিমার মনে হলো, যে মুখটা ছাইমাখা হয়েছিল এতকাল, আজ হঠাৎ তা ধৌত হয়ে গেছে। পৃথিবী তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে তার এই রৌদ্র দিয়ে। বেবিও পাশের গলুইয়ে চুপচাপ বসে দাঁড় টানা দেখছিল।

দিনের আলোর এমন একটা জয়ী মনোভাব আছে যে রাত্রির সমস্ত চিন্তা, চেতনা আর সিদ্ধান্তকে হাস্যকর করে দিতে চায় । কাল রাতে নাসিমার যে সংলাপগুলো তাকে স্বপ্নের সংকেত এনে দিয়েছিল আজ তা মনে করে লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠছে বারবার বেবি।

নৌকোয় আসবার উদ্যোগটা ছিল নাসিমার।

কতদিন সাঁতার কাটিনি। এখানে সাঁতারের সুবিধে নেই, বেবি?

কি জানি। ভালো পুকুর তো নেই।

নদী? ভাড়া নৌকো মেলে না?

খুব।

তাহলে কাল চল। যাবে?

আজ তাই বেরুনো।

বেবির সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে নাসিমা আশ্চর্য রকমে কদিন থেকে শান্ত হয়ে আছে। কেবল একটা মুক্তি, একটা পরমপ্রাপ্তি, দীর্ঘকাল ধরে কেবলি বঞ্চনার পর। সেই সুখ হীরে হয়ে আছে নাসিমার সত্তায়।

নাসিমা বাইরের উজ্জ্বল পৃথিবীর সঙ্গে বহুদিন পরে নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করছে আজ। পেছনে কত দূরে ফেলে এসেছে ঢাকা।

বেবি।

বেবি তখন এপাশে এসে বসলো। বসে চলমান দৃশ্যের দিকে মনোযোগী দৃষ্টি করে রইলো।

কী ভাবছ?

কই কিছু না। দেখছি।

মিছে কথা। আমি জানি তুমি কী ভাবছ। বলব?

নাসিমা ব্যথা অনুভব করলো বেবি লুকোচ্ছে বলে। আসলে হয়ত বেবি লুকোয়নি কিছুই– ওটা নাসিমারই একতরফা ধারণা। বেবির চুলে হাত দিয়ে কাল রাতে মুঠো করে ধরতে ধরতে সে একটা বিয়োগ অনুভব করেছে। তীব্র একটা বিয়োগ। কেন এই ব্যর্থতা? বেবির সমস্ত কিছু সঞ্চিত, উদ্ঘাটিত, মিলিত হোক তার অন্তরে। আর কোনো বাধা, কোনো দূরত্ব, কিছুই নয়। এমন কী দুরাশায় তার মনে হয়েছিল বেবি গলে গলে সুধা হয়ে যাক, আমি সেই সুধা পান করবো।

বেবি তার সমস্ত আদর আর প্রশ্নের মুখে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছিল। কিন্তু তবু তার মনে হয়েছে, এই মুহূর্তে বেবি কী ভাবছে তা আমি কোনদিনই জানতে পাবো না। কিন্তু কেন? প্রশ্ন করে নি, কেননা, অভিজ্ঞতা তাকে বলেছে— আমরা কত কম বলতে পারি, তুলনায় যা আমরা বলতে চাই। আর যদিও বা বলতে পারি, সেই প্রকাশের স্বরূপ কখনোই হয় না যথার্থ। তাই কী লাভ? যদি এমন হতো, যে আমার আপন তাকে কোনো প্রশ্ন না করে শুধু স্পর্শ দিয়ে স্পষ্ট করে জানতে পেতাম তার আত্মার প্রতিটি তরঙ্গ।

একেকটা মানুষ তার শরীরে নিজস্ব একটা পৃথিবী। একটা বিরাট আকর্ষণ তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে নতুন একটা সৌরকক্ষের দিকে— পরস্পর সেই আকর্ষণ-কেন্দ্র থেকে ধার করা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠতে পারে কিন্তু যে কোনো কোণ থেকে মিলিত হওয়ার বাসনায় জ্বলে ছাই হয়ে শুধু নিশ্চিহ্নই হবে— আর কিছু নয়। ব্যবধান কি তাই?

নাসিমা আখতার, আমরা কেউ উত্তর দেব না এই প্রশ্নের। একমাত্র যাকে তুমি শ্রদ্ধা জানাতে পারো তা মৃত্যু। একমাত্র যা তুমি অবলম্বন হিসেবে পেতে পারো তা মৃত্যু। একমাত্র যাকে তুমি নির্ভর করতে পারো তা মৃত্যু। আত্মার ভিতরে, পৃথিবীর জ্বলন্ত কেন্দ্রের মত, গুপ্ত, গতিমান মৃত্যুর অমর চক্র।

পাড়ে নেমে নাসিমা যেন হঠাৎ ছেলেমানুষ হয়ে গেল। এমন একটা চঞ্চলতা সে অনুভব করল তার শরীরে যা দুরন্ত বাতাসে কাঁপন লাগা পাতার অনুরূপ। নেমেই বলল, কী সুন্দর না?

উত্তরের অপেক্ষা করল না। চঞ্চল চোখে দৃষ্টি করতে লাগল চারদিকে, যেন মুহূর্তের সামান্যতম প্রাপ্তিকেও সে হারাতে চায় না। পায়ের স্যান্ডেল ছুঁড়ে ফেলে বলল, তুমি নাইবে না?

বারে, নইলে এলাম কেন?

বেবিরও তখন সেই লজ্জাটা হারিয়ে গেছে। তার তরুণ মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে রৌদ্রে। কথা বলতে বলতে সে শার্ট খুলে রাখলো। একে একে খুললো ট্রাউজার, ঘড়ি আর মোকাসিন। তারপর সবগুলো জড়িয়ে নৌকোয় ব্যাগের ভেতরে রেখে এলো। নৌকোটা এখান থেকে অনেক দূরে।

নাসিমা পানিতে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে ডুবতে লাগল তার শরীর। যখন শুধু গলা অবধি জেগে রইলো তখন বেবি দ্রুত দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার পাশে পানি আর রোদ ছিটিয়ে। টুক্ করে নাসিমা কপট বিরক্তিতে সরে গেল দূরে। আর তাকে ধাওয়া করলো বেবি। এক সময়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো দুজনে।

দিনের আলো আর বেবিকে বিব্রত করছে না। অন্য এক পৃথিবীতে কখন সে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসতে হাসতে পানিতে হাসিতে একঠায় হয়ে গেছে নাসিমা।

এই বেবি!

নাসিমা একটা চাপড় দেয় কাঁধে আদর করে, কিন্তু মুখরেখায় ফুটিয়ে রাখে শাস্তি দেয়ার একটা প্রকট অভিব্যক্তি।

আমি তোমাকে কোনো মূল্যেই প্রতারিত হতে দেব না, বেবি।

বেবি তখন দ্রুত পানি ঠেলে হাঁপিয়ে তোলে নিজেকে। ফস ফস ডুব দেয় আর মুখ তোলে। বেবিকে আমি এত ভালোবেসেছি যে আমার হৃদয়ে তার কুলান হবে না।

পানিতে ভিজে দুজনের মুখ নতুন হয়ে উঠেছে। দুজনকে দেখাচেছ যেন দুটো বিরাট মাছ। নাসিমা বেবির পাশাপাশি সাঁতার দিতে থাকে।

বেবি।

উঁ।

বেবি।

বলো। বলো না?

না, কিছু বলবো না। তোর নাম ধরে শুধু ডাকব। ডাকব?

বেবি কিছু বললো না। এমনকি নাসিমার মুখে কখন যে সে তুমি থেকে তুই-তে রূপান্তরিত হয়ে গেছে তা বুঝতেও পারলো না। শুধু ভাবলো, নাসিমা তাকে এমন করে বেঁধে ফেলেছে যে আর কোনদিন তার বাঁধন থেকে সে মুক্ত হতে পারবে না।

বেবি, তুই দুষ্টু। ভারী দুষ্টু। দুষ্টু, দুষ্টু।

নাসিমা বেবির গায়ে পানি তুলে মৃদু আঘাত করতে করতে আধো চোখ বুঁজে উচ্চারণ করতে থাকে। আমার সব প্রীতি তোর জন্যে। স্পষ্ট অনুভব করতে লাগল তার হৃদয় পাত্র থেকে কী এক নামহীন তবল আধেয় আস্তে আস্তে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে– আর শূন্যতাটুকু ভরে উঠছে বেদনার মত মধুরতায়।

বেবি যেন পানিতে ভিজে ভিজে ছোট হয়ে যাচ্ছে।

বেবি উঠে এলো। তখনো পানিতে রইলো নাসিমা।

বেবি তাকে ভুল বুঝবে না। এই বিশ্বাসে এখন তার মন নত হয়ে এলো। বেবিকে সে কিছুতেই হারাতে পারে না। বেবি প্রবীর নয়, আনিস নয়, বেবির জন্যেই যেন সে দীর্ঘকাল মৃত্যুর পর মৃত্যু পার হয়ে এসেছে। বেবি, আমার বেবি।

নাসিমা গা ভাসিয়ে দিয়ে রইলো পানিতে।

মনের সমস্ত জটিল গ্রন্থিগুলো যেন খুলে যাচ্ছে একের পর এক অপরূপ এই শীতলতায়। মনে হলো অনেক ওপরে উঠে গেছে, পৃথিবীর মালিন্য ছাড়িয়ে, বাইরের নিয়মের বর্শা এড়িয়ে— ওপরে— অনেক ওপরে— তার নির্মম অহংকার নিয়ে আত্মীয়তায় প্রীত হয়ে উঠেছে তার আত্মা সেই ঊর্ধ্বের সঙ্গে।

শৈবাল লতার মত নাসিমা আখতার শীতল-সবুজ, ভাবনাহীন, প্রয়াসহীন, প্রসারিত, দীর্ঘ, প্রবাহিত, আকণ্ঠ হতে লাগল দুপুরের বুড়িগঙ্গায়।

একটা ছায়ায় বসে প্যাকেট থেকে লাঞ্চ খেলো তারা। দুজনে দুজনার জন্যে এত প্রস্তুত হয়ে উঠেছে যে বড় একটা কথা হলো না এই সময়ে। বেবির মন চলেছে একটা সরল রেখায়— নিজের কাছে অস্পষ্ট উৎস থেকে উৎসারিত কৃতজ্ঞতায় সে তখন থেকে বিনম্র, বাকহীন। অন্যদিকে নাসিমা যখন ছায়াটায় এলিয়ে শুয়ে পড়ল আকাশের দিকে মুখ করে তখন তার মনে নতুন একটা রূপ গড়ে উঠছে কোমল আভার মত আস্তে আস্তে।

যে পৃথিবী আমি সৃষ্টি করতে চেয়েছি, তোমার নিষ্ঠুরতায় তা বারবার ভেঙ্গে গেছে। আমি সরে এসেছি। পালানো, শুধু পালানো। থুতু আর কাদার আলপানা ধৌত করে অমলিন হতে পারলাম না— এড়াতে পারলাম না স্মৃতির নখর। পালানোর শক্তিটুকুও আজ আমার শেষ হয়ে গেছে। এক মুহূর্তে যা সত্যি বলে আঁকড়ে ধরি, পর মুহূর্তে তা মিথ্যে হয়ে যায়— ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়।

কেন একেকটা মানুষ হবে অমন নিষ্ঠুর? হয়ত আমাকে মরতে হবে তাই। কিন্তু আগুনে পুড়ে পুড়ে আমি খাঁটি সোনা হতে পারলাম না, হয়েছি ছাই— করুণ একমুঠো ছাই। শুধু ছাই। বেবি, তুমি আমার বাহু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যেও না।

আমাকে তোর কী মনে হয়, বেবি?

বেবি গভীর চোখে তাকিয়ে রইল শুধু। নাসিমা তখন যোগ করল, আমাকে তুই ঘৃণা করবি? — যেমন সবাই আমাকে করে?

না।

সত্যি।— আমাকে দেখে তোর ভয় হয় না?

কেন?

আমি যে অমঙ্গল।

হোক। তুমি আমার মা।

নাসিমার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আলোর মত।

আমার গা ছুঁয়ে বল, সত্যি।

বেবি তাকে স্পর্শ করলো।

প্রথম দিনে মনে আছে তোর? তুই এসেছিলি তোর প্রফেসরকে খুঁজতে। আমি তোকে বসতে বললাম। তোকে দেখে অবধি আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল তুই আমার অনেকদিনের হারানো ছেলে। আমার সন্তান নেই— আমার অংশ থেকে জন্ম নিয়েছে যে চেতনা, তুই যেন তার রূপ ধরে সেদিন সন্ধ্যেয় আমার দু'চোখ আলো করে এসেছিলি। বলেছিলি তোর মা নেই। মারা গেছেন সেই ক- বে । আমি যে তোর মা তুই কি তা তখন বুঝতে পারিসনি? আমার দু'বাহু আকুল হয়ে উঠেছিল তোকে ধরে রাখবার জন্যে। তুই সেদিন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলি, না?

নাসিমা যা ভাবছিল তা খানিকটা এমনি। কেবল শেষ কথাটা শব্দ হয়ে গড়িয়ে পড়ল ঠোঁট থেকে। বেবি শুধালো বুঝতে না পেরে, কবে?

কিছু না, বেবি। আমার হাতটা তুই ধরে থাক। বল, আমাকে তুই ফেলে যাবি না।

না, আমি যাবো না । আমি তোমার কাছে থাকব।

বেবি তার দু'চোখ দিয়ে নীরবে এই অঙ্গীকার পাঠাল নাসিমাকে।

অনেকক্ষণ পরে নাসিমা বলল, লেখাপড়া শেষ করে বাসা নিতে পারবি না? আমি তখন তোর কাছে এসে থাকব। তারপর বউ আনব ঘরে। সোনার মত বউ।

বেবি লজ্জা পেল।

– হ্যাঁ সত্যি, আমি কি মিছে বলছি? আমার কোল ভরে উঠবে তোদের পেয়ে। আমার আর কোনো ভাবনা থাকবে না। এত সুখ কি আমার সইবে, বেবি?

বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল নাসিমা।

বেবি চঞ্চল হয়ে উঠলো।

অশ্রু ঝরে পড়ছে নাসিমার চোয়ালের পাশ দিয়ে, শীর্ণ কণ্ঠনালির দু'পাশে। কিন্তু কোনো বিকার নেই সারা মুখে।

বেবি মুছে দিতে চাইলো অশ্রু।

কাঁদছো কেন? এই তো আমি আছি।

আমাকে কাঁদতে দে, বেবি। এ আমার সুখের দিন।

তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে, সে টের পেল, মৃত্যু তার মুখ স্পষ্ট করে তুলেছে মনের অন্ধকার জানালায়। রক্তের ভিতর এই টের পাওয়া, ওপর থেকে যা বোঝা যায় না।

ঢাকায় ফিরে যখন এসেছিল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। নাসিমা বলেছিল এ বেলাও বাইরে খেয়ে, তারপর বেড়িয়ে বাসায় ফিরবে। আসলে, বেবিকে সে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে চায় না। তাছাড়া, মতির মা-র হাসিটুকু তার কাছে বিষ হয়ে আছে কাল থেকে।

ক্যাসবা-য় বসে ছিল ওরা। ঠিক তখন এই অনুভব ।

বেবির কয়েকজন বন্ধু এসে ঢুকতেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে বেবি। নাসিমা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে, এক মুহূর্তে বেবি আর বেবি থাকলো না– পরিবর্তিত হয়ে গেল তার মুখ। আশঙ্কায় শুধিয়েছে, কী হলো?

কিছু না।

বলে বেবি চোর চাহনিতে তার বন্ধুদের দেখে নেয়।

বেবি কি ভয় পাচ্ছে ওদের দৃষ্টিকে? তুমি কি অনুতপ্ত হচ্ছ, বেবি?

নাসিমা চুপ করে খেতে লাগল। খেতে খেতে টের পেল বেবি তাকে দেখছে মাঝে মাঝে চোখ তুলে। আর তাকাচ্ছে দূরে, যেখানে ওর বন্ধুরা বসে হৈহৈ করছে।

বেবিকে ওরা যখন ডাকলো তখন বুকের স্পন্দন যেন মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল নাসিমার। মনে হলো পায়ের নিচে সিমেন্টে প্রাণ এসেছে— সরে যেতে শুরু করেছে। নাসিমা জোর করে মেঝেয় পা স্থির রাখতে চেষ্টা করল।

সারাটা গা তার থরথর করে কেঁপে উঠতে চাইলো। আবার সেই মুহূর্তগুলো ফিরে আসছে, মেঝের মোজাইক— যেন সরীসৃপের মত কিলবিল করছে। দূরে মেঝের শেষ সীমারেখা সমতল থেকে উঠে যেতে চাইছে ওপরে কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে তার নাম ধরে ডাকছে।

নাসিমা হাতের কাঁটা শক্ত করে ধরে— এত জোরে যে লাগল নিষ্ঠুর দাগ বসে গেল করতলের কোমলে— প্রাণপণ চেষ্টা করল স্থির হতে। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল, না— না।

স্থির হতে হতে শুনতে পেল বেবির কী একটা কথায় হো হো করে হেসে উঠলো ওরা। হাসিটা তীরের মত লকলক করে কাঁপতে কাঁপতে এসে পড়ে গেল তার টেবিলের ওপর।

বেবি ফিরে এলো।

কী বলল ওরা?

কিছু না।

আমার কথা?

বেবি নীরবে নড় করল উত্তরে।

খুব সাধ হলো জানবার জন্যে বেবি ওদের কাছে তার কী পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু বেবি এখন এত একমনে খেয়ে চলেছে যে কোনো কথা সে তাকে শুধোতে পারল না। মনে মনে বলল, আমি জানতাম। তার অভিজ্ঞতা বলল, আমি জানতাম। তার অনেক মৃত্যু কাফন পরে উঠে এসে বলল, আমি জানতাম। সে নিজেকে অনুভব করল দ্রুত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। শিথিল হয়ে আসছে তার মুঠো।

বেবি, আমি তোমাকে শক্তি দেব। কেননা তোমাকে আমি কিছুতেই হারাতে পারি না।

মুখে বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে, বেবি। কাল তোর যে জুতোটা পছন্দ হয়েছিল, আজ কিনে দেব, টাকা এনেছি।

জুতো কেনবার পর ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বেবি হাতঘড়ি দেখে বলল, রাত স'আটটা বাজে।

তা কী করবি এখন, যাবি?

সারাদিন তো বাইরে।

নাসিমা গলায় জোর এনে একটু দ্বিধার পর উচ্চারণ করে, থাক, যাবিনে এখন। পায়ে লাগছে?

জুতোর দিকে তাকিয়ে নাসিমা শুধোয়।

নাহ্। বেশ হয়েছে।

কাল তোর চোখ দেখেই বুঝেছিলাম, পছন্দ করেছিস। আমাকে বলিসনি কেন? বললেই হতো।

তারপর একটু থেমে বেবির দিকে তাকিয়ে মাথা কাত করে বলে, চল একজিবিশনে যাই, যাবি ?

সে তো কাল যাবে বলেছিলে।

নাসিমা যেন নিভে গেল।

আজ যাবি না তাহলে?

এই জুতো হাতে নিয়ে?

বেবি আবছা কৌতুকে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। হঠাৎ তার কী মনে হয়, কী একটা নামহীন কষ্ট হয়, বলে, দাঁড়াও দোকানে রেখে যাই। কাল এসে নিয়ে যাবো।

রিকশায় উঠে বসে ওরা । বেবি সিগারেট ধরায়। হুড তোলা আবরণে ওর অন্ধকার মুখ সিগারেটের লাল আগুনে থেকে থেকে জ্বলে ওঠে। মনে হয় জ্বলন্ত তার মুখ।

হাইকোর্টের মোড়ে বিশাল গাছগুলোর অন্ধকারে যখন তারা তখন নাসিমা হাত রাখলো বেবির পিঠে। বেবি বহুক্ষণ পরে একটা স্বস্তি অনুভব করলো। কী উষ্ণ, চেনা চেনা আর নিবিড় তার হাত। কোন কথা বলল না সে। নাসিমা একটু পর বলল, বেবি, আমার কাছে তুই লুকোবি নে বল।

কী ?

ওরা কী বলেছিল ?

বলেছিল-- দূর, আমি বলতে পারবো না।

তুই কিছু বলেছিস ?

না। কী বলব ?

নাসিমা তখন একটা নিঃশ্বাস লুকোলো। অপসৃয়মাণ অন্ধকার আর দূরে দূরে বিজলি আলোর বৃত্তের দিকে তাকিয়ে ভাবল খানিক। তারপর খুব আবছা গলায় বলল, বেবি, মানুষকে আমি চিনি। ওদের স্বভাব শুধু আঘাত করা, আঘাতটাকে উপেক্ষা করতে পারলেই হলো। আর কিছু না। নিজের কাছে যেটা জরুরি মনে হয়, সেইটাই বড়। মানুষ আমাকে কম আঘাত দেয়নি, বেবি। লোকের দেখাটাকে বড় করে দেখলে ঠকতে হয়, নিজের কাছে অপরাধী হতে হয়— পৃথিবীতে পাপ শুধু এইটেই।

বেবি চুপ করে শোনে। নাসিমা তার নিজেরই উচ্চারণকে বিশ্বাস করবার জন্যে মনে মনে আকুল হয়ে ওঠে।

পালানো, শুধু পালানো। আমার শক্তি নেই তাই বারবার আমি পালিয়ে আসি। মানুষের নিষ্ঠুরতাকে আমি ভয় পাই।

একবার আমি মেরুদণ্ড পেয়েছিলাম— করাচিতে। কিন্তু মানুষ কত নির্ভরশীল। একটা আনন্দ, কিংবা বেদনা, এমনকি এই শরীরটার জন্যে প্রথমত আমরা জনক-জননীর ওপর

নির্ভরশীল। এই দুঃসহ বন্ধনসূত্রকে কেউ কোনদিন এড়াতে পারবে না। নির্ভর করতে হয়েছিল আমাকেও, কিন্তু যার ওপরে আমি সেদিন নির্ভর করেছিলাম সে বঞ্চনা করলো। আমার সে মেরুদণ্ড মোমের মত নত হয়ে এলো সেই বঞ্চনার পর। আমাকে রিক্ত করে দিয়ে গেল।

বেবিকেও হারাতে হবে? শুধু আমি নই, তোমাকেও যে উপেক্ষা করতে হবে– পারবে না তুমি? নাসিমা স্পর্শ দিয়ে ওকে উপলব্ধি করতে চায়। তার অসীম রিক্ততা প্রাচীন জাহাজের বিশাল পালের মত ফুলে ফুলে উঠতে থাকে তখন। প্রতীক চিহ্নের মত স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে সেই ধূসর থাবা। আছড়ায়। ফেটে পড়বার শক্তিটুকু যেন তার অন্তর্হিত হয়ে গেছে। শুকিয়ে গেছে রক্তের নদী। অতলে, আরো অতলে, নাসিমা। ক্লান্তির কালো চোখের আরো পেছনে।

অনেকক্ষণ ধরে ক্লিফটনের বালুতে পা ডুবিয়ে বসে থাকে নাসিমা আখতার। হাতের মুঠোয় দলা পাকানো মণিখালার চিঠি। চিঠিটার কথা এখন আর সে ভাবছে না মোটেই।

এক কাপ কাফির তৃষ্ণায় মন উতলা হয়ে ওঠে। ঘরে ফিরে গেলে নিজে বানিয়ে খাওয়া যেত দু'পা সমুখে ছড়িয়ে গান শুনতে শুনতে। কিন্তু এত শীগগীর সে ফিরবে না। ফেরে না কোনদিনই। বরং জওয়াদের কাছ থেকে যতটা দূরে থাকা যায়, ভালো। জীবিকার জন্যে যে চাকরি করা তার, দিনের মেয়াদ শেষ হলে নাসিমা ব্যস্ত হয়ে পড়ে গোটা শহরটা নিয়ে। কোনদিন দোকানে দোকানে শো কেস দেখে কাটায় আবার কোনদিন সমুদ্রসৈকতে মানুষ, একেক দিন আবার উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ায় এ পাড়া থেকে সে পাড়া। জড়িয়ে পরবার ভয় নেই, হোঁচট খাবার সম্ভাবনা নেই, এতে পাওয়ার বিনিময়ে দিতে হয় না কিছুই। অনেক বড় শহরে হারিয়ে যাওয়ার এই নেশা নাসিমার আজো কাটেনি।

বরং রেস্তোরাঁয় যাওয়া যাক। নাসিমা আখতার উঠে দাঁড়ায়।

রেস্তোরাঁয় বসে বসে মণিখালার চিঠির একটা উত্তর মনে মনে দাঁড় করায়। সেটা খানিকটা এমনি–

আমি যখন পড়ানোর এই কাজটা নিয়ে করাচি আসি, তখনো তোমার মত নিইনি— চাটগাঁয় গিয়েছিলাম সেও আমার নিজেরই ইচ্ছেয়। তুমি যদি আরো বিশদ করে আমাকে জানতে মণিখালা, তাহলে বুঝতে পারতে, আমি আমার ইচ্ছেটাকে কতখানি শ্রদ্ধা করি। এ সব কথা বলার উদ্দেশ্য তোমাকে আঘাত করা নয়, তুমি যা জানতে চেয়েছ এ তারই উত্তর।

তোমরা ঠিকই শুনেছ জওয়াদের সঙ্গে আমি আজ কয়েক মাস হলো থাকছি। আমাদের বিয়ে হয়নি। শুনে হয়ত অবাক হবে, বিয়ে হবেও না। আমি ওকে ভালোবাসি না। তবু আছি। শুনে হয়ত আহত হবে, আমাকে ঘৃণা করবে, কিন্তু আমি জানি আমি কী করছি।

তুমি হয়ত প্রশ্ন করবে, তাহলে জওয়াদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী রকম? আমি যদি এর কোনো নাম দিই তোমরা বলবে বড় বড় কথা দিয়ে কুৎসিত ব্যাপারটাকে ঢাকছি— তাই কোনো নাম দেব না। প্রেম মিথ্যে, মণিখালা— যাকে আমি প্রেম বলে থাকি।

অনেক তো দেখলাম, নিজেকে নামিয়ে নিতে পারলাম না কিছুতেই। কিন্তু শেষ অবধি আমি তো আমার কাছে সত্যি?

না, মণিখালা, কানে আঙুল দিয়ো না। আমি জওয়াদকে ভালোবাসি না, ওর মনে যদিও বা কখনো জন্ম নিতে চায় ভালোবাসা আমি তাকে নিষ্ঠুর হাতে দাবিয়ে দি। কেননা ওটাকে বাড়তে দিয়ে নিজে কষ্ট পেতে চাই না।

আরো আমার সুবিধে— জওয়াদ-এর মাতৃভাষা সিন্ধি, ওর অনেক কথাই আমি বুঝতে পারব না। মনের কথাগুলোকে তাই আমার জন্যেও কখনোই ফেনিয়ে তুলে প্রকাশ করতে পারে না।

আমার সন্তানকে, যদি সে কোনদিন আসে, আমি ভালোবাসতে পারব এই আশা নিয়ে আছি। মিথ্যে প্রেমের মুখোশের জন্য আমার আর কোনো বাসনা নেই।

তোমাদের আমি কিছুতেই বোঝাতে পারব না, আমি কোনো পাপ করছি না। তাছাড়া বোঝানোর মত মনের দীপ্তিও এখন আমার নেই। জওয়াদ এর চেয়ে বেশি কিছু আমার কাছে চায়নি। অত্যন্ত সহজ, সরাসরি ছিল ওর প্রার্থনা। খুশি হয়েছিলাম— আমাকে তা-ই নিযে থাকতে দাও। অনেক ভেবে দেখেছি— মন আব শরীর, দুটোকে এক করে দেখলেই যত বিপত্তি— যা আর দশজন দেখে থাকে। বিপত্তির সম্ভাবনা এখানে নেই বলেই জওয়াদকে নিয়ে আমি তোমাদের মুখোমুখি এত নির্ভীক।

আমাকে ভুলে গেলেই ভালো। আমার জন্য কাউকে ভাবতে হবে না। ইতি তোমাদের, নাসিমা।

বেরিয়ে এলো নাসিমা। ঘরে ফিরে দেখল জওয়াদ তখনো আসে নি।

নাসিমা খেয়ে নিয়ে নিজের কামরায় গিয়ে পড়তে বসলো কালকে যা পড়াতে হবে। জওয়াদ ফিরে এলো, টের পেল তাও। ফিরে এসে কোনদিন তাকে সে বিরক্ত করে না।

আজ জওয়াদ দরোজায় নক্ করলো।

আসতে পারি ?

কাজ করছি।

প্লিজ :

এসো, এক মিনিটের বেশি বসতে পাবে না কিন্তু।

জওয়াদ এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে। জওয়াদের ভঙ্গিটাই অমনি। কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে বলল, নিঃশ্বাসের উষ্ণতা তার কাঁধের ওপর ছড়িয়ে, আসবে ?

না।

জওয়াদ দ্বিতীয়বার আর অনুরোধ করে না। শুধু বলে, মে আই কিস ? প্লিজ, জাস্ট এ পেক ডিয়ার।

অলরাইট।

গালের ওপর ঠোঁট ছুঁইয়ে জওয়াদ উঠে দাঁড়ায়। বলে, সাম টাইম আই থিঙ্ক আই অ্যাম ইন লাভ উইথ ইউ।

শ-স্-স্। ডোন্ট লাই। নাউ গো ব্যাক, রাইট আউট অফ মাই ডোর।

জওয়াদ চলে যায়। জওয়াদ তাকে বিরক্ত করে না, এর জন্য সে অনেক কৃতজ্ঞ। জওয়াদকে তার সহোদরের মত মনে হয়।

সন্তান সম্ভাবনার কথা জওয়াদ জানতে পেরে অবধি কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। ভালো করে তাকাতে পারে না নাসিমার দিকে। নাসিমা মনে মনে কষ্ট পায়, কী হলো তোমার? মনে মনে স্থির করে তখন, জওয়াদকে ছেড়ে সে চলে যাবে। লোকটা যদি বিব্রত হয়ে থাকে, তাকে মুক্তি দেয়াই ভালো। মনে রাখব তাকে, আমার সন্তানের জন্য তার ওপর আমি নির্ভর করেছিলাম। ও যা নেবার নিয়েছে, আমার যা পাওয়ার পেয়েছি। আর কোনো সম্পর্ক না থাকাই ভালো।

চলে যাওয়ার কথাটা স্পষ্ট করে নাসিমা বলার আগেই জওয়াদ বুঝতে পেরেছিল। ক্ষুব্ধ একটা মুখভঙ্গি করে বলেছিল, জানি না কী তোমার হয়েছে। একেক সময় আমার মনে হয় তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন। কোনদিন তুমি জানতে চাইলে না আমি তোমাকে ভালবেসেছি কিনা—

প্রয়োজন— এই শব্দটা তখন বড় সুদূর মনে হয়েছিল নাসিমার, এমন কি এর অর্থটাও যেন তার কাছে স্পষ্ট নয়। আর আরাম চেয়ারে শরীর এলিয়ে দূরে দরোজার কাছে দাঁড়ানো জওয়াদের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল— অন্য কোনো মানুষের জন্য এই মানুষটার অনুভূতি সে শুনছে এক পরম আলস্যে। জওয়াদ বলে চলেছে,

— আমাকে ছেড়ে যেও না । প্লিজ স্টে উইথ মি।

তখন আরো কষ্ট হয়েছিলো লোকটার জন্যে। অনেকদিন পরে নিবিড় করে কারো জন্যে কষ্ট হলো তার। আর সেই কষ্টটা কেমন ছায়া ছায়া, সচকিত।

আজ তার এই আসন্ন পূর্ণতার মুহূর্তে পৃথিবীর কোনো কোণে সামান্যতম কোন বেদনাও অসহনীয়। বলল, অলরাইট। ইফ ইউ ওয়ান্ট মি টু স্টে, আই উইল। ইউ মেড মি ব্রিদ এগেন, আই উড নেভার মেক ইউ আনহ্যাপি। ইয়েস আই উইল স্টে।

কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধায় যে আমার মন আকণ্ঠ ভরে উঠেছে, জওয়াদ। কোনদিন তুমি জানতে চাওনি, জানবেও না, কেন আমি তোমার ক্ষুধার হাতে একদিন নিজেকে তুলে দিয়েছিলাম। আমার তৃষ্ণার রূপ তুমি কোনদিন বুঝতে পারবে না হয়ত।

আমি তোমাকে আর কাছে আসতে দেব না, দূর থেকে তুমি আমার প্রীতিভাজন হয়ে থাকবে।

জওয়াদ, আমাকে এখন একটু একা থাকতে দাও।

কিন্তু স্মৃতি একটা পশুর মত ছড়িয়ে পড়ে নিঃশব্দে, পায়ে পায়ে— আলোতে, অন্ধকারে, পৃথিবীতে, পৃথিবীর অন্তিমে কোটি কোটি শূন্যতায়।

পৃথিবীতে মানবজন্মের পাওনা কি শুধু থুতু আর কাদা? আঘাতের পর আঘাত নাসিমাকে অদ্ভুত রকমে বিজ্ঞ করে দিয়ে গেছে।

সব উঁচু সিঁড়ি থেকে নিচে গড়িয়ে পড়তে পড়তে দুঃস্বপ্নের মত নাসিমার চোখে নেমে এলো জওয়াদের এই ক'দিন পালিয়ে বেড়ানো, যমকালো মুখ আর কপালের ত্রিশূল। মুখটা অস্পষ্ট হতে হতে অন্ধকার হয়ে গেল। শৈবালের মত থোকা থোকা অন্ধকারে ঢেকে গেল তার সমস্ত চেতনা।

বিকেলে নাসিমাকে জওয়াদ বলেছিল, কতদিন তোমার সঙ্গে বেরোইনি আজ বেরুবে?

এই সামান্য প্রশ্রয় দেয়ার লোভটুকু সে সামলাতে পারেনি। বলেছে, তুমি যদি চাও, বেশতো।

তারপর সেরে নিয়েছে স্বল্পপ্রসাধন। মাতৃত্বের বীজে ফুলে উঠেছে সে। অনেকক্ষণ ধরে শাড়িটা ঠিকমত পরে নিয়ে বলেছে, চল আমি তৈরি।

তারপর একটু ঠাট্টা করবার আগ্রহে কপট কণ্ঠে— হোয়াই! ইউ লুক লাইক এ নটি বয়, ডিয়ার। ইউ শুড হ্যাভ কম্বড ইওর হেয়ার ডিসেন্টলি— অ্যান্ড ইন দোজ ব্যাগি প্যান্টস! হেভেন্‌স্!

জওয়াদ চকিতে নিজের দিকে তাকিয়ে দ্রুত কিন্তু সংক্ষিপ্ত হেসে উঠেছে। আজ কয়েকদিন হলো জওয়াদের হাসিগুলো এমনি সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে কেন যেন। বদলে নাসিমা কিন্তু হাসলো তার সারা শরীরে ঝিলমিল তুলে।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি নামতে গিয়ে ওই দুর্ঘটনা।

জ্ঞান যখন ফিরলো তখন বুকের ওপর ঝুঁকে পড়া ডাক্তারের মুখ দেখে চিৎকার করে উঠতে চেয়েছিল নাসিমা। মুখটা প্রথমে মনে হয়েছিল পাথরের ওজনের মত— নত হয়ে আছে বিপজ্জনক রকমে সূক্ষ্ম একটা সুতো থেকে। ডাক্তার তখন ডান হাত শূন্যে হাওয়ায় তুলে বলল, ডোন্ট রাইজ, মাদাম।

সেই হাতটা দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে করতে ফিসফিস করে তখন সে উচ্চারণ করেছে, হোয়াই আই অ্যাম হিয়ার, ডক্টর?

ইউ ওয়ার ইল। ইটস অলরাইট নাউ। প্লিজ ডোন্ট টক। ইওর হাজব্যান্ড উইল কাম ইন দ' ইভনিং।

আশ্চর্য রকমে কান্নার উৎস আজ তার শুকিয়ে গেছে। মথিত একটি মুহূর্ত অতিক্রম করে রুক্ষ কর্কশ, ফিসফিস কণ্ঠে সে বলল, আই নো ইট্‌স নট অলরাইট, ডক্‌। ইউ কুড নট সেভ মাই বেবি।

জওয়াদ সেদিন বিকেলে আসেনি। এসেছে পরদিন। কিংবা কবে এসেছে তা আজ মনে পড়ে না নাসিমার। শুধু মনে পড়ে রাত্রে নার্সের দেয়া দুধ মুখে দিয়ে হঠাৎ বিবমিষায় দু'চোখে আঁধার দেখতে দেখতে তার আত্মা থেকে এক চিৎকার উঠেছে।— তুমি কেন এমন করলে? তুমি কি ভয় পেয়েছিলে আমি তোমাকে নিষ্ঠুর একটা বিপদে ফেলব? তাই কি তোমার মুখোশ ছিল আমাকে ধরে রাখতে? তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম।

নাসিমাকে সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল জওয়াদ।

রাতে নাসিমা উঠে এসে জওয়াদের কামরায় ঢুকলো। জওয়াদ ঘুমিয়ে আছে।

হঠাৎ হাসি পেল নাসিমার ঘুমোনো এই মানুষটার দিকে তাকিয়ে। ঘুমোলে এত অসহায়, এত উদ্যমহীন মনে হয় মানুষকে?

দৃষ্টি থেকে শেষ দ্বীপটি নিমগ্ন হয়ে গেলে থাকে শুধু মৃত্যুর মত বিশাল দিগন্ত। তখন যেদিকেই তুমি যাও, একই। কোনো প্রেক্ষিত নেই, ধ্রুব নেই— আছে শুধু হওয়া এবং না—

হওয়ার ভয়াবহ মধ্যবিন্দু। হাসলো না নাসিমা আখতার। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শুধু। এমন কি জওয়াদকেও সে যেন আর দেখছে না— দেখতে পাচ্ছে না। আস্তে আস্তে কেমন অবাস্তব, অস্তিত্বহীন হয়ে আসছে সবকিছু। পেছনে সরে যাচ্ছে। জওয়াদ হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়ে চমকে উঠল ভূতগ্রস্তের মত। কী ভীষণ দৃষ্টি তাকে বিদ্ধ করছে!

লাফ দিয়ে উঠে নাসিমার বাহুমূল ধরে ঝাঁকি দিয়ে সে বলল, নাসিমা— নাসিমা।

নাসিমা তখনো তেমনি তাকিয়ে আছে। যেন এই স্পর্শ জড়িয়ে আছে কোনো পাথরের গায়ে। তখন ভয় পেল জওয়াদ। ভীষণ একটা ভয়ে তার মুঠো শিথিল হয়ে এলো। ঠিক সেই দম আটকানো মুহূর্তে নাসিমা স্বপ্নের মত উচ্চারণে বলল, ইউ আর অ্যাফ্রেড, লিট্‌ল বয়।

জওয়াদ হাত নামিয়ে নিল। মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ল, হোয়াট!

নাসিমা তখন ছেলেমানুষের মত দু'হাত নাভিমূলের কাছে মুঠো করে ধরে শরীরটাকে সি-স'র মত দোলাতে দোলাতে বলল, মাই মাদার কেম টু মি টু নাইট। শি সেড্‌ আই মাস্ট নট প্লে ইন দ' সান। ইট ইজ সামার দেয়ার– হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে

— এভার সিন এ স্লিপিং টপ্‌? মাই বিগ ব্রাদার ক্যান ডু দ্যাট। আই কান্ট। ক্যান ইউ? বাট ইউ আর অ্যাফ্রেড টু নাইট— হাউ ক্যান ইউ।

নাসিমা খিলখিল করে হেসে উঠে হঠাৎ ভাবনায় ডুবে গেল। মাথাটা একটু বাঁকিয়ে দৃষ্টি দূরে সরিয়ে, অনেক সুদূরে, কী যেন ভাবতে লাগল।

হোয়াট্‌স দিস ফান?

ইয়েস, বুলি মি— ইয়েস, গো অন।

জওয়াদ এতক্ষণে তার চোখের তারা থেকে কী যেন আবিষ্কার করতে পারে। দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করতে চায়, ইউ আর নট হিউম্যান।

বলতে পারে না। আমতা আমতা করতে থাকে। এক পা পিছিয়ে দাঁড়ায়। ভয় করতে থাকে, এ কার সঙ্গে এতকাল সে কাটিয়েছে? আজ নতুন করে যেন তাকে চিনতে পারল। ঠিক চিনতে পারল না, যাকে সে এতকাল চিনত সে বদলে গিয়ে এখন এমন একটা মানুষের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে যাকে সে কোনো দিনই দেখেনি। হঠাৎ নাসিমার মনে হলো লোকটা কালো— ভীষণ ভয়াবহ কালো হয়ে যাচ্ছে—

লুক হি ইজ অ্যাফ্রেড। নো— নো— নো।

চিৎকার করে জওয়াদের পায়ের কাছে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল নাসিমা আখতারের থরথর করে কেঁপে ওঠা শরীর।

বেবির হাতের উষ্ণতায় নিজের করতল উত্তাপে রক্তিম করে তুলতে চায় নাসিমা। একজিবিশনে মেরি গো রাউন্ডের দ্রুতচক্র আলোর বিক্ষিপ্ততায় দাঁড়িয়ে নাসিমা আখতার বেবির দিকে তাকিয়ে বলে, আজ রাতে তুই আমার ওখানে থাকবি। কেমন?

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা
১৯৫৯



# কয়েকটি মানুষের সোনালি যৌবন

বাবা শখ করে নাম রেখেছিলেন রজনী। গায়ের রং ছিল ভোরের কেবল সূর্য উঠতে থাকা অন্ধকারের মতো, ওরই মধ্যে যেন একটুখানি দীপ্তির আভাস। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই রং তার সারাটা মুখে এমন এক সারল্য এনে দিয়েছিলো, যেন অখণ্ড এক মমতার ছবি চোখে দেখা যাচ্ছে। সেই মেয়ে, সেই রজনী, একুশ বছরের বিপজ্জনক বয়সে ঘর পালাবে কেউ ভাবেনি।

কেউ না। রজনী নিজেও না। মানুষ তো তার নিজের সব কথা নিজে জানতে পারে না। রজনীই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন ?

একদিন দুপুরে গেল কলেজে। তিনবার আই, এ, ফেল করবার পর চতুর্থ বারের মতো পড়া চলছিল। আর আই, এ পাশ না করলে যে আজকাল ভাল বর পাওয়া যায় না এ সত্যটা বাড়ি থেকে পাচনের মতো দু'বেলা তাকে গেলানো হচ্ছিল। আজকাল বাবা যখন ডাকেন রজনী বলে সে ডাকে আদরের আভাস মাত্র থাকে না। সে যে ভাগ্যহীনা, সংসারের গলায় মশলা পেষা পাথরের মতো দুর্বহ-ভার, সেই তিক্ততাটুকু ফুটে বেরোয়।

সেদিন রজনী গেল কলেজে। কলেজ থেকে সন্ধ্যের প্লেনে সোজা করাচি।

একা নয়। সঙ্গে একজন। রজনীদের দু'বাসা পরের পুরোনো দোতলার মেজ ছেলে মহসিন। লেখাপড়া প্রায় কিছুই না করে ডা ডা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সুদর্শন চেহারাটাকে মূলধন করে। একদিন মায়ের কাছ থেকে হাজার দু'য়েক টাকা পাওয়া গেল। মা বললেন, ব্যবসা কর, কিছু একটা কর, নইলে আমি আত্মঘাতী হবো। সে টাকাই হলো কাল। দু'হাজার টাকা মহসিনের কাছে মনে হলো কুড়ি হাজার টাকার মতো। রজনীকে সে ভালবাসত। আর তিনবার আই, এ, ফেল করা, সংসারে সবার কাছে সংকুচিতা রজনী মহসিনের মতো সুদর্শন একজনের কাছ থেকে হৃদয়ের পরম প্রশ্রয় পেয়ে মনে মনে হৃদয়টাকেই তার পায়ের তলায় সমর্পণ করেছিল। সেই তাকে নিয়ে মহসিন ঝাঁপিয়ে পড়ল সংকেতহীন ভবিষ্যতের খাদে।

কিছুদিন থেকে রজনী তার বুকের মধ্যে শুনতে পেত দুয়ার ভাঙ্গার আহ্বান।

শুনতো, শুনে শিউরে উঠতো। মহসিন বলত, 'আমি একদিন আসবো, ঝড়ের মতো তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবো।'

ছোটবেলায় ইতিহাসে পড়া পৃথ্বি-রাজ সংযুক্তার গল্প আর সেই সঙ্গে আঁকা একখানা ছবি চমক দিত রজনীর মনে। সে দেখতে পেত, ঠিক ছবিতে যেমন আঁকা, মহসিন ঘোড়ায় চড়ে কোলসাপটা করে তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তখন তার ভয় করত, কিন্তু ভাল লাগত। ফুলের গন্ধ পেত রজনী। চোখে আলো দেখত। মানুষের কোলাহল শুনতে পেত। মহসিনের সঙ্গে তার বিয়ের রাতটা খণ্ড খণ্ড ছবিতে জীবন্ত হয়ে উঠতো। আনন্দে, উদ্বেগে, অন্ধকার ঘরে বালিশ বুকে চেপে নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকত রজনী।

রজনীর পিঠে একদিন মার পড়েছিল। মহসিনের একটা চিঠি পড়েছিল বাবার হাতে। বাসার চাকর ছোকরাটি ফিরছিল বাজার করে। তার থলের মধ্যে চিঠিখানা পুরে দিয়েছিল মহসিন। বলেছিল, 'বুবুর হাতে বাজারের থলে দিবি।'

কিন্তু তা আর হলো না। রজনীর বাবা ছিলেন বারান্দায়। বাজার দেখবার জন্যে চাকরটার হাত থেকে থলে নিয়ে উপুড় করতেই দিব্যি ভাঁজ করা চিঠি বেরুলো। পড়লেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে টুবুলের আঁক কষা স্কেল দিয়ে মারলেন রজনীকে।

রজনীর পিঠ লাল হয়ে উঠেছিল। ব্যথা করছিল। খানিকক্ষণ পর ব্লাউজটা শরীরের সঙ্গে টেনে ধরেছিল কাঁচা রক্ত শুকিয়ে গিয়ে। তিন দিন গেল না কলেজে। সেই তিনটে দিন মহসিন বাসার চারপাশে ঘুরঘুর করল। এবং অবশেষে সেই চাকর ছোকরার মুখ থেকেই শুনলো আদ্যোপান্ত ঘটনা। শুনে প্রথমে সরে গেল রজনীদের বাসার ত্রিসীমা থেকে। রজনীর বাপের চোখে পড়াটা বোধহয় মধুর হবে না, আর এ তিনদিনে যে তাঁর চোখে আদৌ পড়েনি সেজন্যে ভাগ্যতারাকে ধন্যবাদ দিল। পালিয়ে পালিয়ে কী ভাবল কে জানে, প্রায় দিন দশেক পর রজনীকে যখন গলির মোড়ে কলেজ ফেরতা পাওয়া গেল তখন মহসিন বলল, 'বাপ না ডাকাত। বোলো তোমার বাপকে, আমার মতো জামাই পেলে ধন্য হয়ে যাবে।'

রজনী বলল, 'বাবা তোমার কাছে বিয়ে দিলে তো।'

'কেন ?— না দিক তো বয়েই গেল। তুমি চলে আসবে, বাইরে বিয়ে হবে। আজকাল কত হচ্ছে। তাছাড়া খরচাপাতিও নেই। বরং আজকাল বাপ মা তাই চাচ্ছে, তুমি খোঁজ নিয়ে দেখ।'

'অসম্ভব!'

'কী অসম্ভব ?'

'সে পারবো না।'

'কেন ? বাহ।'

'কক্ষনো না।'

ততক্ষণে বাসা প্রায় দেখা যাচ্ছে। মহসিন দাঁড়িয়ে রইল। রজনী মাথা নিচু করে বই খাতা কোলের 'পরে অদল বদল করতে করতে বাসায় গিয়ে ঢুকলো। তারপর সোজা বাথরুমে। সেখানে বসে বসে ভাবলো মহসিনের কথা। রজনী খানিকক্ষণ কাঁদলো। আবছা করে তার মনে পড়ল দু'একজন বান্ধবীর কথা, একটা ভালো মোটর গাড়ি কবে দেখেছিল সেটা, কবে একদিন রজনী কলেজ থেকে এসে দেখে ঢাকা তার তরকারি বেড়ালে খেয়েছিল সেই কথা। এইসব বিচ্ছিন্ন ছবিগুলো কারণহীন এসে ভিড় করলো এবং তাকে কাঁদালো।

বাড়ি পালানোটাও অদ্ভুত। কলেজে ঢুকতে যাবে, দেখে গেটের সামনে মহসিন দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। তাকে দেখেই গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল, তোমার সাথে কথা আছে।' এবং ভালো করে কিছু বোঝা বা বলার আগেই রজনী দেখে কখন মহসিনের সঙ্গে এক রিকশায় উঠে বসেছে সে। রিকশা চলছে মেডিক্যাল কলেজের সমুখ দিয়ে। অত বড় দালানে কয়েক'শ লোক একসঙ্গে শুয়ে রোগেব যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে, কী মারা যাচ্ছে— এই উপলব্ধিটা রজনীর সেদিন হয়েছিল আর জীবনের প্রতি একটা আচমকা বৈরাগ্য এসে গিয়েছিল।

তাকে নিয়ে মহসিন সেদিন সারাদিন ঘুরলো। যে কথাটা বারবার জিগ্যেস করল তা হচ্ছে, 'তুমি আমাকে বিয়ে করবে কিনা বল।'

প্রথমবার যখন জিগ্যেস করেছিল তখন রজনীর মনে হয়েছিল ঠাট্টা। দ্বিতীয় বার মনে হয়েছে, একটা খেয়াল। পরে যখন আবারো জিগ্যেস করেছে, তখন সে বুঝতে পেরেছে ঠাট্টাও নয়, খেয়ালও নয়, মহসিন তাকে সত্যি সত্যি বিয়ে করতে চায়।

গায়ে তার কাঁপন লাগল, সংযুক্তার মতো তারও বুঝি তবে পালা এসেছে লুট হয়ে যাওয়ার। রজনীর কাছে এটা একটা অভিনব ব্যাপার যে কেউ তাকে এত কাছে থেকে, একেবারে চোখ

মুখ হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে ফেলা যায় এত নিকট থেকে, বিয়ের প্রস্তাব করে বসবে। নিজেকে তার অমিত ভাগ্যবতী বলে মনে হলো। মনে হলো, এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের কোটি কুমারীদের ওপর জিৎ হয়ে গেছে তার। সে হাসলো। রজনী মাথা কাৎ করে জানাল, তার এতে অমত নেই।

তখন মহসিন বেরিয়ে গেল। বলে গেল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরছে। রেস্তোরাঁর কেবিনে একা বসে রইলো রজনী। বসে বসে তার অস্বস্তি করতে লাগল। ছটফট করতে লাগল। এই মুহূর্তে যদি বাইরে গিয়ে খানিকটা ছুটোছুটি করতে পারতো, নাচতে পারতো, ছোট ভাইটার গলা জড়িয়ে ধরতে পারতো কী বাসার ছাদে খুব করে হাঁটতে পারতো রজনী, তো ভালো লাগতো। তার বদলে খাতায় পাখি আঁকলো, নাম লিখলো, অনেকগুলো পাতা নষ্ট করলো এমনি করে। অবশেষে মহসিন ফিরে এলো। তখন শেষ বিকেল। চোখের পাতার মতো ফিকে লাল হয়ে যাচ্ছে আকাশটা। মানুষ বাড়ি ঘর মোটরের ছায়াগুলো লম্বা লম্বা দেখাচ্ছে।

বেরিয়ে এসে রজনী জিগ্যেস করল, 'কোথায় ?'

'এসো আমার সঙ্গে।' এয়ারপোর্টে এসে সে বলল, 'রজনী আমরা করাচি যাচ্ছি।'

'না, না। কেন ?'

'তুমি বুঝতে পারছ না, রজনী, আমি তোমায় বিয়ে করব। আমার সঙ্গে অনেক টাকা আছে। আমি একটা কাজ নেব। বাঙালিদের কত কাজ সেধে দিচ্ছে করাচিতে। তোমার নিজের সংসার হবে, যেখানে কেউ তোমাকে বকবে না। আমরা, আমরা মাঝে মধ্যে বেড়াতে আসবো দেশে।'

'না, না।'

'কী না-না ? তোমার বাবা আমাকে দু'চোখ দেখতে পারেন বলছ ?'

'তা নয়।'

'তাহলে, আমার সঙ্গে টাকা নেই মনে করছ ?'

'না।'

'তবে, তবে কী ?'

'না, না।'

'আমি কিস্‌সু বুঝতে পারছি না কেন তুমি না-না করছ।'

মহসিন অত্যন্ত চটে গিয়েছে। সেটা লক্ষ্য করে মনটা ভারী ছোট হয়ে গেল রজনীর। অথচ এইটে স্পষ্ট করে বোঝাতে পারলো না যে, আপত্তিটা তার গোড়াতেই। বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে না কয়ে কী করে চলে যায় ? আর বিয়েই বা করে কী করে ? তার বাবার মুখ মনে পড়ল। রজনী যেন দেখতে পেল, অফিস থেকে ফিরে এলে তাঁর যেমন হয়, তেমনি খুব উদ্বিগ্ন বিব্রত দেখাচ্ছে বাবাকে।

অথচ এই সহজ কথাটা কেন বুঝতে পারছে না মহসিন তা ভেবে অবাক লাগল তার। একবার কী বলতে চেষ্টাও করল, কিন্তু থেমে গেল। মহসিন এমন একটা প্রত্যয় নিয়ে কথাগুলো বলছে যে, রজনীর খানিকটা বিশ্বাস হচ্ছে— জীবনে এ রকমটি হতেও পারে। হয়ত এটাই স্বাভাবিক। এবং সে যদি প্রতিবাদ করে তো ওই মহসিনের কাছে নিছক একটা ভীরু বলে লজ্জা পেতে হবে তাকে।

এই রকম যখন সংকট তখন মহসিনই যেন দেবতা হয়ে দাঁড়াল। বলল, 'অবশ্যি তোমার ভয় করলে আলাদা কথা। তুমি ফিরে যাও। আমি জোর করব না। আমি যাব।'

'কোথায় ?'

'যেখানে তোমাকে যেতে বলেছিলাম। আমাকে আজ যেতেই হবে। আমি আর একটা দিনও থাকছিনে। পোড়ার দেশে থেকে কী হবে ?'

রজনীর খুব ভয় করলো। মহসিন একা কোথায় কোন বিদেশে গিয়ে মুখ থুবড়ে মরে থাকবে, কী দেখা শোনার কেউ থাকবে না— এই ভাবনাটা কষ্ট এনে দিল রজনীর মনে। তার জিদ দেখে আরো মনে হলো লোকটার কপালে দুঃখ নিশ্চিত লেখা আছে, ভাগ্য তাকে টানছে। শিউরে ওঠে মেয়েটা। বড় বড় চোখ মেলে সে তাকিয়ে রইলো মহসিনের দিকে। এই লোকটা যাবে চলে, আর সে থাকবে এখানে, হয়ত এবারও ফেল করবে, বাবা আর পড়াবেন না বলে দিয়েছেন, ছোট ভাইটা পর্যন্ত ইতিমধ্যে তাকে 'তুই' বলে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে, কেননা সে অবধি বুঝে গেছে তার বোনের আর আদর নেই— রজনী আর ভাবতে পারলো না। ভীরু গলায় একবার শুধোলো, 'এখানে থেকে কিছু হয় না ?'

'এখানে থেকে আমি কিছু করতে চাই না।'

আর প্রতিবাদ করল না রজনী।

রাত একটার সময় তাদের প্লেন পৌঁছুলো করাচি। তারা উঠলো হোটেল কোলামবাসে। তেতলার ঘরে।

পীরজাদা হচ্ছে সেই জাতের মানুষ যে রাজার ঘরে জন্মালে মুকুট হারাতো, কোটালের ছেলে বসতো তার সিংহাসনে। নেহাৎ একালে জন্ম বলে রাজ্যও তার হারায়নি, একবস্ত্রে দেশত্যাগও করতে হয়নি, কিন্তু যা হারিয়েছে তার বেদনা সাত রাজাতেও সারিয়ে দিতে পারবে না।

দেশত্যাগের বদলে গৃহত্যাগ করেছে পীরজাদা। আজ আড়াই বছর ধরে হোটেল কোলামবাসের তেতলার শেষ দক্ষিণ ঘরখানা তার আশ্রয়। একদিকে জানালা খুললে দূরে আরব সাগরের ইশারা, আর এক দিকের জানালায় শাহরাহ্ ইরান পেরিয়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রান্তরের শেষ প্রান্তে মালার মতো মেলারাশি প্রাসাদের বীথি। রাতে ঐ দূর দালানগুলো থেকে অসংখ্য আলোর ডট্ অন্ধকারকে চন্দনফোঁটার মতো সাজিয়ে রাখে। পীরজাদা যেদিন অত্যধিক মদ্যপান করে চোখের তীব্রতা হারিয়ে ফেলে, সেদিন তার মনে হয় এক সুন্দরী, যার মুখ নিকষ কালো সে প্রসাধন করে অধীর অপেক্ষা করছে। তাকে স্পর্শ করা যাবে না, তার আর কোন অঙ্গ দেখা যাবে না, তার আসন দেখা যাবে না— সে শুধু তার বিশাল মুখ সজ্জিত করে রাতের পর রাত অপেক্ষা করবে। তার মাথার চুলে চক্রের মতো ঘুরবে তারকাপুষ্প।

যে পীরজাদা সুন্দরী তরুণী দেখলে শিউরে উঠত, মনে মনে এবং কখনো কখনো সরবে তাদের গাল দিত 'বাস্টার্ড, হাস্‌সি, বেশ্যা' বলে সেই পীরজাদা যখন এই সব রাতে বারান্দায় বেরিয়ে এসে ঐ আলোর মধ্যে নিকষ কালো কল্পনার মহিলাকে দেখতে পেত তখন তার মনে হতো ভেতর থেকে বুক খালি করে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে। মাথার মধ্যে তখন সুরার সেতার বাজছে। সে রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে প্রলাপ বকতো আর কাঁদতো।

বন্ধুদের রীতিমত শক্তি প্রয়োগ করতে হতো পীরজাদাকে তখন বারান্দা থেকে ঘরে আনতে। এটা একটা নিয়ম হয়ে গিয়েছিল, সুরা পানের আসর থেকে পীরজাদাকে কেউ একা বারান্দায় বেরুতে দিত না। তাকে চোখে চোখে রাখা হতো।

কিন্তু যারা পাহারা দেবে তারাও তো মদ খেতেই বসেছে। তাদের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেলে কে আর কাকে রাখবে চোখে ? তখন পীরজাদা বেরুতো বারান্দায়। আর ঘটতো এই কান্ড। নিচে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে ভয়ে তার শরীর হিম হয়ে যেত। কারণ তার মনে হতো, পীরজাদা বুঝি রেলিং থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করছে।

অবশ্যি সে ইচ্ছে থাকলে আজ থেকে আড়াই বছর আগেই সব শেষ হয়ে যেত। তার কবরের 'পরে ঘাসের শীষ ঘন হয়ে উঠত এতদিনে। তবে সুদর্শন অগ্নিসম্ভব গায়ের রং, কয়লা রং স্যুট পরা, নীল চোখ, দীর্ঘ এই মানুষটাকে জীবিত বলাও ভুল। কারণ, পীরজাদা মনে মনে জানে তার বেঁচে থাকার এখন একটি মাত্রই উদ্দেশ্য, আর তা হচ্ছে এই ছ'ফুট দেড় ইঞ্চি দীর্ঘ লাশটা যদ্দিন না মাটির তলায় যাচ্ছে তদ্দিন মাটির ওপরে তাকে বাঁচিয়ে রাখা। আর সম্ভবত তাই নিয়ম বা অনিয়মের ভেদাভেদ নেই তার কাছে। রাত চারটেয় তার শোবার সময়, দুপুর এগারোটায় ব্রেকফাস্ট, তিনটেয় লাঞ্চ, ডিনারের কথা কোনদিন মনে থাকে কোনদিন থাকে না। সাতদিন অফিসে ভূতের মতো কাজ করতে পারে এক লহমার বিশ্রাম না নিয়ে, আবার তিনদিন একটানা ঘুম থেকে বুঝি আজরাইলও টেনে তুলতে পারবে না। মদ স্পর্শ করবে না মাসের পর মাস, আবার বসলে বড় একটা বোতল বিরতিহীন পান করে কারো সাহায্য না নিয়ে নিচ তলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠে অন্ধকারে চাবি দিয়ে ঘরের তালা খুলে পোশাক বদলে ঘুমোতে যেতে পারে একটুও না টলে, ভুল না করে।

এর শুরু সেই আড়াই বছর আগে।

তারো তিন বছর আগের কথা। পীরজাদা তখন সদ্য বিলেত ফেরত, চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্সীতে সাফল্যের সঙ্গে ওৎরানো ছেলে। দেশে ফিরে চাকরি নিল না। বাবা বললেন, 'আমি টাকা দিচ্ছি, তুমি ফার্ম করো।' বাবাকে একালের ছেলেদের চেয়ে একটু বেশি শ্রদ্ধা করতো পীরজাদা। চাকরির অফারটা ছিল ভালো। কিন্তু সেটা তক্ষুনি ফেরৎ পাঠিয়ে ফার্ম করার জন্যে উঠে পড়ে লাগল সে।

কয়েক মাস পর সুদূর গুজরানওয়ালা থেকে বাবা লিখলেন, 'আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ। আশঙ্কা হচ্ছে বাঁচবো না। তুমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছ এবং ইতিমধ্যে অনেকখানি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছ এটা পিতা হিসেবে আমার পরম আনন্দের কারণ। কিন্তু তবু বলবো, এ আনন্দ সম্পূর্ণ নয়। তুমি সংসারী হও। পুত্রবধূর মুখ না দেখে মরলে বেহেস্তে গিয়েও শান্তি পাবো না। তোমার ওপর আমার অসীম আস্থা আছে। আমি একটি সুলক্ষণা, সর্বগুণসম্পন্না, সুন্দরী পাত্রীর সঙ্গে তোমার বিবাহ স্থির করেছি। পত্র পাওয়া মাত্র বাড়ি চলে এসো। আগামী বৃহস্পতিবার রাত্রে শুভদিন ধার্য হয়েছে।'

পীরজাদা এলো গুজরানওয়ালায় সেই রাতেই ট্রেন ধরে। এবং যথানিয়মে বৃহস্পতিবারও এলো। পরিবারের বড় ছেলের বিয়েতে তিনদিন তিনরাত রোশনাই হয়ে থাকল সারা মহল্লা। চতুর্থদিনে পীরজাদা বউ নিয়ে ফিরলো করাচি। সুন্দরী সন্দেহ নেই, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য জগতের মেয়ে।

পীরজাদার বাবা সন্ধান রাখতেন না, তাব ছেলের জীবনে পরিবেশের কতখানি পরিবর্তন হয়েছে ছ'বছর বিলেত বাসের ফলে। যে সুলক্ষণা মেয়েটিকে তিনি ছেলের জীবনসঙ্গিনী করে দিলেন, সে সলাজ, সন্ত্রস্ত এক গেঁয়ো বালিকা। পীরজাদা যে সমস্ত বান্ধবীদের সঙ্গ পেয়ে অভ্যস্ত তাদের কলরব মুখরিত বিদ্যুৎ চমকিত উপস্থিতির পাশে এ মেয়ে যেন মাটির প্রদীপ। প্রথম ক'দিন স্তব্ধ হয়ে রইলো লোকটা। এমন কী একে আত্মনির্বাসনও বলা যেতে পারে। প্রায় এক পক্ষকাল করাচিতে থেকেও পীরজাদার সাক্ষাৎ তো দূরে থাক তার সিগারেটের ছাইটুকু পর্যন্ত কেউ দেখতে পেল না। একদিন বিকেলে তার কয়েকজন বন্ধু, বন্ধুপত্নী আর একজোট অবিবাহিত বান্ধবী এসে অতর্কিতে বাসায় চড়াও হলো। সমস্বরে তারা বলল, 'কী এমন বউ পেয়েছ যে বাসা থেকে বেরুতেও চাও না ? আমরা দেবী দর্শনে এসেছি।'

লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে গেল পীরজাদা। এদের সামনে ঐ স্বল্পশিক্ষিতা, এক শতাব্দী পেছনে পড়ে থাকা, প্রচুর পোশাকে প্রায় সম্পূর্ণ আবৃতা তার স্ত্রীকে কী করে সে বার করবে ? তার বান্ধবীদের চোখে যে দীপ্তি জ্বলছে, পীরজাদার মনে হলো, তা প্রস্তুত হয়ে আছে উপহাসের জন্যে। পীরজাদাকে সেদিন গলদঘর্ম হতে হয়েছিল উদগ্রীব মানুষগুলোকে নিরস্ত করতে। শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে তাদের তো পাঠানো গেল। এবং প্রতিজ্ঞা করতে হলো অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই স্ত্রীকে সে হাজির করবে তাদের দরবারে।

বলতে গেলে সে রাত থেকেই স্ত্রীকে আধুনিকা করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল লোকটা। পীরজাদার একটা স্বভাব যখন যে কাজ করবে নিঃশ্বাস না নিয়ে করা চাই, আর যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ স্বস্তি নেই। স্ত্রীর কোন ওজর আপত্তি টিকলো না, ঘরের কাজ মাথায় উঠলো রান্নাবান্না পড়ে রইলো, বসে বসে সে মুখস্ত করতে লাগলো সামাজিক কেতা-কানুনেব বুলি, নতুন ধরনের কাটা কামিজ পরে অস্বস্তির সঙ্গে শুরু হলো তার চলাফেরা, এক ফালি দোপাট্টায় শরীর বিব্রত হয়ে রইল, মুখে নানা রঙের সমাবেশ মুখোশের মতো যন্ত্রণার সৃষ্টি করলো, নাক জ্বালা করতে থাকল সুরার গন্ধে, বাথ সল্‌টে বমি। কিন্তু মাত্র দিন সাতেকের জন্যে।

এক পক্ষকাল যেতে না যেতে দেখা গেল পীরজাদার শাদা রেসিংকার, যেটা সে শখ করে আসবার পথে ইটালিতে কিনেছিল, সেটা সন্ধ্যায় কোনদিন সেজানে এসে দাঁড়াচ্ছে, কোনদিন বীচ লাক্‌সারির কার পার্কে পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা শাহরাহ্ ইরান ধরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলছে পুরনো ক্লিফটনের দিকে। রোববারে তো কথাই নেই, নিশ্চয়ই হক্‌স বে'তে দেখা যাবে। এতকাল পীরজাদার পাশে একেক দিন একেক রূপসীর দেখা মিলত— সিংহাসন কারো স্থির ছিল না— কোন কোনদিন একাধিক আরোহিণীও চোখে পড়ত, মনে হতো হারেম লুট করে রাজধানীতে ফিরছে যুবরাজ। কিন্তু এবারের আরোহিণী একজন, আর তাকেই দেখা গেল দিনের পর দিন, সন্ধ্যের পর সন্ধ্যে। দামেশকের তলোয়ারের মতো ঋজু ছিপছিপে এক তন্বী। চলনে সভা স্তব্ধ হয়, হৃদয় স্পন্দিত হয়ে ওঠে। উদ্যত ফণিনীর মতো তার বঙ্কিম গ্রীবা, রক্তিম ঠোঁটে এক বিজয়িনীর স্মিত দম্ভ, শরীরের রং-এ সুরার জ্যোছনা, স্তনাগ্রে তীরমুখের তীক্ষ্ণতা আর চোখে সর্বনাশের ইঙ্গিত।

বন্ধুরা ছেঁকে ধরলো, 'কে এই নারী ?'

বান্ধবীরা ঘনঘন টেলিফোন করতে লাগল, শেষে কি স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বাস- ঘাতকতা করছে পীরজাদা ?

পীরজাদা বাড়িতে একদিন বিরাট পার্টি দিয়ে লম্বা এক বাও করে বিনীত কণ্ঠে জানালো 'ইনিই আমার ধর্মমতে পরিণীতা স্ত্রী।' সে রাতে তার স্বাস্থ্য পান করলো সকলে। বেগম পীরজাদার হাতে হাইবল কলিন্স যে নিখুঁত ভঙ্গিতে উত্তোলিত ছিল তা দেখে তাক লেগে গেল সবার। পুরুষেরা কয়েক জীগার পানীয় একসঙ্গে মাছের মতো পান করলেন। রমণীকুল নিঃশ্বাস এবং বিষ বাতাসে ছড়িয়ে রাত বারোটা বাজতে না বাজতেই ঘরে ফেরবার জন্যে হাই তুললেন। গর্বে বুক ফুলে উঠলো পীরজাদার। ভাবলো কিশতি মাৎ করেছি।

পার্টি শেষে শোবার ঘরে এসে স্ত্রীকে এক সশব্দ চুম্বন করে সেই বিজয়ের উল্লাস জ্ঞাপন করলো সে।

পরদিন থেকে বান্ধবীর সংখ্যা কমলো পীরজাদার, কিন্তু বন্ধুর সংখ্যা বাড়লো। অনেক দূরের বন্ধু নিকট হলো, নিকটের বন্ধু নিয়মিত অতিথি হয়ে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে পীরজাদার ফার্ম জমে উঠেছে। এখন আর অবসরের দিন নেই তার। কিন্তু অফিসে যেদিন পীরজাদাকে অধিক রাত অবধি কাজ করতে হতো, সেদিনও তার স্ত্রীকে সঙ্গ দেবার জন্যে বন্ধুর অভাব হতো না।

সারাদিনের কাজ ক্লান্ত করে রাখতো পীরজাদাকে। কিন্তু নেশায় পেয়ে বসেছে তার স্ত্রীকে। হয়ত কোন রোববারে তাকে থাকতে হলো শহরে, তাতে কী ? তার স্ত্রী বেরিয়ে পড়ল ছুটিবার করতে ম্যানোরা দ্বীপে কী হক্‌স বে-তে। দীর্ঘদিন একরম চলবার পর, আতঙ্কিত হয়ে পীরজাদা লক্ষ্য করল তার হাতের তৈরি পুতুল প্রাণ পেয়েছে এবং তাকে থামানোর কৌশল তার জানা নেই। যে বিশেষ বন্ধুটি তার স্ত্রীর জন্যে সহানুভূতি এবং সঙ্গদানে উদার তাকেও সে কিছু বলতে পারল না।

একদিন রাতে পীরজাদা ঘরে ফিরে বন্ধুটিকে দেখতে পেল বসে আছে, তার পোশাক থেকে রনিয়ে রনিয়ে উঠছে তার স্ত্রীর প্রিয় সুবাস। বন্ধু অল্পক্ষণ পরেই চলে গেল। পীরজাদার চোখে পড়ল স্ত্রীর শুভ্রকণ্ঠে সদ্য চুম্বনের চিহ্ন। বেয়ারার কাছে শোনা গেল, ভদ্রলোক বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে মেমসাহেবের সঙ্গে গল্প করছিলেন।

সে রাতে কঠোর হওয়ার প্রথম ও শেষ চেষ্টা করেছিল পীরজাদা। তার ফল হলো এই, স্ত্রী খানিকক্ষণ কাঁদলো, বলল, 'আমাকে তবে মুক্তি দাও' ; বলল, 'আমাকে কেউ অবিশ্বাস করুক এ আমি চাইনে।' পাঁচ দিন স্বামী স্ত্রীতে কথা বন্ধ হয়ে রইল। ষষ্ঠ দিনে পীরজাদা নতি স্বীকার করল। বলল, 'তুমি বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। সে রাতে আসলেই আমার মনটা ভালো ছিল না।'

কিন্তু পীরজাদাও জানত, কোথায় যেন ভাঙ্গন ধরেছে, স্পষ্ট করে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, রক্তের মধ্যে কেবল আঁচ করা যাচ্ছে। তার অবস্থা তখন গভীর রাতে ঘুম ভাঙা এক বেড়ালের মতো যে একটা শত্রুর পদশব্দের জন্যে অপেক্ষা করছে।

গোড়ার দিকে বাবা পুত্রবধূর রূপান্তর দেখে শংকিত হয়ে চিঠি লিখেছিলেন। পীরজাদা সেদিন তার উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করেনি। চিঠিতে যখন সাবধান বাণীর আয়তন দিনে দিনে বাড়ছিল তখন সে ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিল, 'এ বিয়ে আমার মতানুসারে হয়নি। পছন্দটা ছিল আপনার, কিন্তু ঘর করতে হচ্ছে আমাকে। অতএব আমার পছন্দের সমান তাকে হতে হবে। তাই হচ্ছে।'

এখন, এই মুহূর্তে তার মনে পড়ল বাবার কথা। মনে হলো, তাঁর কাছে সান্ত্বনা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যাবার মতো মুখ নেই, মনোবলও নেই। একদিন তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিয়ে তিনি ইন্তেকাল করলেন। আজ তাকে বলবার আর কেউ রইলো না, কিন্তু আজকেই তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল অমন একটা মানুষের। স্ত্রীর সামনে পিতার শোকে কাঁদার সাহসও পেল না লোকটা।

ওর একটা বহুদিনের পুরনো অভ্যেস ছিল, অফিস থেকে ফিরে এসে পোশাক বদলাতে বদলাতে হাফ পেগ হুইস্কি অনেকটা পানির সঙ্গে মিশিয়ে পান করা। একে বিলাসিতাও বলা যেতে পারে। প্রথমে লম্বা হয়ে খানিকক্ষণ বসে থাকত চেয়ারে— তখন কয়েক চুমুক। যে পোশাক বদলাতে পাঁচ মিনিট লাগার কথা নয় সেইটে সে বিরতি দিয়ে দিয়ে পনের থেকে বিশ মিনিটে বিস্তৃত করতো— তখন গ্লাস নিঃশেষ। সুরার আসল স্বাদ পীরজাদা এই বিশেষ সময়টিতে যতখানি পেত আর কোন সময় তার সিকিও পেয়েছে কিনা সন্দেহ।

এ ড্রিংক সে নিজে বানাতো, চিরকাল এটা ছিল উপভোগের আরেকটি অংগ। একদিন ঘরে ফিরে দেখল তার স্ত্রী বানাচ্ছে। দেখে অবাক হলো, খুশিও হলো। পাঁচদিন কথা না বলার সেই সময়টার স্মৃতি তখনো তাজা। তাই স্ত্রীর এই ব্যবহারে পীরজাদা অভূতপূর্ব এক অন্তরঙ্গতার স্বাদ পেল। এবং এটা যখন তার স্ত্রীর একটা নিয়মিত কাজ হয়ে দাঁড়াল তখন তার হৃদয় থেকে সমস্ত মালিন্য সন্দেহ মুছে গিয়ে বইলো অনুরাগের নির্মল ঝর্ণা। সুখ বলতে পীরজাদার চোখের সমুখে তখন ভেসে উঠতো তার স্ত্রীর ছবি, যে হাসছে, যে এগিয়ে দিচ্ছে তাকে সারাদিনের ক্লান্তির পর বিকেলের পানীয়।

কিন্তু সুখের কপাল নিয়ে পীরজাদা পৃথিবীতে জন্মায়নি। জন্ম মুহূর্তে মা-র মৃত্যু থেকে তার শুরু। এমন কিছু লোক আছে যারা নিজের দুর্ভাগ্য নিজে বানায়, তাদের বানাতে হয়, স্বেচ্ছায় নয়, অনিচ্ছায়। পীরজাদা সেই দলের মানুষ।

সেদিন বিকেলে এসে স্ত্রীর হাত থেকে পানীয় নিয়ে চুমুক দিতেই মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেল তার। স্ত্রী হেসে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে? খাও।'

পীরজাদা অপ্রস্তুত হয়ে আরেক চুমুক পান করে টাই খুলল। খুলতে খুলতে ভাবল, আজ কি এমন কিছু ঘটেছিল যার জন্যে তার মেজাজ খারাপ হয়ে আছে, ফলে বিস্বাদ লাগছে এই পানীয়? না, তেমন কিছু তো হয়নি। বরং আজ একটা ভালো দিন বলা যেতে পারে। কাজে ছিল স্বাচ্ছন্দ্য, মনোযোগ ; বাইরে বাতাস ছিল সুন্দর, পথে ছিল না তিলমাত্র ভিড়। তবে? পীরজাদা আবার গ্লাসটা হাতে নিল। এক চুমুকে বাকিটুকু নিঃশেষ করবার জন্যে হাঁ করল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে দেখতে পেল স্ত্রীর ঠোঁট কাঁপছে। চোখ এক পলকের জন্য বিস্ফারিত হল ; আতঙ্কে বরফ হয়ে গেল মেয়েটা। হাত থেকে গ্লাস নামালো পীরজাদা— হয়ত চোখের ভুল, হয়ত গ্লাসের মধ্য দিয়ে দেখেছে বলে অমন মনে হয়েছে। ভালো করে দেখবার জন্যে হাত থেকে গ্লাস নামালো পীরজাদা।

সঙ্গে সঙ্গে আরেক বিস্ময়। তার স্ত্রী প্রায় দৌড়ে, অস্পষ্ট একটা কাতরোক্তি করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে হাতের গ্লাস হাতে রইল পীরজাদার— যেন চলমান ছবি স্থির হয়ে গেছে।

পাশের ঘরে এসে দেখে স্ত্রী বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। সমস্ত মুখ তার শাদা হয়ে গেছে, দরদর করে ঘাম পড়ছে। পীরজাদা তাকে বুকের মধ্যে নেবার চেষ্টা করল। সে এলো না। জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে ?' উত্তর পাওয়া গেল না। পীরজাদার মনে হলো হঠাৎ তার বড্ড মাথা ধরল। সে আবার জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে ?' এবারে তার কণ্ঠস্বরে ছিল কিছুটা উত্তাপ। সচকিতা হয়ে স্ত্রী তখন তাকে একবার দেখল। বলল, 'ও গ্লাস তুমি ফেলে দাও। খেও না ?'

'কেন ? কী আছে গ্লাসে' ?

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। তখন সেও ঘরে গিয়ে গ্লাসটা আবার হাতে নিল। ভাবলো, তবে কি তার স্ত্রী চায় না সে সুরা পান করে ? তা যদি হয়, তাহলে মেয়েটার চোখে আতঙ্ক কেন ?

জগতে তেত্রিশ বছর বাস করছে পীরজাদা। আবার সে টাই বাঁধলো গলায়, জুতো পরল, জ্যাকেট চাপালো এবং গ্লাস থেকে সম্পূর্ণ পানীয় একটা শিশিতে ঢেলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাত সাড়ে দশটায় অবসন্ন হৃদয় নিয়ে ফিরলো পীরজাদা। হুইস্কিতে বিষ মেশানো ছিল। তার বন্ধু এক ডাক্তার ছিল। ল্যাবরেটরীতে বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেল। খবরটা পেয়ে পীরজাদার মনে হয়েছিল, এখন আবার সে সম্পূর্ণ গ্লাসটা পেলে পান করে ফেলতে পারত। যেন অনুতাপও হলো তখন তা করেনি বলে। তাকে হত্যা করতে চেয়েছে তার স্ত্রী— এ সত্য না স্বপ্ন ? কেন তাকে সে হত্যা করতে চাইবে ? কেন ? টলতে টলতে বাড়ি ফিরল সে।

ফিরে দেখল ঘর শূন্য, স্ত্রী নেই। এটাও যেন আশা করা গিয়েছিল। বিস্ময় তাকে আলোড়িত করতে পারল না। সে রাতে সারা রাত সুরা পান করল পীরজাদা।

দু'দিন পরে সন্ধ্যার সংবাদপত্রে এক খবর ছাপা হলো যার সারমর্ম— জনৈক ভদ্রমহিলা করাচি থেকে রাতের ট্রেনে পেশোয়ার যাচ্ছিলেন জনৈক পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে। পথিমধ্যে ভদ্রমহিলা দারুণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ব্যাধির প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তার পুরুষ সঙ্গীটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ভদ্রমহিলা এক স্টেশনের বারান্দায় প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর নাম বলেন— বেগম পীরজাদা।

খবরটা বিদ্যুতের মতো স্পর্শ করলো পীরজাদার বন্ধুমহলকে। তারা টেলিফোন করল, দেখা করতে এলো, খুঁজে বেড়াল পীরজাদাকে। কিন্তু এত কাণ্ড যাকে নিয়ে তাকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। একমাস পর পীরজাদাকে আবার হঠাৎ দেখা গেল করাচিতে। তখন সে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। এই একটা মাস সে কোথায় ছিল তা জানা গেল না। বন্ধুদের সে বর্জন করলো, বান্ধবীদের সতেরো হাত দূরে রাখল। বাসা তুলে দিলো। উঠে এলো হোটেল কোলামবাসে। প্রথমে তার মনে হয়েছিল বুঝি খুব কষ্ট হবে, কিন্তু কই তাতো হলো না। বরং যেন তার *মনে লেগেছে অস্বাভাবিক এক মুক্তির রঙ। এ এমন এক মুক্তি যেন জীবন চলছিল এতক্ষণ* সিনেমা হলে শাদা কালো ছোট পর্দার ছবির মাপে, হঠাৎ পর্দা প্রশস্ত হয়ে গেল– শাদা কালোর বদলে রং দেখা দিল।

আসলে এটাই হচ্ছে পীরজাদার কষ্টের রূপ। একেকটা মানুষের কষ্টের ছবি একেক রকম। *এ লোকটা নিজে সচেতন নয় তার কষ্ট এসেছে এই ভাবে। ওটাতো মুক্তি নয়, ও হচ্ছে মৃত্যু।*

হোটেল কোলামবাসের তেতলায় সর্বদক্ষিণের ঘরে আজ আড়াই বছর ধরে যে মানুষটা থাকে, তাকে দেখে এখন আর এসব কল্পনাও করা যাবে না। এখন, আগেই বলা হয়েছে, সে যদ্দিন না মাটির তলায় যাচ্ছে তদ্দিন নিজেকে মাটির ওপর বাঁচিয়ে রেখে চলেছে।

পীরজাদার ইনভাইটেশন ছিল তার এক ক্লায়েন্টের বাড়িতে। ক্লায়েন্ট ভদ্রলোকের মেজ মেয়ের জন্মদিন। তাকে কিছু মূল্যবান অলঙ্কার উপহার দেয়া গেল। সর্ব অঙ্গে যৌবন বিচ্ছুরিত মেয়েটা ভারী খুশি হয়েছে— ছবিটা এখনো চোখে ভাসছে তার। যে কেউ মনে করতে পারতো উপহারের এই বহর দেখে যে, পীরজাদার চোখ পড়েছে মেয়েটির ওপর। হয়ত তারা মনে করেছেও। পীরজাদার চেয়ে আর কে ভালো জানে এটা হচ্ছে তার ঘৃণার একটা প্রকাশ। যে কোন নিয়ম, নিয়মের কথা শুনলে পীরজাদার আজকাল গা জ্বালা করতে থাকে। তখন সর্বস্ব পণ করে তার ওপর কিশতি মাৎ করতে তৎপর হয়ে ওঠে সে। জন্মদিনে উপহার দেয়াটা একটা নিয়ম। এ নিয়ম বদলাতে পারবে না পীরজাদা। আর তাই যেন জেদ করে মূল্যবান এক উপহার ছুঁড়ে ফেলে ক্রোধ নেভানো। উপহারটা দিয়েই বেরিয়ে এসেছে সে। এসে বসেছিল একবারে সুরা পান করতে। যখন উঠল, রাত তিনটে। মোড়ের বুড়ো ঝাঁকড়া গাছটার নিচে ছায়া ছমছম করছে। মনে হচ্ছে শহর থেকে সমস্ত লোক পালিয়ে গেছে মহামারীর ভয়ে।

এলফিনস্টোন স্ট্রীটে দোকানগুলোর শো প্যানেলে এখনো তীব্র আলো জ্বলছে। মূর্তিগুলোর গায়ে পরানো বডিস, শার্ট, টাউজার। কোনটা কবন্ধ. কোনটার শুধু উর্ধ্বাঙ্গ। খোলা স্যুটের কাপড় হঠাৎ স্তব্ধ ঝর্ণার মতো ঝুলছে। অতিকায় সিগারেটের টিন থেকে উঁকি দিয়ে আছে জাদুকরের লাঠির মতো সিগারেট। আকাশে নিয়ন বাতির দীপ্তিতে লেখা বিজ্ঞাপন জ্বলছে, নিবছে, জ্বলছে। একটা বিজ্ঞাপনের চারদিকে সহস্র বিন্দুতে খণ্ড খণ্ড লাল বর্ডার নর্তকীর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরছে। বিরাম নেই সে চলার।

পীরজাদা একটা সিগারেট ধরালো। সারা রাতে খাদ্যবস্তু কিছু পেটে পড়েনি এক প্লেট চীনাবাদাম ছাড়া। এখন কিছু খেতে পেলে ভালো হতো। ভাবলো, গাড়িটা ঘুরিয়ে যাবে কোনো হোটেলে। হয়ত এখনো কোথাও ফ্লোর শো হচ্ছে, রান্নাঘরে কিছু থাকতে পারে।

রেক্স সিনেমা পেরিয়ে ফোয়ারার কাছে আসতেই আকাশের দিকে চোখ পড়ল পীরজাদার। সে আকাশে তারার চন্দন ফোঁটা। তৎক্ষণাৎ তার চোখের সমুখে ভেসে উঠলো কল্পনার সেই নিকষ কালো মহিলার মুখ। সে যেন চোখের ইশারায় ডাকছে। পীরজাদা আর কোন দিকে তাকাল না. ফিরল না, সোজা তার গাড়ি ছুটল হোটেল কোলামবাসের দিকে।

মাসখানেক হলো একটা নতুন জিনিস লক্ষ্য করছে পীরজাদা। আকাশের সেই কাল্পনিক মুখের কথা মনে পড়তেই আচমকা আরেক জনের কথা মনে পড়ে যায় তার। সে ব্যক্তিটি তার দু'কামরা পরের অধিবাসিনী রজনী। রজনীকে প্রথম যেদিন দেখেছিল. সময়টা সন্ধ্যে, চমকে উঠেছিল পীরজাদা। বুকের মধ্যে মোচড় অনুভব করেছিল— যেন জন্মজন্মান্তরের ব্যথা। মন হয়েছিল, রজনীর কালো মুখের লাবণ্য দেখবার জন্যেই এতকাল ধরে সে বেঁচে আছে।

পীরজাদা অবাক হয়ে দেখত রজনীকে। ভীরু, নম্র, সচকিতা, তাড়া খাওয়া হরিণীর মতো মেয়ে। বোধহয় অস্পষ্ট করে একটা সাদৃশ্য এবং সান্ত্বনা খুঁজে পেত প্রথম পর্যায়ে তার স্ত্রীর গ্রামীণতার সঙ্গে।

হয়ত সকালে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছে রজনী, পদশব্দে চোখ ফিরিয়ে পীরজাদা তাকিয়ে থাকত। তার চোখে কী থাকত কে জানে, রজনীর লজ্জা করত। ঘরে চলে যেত সে তাড়াতাড়ি। বুকের মধ্যে দুপদুপ করত।

তার পালানোটা চোখে পড়েছিল পীরজাদার। তারপর থেকে রজনীর মুখোমুখি পড়ে গেলে পীরজাদাই সরে যেত।

আর রজনীর সঙ্গে যে লোকটা এসেছে, মহসিন, পীরজাদা তাকে হোটেল থেকে রোজ ভোরে বেরুতে দেখত। ওর খুব ইচ্ছে করত দু'জনের সঙ্গে কথা বলে, কিন্তু নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ও এতখানি পরিচিত যে ভয় হতো তাতে করে সবটাই হারিয়ে যাবে। এই যে রজনীকে দেখে তার মনের মধ্যে কেমন একটা উপশম হচ্ছে, শান্তি হচ্ছে, সেটা আর থাকবে না। হয়ত রজনীরা চলে যাবে। আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না এ শহরে।

মেয়েটাকে বোঝা যেতো না। কী যেন ভাবে ও। সারাক্ষণ ভাবে। সারাদিন ওর মনটা কোথায় যেন পড়ে থাকে। পীরজাদা খুব অবাক হতো মানুষের এত তন্ময় হয়ে থাকার ক্ষমতা দেখে।

আর একটা জিনিস বুঝতে পারত না সে। তা হচ্ছে ওরা হোটেলে আছে কেন? দেখে ওদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে যে ধারণা হয় তাতে কোন তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে থাকারই কথা। এখানকার এত খরচ তারা জোগাচ্ছে কি ভাবে? কিন্তু এ ভাবনা তার ভেবে কি লাভ? সে মাথা ব্যথা হোটেল ম্যানেজার ইব্রাহিম বালোচের।

কেবল একদিন কথা হয়েছিল রজনীর সঙ্গে। সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল করাচিতে যা সচরাচর হয় না। বারান্দায় এসে পড়ছিল বৃষ্টির ছাঁট। ভিজিয়ে দিচ্ছিল। রজনীর হয়ত মনে পড়েছিল, বাংলায় তার বাসার মধ্যে এমন সব দিনে ছাদের 'পরে অবাধ স্বাধীনতার কথা। সে বৃষ্টিতে খুব করে ভিজল। মহসিন নিত্যকার মতো বেরিয়েছে কাজের সন্ধানে। ফিরে এসে দেখে রজনীর গায়ে তাপ, জ্বর এসেছে।

রজনী তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি মরে যাবো। আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলো।'

বিব্রত হলো মহসিন। বাড়ির উল্লেখ মনের মধ্যে খচ করে বিঁধলো। বলল, 'তুমি একটু শুয়ে থাকো, আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি।'

অতরাতে মহসিন বেরুলো ডাক্তারের খোঁজে। করাচির কিস্‌সু জানে না চেনে না, ম্যানেজার একটা ঠিকানা দিয়ে দিল, সেইটে নিয়ে সে ছুটলো। এ দিকে ঘরে কাৎরাচ্ছে রজনী। ভুল বকছে। বলছে, 'আমাকে বাড়ি নিয়ে যাও, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

কামরায় ফিরছিল পীরজাদা। ঘরের মধ্যে থেকে মেয়েটার কাতরোক্তি শুনে থমকে দাঁড়াল। ব্যাপারটা অনুমান করতে চেষ্টা করল। কিছু বোঝা গেল না। মহস্নি ঘরে আছে কিনা তাও বুঝতে পারল না। পোর্টারকে ডেকে বলল সংবাদ দিতে। সে এসে জানাল, রজনী একা। জ্বর এসেছে।

ঘরে যাওয়া হলো না পীরজাদার। রজনীর ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করছিল, তাও দ্বিধায় মরে গেল। ওদের কামরার সমুখে সে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। রজনীর যন্ত্রণা বুঝি আবার বাড়লো। বার থেকে মনে হলো একটা কাটা কবুতর দাপাচ্ছে।

পীরজাদা ভেতরে এসে বলল, 'পানি দেব ?'

রজনী তাকে দেখল বড় বড় চোখ মেলে। এক মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল সে। কী বলল বোঝা গেল না। পীরজাদা তার পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। জিগ্যেস করল, 'জ্বরটা কখন ? আপনার স্বামী কোথায় ?' চোখ দিয়ে একটা ইশারা করল রজনী যার কোন মানে হয় না। পীরজাদা যদি মনের ভাষা শুনতে পেত, তাহলে শুনতে পেত, মেয়েটা বলছে আমার স্বামী কে ? যে বিয়ের জন্যে ঘর পালানো, সে বিয়ে তো আমার আজও হয়নি।

পীরজাদা খানিকক্ষণ ছটফট করলো বসে থেকে। মনে হলো জ্বরটা তারই হয়েছে। নিচে নেবে এসে গাড়ি করে তার বন্ধু ডাক্তারটিকে ডেকে নিয়ে এলো দশ মিনিটের মধ্যে। সেই বিষ মেশানো হুইস্কির আড়াই বছর পরে আজ প্রথম বন্ধুটির বাড়িতে তার পদার্পণ। তাই সে তক্ষুণি এলো এবং রোগিনীকে দেখে অবাক হলো। তার কী ধারণা হলো কে জানে, ডাক্তার মানুষ— অসুস্থ মানুষের সমুখে ব্যক্তিগত কিছু জিগ্যেস করল না। ওষুধ দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, 'পীরজাদা আমার সঙ্গে একবার টেলিফোনে কথা বোলো।'

তখন তার কথা শুনে যে কেউ বুঝতে পারত এ মেয়েটার সঙ্গে পীরজাদার কী সম্পর্ক সেইটে জানবার জন্যে তার কৌতূহল ফেটে পড়ছে। কিন্তু তখন পীরজাদার মাথার মধ্যে রজনীর ব্যথাক্লিষ্ট মুখ ; ভাববার মতো মনের অবস্থা তার নেই।

ডাক্তার চলে যাবার পর রজনীর পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল পীরজাদা। তখন মেয়েটা একটা কথাই উচ্চারণ করেছিল, 'শুকরিয়া।' সেই একটি মাত্র শব্দ যেন সহস্রের অভিধা নিয়ে বাজলো পীরজাদার হৃদয়ে। সে আর কিছু নয়, উদ্বেলিত হৃদয়কে শান্ত করে, কোন রকমে বলে গেল, 'আমি কুড়ি নম্বরে থাকি। বাইরে বেয়ারাকে বলে গেলাম থাকতে। দরকার পড়লে ডাকবেন।'

মনের মধ্যে একটা দুরন্ত আশা ছিল, রজনী তাকে যেতে দেবে না। কিন্তু রজনী কিছুই বলল না। পীরজাদা তার ঘরে ফিরে এসে জেগে রইলো উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে।

না, সে রাতে আর পীরজাদার ডাক আসেনি। মহসিন ফিরে এসেছে, তার কণ্ঠস্বরও শুনেছে। মহসিন ওষুধ নিয়ে এসে দেখে, রজনীর চিকিৎসা আগেই হয়ে গেছে। উদ্যোক্তার পরিচয় বেয়ারার কাছ থেকে পেয়ে খুশিও হতে পারল না, অনধিকার চর্চা বলে ক্রুদ্ধও হতে পারল না। লোকটা যা করেছে তা মানবিক। মানবিকতার এমন এক প্রচণ্ড শক্তি আছে, যে, মালিন্যকে তার সামনে মাথা নত করে থাকতে হয়।

মহসিন যে ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেনি, এটা বোঝা গিয়েছিল তারপরে বহুবার পীরজাদা মুখোমুখি পড়েও একটা কথা না বলা বা ধন্যবাদ না দেয়াতে। এটা লক্ষ্য করে পীরজাদা মরমে মুষড়ে রইলো, যেন একটা বিরাট অপরাধ করে ফেলেছে সে। ক'দিন চোরের মতো পালিয়ে সে ঘর থেকে বেরুতো, ঘরে ফিরত, পাছে সামনে পড়ে যায় মহসিনের বা রজনীর। আর রজনীর উচ্চারিত একটি মাত্র শব্দ 'শুকরিয়া'— রজনী তার সীমিত উর্দুজ্ঞানে ঐ একটি মাত্র কথাই বলতে পেরেছিল— সেটা পীরজাদার কানে অমৃতের মতো লেগে রইলো।

তারপর থেকে এমন হলো, হোটেলে ফিরলেই বুকের মধ্যে সে রজনীর অস্তিত্ব টের পেত। এই নতুন অনুভূতিটা বেশ কিছু দিন উপভোগ করলো পীরজাদা। এই সারাক্ষণ মনের মধ্যে কান পেতে থাকা, দূরে বাড়িগুলোর বিন্দু বিন্দু আলোর মধ্যে রজনীর মুখের আভাস সৃষ্টি, হঠাৎ চোখে পড়া রজনীর একটা শাড়ির রং— সমস্ত কিছু মিলিয়ে এক মন্ত্রের নিগড়ে যেন বাঁধা পড়ে গেছে সে।

দিন দশেক পরে একদিন বিকেলে রজনী আর মহসিনকে বেরুতে দেখা গেল। পীরজাদা এর আগে কখনো দু'জনকে এক সঙ্গে দেখেনি। রজনী পরেছে একটা ছাই রং শাড়ি— যেন তার গায়ের রং ভোরের আলো লেগে ফিকে হয়েছে। কবরী রচনা করে তাতে দিয়েছে মোতিয়ার বেড়। চলনে ফুটে উঠেছে আন্দোলিত কুসুমের ছন্দ। মুগ্ধ হলো পীরজাদা এবং অনুতপ্ত হলো।

অনুতাপ— কারণ, এই প্রথম তার মনে পড়ল রজনী বিবাহিতা। এ সত্যটা জেনেও তার মন এতদিন চাতুরি করে ভুলে বসে ছিল। ধিক্কারে ভরে উঠলো সমস্ত মন। চোখ ফিরিয়ে সে ঘরে ঢুকলো। এ সম্পর্কে আর দশটা মানুষের চেয়ে পীরজাদার ভয়টা ছিল সবচে বেশি। তার নিজের স্ত্রী অন্য এক পুরুষের প্রেমে পড়ে একদিন তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল বিষ খাইয়ে। ছি ছি করতে লাগল তার আত্মা। চেয়ারে কাঠ হয়ে বসে থাকবার, নিজেকে সংযত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল, এ তার কী হলো ? জীবনের জন্যে, বেঁচে থাকার জন্যে, আবার সে দিশা খুঁজে আবারো কি ডেকে আনবে আরেক মৃত্যু ?

পীরজাদা ছটফট করছে। ভাগ্যের পরিহাস, যে কারণে ছটফট সেটা অমূলক। কিন্তু সে কথা সে জানবে কি ? এ কথা রজনী ছাড়া আর কেউ জানে না যে, মহসিনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়নি ? বিয়ের জন্যে ঘর ছেড়েছিল। হোটেলের ভাড়া করা ঘরে প্রথম রাতেই রজনীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও বাসর হয়ে গেছে। মন তো দিয়েছিল, মনের আঁধারটিকেও সমর্পণ করতে হয়েছিল মহসিনের উত্তুঙ্গ ইচ্ছার মুখে। কিন্তু বিয়ে হয়নি।

মহসিন বোঝাতে চেষ্টা করত, 'দ্যাখো, এটা নতুন জায়গা। কিছু জানিনে শুনিনে, কোথায় কাকে গিয়ে বলবো বিয়ে পড়িয়ে দাও। বিয়ে তো আমাদের হয়েই গেছে। হয়নি ? বিয়ের চেয়েও এখন যেটা বড়, আমার একটা কাজ দরকার, আমাদের একটা বাসা দরকার– কই সে কথা তো তুমি আমাকে কিছু বলো না।'

শুনে রজনী মরমে মরে যেত। তাইতো, আগে একটা কাজ দরকার। ভয়ে বুক শুকিয়ে যেত, কাজ না পেলে খাবে কী ? কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ? তখন আর কিছু দিশেবিশে না পেয়ে মহসিনের বুকের মধ্যে নিজেকে রেখে সহানুভূতি আর সাহস ঢেলে দেয়ার ভীরু চেষ্টা করত সে।

এই করে চলছিল। কিন্তু রজনী বাংলার মেয়ে। নিয়মাচারের জন্যে তারা আজো জীবন দিতে জানে। মহসিন যেখানে দিনের পর দিন ভগ্নহৃদয়ে ফিরে আসছে কাজের কোন হদিশ না পেয়ে, সেখানে রজনীর তো উচিত ছিল তাকে সাহসে বলীয়ান করে তোলা, তার ইচ্ছার সমুখে বিনীতা হওয়া। কিন্তু ঘটলো উলটো। যত দিন যাচ্ছে রজনীর প্রেমের গোলাপে কাঁটার সংখ্যা বাড়ছে সমপরিমাণে। এই সত্যটা তাকে দগ্ধে মারছে যে, সে তার বিবাহিতা স্ত্রী নয়। সে অনাচার করছে।— তার প্রেম বড় নয় তার ক্ষুধা বড় নয়, তার আশ্রয় বড় নয়— তার সব প্রয়োজনের বড় যে প্রয়োজন সেটা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে।

কিন্তু কথাটা বলতে সাহস হয় না। মহসিন যে অমিত আশা নিয়ে এসেছিল তা নিভে গেছে। না বললেও রজনী এটা এখন স্পষ্ট করে জানে। মহসিন বুঝেছে, তার স্বল্পবিদ্যে এবং শূন্যের মূলধন দিয়ে এমন বড় কিছু করা যাবে না যাতে রজনী ও তার কল্পনার সংসার বাস্তব হয়ে উঠবে। অথচ ফেরবার পথ নেই। একেকদিন কাজ খোঁজার অছিলায় সারাটা দিন সে কাটায় ক্লিফটনে।

সমুদ্রের গর্জন তবু চিন্তাকে অবশ করে রাখতে পারে খানিকটা। চোখের সমুখে পৃথিবীর একদল হাস্যমুখরিত মানুষ, মেলা, নাগরদোলা দেখে দুর্বহ সময়কে সহনীয় করে তোলা যায়। একেক দিন মহসিনের মনে প্রশ্ন উঁকি দেয়— কেন সে রজনীকে নিয়ে এসেছিল ? রজনীর ওপর তার ভীষণ রাগ হয়। মেয়েটা কেন আসতে রাজি হলো তার সঙ্গে ?

হোটেল কোলামবাসে এসে গাড়ি থামলো পীরজাদার। রাত তখন সাড়ে তিনটে। দূর থেকে সমুদ্রের ক্ষুব্ধ গর্জন ভেসে আসছে। একবার ভাবলো, ক্লিফটন থেকে বেড়িয়ে আসে। অমন কত রাতে একা একা সে হেঁটেছে ক্লিফটনের বালুবেলায়, কী গাড়িতে চুপ করে বসে থেকে সমুদ্রকে শুনেছে।

আজ একটু বেশি পান করে ফেলেছে পীরজাদা। কেমন যেন ঘুম জড়িয়ে আসছে। থাক ক্লিফটন।

পোর্টার বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। সালাম করে উঠে দাঁড়াল তাকে তেতলা অবধি পৌঁছে দেয়ার জন্য। পীরজাদা হাতের ইশারায় তাকে নিরস্ত করে একাকী সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে কিছু একটা আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করল তার। কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না। কেবল কতগুলো অসম্বদ্ধ অর্থহীন শব্দ গড়িয়ে পড়ল মুখ থেকে।

রজনীর কামরার সমুখে এসে থমকে দাঁড়াল পীরজাদা। এতরাতেও ঘরে আলো জ্বলছে। স্কাইলাটের কাচের ভেতর দিয়ে চৌকো সোনার পাতের মতো আলো পড়ে আছে তার পায়ের কাছে। ভেতরে কোনো শব্দ নেই, সাড়া নেই। পীরজাদা সোনার পাতের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো। এত রাতে তো কোনদিন ওদের ঘরে আলো জ্বলে না।

মাথার মধ্যে অত্যধিক সুরা ছিল বলেই বোধ হয় সে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। একটা যুগও চলে যেতে পারতো। হঠাৎ ঘরের মধ্যে মৃদু পায়ের শব্দে কান খাড়া করে তাকাল।

ঘরের মধ্যে বাতি নিবলো। পীরজাদা তখন চলে যাবার উদ্যোগ করবে, এমন সময় দপ্ করে আবার সেই সোনার পাত এসে তার পায়ের ওপর পড়লো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল সে। বাতি আর নিবলো না।

এসে নিজের ঘরে সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে বিছানাটা দুলে উঠলো কেয়ামারির সাম্পানের মতো। আলো, চেয়ার, টেবিল, পর্দা, জাগ, সমস্ত কিছু নিয়ে এক প্রচণ্ড টানে সাঁতারুর মতো সোজা তলিয়ে গেল সে ঘুমের ভেতর।

রজনী ভেবেছিল অন্ধকারে শুয়ে থাকতে পারবে। বুকের মধ্যে তো ঢিপঢিপ করছিল। বাতি নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো হৃদয়টা এখুনি ছিঁড়ে যাবে ভয়ে। তক্ষুণি আবার বাতি জ্বালিয়ে ঘরের মধ্যখানে সে দাঁড়িয়ে রইলো। সর্ব অঙ্গ তার থরথর করে কাঁপছে। আরো শঙ্কা হলো যখন বাইরে শুনল পায়ের শব্দ। কে যেন দাঁড়াল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল,

দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। একবার মনে হয়েছিল, দরোজা খুলে দেখে। কিন্তু সাহস হয়নি। পরে সে শুনল, পায়ের আওয়াজটা একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে থামল, তারপর দরোজা খোলার শব্দ। তখন বুঝলো পীরজাদা ফিরেছে।

সব রাত পোহায়। দুঃখের রাতও শেষ হয়। সূর্য ওঠে। সারাটা রাত জেগে বসেছিল রজনী। রাতের বেলায় তবু সব কেমন যেন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। দিনের আলোয় তা নিষ্ঠুর সত্য হয়ে ফুটে উঠল।

রাতে শুয়ে ছিল দু'জনে। মাঝরাতে পাশে হাত পড়তেই রজনী চমকে উঠেছে। মহসিন নেই। প্রথমে মনে করেছিল বাথরুমে গেছে। কিন্তু পনেরো বিশ মিনিট কেটেছে, সাড়া নেই। তখন সে উঠে বসেছে। নাম ধরে ডেকেছে। সাড়া আসেনি। বাতি জ্বালিয়ে দরোজা খুলে দেখে শাওয়ার থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে নিত্যকার মতো— সে নেই। সারাটা ঘর শূন্য। তখন ভীষণ ভয় করলো রজনীর। চোখের সামনে সব দেখেও কিছুই যেন সে দেখতে পারছে না। তার মাথায় কিস্সু ঢুকছে না। মহসিন তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে, এ সত্যটা কিছুতেই সে যেন বুঝতে পারছিল না। কেবল কী রকম একটা অতল ভয় করছিল। আর কিছু না।

বেয়ারা এসে সকালের চা দিয়ে গেল। চা স্পর্শ করলো না। কিছুক্ষণ পর ব্রেকফাস্ট আনলো, যেমন রোজ আনে, দু'জনের জন্যে। দু'জনের ব্রেকফাস্টের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলো সে। সব কিছু দু'জনের। কিন্তু একজন নেই। মায়ার মতো একবার আশা হলো হয়ত ফিরে আসবে মহসিন। কিন্তু দুপুর হয়ে গেল, সে এলো না।

অবাক হলো বেয়ারা। জিগ্যেস করল, 'মেমসাব কা তবিয়ৎ কেয়া ঠিক নেহি ?'

বুড়ো পাঠানের কণ্ঠে এমন একটা মমতা ছিল, রজনীর মনে হলো এখুনি তার চোখে পানি এসে পড়বে। তাড়াতাড়ি সে কোন রকমে মাথা নেড়ে একটা হ্যাঁ-না গোছের জবাব দিল। বেয়ারা জিগ্যেস করল, 'সাহেব কি ভোরে ভোরেই কাজে বেরিয়ে গেলেন ?' তারও জবাব সে দিল না। বরং একটা কথা জিগ্যেস করার ফলে সে যে পরিত্যক্ত এইটে প্রকট হয়ে উঠলো তার মনের মধ্যে। বুড়ো পাঠান কী বুঝলো কে জানে, ট্রে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। জাগে ভরে দিয়ে গেল নতুন পানি।

সে যাবার পর টসটস করে দু'ফোটা উষ্ণ অশ্রু গড়িয়ে পড়ল রজনীর গালে। তা মুছে ফেলার কথা মনে হলো না। ফোঁটা হলো প্রস্রবণ। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে বসে কাঁদলো রজনী। উঠে দাঁড়াতেই জানালা দিয়ে দূরে শহর চোখে পড়ল তার। রুক্ষ ধূসর মাটিতে ছোট বড় দালান, একটা দু'টো গাছ, গাড়ি চলছে, কয়েকটা ছেলেমেয়ে স্মার্ট পোশাক পরে রোদের মধ্যে কুটিপাটি হাসতে হাসতে রাস্তা পার হচ্ছে। এ সবের যেন কোন মানে বোঝা যাচ্ছে না। এ যেন আরেকটা পৃথিবীতে ঘটছে, আর সে, রজনী, তার কোনো শক্তি নেই সেখানে যেতে পারে।

আস্তে আস্তে দরোজা খুলে বেরুলো রজনী। করিডরে কেউ নেই। ইতস্তত করল একবার। চারদিক দেখল। তারপর হঠাৎ সাহস সঞ্চয় করে কুড়ি নম্বরের দরোজায় মৃদু টোকা দিল। বুকের স্পন্দনটা যেন হঠাৎ বেড়ে গেছে, তাকে আর কিছুতেই শান্ত করা যাবে না। অনেকক্ষণ পর আবার আঘাত করল দরোজায়। অস্পষ্ট উচ্চারণও করল, 'শুনুন'। তার তখন এটুকু বোঝার মতো জ্ঞান নেই যে তার বাংলা কেউ বুঝবে না।

ভেতর থেকে এবারে বিজড়িত কণ্ঠে উত্তর এলো, 'কাম ইন।'

লোকটার কণ্ঠ শুনে তার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। চলে যাবার জন্যে ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠল। মুখ ফেরাবে এমন সময় দরোজা খুলে পীরজাদা বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ সাড়া না পেয়ে কে লোকটা দেখবার জন্যে বিরক্ত হয়ে উঠে এসেছিল সে। কোনো রকমে উচ্চারণ করতে পারল, 'আপনি!'

রজনীর কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে সে আবার শুধালো, 'আমাকে কিছু বলবেন ?'

জামার বোতাম ছিল খোলা। পীরজাদা সেগুলোকে কোনো রকমে বন্দি করতে করতে পর্দা সরিয়ে ভেতরে আসবার পথ করে দিল। এবং আশেপাশে মহসিনকে না দেখে উৎকণ্ঠিত হলো। রজনীকে একবার ডাক্তার ডেকে এনে দিয়েছিল বলে লোকটা বিষ চোখে কয়েকদিন তাকে দেখেছে। এখন ঘরে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে হয়ত খুন করতে আসবে।

সোফার ওপরে পরিত্যক্ত পোশাক ছিল ছড়ানো। সেগুলো সলজ্জ হয়ে গুছোতে গুছোতে পীরজাদা বলল, 'বসুন। এ ঘরটা খুব আগোছালো। কিছু মনে করবেন না।'

রজনী বসলো না। তার স্বল্প জানা উর্দু আর বইয়ের ইংরেজি মিশিয়ে কোন রকমে যা বলল তার অর্থ— সে বসবে না, একটা কথা বলতে এসেছে।

নিশ্চয়ই সে কথা বলবে, কিন্তু বসবে না এটা কেমন কথা ? অতএব বসতে হলো। কথাটা বলবার জন্যে যে শক্তির দরকার তা সেই মুহূর্তে রজনীর ছিল না বলে বসে পড়া ছাড়া পথ ছিল না তার।

আর পীরজাদা তার ভাষার অস্বাচ্ছন্দ্যে এতদূর অস্বস্তি বোধ করল যে, বাংলা না জানার জন্যে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হলো। বলল, 'আপনি বলুন আমি বুঝতে পারছি।'

রজনী বলল, 'আমি বড় বিপদে পড়েছি। আপনি ছাড়া এখানে কাউকে চিনিনে। কাল রাত থেকে ওকে দেখছি না।'

কথাটা অপ্রত্যাশিত। পীরজাদা প্রথমে কিস্‌সু বুঝতে পারল না। হ্যাঁ করে তাকিয়ে রইল রজনীর দিকে। তার শ্যামল মুখের ওপর ইতস্তত দ্রুত কী যেন খুঁজে বেড়াল চোখ। বোকার মতো জিগ্যেস করল, 'কাকে দেখছেন না ?'

রজনী চকিতে একবার চোখ তুলে চোখাচুখি হতেই দৃষ্টি নামিয়ে নিল। বলল, 'ওকে।'

'আপনার স্বামীকে ?'

রজনী মাথা নিচু করে রইল।

তখন সব কিছু স্পষ্ট হলো পীরজাদার কাছে। পায়ের আসন বদল করে বসলো সে। তখন রজনীকে সম্পূর্ণ করে দেখল। তার ভীত রক্তশূন্য মুখের 'পরে বেশিক্ষণ দৃষ্টি রাখতে পারল না। করতলে মাথা রেখে ভাবতে চেষ্টা করল পীরজাদা।

আবার যখন চোখ তুলল, দেখল, রজনী তার দিকে ছলোছলো চোখে তাকিয়ে আছে। সে চোখে অবোধ আকুলতা দেখে পীরজাদার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো, বড় অক্ষম মনে হলো নিজেকে। চকিতে মনে পড়ল তার স্ত্রীর পালানো এবং বীভৎস মৃত্যুর কথা। তখন প্রবল ইচ্ছে হলো, উঠে গিয়ে সমুখে বসে থাকা ঐ ভয়ার্ত মেয়েটাকে নির্ভয় করে তোলে তার শরীর স্পর্শ করে। হয়ত সে উঠেই যেত, কিন্তু বাধা পড়ল।

মনের মধ্যে চাবুক পড়ল যেন। একী করতে যাচ্ছিল সে ? রজনীর জন্যে এতদিন দূর থেকে যে দুর্বলতা গড়ে উঠেছিল, আজ তা-ই যেন আগল ভেঙ্গে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আরেক মানুষের স্ত্রী রজনী, তার জন্যে এতটুকু মমতা করাও যে পাপ।

যেখানে তার উচিত ছিল রজনীর বিপদ দেখে সাহায্য করবার জন্যে উদ্বুদ্ধ হওয়া, সেখানে পীরজাদা স্বার্থপরের মতো নিজেরই মমতাকে প্রকাশ করবার জন্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছে!

স্তব্ধ হয়ে ভাবলো, যদি আজ রজনী না হয়ে অন্য কোনো মেয়ে হতো তাহলে কি সে এতখানি বিচলিত বোধ করত ? করত না। অন্য কোনো সময়ে হলে সে এর সিকিও অনুভব করতে পারত না— এইটে বুঝতে পেরে চুপ হয়ে গেল সে। তার মুখ কঠিন হলো। হৃদয়কে সে পাথর করে তুললো, যে পাথরের হৃদয় নিয়ে সে এই আড়াইটে বছর বেঁচে আছে ; বলল, 'আমাকে মাফ করবেন, আমি কিছু করতে পারব না। আপনার বিপদের কথা শুনে আমি দুঃখিত ও মর্মাহত। আমার কিছু করবার নেই। আপনি ম্যানেজারকে খবর দিন, তিনিই ব্যবস্থা করবেন।'

শুনে রজনী স্তম্ভিত হয়ে গেল। যে লোকটা তার অসুখে বিনি ডাকে এগিয়ে এসেছিল, সেই একই লোকের সমুখে সে বসে আছে বিশ্বাস হলো না। পীরজাদাকে তার মনে হয়েছিল সহানুভূতিশীল। সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, তার বিপদের মুহূর্তে অমন রুক্ষ কথা শুনতে হবে। মানুষের ওপর রজনীর যে ভালো ধারণাগুলো ছিল তা খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেল। পশুর মতো মনে হলো পীরজাদাকে। উঠে দাঁড়াল রজনী।

পীরজাদা বুঝতে পারল, সে অন্যায় করেছে। সে একচোখা বিচার করেছে। মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি যে কর্তব্য তা সে করতে পারল না। ক্ষমাহীন অপরাধ বোধ নিয়ে সেও উঠে দাঁড়াল এবং বিনীতকণ্ঠে বললো, 'আপনি হয়ত আমাকে অমানুষ ভাবছেন। আমি যে কথাগুলো বলেছি তা কোনো বিশেষ কারণে বলেছি যার সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই, তাই বুঝিয়ে বলতে পারব না।'

তার কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতাটুকু রজনীকে স্পর্শ করল। তাকে আবার ভরসা করতে মনটা ইচ্ছুক হয়ে উঠল। রজনীর মন থেকে তিক্ততার খানিকটা যেন অপসারিত হয়ে গেল। বলল, 'আমি আর কাউকে চিনিনে বলেই আপনার কাছে এসেছিলাম।'

'আমাকেও আপনি চেনেন না। সে যাক, এখন আমার মনে হচ্ছে ম্যানেজারের সঙ্গে আপনার দেখা করাই ভালো।'

'কেন ?'

'সে বিষয়ী মানুষ। প্রথমেই তার মনে পড়বে হোটেলে বাকি বিলের কথা। সেটা আপনার মাথায় আরেক বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।'

রজনী ভাবেনি। এবারে সে চোখে মুখে দিশে দেখতে পেল না। বলল, 'তাহলে ?'

'একটা কাজ করতে পারবেন ? আপনি দোতলায় নেমে ন'নম্বর কামরায় যান। ওখানে লালা স্বরাজ থাকেন, আমার বন্ধু সাংবাদিক। আমি টেলিফোনে তাঁকে বিস্তারিত জানিয়ে দিচ্ছি। আমার মনে হয়, সে নিশ্চয়ই একটা কিছু করতে পারবে।'

তার সমুখেই পীরজাদা টেলিফোন করল লালা স্বরাজকে। স্বরাজ সৌভাগ্যবশত তার কামরাতেই ছিল। আজ তার ছুটিবার। পীরজাদা নিজে রজনীকে দিয়ে এলো লালা স্বরাজের

কামরায়। বসলো না। ঘরে এসে পরপর দু'টো নির্জলা বড় হুইস্কি পান করল। রজনীর কথা বারবার মনে পড়ছে অথচ সে মনে করতে চায় না। রজনীর জন্যে তার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে, অথচ কষ্টটাকে কিছুতেই দাবিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

লালা স্বরাজ বাঙালি মেয়ে শুনে উৎসাহ বোধ করল। কিছুদিন হলো বাংলার জন্যে তার একটা অনুরাগ দেখা দিয়েছে। সেটার শুরু রবীন্দ্র শত-বার্ষিকীর সময়ে। কিনেছিল নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'র রেকর্ড। বুঝতে পারেনি একবর্ণ, কিন্তু ভাষাটার প্রতি ভালোবাসা জন্মে গেল। কেনা হলো সুনীতি বাবুর বাংলা শেখার বই। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতি, মানুষ সব কিছুর জন্যে আগ্রহটা প্রবল হলো তার।

এতদিন একটি মেয়ে, বাঙালি মেয়ে এ হোটেলে আছে এটা সে জানে না ভেবে অবাক হলো। সে পীরজাদাকে টেলিফোনে বলল. 'তুমি এখুনি ওকে নিয়ে এসো।'

পীরজাদা এসে রজনীকে পৌঁছে দিয়ে গেল তার কামরায়। আড়ালে ডেকে বলল, 'থানা পুলিশে খবর দিয়ে অনর্থক হাঙ্গামা বাধানো রজনী পছন্দ করছে না। তুমি সাংবাদিক মানুষ, যে করে হলে হৈচৈ কম হয়, লোকটার সন্ধান এনে দাও।'

রজনীকে দেখে প্রথমেই যে কথাটা মনে হলো লালা স্বরাজের তা হচ্ছে মেয়েটা বোকা। শিশুর মতো একটা মমতা মাখানো সারা মুখে। রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলির ছবি খুঁজে পেল সে। আরো ভালো লাগল, একেবারে নতুন লাগল, তার পরনে নানা রংয়ের বরফি করা তাঁতের সবুজ শাড়িটা।

সাংবাদিক মানুষ লালা স্বরাজ। তার দৃষ্টিই আলাদা। প্রথম পরিচয়ের আবেশটুকু পার হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে রজনীকে পরিমাপ করল। জিগ্যেস করল, 'এ হোটেলে কদ্দিন ?'

'দেড় মাস।'

'করাচিতে এই প্রথম ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার স্বামী ?'

রজনী চোখ তুলে তাকাল। বলল. 'হ্যাঁ।'

এতক্ষণে রজনীর মনের মধ্যে একটু সাহস দেখা দিচ্ছে।

লালা স্বরাজ আচমকা প্রশ্ন করল, আপনার কি মনে হয় আপনি সত্যি কথা বলছেন ?'

'কোনটা!'

'যে উনি আপনার স্বামী ?'

কথাটা বলে লালা স্বরাজ উঠে দাঁড়াল। বেল টিপল। বেয়ারা এলে তাকে চায়ের জন্যে পাঠাল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে রজনীকে বলল, 'আমার ধারণা. উনি আপনার স্বামী নন।'

রজনী প্রতিবাদ করতে গেল। কিন্তু কী বলল ভালো করে বোঝা গেল না। বাংলা উর্দু ইংরেজি মিশেলে সব তালগোল পাকিয়ে গেল। নাজেহাল হয়ে বলল, 'আমি আপনাদের ভাষায় ভালো করে কথা বলতে পারিনে। আমি কিছুই বুঝিয়ে বলতে পারছি না।'

লালা স্বরাজ বলল, 'আপনি বাংলাতেই বলুন। ইদানীং আমি আপনাদের ভাষা শেখবার চেষ্টা করছি। বলতে না পারলেও মোটামুটি বুঝতে পারি।'

কিন্তু রজনী আর কিছু বলতে পারল না। লালা স্বরাজ বুঝতে পারল রজনীর স্বামী নয়। তবু একসঙ্গে একই হোটেলের কামরায় দেড়মাস তারা থেকেছে। রজনীর রূপে নেই প্রখরতা, দৃষ্টিতে নেই বিদ্যুৎ, ভঙ্গিতে নেই আজাদ-জেনানার দম্ভ। রজনী শান্ত, আত্মস্থ, নির্ভরশীলা নারী। তবে কি সে ভালবাসত লোকটাকে ? আর এই ভালবাসাই তাকে আকুল করে তুলেছে পালিয়ে যাওয়া লোকটার সন্ধানে সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষের কাছে সাহায্য চাইতে ? কুণ্ঠাহীনা করেছে ? আর লোকটা যদি সত্যি সত্যি ভালোবেসে থাকত রজনীকে, তাহলে পালিয়ে গেল কেন ? কেন ওরা এসেছিল করাচিতে ? কেন এ হোটেলে উঠেছিল ? রজনীর দিকে আবার ভালো করে তাকাল লালা স্বরাজ। কিছুই বোঝা গেল না। তার একটা প্রশ্নেরও উত্তর সেখানে নেই। কেবল লোকটার জন্যে ভালবাসার স্পন্দন যেন মেয়েটার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।

এমন কাণ্ড সে জীবনে দেখেনি। ভালবাসার এই পরোক্ষ পরিচয়ে বিস্মিত হলো সে। বলল. 'কিছু মনে করবেন না। আমারই বুঝতে ভুল হয়েছিল। কাল অধিক রাত অবধি কাজ করতে হয়েছে, মাথা গুলিয়ে আছে। আপনার স্বামীর সন্ধান আমি যথাসাধ্য করব। আশা করি সফল হবো। আপনি ঘরে যান। দরকার হলে আমাকে খবর দেবেন।'

রজনী চলে গেলে সে ভাবতে বসলো, সন্ধানটা কিভাবে নেয়া যেতে পারে। মহসিনের চেহারা তার জানা নেই, একটা ছবি পেলে কাজ হতো। তক্ষুণি সে রজনীর কামরায় এসে ফটো চাইল। মেয়েটা অনেকক্ষণ সুটকেস খুঁজল, মহসিনের কাগজপত্র ঘাঁটলো, কিন্তু ছবি পাওয়া গেল না। বলল, 'তাহলে ?'

কোনো রকমে একটা বর্ণনা দিল তার। লালা বেরিয়ে এসে কী ভেবে পীরজাদার দরোজার দিকে গেল। দেখল, ঘর বন্ধ। পীরজাদা বেরিয়ে গেছে।

সন্ধ্যের সময় ফিরে এসে লালা স্বরাজ দেখল, তখনো পীরজাদার ঘর বন্ধ। দুপুর থেকে শহরের সর্বত্র তার যেখানে যত বন্ধু আছে সবার কাছে সে ঘুরেছে— পুলিশের ছোট বড় কর্তা থেকে শুরু করে হাসপাতাল, হোটেল, বাঙালিদের আড্ডা, ক্লাব, সংঘ কিছুই বাদ রাখেনি। কিন্তু সে নিজেও জানতো, এ করে কিছুই হবে না। একটা সুস্থ সজ্ঞান লোক এত বড় শহরে গা ঢাকা দিয়ে থাকলে তাকে খুঁজে বার করা শক্ত। হয়ত আদৌ সে এ শহরেই নেই। হয়ত ঢাকা চলে গেছে। কিন্তু গেল কেন রজনীকে ফেলে ?

দরোজায় টোকা দিতেই বেরিয়ে এলো রজনী। যেন এতক্ষণ তার জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল। ভেতরে এসে বসল লালা স্বরাজ। বলল, সে সর্বত্র খবর নিয়েছে। এখনো হদিশ মেলেনি। জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা উনি ঢাকা চলে যান নি তো ?'

'না. আমার মনে হয় না।

'আশ্চর্য!'

'কী ?'

'আপনাকে ফেলে কোথায় যেতে পারেন ? আমি হাসপাতালেও খোঁজ নিয়েছি।'

মাথার ওপরে বিরাট চক্রের মতো বাতি জ্বলছে। সেই আলোয় লালা স্বরাজ দেখল রজনী সারাটা বিকেল কেঁদেছে। তার মুখ কান্না শেষে পাথরের মতো ভার হয়ে আছে। সে বলল, 'আপনি দেশে ফিরে যান।'

চমকে উঠল রজনী। দ্রুত মাথা নাড়ল। অস্পষ্ট উচ্চারণ করল, 'না, সে হয় না।'

'কেন?'

'দেশে আমার কেউ নেই।'

'কেউ নেই?'

যেন প্রতিধ্বনি করে উঠল লালা স্বরাজ।

'বাবা মা ভাই বোন কেউ নেই? আপনার স্বামীর কেউ নেই? তারও কেউ নেই?'

'না।'

সে ভাবল মেয়েটা মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু মিথ্যে বলার মতো মেয়ে বলেও মনে হচ্ছে না। একদিকে তার সাংবাদিক মন রহস্য ভেদের জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠল, অন্যদিকে এই মেয়েটার জন্যে মমতা করতে লাগল, সেই মমতা তাকে বারণ করল মেয়েটাকে আর কোন প্রশ্ন করতে। তার মনে হলো রজনী ভেঙে পড়বে।

জীবন যে কী অসামান্য অগোচর এক শক্তির চক্রে আবর্তিত, উৎক্ষিপ্ত, জটিল হয়ে ওঠে, মানুষ তার এক নগন্য ভগ্নাংশও জানতে পারে না, এ কথা লালা স্বরাজ জানে। তার নিজের জীবনটাও তো ওই। কে তার কতটুকু জানে, তাকে কতটুকু কে বুঝতে পারে? এই মেয়েটার কোমল চোখের সমুখে বসে তার নিজের অতীতের ছবি দেখতে পেল লালা স্বরাজ। তার বাবা ছিল করাচি পোর্টের অসংখ্য ঝাড়ুদারের একজন। ছোটবেলার কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে তার। বাবার সঙ্গে সেই ভোরে বেরুতো ভিজে ন্যাকড়া আর বালতিভরা পানি নিয়ে। বাবা ঝাড়ু দিয়ে যেতেন আর সে ন্যাকড়া ভিজিয়ে ভিজিয়ে মেঝে মুছতো। বাবা বলতেন, 'মুছতে মুছতে যখন নিজের চেহারা দেখতে পাবি তখন বুঝবি কাম ভালো হয়েছে।' মেঝেতে নিজের চেহারা সে কোনদিন দেখতে পায়নি। কথাটা ভয়ে বাবাকে বলত না সে।

সারাদিনের কাজ ছিল এই। সকাল দুপুর সন্ধ্যে। একটা দিন হপ্তায় ছুটি মিলত। কিন্তু বস্তি থেকে বেরুনো ছিল তার নিষেধ। বাবা ভয় করতেন, ছেলে অস্পৃশ্যের সন্তান, পথে বেবিয়ে কোথায় কোন ব্রাহ্মণের ছায়া মাড়াবে, চোখে পড়বে, অভিশাপ কুড়োতে হবে। ভালো করে বুঝতো না স্বরাজ ব্যাপারটা। বাবাকে দেখত বেরুতে। জিগ্যেস করলে তিনি বলতেন, 'তুই এখনো ছেলেমানুষ, কখন কী করে বসবি, তাই বেরুনো মানা।' তখন নিজেকে হাত পা বাঁধা কুকুরের মতো মনে হতো স্বরাজের। ব্রাহ্মণকে মনে হতো অতিমানব। কল্পনা করত দৈত্যের মতো দীর্ঘ তারা, অসুরের মতো শক্তি তাদের, চোখ দিয়ে বেরুচ্ছে আগুন— যে আগুন তাকে পুড়িয়ে মারবার জন্যে সারাক্ষণ লক্ষ্য করছে।

রজনীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ কানে এলো।

'কী ভাবছেন?'

লালা স্বরাজ তার অতীত থেকে ফিরে এসে ধরা পড়ে যাওয়ার হাসিতে বিব্রত হলো। বলল, 'কিছু না।'

রজনী কী বুঝলো, মন ছোট করে বলল, 'আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। আমার জন্যে সারাটাদিন আপনার নষ্ট হলো।'

'না, না, সে কী ?'

'আপনার কি মনে হয়, ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে ?'

'যাবে, নিশ্চয়ই যাবে, কেন যাবে না ?' তারপর কী ভেবে লালা স্বরাজ যোগ করল, 'মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কেমন কথা ? একমাত্র মরে গেলেই মানুষ সত্যি সত্যি হারিয়ে যায়। বেঁচে যে থাকে তাকে আজ হোক কাল হোক পাওয়া যাবেই। আমার তো মনে হয় উনি নিজেই ফিরে আসবেন। হয়ত আজ রাতেই আসবেন। নিশ্চয়ই কাল রাতে আপনাদের ঝগড়া হয়েছিল ?'

তার কথা মরমে গিয়ে স্পর্শ করল রজনীকে। পরম একটা নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এলো তার। সত্যি তো মহসিন আজ রাতেও ফিরে আসতে পারে। বরং এইটেই সম্ভব। রজনীর তখন খুব ভালো লাগল। মনটা তার আরো সহজ হয়ে উঠল। সলজ্জ হয়ে মাথা নেড়ে মুখে বলল, 'না, ঝগড়া কী!'

মানুষ বেঁচে থাকলে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবেই, এই কথা লালা স্বরাজ বলেছে, কিন্তু সত্যি সত্যি সে কি তা বিশ্বাস করে ? তার নিজের জীবনে কি এটা মিথ্যে হয়ে যায়নি ? কিন্তু যখন সে বলেছে তখন এত অনুভব করে বলেছে যে তার মন ভীষণ রকমে আচ্ছন্ন হয়ে রইল এক আশ্চর্য কোমলতায়। রজনীকে তার খুব আপন বলে মনে হলো। সুন্দর একটা পরিবেশ রচিত হলো তার হৃদয়ের মধ্যে। সে বলল, 'সারাদিন ঘরে বসে থাকলে আপনার মন খারাপ করবে যে, কাঁদেন নি তো ?'

রজনীর ভালো লাগল কান্নার উল্লেখে। লোকটাকে কাছের মনে হলো। সত্যি সে কেঁদেছে। কিন্তু মুখে বলল, 'না।'

'তাহলে চলুন, শহরে বেরিয়ে আসবেন। এই সময়টা কার্নিভালের মতো খুশিতে ভরে থাকে বাইরে। যাবেন ? আপনার সঙ্গে বাংলায় কথা বলে এই আধঘণ্টায় রীতিমত পণ্ডিত হয়ে গেছি। কেমন বাংলা বলি বলুন তো ?'

'ভালো।'

'কি, যাবেন ?'

সারাটা দিন ঘরের মধ্যে ছটফট করেছে রজনী। কতবার যে উঠেছে, বসেছে, শুয়েছে, হেঁটেছে, দাঁড়িয়ে থেকেছে তার ইয়ত্তা নেই। ঢাকা থেকে পালিয়ে আসার সময় বুকের মধ্যে যতটা না কাঁপুনি লেগেছিল, আজ সারা দিনে তার চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা তাকে দুর্বল করে তুলেছে। দুর্ভাগ্য তার নতুন নয়। তিনবার আই এ ফেল করা, কয়েকবার তাকে দেখতে এসে পছন্দ না করা, মা-বাবার বকুনি, এ সব তাকে যথেষ্ট পাথর করে ফেলেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যকে দূর করবার জন্যে পেছনে ফেরার পথ বন্ধ করে শেষ বারের মতো যাকে সে অবলম্বন করেছিল, সে চলে যাবার পর আজ সত্যি সত্যি নিজেকে বড় রিক্ত মনে হয়েছিল তার। রিক্ততা যখন চরমে গিয়ে পৌঁছয়, তখন আশ্চর্য রকমে মানুষ মুক্ত বোধ করতে থাকে। ইন্দ্রিয়ের একটা সহন-সীমা আছে, সেটা পেরিয়ে গেলে দুর্বহ ভারও আর ঠাহর হয় না। রজনীর হয়েছে সেই দশা। তার মনে হলো, জন্মজন্মান্তরে এমন সহানুভূতি সে পায়নি। সে বলল, 'এখন কি বাইরে বেরুনোর সময় আছে ?'

'নিশ্চয়ই আছে। শহরে বেড়াতে হলে এই তো সময়। প্রকৃতিকে দেখতে হলে দিন, আর শহর— রাতে। চলুন, আপনার কিছুতেই মন খারাপ করে বসে থাকা চলবে না। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি। আপনি কাপড় বদলে নিন।'

লালা স্বরাজ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বেশ সুন্দর একটা বাতাস দিচ্ছে। চাঁদ উঠেছে। কেবল উঠেছে। কেবল উঠেছে বলে অনেক বড় আর লাল দেখাচ্ছে চাঁদটাকে ; মনে হচ্ছে জন্মের কষ্ট হচ্ছে চাঁদটার। মাঝরাতে যখন আকাশের মাঝখানে এসে পড়বে, তখন ঝকঝক করতে থাকবে, আনন্দের মতো দেখাবে।

একটা চিরকুট লিখল স্বরাজ। লিখল— 'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। তুমিও দ্যাখো। তুমিও খোঁজ করো। কেবল আমার ভরসায় থেকো না।

লিখে কাগজটা পীরজাদার দরোজার ভেতরে চালিয়ে দিল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে।

নিচে লনে চেয়ার পেতে কেউ কেউ বসেছে। মনে হচ্ছে, অন্ধকারের মধ্যে শাদা শাদা শরীরগুলো কে যেন এঁটে রেখে গেছে চাবি দিয়ে।

একটা গাড়ি এসে থামল, কেউ নামলো, গাড়িটা গড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে বসে রইল হামা দিয়ে।

মানুষ যদি বেঁচে থাকে তো একদিন না একদিন তাকে খুঁজে পাওয়া যাবেই। লালা স্বরাজ অবাক হয়ে ভাবল, যে কথাটা সে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে বহুদিন আগে থেকেই, আজ সেটাই কী করে সে এত বিশ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করতে পারল ?

সেই যে সমাজের অস্পৃশ্য হরিজন বলে বাবা বেরুতে দিতেন না, তাতে কী ? স্বরাজ ছুটিবারে যেত সায়েবদের বাংলার পেছনে মালি খানসামাদের কোয়ার্টারে। সেখান থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত একটা নতুন জগৎ। স্বর্গের মতো। ফুলের মতো ছেলেমেয়েরা, তারই বয়সী, খেলছে, লাফাচ্ছে, দৌড়াদৌড়ি করছে। মা তাদের লাল চুলে বো বেঁধে দিচ্ছেন ছেলেটাকে ডেকে গানের মতো গলায় কথা বলছেন। চটপট মাকে কী যেন বলছে সে ছেলে। হাসছে। তার পোকায় খাওয়া দাঁত খুশিতে কী সুন্দর দেখাচ্ছে। খুব ঝিলিক দিয়ে রোদ উঠেছে। মাঠ খুব সবুজ হয়েছে। শাদা হাফ প্যান্ট পরে সায়েব বাগানে ঘুরছেন। বক্‌লস বাঁধা কুকুরটা তার পেছনে পেছনে যাচ্ছে।

এক আধদিন সায়েবের মুখোমুখি পড়ে গেলে চোরের মতো পালাতে চেষ্টা করত স্বরাজ। কিন্তু পরক্ষণেই দেখত, না, তাকে তাড়া করছেন না উনি। বরং কাছে ডেকে প্রথম দিনই নাম পরিচয় জিগ্যেস করেছিলেন; এবং দ্বিতীয় দিনে কুকুরটা একটা বেড়াল দেখে খুব লাফাচ্ছিল, বেড়ালটাকে ধরে বেঁধে দূরে কোথাও ফেলে দিতে বলেছিলেন সায়েব। এ বেড়ালটা জ্বালাত রোজ। একটা কাজ পেয়ে স্বরাজ সেদিন মহাখুশি। তাকে কায়দা করে মাখা রুটির লোভ দেখিয়ে, ধরে, বস্তাবন্দি করে পিঠে ঝুলিয়ে স্বরাজ একটা চলন্ত ট্রাকের ওপর তুলে দিয়েছিল।

এমনি করে চেনা হয়ে উঠেছিল স্বরাজ সেই সায়েব পরিবারে।

এখন ছুটিবারে তার কাজ সায়েবের ছোট দুই ছেলে আর মেয়েটার সঙ্গে খেলার যোগান দেয়া। পাখির ছানা পেড়ে আনা, লুকিয়ে দু'পয়সার তেলেভাজা এনে খাওয়ানো, চাচার নতুন

মাদল চুরি করে ওদের উপহার দেয়া— এই চলছিল। একদিন মেয়েটা, পাঁচ বছরও হবে না, স্বরাজকে ডেকে নিয়ে খেলার ছোট অর্গান দেখাচ্ছিল, উপুড় হয়ে বসে রীডে টুং টুং আওয়াজ করছিল। অতটুকু যন্ত্র থেকে অমন মিঠে সুর বেরুতে পারে দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল স্বরাজ। আরো অবাক হয়েছিল ঐটুকু মেয়ের বাজানোর ক্ষমতা দেখে। তারপর কী হয়েছিল মনে নেই তার। বাঁ কানের ওপর একটা প্রচন্ড থাপ্পর খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে। জ্ঞান ফিরলে শুনেছে খানসামা নাকি তাকে দেখেছে সায়েবের মেয়েকে সে বদ মতলবে ফোঁসলাচ্ছিল। দেখে ধাপ্পর মেরেছে। সেই থেকে তার ও বাড়িতে যাওয়া বন্ধ। সেই থেকে বাঁ কানে আজ অবধি কিছু শুনতে পায় না লালা স্বরাজ।

ঐ ঘটনার পর ভীষণ এক আক্রোশ আর জেদ জন্ম নিয়েছিল তার মনে। মনে আছে, বাবা তাকে বেরুতে দিতেন না ছুটিবারেও।

একদিন বাবা খুব সাজ পোশাক করে বেরুলেন। বলে গেলেন, দূরে যাচ্ছেন তিনি। এ দু'দিন যেন ভালো ছেলে হয়ে স্বরাজ তার চাচার সঙ্গে ঝাড়ামোছার কাজ করে। বাঁদরামো করলে বেঁধে রাখবেন শুয়োরের খোঁয়ারে।

পরদিন সকালে চাচার সঙ্গে কাজ করেছে স্বরাজ। চাচা হঠাৎ ঝাড়ু থামিয়ে বলল, 'এই শুনেছিস, তোর বাবা বর সেজে বিয়ে করতে গেছে।'

'যাহ।'

'বিশ্বাস হলো না, না ? শালা যখন সৎমার হাতে পয়জার খাবি তখন বিশ্বাস হবে। নে' বালতি তোল, কাজ কর।'

বলেই পেটে এক লাথি। স্বরাজ বসে বসে মেঝে ঘষছিল, ঘ্যোঁৎ করে মাটিতে পড়ে গেল। বালতি আঁকড়ে ধরে সামলাতে গিয়ে ময়লা পানিতে টাবুটুবু হয়ে গেল ঘর। তার জন্যে সায়েবের কাছে বকুনি খেতে হয়েছিল চাচাকে। বাবা সত্যি সত্যি বিয়ে করে ফিরলেন। চাচা শোধ নিল কথাটা লাগিয়ে। এমনিতেই নতুন মাকে দেখে ভয়ে ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল স্বরাজ। আর বিয়ের তাড়ি খেয়ে বাবার মেজাজ টং। স্বরাজকে ধরে এমন মার মারলেন, সে সেই যে বাড়ি থেকে বেরুলো আর ফিরল না।

বছর খানেক পশুর মতো এদিক ওদিক ঘুরে দশ বছরের স্বরাজ কী করে দৈবচক্রে পড়ে মালের জাহাজে পৌঁছুলো ত্রিনিদাদ। সেখানে সে বুঝতেও পারল না, এক পাদ্রীর পাল্লায় পড়ে তার দীক্ষা হলো খ্রিষ্টান ধর্মে। এক রুটির দোকানে চাকরি করতে গিয়ে নিঃসন্তান মালিক তাকে নিলেন দত্তক পুত্র। তারই কল্যাণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত পড়াশোনা হলো স্বরাজের। রুটির দোকানের মালিক তাকে তার লালা উপাধি ছাড়া আর কিছুই দিয়ে যেতে পারেননি। লালা স্বরাজ তাব মৃত্যুর পর দোকান বিক্রি করে লণ্ডনে এসে গায়ে গতরে খেটে শিখলো সাংবাদিকতা।

ত্রিনিদাদে যেদিন পা দিয়েছিল সেদিনই সে নিজেকে অনাথ বলে পরিচয় দেয়। লালা বিক্রমদেব তাকে অনাথ জেনেই দত্তক নিয়েছিল। অথচ স্বরাজ জানতো তার বাবা দশরথ আজো বেঁচে আছেন। বাবার জন্যে থেকে থেকে মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠত, লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত কিশোর স্বরাজ। কিন্তু কাউকে বলতে পারেনি। এটুকু জ্ঞান তার সেই বয়সেই হয়ে গিয়েছিল যে, পিতৃপরিচয় দিলে তাকে লালা বিক্রমদেবের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে পথে

না খেয়ে মরতে হবে। সেটা দু'কারণে। প্রথমত তার পিতা জীবিত। দ্বিতীয়ত, সে হরিজনের সন্তান। লালা বিক্রমদেব নিজে খ্রিষ্টান হলেও হরিজন থেকে যে ছেলে খ্রিষ্টান হয়েছে তাকে পুত্র হিসেবে কেন, চাকর হিসেবেও বাড়িতে রাখবেন না।

সাংবাদিকতায় পাশ করে লালা স্বরাজ আর ত্রিনিদাদে ফিরল না। দীর্ঘ কুড়ি বছর পর ফিরে এলো করাচিতে। কাজ নিল এ শহরেই। আর খুঁজল তার বাবা দশরথকে। গিয়ে দেখল, সে বস্তি কবে উঠে গেছে। কেউ বলতে পারল না দশরথের কথা।

সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় ঘুরেছে, করাচির একটা গলি খুঁজতে বাদ রাখেনি, কিন্তু সন্ধান পাওয়া যায়নি দশরথের। সমাজের যে স্তরে সে আছে, সেখান থেকে কুলি ধাঙড় ঝাড়ুদারের সমাজ অনেক দূরে। এ দূরত্ব হলো তার অনুসন্ধানের আরেক বাধা। মুখ ফুটে সে বলতে পারল না, 'আমি আমার বাবা দশরথকে খুঁজছি।' দশরথের নাম চিহ্ন পরিচয় যেন এ পৃথিবী থেকে চিরদিনের মতো মুছে গেছে।

আজো সে কোন ধাঙড় ঝাড়ুদার দেখলে দাঁড়ায়। চোরের মতো চারদিক দেখে হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে জিগ্যেস করে দশরথ বলে কোনো বুড়োকে তারা চেনে কিনা। ঠিকানা দেয় নিজের। বলে দেয়, খোঁজ দিতে পারলে পাঁচ শ' টাকা দেবে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে কেউ আর আসে না। আজ পাঁচ বছর হয়ে গেছে কেউ আসেনি।

তন্ময় হয়ে ভাবছিল লালা স্বরাজ। পেছনে একটা মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে সচকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, রজনী। চাঁপা রংয়ের শাড়ি পরে, সজ্জা করে, চুলের বেণি বুকের 'পরে দুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নত চোখে। মধুর হেসে স্বরাজকে আপ্যায়ন করল সে। স্বরাজ বলল, 'অনেকক্ষণ লাগলো।'

'কই না তো।'

শাড়ির আঁচল দিয়ে সারা শরীর ঢেকে কুণ্ঠার সঙ্গে উত্তর করল রজনী। কাজটা দেখে স্বরাজ শুধালো, 'আপনার কি খুব ঠাণ্ডা লাগছে। ?'

'কেন, না।'

'অমন জড়সড় হয়ে আছেন, তাই বললাম।'

'না, একটুও না।'

'বেশতো। তাহলে ভালো করে গুছিয়ে নিন আঁচলটা। বাঙালি মেয়ের শাড়ি পরা সারা বিশ্বের মেয়েরা লুফে নিচ্ছে, আর তার নমুনা এই!'

রজনী অবাক হলো। তার সজ্জাই বা কী ? যতটুকু আছে তা-ই যে একটা মানুষের মনোযোগ কেড়ে নেবে এটা তাকে লজ্জিত করল। মনটা উসখুস করে উঠল, যেন ভারী অপরাধ করে ফেলেছে সে। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'কেন, এইতো ঠিক আছে।'

'উঁহু, ঠিক নেই। আঁচলটা অমন করে থাকবে কেন ? বড্ড আনস্মার্ট লাগবে যে। শাড়ি অমন করে পরে নাকি কেউ ? বাইরে দেখলে হাসবে।'

'কারা ?'

'যারা হাসে। পোশাক তো সবাই পরে, তাই বলে সেটা সুন্দর করে পরতে হবে না ?'

'আচ্ছা।'

রজনী ভেতরে গিয়ে ঢং বদল করে এলো। এবারে সে আঁট করে পরেছে। হালকা লাগছে শরীর। আর বদলেছে গায়ের জামা। কেমন লজ্জা করছে তার। লালা স্বরাজ দেখে বলল, 'চমৎকার। এতক্ষণে মনে হচ্ছে, আপনার সব দুশ্চিন্তা গেছে। আগে মনে হচ্ছিল ম্লান, প্রাণহীন। চলুন।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে লালা স্বরাজ তাকে হাত বাড়িয়ে সাহায্য করল। সংকোচ করতে গিয়ে তা জয় করল রজনী। লোকটার সবকিছুর মধ্যে এমন এক আন্তরিকতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে যা বিশ্বাস করতে মন সায় দিচ্ছে। তার মুঠোর মধ্যে রজনীর হাত এতটুকু কাঁপল না।

মনের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড চলছিল পীরজাদার। একবার মনে হচ্ছে, রজনীকে সাহায্য করা উচিত ছিল তার ; আবার ভাবছে, নিজেকে রজনীর কাছ থেকে শত হস্ত দূরে রাখার সিদ্ধান্তই সঙ্গত। আসলে, রজনীর প্রতি তার হৃদয় যে ভীষণ রকমে আকৃষ্ট, এ সত্য থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই এ মানসিক দ্বন্দ্বের অবতারণা।

মানব চরিত্র খুব কম বোঝে সে, নিজেকে তো আরো নয়। পীরজাদা সে অভাব চিরকাল এক অবোধ দুরন্ত অভিমান দিয়ে ভরিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে।

রজনীকে লালা স্বরাজের হাতে তুলে দিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়া— এটাও সেই অভিমানেরই কীর্তি। কিন্তু বাইরে এসেও মুক্তি পাওয়া গেল না। মন বসলো না কোথাও। রজনী, মাথার মধ্যে রজনীর মুখ সম্রাজ্ঞীর মতো জাঁকিয়ে বসে আছে। এ যন্ত্রণা সুরাপানে মিটল না। এক্সেলশিয়রে বসে বসে সে পন্থায় ব্যর্থ হলো সে, তখন এলো মেট্রোপলে। কায়রোর মোহিনী নর্তকী রাজিয়া শহরে এসেছে। তার নন্দিত যৌবনের ছবি আজকের কাগজে দেখেছিল পীরজাদা। আজ মেট্রোপলে তার নাচের প্রথম রাত।

স্ত্রীর বীভৎস মৃত্যুর পর এক রজনী ছাড়া অন্য কাউকে দেখে বিচলিত হয়নি পীরজাদা। এটা অন্যায় মনে হয়েছে তার কাছে। এবং তাই এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, নর্তকী রাজিয়ার দেহ প্রদর্শনী দেখে যদি এতটুকু চঞ্চল হয় তার স্নায়ু, তাহলে পাপবোধের বোঝাটা খানিক হাল্কা হবে। এ যেন নিজেকে শাস্তি দেয়া; রজনী ছাড়া অন্য কাউকে ভালো লাগবে না কেন– মনকে এ রকম একটা ধমকানি দেয়া।

বেয়ারা এসে সালাম করল। ডিনারের অর্ডার দিল পীরজাদা। ডিনারে কী পছন্দ করবে সে ? তার জবাবে বলল, 'তোমার রাঁধুনির আজ যা সেরা, তার সমারোহ দেখতে চাই আমার টেবিলে।'

সে ছিল অভিজ্ঞ বেয়ারা। তার নিজের পছন্দের ওপর ছেড়ে দেয়াতে লোকটা গর্বিত হলো, এবং এমন এক স্মিত হাস্যের সঙ্গে প্রস্থান করল যার অর্থ— কোনটা সেরা তা আমি জানি, আর আমি যে জানি তা আপনিও স্বীকার করবেন একটু পরেই।

ঠিক তখন আলো স্তিমিত হলো। এক মুহূর্তের ব্যবধানে রণিয়ে উঠলো সঙ্গীত। মৃদু বিচ্ছুরিত নীল আলোচক্রের মধ্যে এসে অভিবাদন জানালো স্বল্পবাস পরিহিতা প্রায় নগ্ন রাজিয়া। তার চোখে নীল সুরমা, মৎসপুচ্ছের অনুকরণে অঙ্কিত তার আঁখিকোণ। রক্তিম বুকের ঊর্ধ্ব থেকে উন্মুক্ত নাভিমূল অবধি এক সূক্ষ্ম সুরমা রেখার কারুকাজ। পীরজাদা তার বিক্ষিপ্ত মন কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা করল। ঐ বিদ্যুতের মত সঞ্চরণশীল শরীরে তার একাগ্র দৃষ্টি স্বর্ণ-সন্ধানীর মতো ভ্রমণ করতে লাগল।

খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেছে বেয়ারা। সে খেতে শুরু করল। সেখানেও চেষ্টা করল একাগ্র হতে, খাদ্যের স্বাদ পূর্ণ উপলব্ধি করতে।

স্রোতোধারার মতো হিল্লোলিত হচ্ছে, রাজিয়ার মর্মর শুভ্র কাঁধ। কাঁধ থেকে স্পন্দিত তরঙ্গ নেবে আসছে মরুভূমির জ্যোছনা মাখা বিশাল বালুবীথির মতো দুই স্তনে, সেখানেও স্থির থাকছে না তরঙ্গ, গিয়ে পৌঁছুচ্ছে চিতাবাঘের বুকের মতো দুই উষর উরুতে। সেখানে মূর্চ্ছিত হচ্ছে এবং পর মুহূর্তে আবার কাঁধ থেকে তার পুনরাবৃত্তি চলছে। চক্রাকারে ঘুরে উঠছে নাভি, যেন তার মধ্য থেকে এখুনি উৎক্ষিপ্ত হবে কামনার ফুল। পরক্ষণে তা স্তম্ভিত হচ্ছে। তখন পদ্মদলের মতো সঙ্গীতের ওপর ভাসছে রাজিয়া। সে লুটিয়ে পড়ছে, তার দুই বাহু শৃঙ্খলিত বন্ধনের ভঙ্গিতে বিলাপ করছে দয়িতের স্পর্শ কামনা করে।

কিন্তু তবু রজনীকে ভোলা যাচ্ছে না। এক মুহূর্তের জন্যে যেন ঘোর লেগেছিল। সেটা স্থায়ী হতে পারল না। খাদ্য বিস্বাদ ঠেকল।

রাজিয়া তার  পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়েছে। মেঝেয় গড়াচ্ছে তার সুতনু। ঝড়ে উৎক্ষিপ্ত গোলাপ পথিকের পায়ে পিষ্ট হতে চায়— যেন এই তার সুখের মরণ। একেবারে নিকট থেকে নারী দেহের অনাবৃত জীবন্ত মসৃণতা তার চোখ আচ্ছন্ন করে ফেলল। চোখের সমুখে যেন কোটি কোটি রক্তমুখ রোমকূপ ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পেল না। হাত বাড়াতে গেল পীরজাদা। ঠিক তখন তীরের মতো উৎক্ষিপ্ত হলো রাজিয়ার দেহ। চোখের পলকে অপসৃত হলো দূরতম কোণে।

পীরজাদা উঠে দাঁড়াল। না, এসবে কিছু হবে না। বমি করতে ইচ্ছে করছে তার। গাড়িতে এসে বসলো। এর চেয়ে হোটেলে ফিরে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে কেমন হয়?

অন্ধকারে স্ফটিক প্রাসাদের মতো দাঁড়িয়ে আছে হোটেল কোলামবাস। শহরের এ দিকটা এমনিতেই নির্জন, রাত বারোটা বাজেনি, এরি মধ্যে চলে গেছে সবাই। করিডর, হল, সিঁড়ি, ফুলের টব হঠাৎ বড় হয়ে গেছে যেন।

পীরজাদা অবাক হয়ে ভাবল, মানুষের উপস্থিতি কী দাম্ভিক, সমস্ত কিছুকে তার সমুখে সংকুচিত হয়ে থাকতে হয়ে।

শূন্য করিডর দিয়ে যেতে যেতে ডাইনিং হলের পাশে থমকে দাঁড়াল পীরজাদা। নিস্তব্ধ বিশাল হলের শেষ প্রান্তে দু'টি মানুষ তখনো বসে আছে। সারা ঘরে  আর কেউ নেই। দূর থেকে এতটুকু দেখাচ্ছে তাদের, যেন স্বপ্নের মধ্যে একটা ছবি।

ওরা রজনী, রজনী আর লালা স্বরাজ। রজনী বসে আছে তার দু'কনুই টেবিলে তুলে যুক্ত করতলের কাপে চিবুক রেখে। অপরূপ তার সজ্জা। তাতে উগ্রতা নেই, স্নিগ্ধতা আছে। ঐশ্বর্য নেই, দীপ্তি আছে। দুপুরে দেখা রজনীর সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। যেন মলিন ফুলদানি মার্জিত হয়ে ঝকঝক করছে।

বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলো পীরজাদা। লালা স্বরাজের ধীর ফিসফিস কণ্ঠ ভেসে আসছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তার প্রতিক্রিয়া রজনীর চোখে মুখে ফুটে উঠছে। আগ্রহ এবং লজ্জার এক অপরূপ সমন্বয় রজনীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করল সে।

লালা স্বরাজের সান্নিধ্যে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে কী করে এমন পরিবর্তন ঘটলো রজনীর তা মাথায় ঢুকলো না পীরজাদার। নিজের ঘরে এসে দেখল স্বরাজের চিরকুট পড়ে

আছে। তার লেখা মাথার মধ্যে আগুন ছড়ালো। কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল চিরকুটখানা। রজনীর স্বামীকে খুঁজে বার করবার কোনো দায় নেই তার। ঈর্ষার ভীষণ আগুনে দগ্ধে মরতে লাগল সে।

পীরজাদার ভাগ্য বলতে হবে। কারণ ডাইনিং হলে তখন লালা স্বরাজ রজনীকে যা বলেছিল সেটি একটি কবিতা— রবীন্দ্রনাথের কবিতা। লালা স্বরাজ তার বাংলা সাহিত্যজ্ঞানের মুখস্ত পরিচয় দিচ্ছিল রজনীকে। তার এক বর্ণ বুঝলেও পীরজাদার ঈর্ষার মাত্রা সহস্রগুণে বাড়তো সন্দেহ নেই। তবে তাতে করে রজনীর মুখে লজ্জা এবং আগ্রহের মিশ্রিত প্রকাশটি কেন, তা বোঝা যেত। লালা স্বরাজ আবৃত্তি করছিল—

'তোমার স্বপ্নের দ্বারে আমি আছি বসে
তোমার সুপ্তির প্রান্তে, নিভৃত প্রদোষে
প্রথম প্রভাত তারা যবে বাতায়নে
দেখা দিল। চেয়ে আমি থাকি একমনে
তোমার মুখের 'পরে। স্তম্ভিত সমীরে
রাত্রির প্রহর শেষে সমুদ্রের তীরে
সন্ন্যাসী যেমন থাকে ধ্যানাবিষ্ট চোখে
চেয়ে পূর্বতট পানে, প্রথম আলোকে
স্পর্শ স্নান হবে তার এই আশা ধরি
অনিদ্র আনন্দে কাটে দীর্ঘ বিভাবরী।
তব নবজাগরণী প্রথম যে হাসি
কনক চাঁপার মতো উঠিবে বিকাশি
আধো খোলা অধরেতে, নয়নের কোণে
চয়ন করিব তাই, এই আছে মনে।'

রজনী একদিকে অবাক হয়ে গিয়েছিল লালা স্বরাজের বিদেশী জিহ্বা থেকে বাংলা কবিতা শুনে, অন্যদিকে তার মনে হচ্ছিল, এ কবিতার অর্থ কী আর ইঙ্গিতই বা কী লোকটা তা ভালো করে জানে না। যদি জানতো তাহলে অমন নিঃসকোচে আবৃত্তি করে শোনাতে পারত না তাকে। যত স্বচ্ছন্দ পুরুষই হোক না কেন, পয়ারের চোদ্দ লাইন বলে যেতে যে সময় লাগে ততক্ষণ ধরে প্রেমের অমন আকুতি জানানো যায় না। রজনীর কল্পনাক্ষমতা অসীম। সে যেন এতকাল মনে মনে এই নিবেদনেরই ধ্বনি শুনতে চেয়েছিল। লালা স্বরাজের সোনার মতো ভাগ্য। সে নিজের অজান্তে রজনীকে তৃপ্ত করলো। ফলে আবৃত্তি শেষে যখন সে শুধালো, 'আমার উচ্চারণ কেমন ?' তখন রজনী আকাশ থেকে পড়ল। স্বপ্নভঙ্গের দুঃখে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো সে। লালা স্বরাজ সে চুপ করে থাকার ব্যাখা করল, পরীক্ষায় তার ডাহা ফেল হয়েছে। বলল, 'আবৃত্তি শুনে হেসে ফেলেননি, কঠিন মনোবল আপনার। আজ থেকে আমি আপনার ছাত্র। এ কবিতার কোথায় ত্রুটি হলো মনে রাখবেন, শুধরে দিতে হবে।'

রজনী হেসে বলল, 'আচ্ছা। এবারে উঠুন।'

ভাগ্যকে চিনতে শিখেছে রজনী। এটুকু তার উপলব্ধি হয়েছে, পরম বন্ধুও বন্ধু নয়। মাত্র সাতদিনের ব্যবধানে রজনী এখন এত পরিবর্তিত যে তাকে দেখে আর চেনা যাবে না।

অবশ্যি মাথার ওপর দিয়ে ঝড় গেছে। যে গাছটা এতকাল ফুলে ফলে পল্লবিত সবুজ, কালবোশেখীর পর তার পত্রহীন রূপ দেখে অবাক হতে হয়। রজনীর এখন সেই দশা। বেঁচে থাকার দুরন্ত তাগিদে রাতারাতি যেন নতুন পাতার কিশলয় দেখা যাচ্ছে।

হোটেল কোলামবাসের ম্যানেজারকে বুদ্ধি করে লালা স্বরাজ নিজেই জানিয়ে দিয়েছিল, মহসিনকে জরুরি কাজে ঢাকা যেতে হয়েছে। রজনী কিছুকাল থাকবে। ম্যানেজারের কাছ থেকে জানা গিয়েছিল প্রায় সাতশ' টাকা বাকি। লালা স্বরাজ মনে মনে হিসেব করেছিল, রজনীর ঢাকা ফিরে যেতে লাগবে আরো দু'শ কিছু। অর্থাৎ এক হাজার টাকার ধাক্কা।

কথাটা রজনীকে জানাতেই তার মুখ শাদা হয়ে গেল। তার ধারণা ছিল, এবং স্বরাজকেও বলেছিল, গায়ের গহনা বিক্রি করে সব খরচা মোকাবেলা করা যাবে। হাতে তার খুব বেশি হলে ছিল গোটা তিরিশেক খুচরো টাকা। নিজের প্রচুর খাদ মেশানো হার আর ক'গাছা চুড়ি আংটির বদলে বড়জোর তিনশ' টাকা আসতে পারে। বাকি টাকা পাবে কোথায় ?

তার ভয়ার্ত মুখ লক্ষ্য করে লালা স্বরাজ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। পরামর্শ দিয়েছিল বাড়িতে চিঠি লিখতে। তারা নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করতে পারবে। কিন্তু রজনী সেদিন মুখ ফুটে বলতে পারেনি, বাড়িতে চিঠি সে কোনদিনও লিখতে পারবে না। তার চেয়ে গলায় দড়ি দেয়া বরং অনেক সহজ ও সুলভ। প্রসঙ্গ এড়ানোর জন্যে উত্তর করেছিল, হ্যাঁ, সে বাড়িতেই চিঠি লিখবে।

তারপর দুদিন লালা স্বরাজ জিগ্যেস করেছে, বাড়িতে সে চিঠি লিখেছে কিনা ? রজনী উত্তর করেছে, হ্যাঁ লিখেছে।

এত সহজে, মুখে কোন চিহ্ন না ফুটিয়ে, মিথ্যে বলার ক্ষমতাটা রজনীর একেবারেই নতুন পাওয়া। ঢাকা সে কোনকালেও ফিরে যেতে পারবে না। ফিরে গেলেও বাড়িতে তার স্থান হবে কিনা সে সম্পর্কে প্রচুর সন্দেহ আছে। স্থান হলেও কপালে যা জুটবে তা মনে করেও শিউরে উঠতে হয়। এদিকে, করাচিতে এমন করেই বা থাকা চলে কদ্দিন ? একটা করে মুহূর্ত যায় আর রজনীর মনে হয় জীবন থেকে একটা নিরাপদ মুহূর্ত ব্যয়িত হয়ে গেল। করাচিতেই কি তার মৃত্যু হবে ? মহসিন চলে যাবার দ্বিতীয় রাতে সে স্থির করল, না, ঢাকাতেই ফিরে যাবে রজনী। তবু বাংলাদেশ। বাবা মায়ের দেশ। নাইবা উঠল সে বাবার কাছে। এই একটা দিনে তার এতটুকু জ্ঞান হয়েছে যে, নারীর একেবারে নিজস্ব অস্ত্রগুলো দিয়ে বিপদের অনেক ব্যূহ ভেদ করাই সম্ভব। ঢাকায় ফিরে গিয়ে নিজের একটা আশ্রয় খুঁজে পাওয়া হয়ত একেবারে কঠিন হবে না। জীবনে তার বড় কিছু চাইবার নেই— নিরাভরণ সামান্য হলেই তার স্বর্গ।

কিন্তু আদৌ সে যেতে পারছে কী করে ? এই নির্বান্ধব শহরে এক হাজার টাকা তাকে কে দেবে ? মনে করে দিশে পেত না রজনী। তখন মন থেকে জোর করে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইতো দুশ্চিন্তা।

তখন লালা স্বরাজের সান্নিধ্য ভালো লাগত। লালা স্বরাজের ঐ একটা গুণ, তার সঙ্গ পেয়ে সব কিছু ভুলে থাকা যায়। অনেকক্ষণ ধরে এই বিভ্রান্তিটা থাকে যে, তার কিছুই হয়নি। তার

সব আছে। তার সংসারে আনন্দের প্রস্রবণ বইছে। এবং এই যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্বরাজের সঙ্গে শহরের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত অবধি ঘুরে বেড়ানো চলছে, কখনো বসছে ক্লিফটনের সেই রেস্তোরাঁর দোতলায়, কখনো এলফিনস্টোনের আলোক মুখরিত বিপণির দরোজায় দাঁড়িয়ে জিনিস এবং মানুষের সমারোহ দেখা হচ্ছে, সেজানের রাত্রিতে টেবিলের দুই প্রান্তে বসে বেহালায় হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত কান্নার মতো সুর শুনতে শুনতে খাওয়া পড়ে থাকছে, লালা স্বরাজের মুখে স্পন্দিত আবৃত্তি শুনে তার আজীবন স্বপ্নের প্রতিবাস সৃষ্টি হচ্ছে— এ সব মিলিতভাবে তার আড়াল, তার সংকোচ, তার আশংকা সমস্ত কিছুকে কখন তুচ্ছ করে দিয়েছে তা রজনীও ভালো করে বলতে পারবে না।

অন্য দিকে লালা স্বরাজ তার বাংলা প্রীতির তোড়ের মুখে এরকম নিখাদ একটি বাঙ্গালি মেয়ের সঙ্গ পেয়ে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। রজনীকে নিয়ে সে এরই মধ্যে তার বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে আচমকা হানা দিয়েছে অবাক করে দেবার জন্যে। পার্টিতে, সিনেমায়, ফেলর শো-তে নিয়ে গেছে রজনীকে জাহির করবার জন্যে। মধ্যযুগের উদ্ধত কিন্তু নারীর কাছে বিনীত সেনানায়কের মতো সে রজনীর ক্ষীণ কটি আভাসে একহাতে বেষ্টন করে বিজয়গর্বে বিচরণ করেছে এ শহরের অভিজাত আড্ডায়।

ফলটা হলো এই, তিনদিন যেতে না যেতে গুজব রটলো, লালা স্বরাজ এক বাঙালিনীর প্রেমে পড়েছে। গুজবটা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কানে পৌছুলো স্বরাজের। বন্ধুরা জ্বালিয়ে মারল টেলিফোনে। বান্ধবীরা মুখ গোল করে বিস্ময় প্রকাশ করল, 'অবশেষে বাঙালিকে?' গুজবটা পল্লবিত হয়ে এ রকম আকার ধারণ করল– লালা স্বরাজ গত এক বছর ধরে এ মহিলাকে ভালোবাসছিল, তার প্রমাণ— গত এক বছর থেকে তাকে বাংলা শিখতে এবং বাংলা গান গুনগুন করতে শোনা গেছে। এতকাল চুপ করে থাকার ব্যাখা তারা করল— স্বরাজ সাংবাদিক মানুষ, সংবাদ স্কুপ করে তাক লাগানো যার স্বভাব, তার পক্ষে এই-ই তো স্বাভাবিক। মোটকথা, সত্য মিথ্যে যাই হোক, দ্রুত প্রচারিত এ গুজব তার কাছে নেহাৎ মন্দ লাগল না। চতুর্থ দিনে সে অ্যামপিজ-এর দোতলায় বসে খাঁখাঁ দুপুরে কফি পান করতে করতে রজনীকে তার জীবন কাহিনী বলে ফেলল। সে ইতিহাস শুনে চোখ ছলছল করে উঠলো রজনীর। হয়ত তার নিজের বাবার কথা মনে পড়ে গেছে আচমকা। আঁচল তুলে চোখ মুছতে যাবে, লালা স্বরাজ তার হাত ধরে ফেলল, বলল, 'একী তুমি কাঁদছ?'

মাথা নাড়তে গিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল রজনীর। স্বরাজ তার শাদা রুমালে সে অশ্রু ধরে রেখে সযত্নে পকেটে পুরল। বলল, 'আমাকে করুণা না করে যে গৌরব তুমি দিয়ে গেলে তার যোগ্য নই। আমি হরিজনের ছেলে, আমার জন্যে অশ্রু হতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি।'

রজনী তার উত্তরে বলল, 'এক সাধারণ মেয়ের অশ্রুকে এত বড় করে দেখলে অহঙ্কারের পাখায় ভর করে সে আকাশে উড়তে থাকবে। সেখান থেকে যদি কোনদিন তাকে মাটিতে নেমে আসতে হয় তো হতভাগিনীর আর দুঃখের অবধি থাকবে না।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো লালা স্বরাজ। পরে বলল, 'সে দুঃখ কোনদিন আসবে না। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।'

যেন সাপের মাথায় পা পড়েছে, সন্ধ্যের সময় বার থেকে ঘরে এসে শরীর শুদ্ধ চমকে উঠলো রজনীর। খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে মহসিন নিঃশব্দে হাসছে। অধঃপতিত একটা মানুষের অহংকার হলে যেমন হয়, হাসিটা তেমনি।

উনিশ দিন পরে এই লোকটাকে দেখে রজনীর কী রাগ হলো, না আনন্দ হলো, না বিস্ময়, না ভয়, তা এখনো বলা যাচ্ছে না। শুধু বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলো সে।

মাথার চুল রুক্ষ, মুখ মলিন, চোখের কোলে কালিমা, এক গাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গায়ের কাপড় ধোয়া পড়েনি কয়েকদিন। সব মিলিয়ে করুণার উদ্রেক হতে পারতো। কিন্তু সেটাও সম্ভব হলো না গা জ্বালানো ঐ নিচুস্তরের নিঃশব্দ হাসিটার জন্যে।

হাত তুলে রজনী বলল, 'বেরিয়ে যাও।'

নিজের কথা নিজের কানে পৌঁছুতেই চমকে উঠলো রজনী। আজ মহসিনকে একথা বলতে হচ্ছে, এর চেয়ে অবিশ্বাস্য অপ্রত্যাশিত যেন আর কিছু হতে পারে না। এক পলকের জন্যে অনুতাপও হলো। হাতটা নামিয়ে আনলো সে আস্তে আস্তে। অবসন্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'যাও।'

মহসিন মুখ থেকে হাসি সরালো। আপাদমস্তক রজনীকে দেখল অনেকক্ষণ সময় নিয়ে। তারপর উঠে এসে তার সমুখে একেবারে মুখের কাছে মুখ স্থাপিত করে, শরীর দিয়ে শরীরকে প্রায় ছুঁয়ে দাঁড়াল। ভয়ে চোখ বুজলো রজনী। ভয় করছে কেন ? টের পেল, মহসিন আবার ফিরে গেল। চোখ মেলে দেখল, ফিরে গিয়ে লোকটা চেয়ারের 'পরে অধোবদনে বসে আছে।

এ উনিশ দিন কোথায় ছিল মহসিন, কিভাবে ছিল, খুব একটা ভালো ছিল না, এসব কথা মনে করে মন খারাপ করল তখন। কিন্তু অবাক হয়ে রজনী তার মনের দিকে তাকিয়ে দেখল, মহসিনের জন্যে ভালোবাসার এতটুকু আর অবশিষ্ট নেই এ হৃদয়ে। যে লোকটার কথায় একদিন অন্ধের মতো সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিল, যে লোকটার মধ্যে তার আশ্রয়, ভবিষ্যত, সুখ, সম্পদ সমস্ত কিছু দেখেছিল সেই একই লোক এই উনিশ দিনে তার জীবনে তুচ্ছের চেয়েও মূল্যহীন হয়ে গেছে। তাকে ফেলে চলে গেছে বলে রাগ হচ্ছে না, দুঃখ হচ্ছে না, কেনই বা হবে ? রজনী নিজেও যেটা বুঝতে পারছে না তা হচ্ছে, লালা স্বরাজের অন্তরংগ আন্তরিকতা তাকে এমন করে ঘিরে ফেলেছে যে মহসিন কোনো অস্ত্র দিয়েও সে ব্যূহ ভেদ করতে পারবে না।

বরং মহসিনকে দেখে রজনীর অন্তর চমকে উঠেছিল। তার সুখের দিন বুঝি ফুরালো। লালা স্বরাজ যে পৃথিবীর সন্ধান তাকে দিয়েছে, এত গভীরভাবে সে সেটাকে বিশ্বাস করেছে, যে মহসিনের হঠাৎ আবির্ভাবে অমঙ্গলের সম্ভাবনায় রজনী এখন বিচলিত।

মহসিন হঠাৎ মাথা তুলে বলল, 'রজনী, আমাকে কিছু টাকা দাও।'

কথাটা এত অপ্রত্যাশিত যে রজনীর মনে হলো সে ভুল শুনেছে। সে জিগ্যেস করল, 'কী ?'

'টাকা। নেই ?'

রজনী বিস্মিত হলো। বুঝতে পারল না তার কাছে মহসিন টাকা চাইছে কেন ? মহসিন তো ভালো করেই জানে, তার হাতে একটা পয়সাও নেই। যে গোটা তিরিশেক টাকা ছিল সেটা অনেক বুদ্ধি করে আদায় করা। মহসিন তার ঢাকা থেকে আনা টাকা নিজের কাছেই রেখেছে, নিজে খরচ করেছে। সে টাকা এ দেড় মাস ধরে খরচ হয়েছে। টাকা সম্পূর্ণ খরচ হয়ে গেছে, অথচ কাজের কোন আশা না দেখেই যে সে একদিন পালিয়ে গেছে এ কথাটাও ওর চলে যাবার পরদিনেই বুঝতে পেরেছিল রজনী। বরং সে তার পরম সম্পদ, তার লজ্জা,

রাতের পর রাত হরণ করে পালিয়েছে। একটিবার ভাবেনি তার কী হবে। সে কথা মনে করে ভীষণ আক্রোশ হলো রজনীর। সে যদি গলায় দড়ি দিত, তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী হতো মহসিন। এত বড় সর্বনাশ করবার পরও লোকটা আবার এসেছে তার কাছে, টাকা চাইছে, শুনে গা জ্বলতে লাগল রজনীর। মহসিন যে স্পষ্টই অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, পশুর মতো কোথাও পড়ে রাত পার করছে— এটা তার চেহারায় লেখা দেখা যাচ্ছে। তবু রজনীর দয়া হলো না এতটুকু। সে বলল, 'আমি কোথায় টাকা পাবো ?'

'কেন, লালা স্বরাজের কাছ থেকে।'

হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল রজনীর। হাতে চাবুক থাকলে পশুপেটা করত লোকটাকে। নেই বলে অসহায় দু'হাত মুঠো হয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল তার। 'বেরিয়ে যাও, আমি চিৎকার করবো নইলে। পশু একটা পশু। তোমার কিচ্ছুতে বাধে না, কিচ্ছুতে আটকায় না।'

'থামলে কেন ?'

'আর কিছু বলার প্রবৃত্তি আমার নেই।'

'আমার আছে।'

'কী বলবে ?'

'দাঁড়াও।'

মহসিন একটা সিগারেট বের করে ধরাল। প্রচুর একটা টান দিয়ে ওটাকে নিরীক্ষণ করল। তারপর বলল, 'জানতাম তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারবে। তাই ফেলে গিয়েছিলাম। একটা কথা কী জানো, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালে সুবিধে অনেক। শালার একেক সময় ভাবি মেয়ে হয়ে জন্মালাম না কেন ? লালা স্বরাজের মতো পাঁঠার কাছ থেকে একটা পয়সাও খসাতে পারোনি এটা কেমন কথা ? বোকার মতো রাতে শুয়ে থাকলেই হলো ? মালকড়ি বানাবার এইতো বয়স। কিছু পয়সা ছাড়ো।' তারপর হাই তুলে বলল, 'দু'দিন গোসল হয়নি। একটু হাত পা ছড়িয়ে গা ধুয়েনি। কী বল ? শ' খানেক হলেই আপাতত আমার চলে যাবে।' বলে মহসিন বাথরুমের দিকে গেল। দরোজা খুলে কী ভেবে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'পীরজাদার তো বেশ লোভ ছিল তোমার ওপর। তার নাকে দড়ি দিতে পারলে গ্র্যাণ্ড হতো। ব্যাটাচ্ছেলের প্রচুর টাকা। যা ওড়ায়।'

দুম্ করে বন্ধ হয়ে গেলে বাথরুমের দরোজা। মিনিট খানেক পরে অঝোর ধারে পানি পড়ার শব্দ।

রজনী একবার ভাবলো, নিচে গিয়ে ম্যানেজারকে ডেকে নিয়ে আসে। পরক্ষণেই মনে হলো, সে ভদ্রলোক মহসিনকে তার স্বামী বলে জানে, জানে সে ঢাকা গেছে। স্বামীর আবার অনধিকার প্রবেশ কী ?

অবাক হলো এই ভেবে, কারো চোখে না পড়ে মহসিন হোটেলে তার কামরায় এসে ঢুকলো কী করে ? রজনী লালা স্বরাজের কথা চিন্তা করল। তাকে গিয়ে বললে কেমন হয় ? মহসিনকে দেখে লালা স্বরাজ হয়ত বিনীতভাবে বিদায় নেবে। একদিনেই রজনীর জানা হয়ে গেছে, ভেতরে বাইরে স্বরাজ খাঁটি ভদ্রলোক ; ঘরে চোরকে দেখে পেটানোর বদলে দরোজা খুলে দিয়ে বলবে, 'আপনি ভুল করে অন্য কামরায় ঢুকেছেন।'

মহসিনকে দেখলেই লালা স্বরাজ নিশ্চিত ধরে নেবে, তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। মহসিন রজনীকে তার আগে ভালোবেসেছে, অতএব অগ্রাধিকার তারই।

মহসিনের মুখে পীরজাদার উল্লেখে লোকটার কথা বেশ ক'দিন পর মনে পড়ল। স্বরাজের সঙ্গ পেয়ে সে ভুলে গিয়েছিল এ লোকটার অস্তিত্ব। এক কারণহীন অপরাধবোধে ভরে উঠল তার মন। মনে হলো, পীরজাদাকে সে প্রতারিত ও ক্ষুণ্ন করেছে।

রজনী ঠায় বসে রইলো সোফার 'পরে। বাথরুম থেকে অবিরাম জলধারার শব্দ ভেসে আসছে। আজ সারাটা দুপুর তার কেটেছে লালুখেতে স্বরাজের এক বন্ধুর বাসায়। সেখানে তাদের দু'জনের ছিল দুপুরের খাবার নেমন্তন্ন। সাজানো গোছানো দু'টি মানুষের সেই সোনার সংসারে বিকেল অবধি কাটিয়ে রজনীর মন স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলো। তারও সংসার হবে, এমনি সংসার, আর লালা স্বরাজ। বলতে গেলে, লালা স্বরাজকে তার জীবন মৃত্যুর বন্ধু হিসেবে কল্পনায় আজ এই প্রথম স্পষ্ট করে সে এঁকেছে। সে ছবি এখন একটা উদ্যত কুৎসিত হাতে যে কোনো মুহূর্তে আর্তনাদ করে পড়বে মাটিতে।

মহসিন বেরিয়ে এলো। সে শুধু গোসলই করেনি, তার পরিত্যক্ত রেজার ব্লেড বের করে দাড়ি কামিয়েছে, একটু সুগন্ধও মেখেছে বুঝি, মৃদু বাস দিচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে নিজেকে বড্ড ক্লান্ত লাগল রজনীর। অসহায় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

মহসিন তাকে চকিতে দেখে নিয়ে বলল, 'ভয় পাওয়া তোমার শোভা পায় না রজনী। তুমি অযথা ভয় পেয়েছ। তোমার সুখে বাদ সাধতে আসিনি। চলে গিয়েছিলাম পরোক্ষভাবে সেটা মঙ্গলের কারণ হয়েছে। তার জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে নিশ্চয়ই।'

'চুপ করো।' চেঁচিয়ে উঠল রজনী।

মহসিন বলল, 'সবটা শোনো। অন্তত করাচি আসবার প্লেন ভাড়াটা আমাকে দাও।'

'করাচি আমি আসতে চাই নি।'

হাসল মহসিন।

'না এলে আমার কী সাধ্য ছিল জোর করে আনি। এতবড় মেয়েকে লজেন্স দেখিয়ে ভোলানো যায় না, হাত ব্যাগে পুরেও হাওয়া হওয়া যায় না।'

'তুমি যাবে?'

'টাকা দিলেই যাবো।'

'কিসের টাকা?'

'বাহ, তুমি থাকবে সুখে। আর আমি না খেয়ে রাস্তায় পড়ে মরবো?'

'তাই মরো।'

কথাটায় মহসিন কানও দিল না। বলে চলল, 'ভালোই হয়েছে। কী বল?'

'কী ভালো হয়েছে?'

'এই তুমি যা করছ।'

'কী করছি আমি? কী করছি? বলো কী করছি?'

চটে গেল মহসিন। মুখ বিকৃত করে বলল, 'ন্যাকা। কিছু বোঝো না? জিগ্যেস কর নিজেকে কী করছ। কাপড় খুলে দ্যাখো কী করছ। আরো বলতে হবে? দাও, টাকা দাও।'

'নেই।'

'নেই ?'

'থাকলেও দেব না।'

'তাহলে আছে ?'

'তোমার লজ্জা করে না ?'

'লজ্জা তো তোমারও করতে পারত। সে যাক, লালা স্বরাজকে নাচাচ্ছ নাচাও। ও বোধহয় জানেও না। তোমার পেটে আমার ছেলে বড় হচ্ছে। জানে ?'

মুখ শাদা হয়ে গেল রজনীর। ঠোঁট কেঁপে উঠল মৃত্যুর মুখে প্রজাপতির মতো। কিন্তু কিছু বলবার মতো শক্তি পেল না। স্পষ্ট সে বুঝতে পারল, এ লোকটা তার সর্বনাশ করতে উদ্যত, যদি সর্বনাশের আরো কিছু বাকি থাকে। বোকার মতো যে প্রাসাদ সে কল্পনায় গড়ে তুলেছিল, এই একটা কথার উচ্চারণে তা ধূলোয় মিশে যাবে। ভয় হলো স্বরাজকে গিয়ে এখুনি হয়ত সে বলবে। স্বরাজের কাছে সে যে বলে বসে আছে, মহসিন তার স্বামী নয়, কেউ নয়। স্বরাজ যে জানেও না, রজনী মিথ্যে করে বলেছে মহসিন তার দেহস্পর্শ করেনি— বলেছে, সে পবিত্র।

রজনী মাতালের মতো টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। কোনো রকমে গলা থেকে হার খুলে হাতে দিয়ে বলল, 'তুমি যাও।'

চট করে হারখানা পকেটে পুরে মহসিন দরোজা খুলে গলা লম্বা করে দেখল ডানে বামে। তারপর সুরুত করে বেরিয়ে গেল।

রজনী বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝি। মাথার 'পরে হাতের ছোঁয়া পেয়ে চোখ মেলে দেখে চোখ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে লালা স্বরাজ। এত ভালো লাগল, চোখ বুজলো, আবার। কয়েক মুহূর্ত পরে বোধ করি ফিরে আসতেই ধড়মড় করে উঠে বসলো সে। স্বরাজ বলল, 'দরোজায় নক করে সাড়া পেলাম না। খেতে হবে না ? সাড়ে ন'টা রাত হয়েছে।'

ম্লান হাসল রজনী। শাড়ি মুখ কুন্তল দ্রুত সংযত করতে করতে উঠে গেল। স্বরাজ বলল, 'সাড়া না পেয়ে হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কী হলো ? দরোজা খুলে দেখি ঘুমিয়ে আছো। যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।'

'বসুন।'

রজনী বাথরুমে ঢুকলো মুখ মার্জনা করতে। স্বরাজের কথা কানে বাজতে লাগল। পাশাপাশি মনে হলো মহসিনের কথা। একটা মানুষ থেকে আরেকটা মানুষ কত বিপরীত— পশু আর দেবতা। বেরিয়ে এসে রজনী বলল, 'আমাকে এ হোটেল বদল করতে হবে।'

'কেন ?'

স্বরাজ বিস্মিত হয়ে তাকাল তার দিকে।

'কেন ? কী হয়েছে ?'

স্বরাজ যে এতটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে তা ভাবেনি সে। তাকে যে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যেই তখন হাসল রজনী। বলল, 'কিছু হয়নি তো। এমনি। এমনিতেই ভালো লাগছে না।'

'কেউ কিছু বলেছে ?'

স্বরাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কারণ অনুসন্ধান করতে লাগল রজনীর মুখে। তার হঠাৎ মনে পড়ল পীরজাদার কথা। পীরজাদা তো কিছু অঘটন করে রাখেনি ? স্বরাজের আরো সন্দেহ হলো এই ভেবে যে, পীরজাদাকে এ তিন সপ্তাহ ধরে খুব কম দেখা যাচ্ছে, ঘরে টেলিফোন করে জবাব পাওয়া যাচ্ছে না, তার সমুখে পড়লে এড়িয়ে যাচ্ছে, কিছু জিগ্যেস করলে আমতা আমতা করছে, এবং রজনীর কথা সে একবারও জানতে চাইছে না। যে রজনীকে পীরজাদা নিজে এনে দিয়েছিল তার কাছে, রজনীর প্রসঙ্গে সেই পীরজাদারই পাথরের মতো নীরবতা লালা স্বরাজকে ভাবিয়ে তুলেছিল। সরাসরি সে রজনীকে জিগ্যেস করে বসল, 'পীরজাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?'

রজনী আয়নার সমুখ থেকে প্রসাধন শেষ করে তার কাছে এসে বলল, 'না না, উনি কি বলবেন ? ওঁর মত মানুষ হয় না। কেউ আমাকে কিছু বলে নি।'

চিন্তিত হয়ে বসে রইলো লালা স্বরাজ। রজনীর জন্যে কী করা যেতে পারে ভাবতে ভাবতে কখন তার কপালে কুঞ্চন রেখা জেগে উঠেছে তা সে নিজেও জানে না। সেটা চোখে পড়ল রজনীর। সে বুঝলো তার চলে যাওয়ার কথা শুনে স্বরাজ হয়ত ভাবছে, এ তাকে এড়িয়ে যাওয়ার একটা ছল, সত্য কথার ভদ্র পোশাক। তাই তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে সিগারেট নিয়ে অ্যাশট্রেতে নিবিয়ে দিল। লাইটারটা তুলে দিল। বলল, 'একটা কথা বললে এমন করে ভাবতে থাকেন, আমার আর কথা বলাই চলে না। আপনি বললে, এখানেই থাকব। ভাবছিলাম শুধু শুধু কত খরচ। সস্তা কোথাও হলে ঋণটা কমতো।'

আজ সকালে রজনীর হোটেলের বিল সম্পূর্ণ শোধ করে দিয়েছিল সে। ইঙ্গিতটা তারই। লালা স্বরাজ উঠে দাঁড়িয়ে শুকনো গলায় বলল, 'তোমার মনটা আজ ভালো নেই রজনী। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনও মেঘে ভরে গেল। ঋণের কথা তুললে কেন ?'

রজনী শুনে অপ্রতিভ হলো। ডাইনিং হলের জন্য বেরিয়ে এলো দু'জন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনস্থির করল স্বরাজ। এই মেয়েটার কোথায় যে কী কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে পারছে না, কী করলে বোঝা যাবে তাও ঠাহর করতে পারছে না। সে বলল, 'রজনী, চলো আজ আমরা বাইরে যাই।'

'কেন, বাইরে কেন ? সারাদিন তো বাইরেই কাটলো।'

'তাতে কী ? জানো রজনী, করাচিতে রাতের একটা খুব সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ আছে, ভারী সুন্দর, এখন তোমাকে বলব না, চলো আজ দেখাবো। অনেকদিন আগে একদিন অধিক রাত্তিরে মোটরে করে আসতে আসতে আবিষ্কার করেছিলাম। কাজ করে ফিরছিলাম।'

তার কথার ধ্বনিতে শিশুর মতো এক আগ্রহ রণিয়ে উঠলো। ছড়িয়ে পড়ল তা রজনীর মধ্যে। উজ্জ্বল চোখে সে বলল, 'কী সুন্দর হবে! না ?'

বীচ লাক্সারিতে বসে খেলো ওরা। দূরে সমুদ্রের গর্জন পৃথিবীর আলো কোলাহলের মধ্য দিয়ে অবিরাম পার হতে হতে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এসে ভেঙে পড়ছে তাদের চারধারে। সমুদ্রের তীরে এখানে ওখানে গাছপালার ভেতর দিয়ে একটা দু'টো করে বাতি জ্বলছে। নোনা হাওয়া দিচ্ছে মুখের 'পর।

হঠাৎ কাঁটা রেখে স্বরাজ শুধালো, 'তোমার গলার হার কই ?'

গলায় অজান্তে হাত ওঠালো রজনী। পরক্ষণে সে নামিয়ে নিল। মৃদু গলায় বলল, 'খুলে রেখেছি।'

'অলংকার তোমার ভালো লাগে না?'

'এইতো ভালো।'

রজনীর লাজুক উত্তরটা মধুর লাগলো তার কাছে। চারদিকের জলুস ভরা মুখরা মেয়েদের পাশে রজনীকে অনেক রমণীয় অনেক দীপ্তিময় মনে হচ্ছে। স্বরাজ বলল, 'এইতো সত্যি ভালো। তুমি আমার ভেতরটাকে এমন করে বদলে দিচ্ছ রজনী, মনে হচ্ছে এতকাল যা জানতাম, বুঝতাম, সব মিথ্যে। আমি কিছু দেখিনি, বুঝিনি— তোমার মধ্যে নতুন করে সব দেখলাম, বুঝলাম।'

মনে মনে শিউরে উঠল রজনী। তার হারের ইতিহাস যদি কোন রকমে টের পায় স্বরাজ, প্রলয় কাণ্ড হয়ে যাবে।

সেখান থেকে বেরিয়ে ট্যাক্‌সি নিল ওরা। ড্রাইভারকে স্বরাজ বলল, 'গুরু মন্দিরের দিকে চলো।'

পেছনের সিটে গা ঘেঁসে বসল দু'জন। মুখের 'পর এই আলো এসে পড়ছে, ঐ পড়ছে না; একটা মোড়ে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়াচ্ছে, তখন মাথার 'পর বিজ্ঞাপন বাতি থেকে লাল-সবুজ আলো পালা করে রজনীকে ভিজিয়ে দিচ্ছে, দিচ্ছে না, দিচ্ছে— যেন একটা বিরাট মঞ্চের 'পর নাটকের চরিত্রে সে; তিনটে মাকরানী জোয়ান হেঁটে যাচ্ছে অলস পায়ে, তাদের একজনের কাঁধে টিয়ে পাখি, পাখিটা চলার তালে তালে দুলে দুলে উঠছে, একটা বোরকা পরা মেয়ে রাস্তার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে ভূতের মতো; আরেকটা মোড়ে আণ্ডারগ্রাউন্ড করিডরের মুখে রেলিং ঘেরা ফাঁকা স্কোয়ারে শুয়ে আছে ভিখিরি ভবঘুরে; দু'টো লোক খাটিয়া টেনে এনে বসে অন্ধকারে ফুঁকছে সিগারেট; দাঁড়ানো খালি স্কুটারে উঠলো এক পাঠান, ড্রাইভার হাত বাড়িয়ে মিটারের ফালগ নামিয়ে দিল; তাদের ট্যাক্‌সি মোড় নিল, মোড় নিতে গিয়ে আরেকটা পাখিকে চকিতে পাশ কাটাতেই রজনী টাল সামলাতে পারল না। স্বরাজের কাঁধের ওপর তার শরীর গিয়ে পড়ল। কোথা দিয়ে কী হলো বুঝতে পারল না রজনী। তার মনে হলো স্বরাজ তাকে দু'হাতে ধরে ফেলল। স্বরাজের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ঝংকৃত হয়ে উঠল রজনীর গাত্র সুবাস।

ঠোঁট থেকে ঠোঁট বিচ্ছিন্ন করে রজনী তার কাঁধের 'পর মুখ রেখে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল। স্বরাজ বাহু দিয়ে তাকে বেষ্টিত করে কোনো কথা না বলে তাকিয়ে রইলো দ্রুত অপসৃয়মাণ দালান ল্যাম্পপোস্ট ফুটপাথের দিকে। যেন তারা ঝড়ের মধ্য দিয়ে অতি নিরাপদে একটা জাহাজে চড়ে দূরে কোথাও যাচ্ছে।

'ডানে, ডান দিকে যাও।'

রজনী চোখ বুজে শুনলো স্বরাজ তাদের ট্যাক্‌সিকে থেকে থেকে নির্দেশ দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর রজনীকে জড়ো করে তুলে সে বলল, 'দ্যাখো।'

রজনী তাকিয়ে দেখে তারা চওড়া নির্জন রাস্তা দিয়ে দু'ধারে অগুনতি প্রাসাদের মতো বাড়ি ফেলে ছুটে চলেছে। আকাশে অনেক তারা উঠেছে। স্বরাজ বলল, 'এটা হচ্ছে শাহিদ-এ-মিল্লাত রোড, বন্দর রোড থেকে ড্রিগ রোডে গিয়ে পড়েছে। সমুখে দ্যাখো, যা তোমাকে দেখাবো বলেছিলাম, আসছে।'

পাথরের উঁচু নিচু অসমতল কেটে গড়ে উঠেছে সারাটা এলাকা। ট্যাক্‌সি ছুটছে বাতাস কেটে। দৃশ্যপটের মতো তারায় ভরা আকাশ নেবে এসেছে উইণ্ডস্ক্রীন ভরে। দু'দিকে অন্ধকার। যেন সোজা ছুটে চলেছে তাদের ট্যাক্‌সি ঐ তারার দিকে।

স্বরাজ বলল, 'ঐ রজনী।'

ঠিক সেই মুহূর্তে অপসারিত হলো আকাশ; ঘটলো ইন্দ্রজাল ; নক্ষত্রের বদলে উইণ্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে দেখা গেল পায়ের নিচে আলো জ্বলা এক শহর ছবির মতো অপরূপ বিছিয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়া শিবিরের মতো দেখাচ্ছে। আসলে এতক্ষণ তারা যে সমতল ধরে আসছিল তা এখানে এসে হঠাৎ ঢালু হয়েছে। পাহাড়ের গা বেয়ে বানানো পথ দিয়ে নামছে তারা। সে পাহাড়ের গায়ে গায়ে উঠেছে দালান, একেবারে দূরে নিচে ঐ সানুদেশ অবধি। যেন জাদুবলে গুহার দরোজা খুলে সঞ্চিত বিক্ষিপ্ত হীরক-ঐশ্বর্যের মধ্যে গিয়ে পড়েছে তারা। যেন একটা রুদ্ধ দুয়ার কার পরশে মন্ত্রবলে গেছে খুলে। এই বিশাল দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রজনীর হৃদয় প্রথম হলো স্তম্ভিত। পরে মনে হলো তার ভেতরটা এত বিশাল হয়ে উঠেছে যে সমস্ত পৃথিবীর, জীবনের সব ভালো-মন্দ, জয়-পরাজয়, করুণা-প্রীতি, তুচ্ছ-মহৎ সব কিছুর স্থান হবে সেখানে।

স্বরাজ বলল, 'এই পথটার এরূপ প্রথম যে রাতে দেখলাম, আমার ভেতরটা এত বদলে গেল, তার এক কণাও বলে বোঝাতে পারব না। মনে হলো, আমি সব পেয়েছি। আমার দুঃখ নেই, মালিন্য নেই, স্বার্থের আর্তনাদ আমার তুচ্ছ, জীবনের বিচিত্র বিরাট আমার সমুখে। যেন আমার নতুন জন্ম হলো। এমন করে আর কখনো কারু জন্ম হয়নি। যেন আমার তীর্থে আমি পৌঁছেছি। আমার ধর্মে প্রভু জেসাস যে শান্তিময় পৃথিবীর প্রতিজ্ঞা বারবার করে গেছেন, মনে হলো সে পৃথিবী আমার পায়ের নিচে, একেবারে হাতের কাছে। মনে হলো হাত বাড়িয়ে গেলেই ছুঁতে পারবো। মনে হলো, প্রতিটি দীপ আমার জন্যে জ্বলছে। মনে হলো, প্রতিটি ঘর আমার ঘর।'

লালা স্বরাজের এ রূপ আগে দেখেনি রজনী। একেবাবে অন্তর থেকে ছেঁকে তোলা একটা অনুভূতিকে এত কাছে থেকে এর আগে প্রত্যক্ষ করেনি সে। যেন তার হৃদয়েব মধ্যে মুখ রেখে ফিসফিস করে কথা বলছে স্বরাজ। তার সঙ্গে এতটুকু দূরত্ব নেই আর। চন্দনে কুসুমে কখন ভাগ করে নিয়েছে স্বর্গের সোনা।

স্বরাজ তার কণ্ঠের 'পরে হাত রেখে বলল, 'তুমি আমাকে বিয়ে করবে রজনী ?'

বৃহস্পতিবার তাদের বিয়ে। সে রাতের একদিন পরেই। এত তাড়াতাড়ি কিছু ছিল না, কিন্তু রজনীর প্রয়োজন ছিল। তার ভয় হচ্ছিল আবার যে কোনদিন মহসিনের আবির্ভাব ঘটতে পারে।

বিয়ের পরই তারা চলে যাবে এ হোটেল থেকে। বাসা নেবে। রজনী তার সংসার সৃষ্টি করবে। বৃহস্পতিবার সকালে কোর্টে বিয়ে হয়ে গেলে পর তারা আর ফিরবে না হোটেলে। এক ব্যবসায়ী বন্ধুর কটেজ আছে হক্‌স বে'তে। সেখানে হবে তাদের মধুচন্দ্রিমা।

মাঝের এই একটা দিন স্বপ্নের মধ্যে কেটেছে রজনীর। এ দিনটা সে ইচ্ছে করেই দেখা করেনি লালা স্বরাজের সঙ্গে। এটা তাদের বোঝাপড়া হয়ে ছিলো যে, এ দিনটা আর দেখা

হবে না। স্বরাজ নেবে ছুটি, নিজেকে সে প্রস্তুত করবে। আর রজনী থাকবে তার কামরায় একাকী, সেখানে সে বিশ্রাম নেবে— আত্মার, শরীরের। দু'জনের কাছেই ভারী ভালো লাগছিল এই সিদ্ধান্তটা। যেন একটা দিন দূরে থেকে, অদর্শনের মধ্য দিয়ে, পরস্পরের জন্যে অধীরতাটুকু আকাশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুবে।

সারাটা বুধবার শান্ত সুন্দর হয়ে রইলো রজনীর অন্তর। প্রচুর অবসর যেন তার হাতে, শ্রীমণ্ডিত নির্ভর যেন তার সমুখে, রাণীর ঐশ্বর্য তার দু'হাতের মধ্যে। সকালে উঠে অনেকক্ষণ শুয়ে রইলো সে বিছানায়। কতদিন পরে গান গাইতে ইচ্ছে করল তার। ছোটবেলায় মার মুখে গুনগুন করতে শোনা 'সেদিন দু'জনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা' মনে পড়ে মনের মধ্যে রণিয়ে রণিয়ে উঠতে লাগল তার সুর। উঠে এসে সোফার ওপর উপুড় হয়ে অপটু গলায় অনেকক্ষণ ধরে সেটা গাইলো। শুয়ে শুয়ে খেলো ব্রেকফাস্ট। তারপর জানালা খুলে পায়ের নিচে উজ্জ্বল ব্যস্ত শহর দেখল। পাম গাছের দীর্ঘ ছায়া খাটো হতে হতে একেবারে শেকড়ের চারপাশে এসে যখন বন্দি হলো তখন নাইতে গেল রজনী। নেয়ে উঠে নতুন স্নিগ্ধতায় ভরে উঠলো মন। দেহ থেকে প্রসাধনীর মৃদু সুবাসে আচ্ছন্ন হয়ে রইলো ইন্দ্রিয়।

বিকেলে আবার গিয়ে দাঁড়াল জানালার পারে। কোথাও বেরুবে না, তবু প্রসাধিত সজ্জিত করল নিজেকে। কাল সকাল দশটার এখনো অনেক বাকি। তবু কাল কিভাবে সজ্জা করবে, কেমন করে বেরুবে এই ভাবনা ভাবতে বসলো তার মন।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙলো লালা স্বরাজের। আজ বৃহস্পতিবার। আর ক'ঘণ্টা পরেই দশটা। এত ভোরে কোনদিন ওঠেনি সে। ঘরেই তো ফেরে রোজ রাত তিনটের আগে নয়। কাল রজনীর কথামত ছুটিতে কেটেছে। ঘুমিয়েছিল বারোটার মধ্যে। জেগে উঠে বুকের মধ্যে রিমঝিম করতে থাকল তার। স্বর্গে থাকেন বিধাতা পুরুষ। মর্ত্যের মানুষের সঙ্গে একেক সময় তার পরিহাস করতে ইচ্ছে হয়, এরকম কথা শোনা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে হোটেল কোলামবাসের এই ন'নম্বর কামরায় যা ঘটলো তাকে হয়ত দশটা মানুষ মিলে সেই পরিহাসই বলবে। কিন্তু লালা স্বরাজের কাছে তার ব্যাখ্যা অন্য রকম। ব্যাখ্যা থাক, যা ঘটলো তা এই।

গোসল করে এসে চা খেতে খেতে সকালের কাগজ পড়ছিল সে। আজ তার মন বসছিল না কোন সংবাদে। চঞ্চল চোখ এ পাতা ও পাতায় ভেসে বেড়াচ্ছিল, একই লেখা সতেরোবার দেখছিল। এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল ছোট্ট একটি সংবাদ। সে সংবাদে লেখা, গতকাল বিকেলে করাচিতে আসছিল হায়দ্রাবাদ থেকে লোকাল। তার পাদানি থেকে ফসকে পড়ে দশরথ নামে আনুমানিক পঁয়ষট্টি বৎসরের এক দরিদ্র বৃদ্ধ হরিজন গুরুতর রূপে আহত হয়েছে। তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে আশঙ্কাজনক অবস্থায়।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল স্বরাজ। দশরথ? দশরথ যে তার বাবার নাম—

যে বাবাকে ফেলে সে ছোটবেলায় পালিয়ে গিয়েছিল, যে বাবাকে সে গত পাঁচ বছর ধরে করাচির বস্তিতে বস্তিতে খুঁজে বেরিয়েছে। তার বাবা বেঁচে থাকলে তো আজ পঁয়ষট্টি বছর বয়সের হতেন। তিনিই কি আসছিলেন হায়দ্রাবাদ থেকে? উত্তেজনায় সারা শরীর কেঁপে

উঠলো লালা স্বরাজের। কিন্তু কিছুতেই বিচলিত হওয়া স্বভাব নয় তার। এ বৃদ্ধ তার বাবা নাও হতে পারেন। দশরথ নামে রামায়ণের যুগ থেকে আজ অবধি কোটি কোটি মানুষ জন্ম নিয়েছে।

তবু দুর্ঘটনার কথা শুনে তার মনের মধ্যে কেমন করে উঠলো। কী জানি হয়ত হাতের কাছে এসে হারিয়ে যাবে। তবু তো নামের মিল রয়েছে, এ মিলটুকুও সে গত পাঁচ বছরে খুঁজে পায়নি।

ঘড়িতে তাকিয়ে দেখল সাতটা বাজে। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসা যাবে। হয়ত রজনী এখনো ঘুম থেকেই ওঠেনি।

পোশাক পরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল সে হোটেল থেকে। বুড়ো পাঠান পোর্টারের সঙ্গে দেখা হলো সিঁড়ির মুখে। তাকে বলল, 'মেম সাহেব আমার কথা জিগ্যেস করলে বোলো আমি এক্ষুণি আসছি।'

সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল না স্কুটার, ট্যাক্সি। একটা টাঙ্গা যাচ্ছিল। সেটাকে থামিয়ে উঠলো স্বরাজ। কিছু দূরে গিয়ে একটা খালি ট্যাক্সি চোখে পড়তেই চিৎকার করে সেটা থামাল। বসলো তাতে। ট্যাক্সি ছুটে চলল রেলওয়ে হাসপাতালের দিকে।

হাসপাতালে এ সময় ভিজিটর আসা নিষেধ। তার সাংবাদিক কার্ড দেখিয়ে মুক্তি পাওয়া গেল। খোঁজ পেতে পেতে লাগল মিনিট পনেরো। অবশেষে তেতলার এক চার-বেড কামরায় তাকে নিয়ে এলো ওয়ার্ডেন।

দরোজায় পা দিয়েই লালা স্বরাজ দেখল বেড খালি। আসলে তিনটে বেড খালি ছিল, সেই তিনটেই আগে চোখে পড়েছে তার। আবার যখন ভালো করে তাকাল, দেখল, ডান দিকের বেডে ফিরে শোয়া একটি দেহ। সমস্ত দেহ কম্বলে ঢাকা। মুখের যতটুকু প্রকাশিত কেবল শাদা চুল দেখা যাচ্ছে। তার শরীর এমন শান্তিতে ডুবে আছে যে এ কেবল অধিক মর্ফিয়াতেই সম্ভব।

ডাক্তার জানাল, একটা পা হাঁটুর ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, রক্তক্ষরণ হচ্ছে প্রচুর।

লালা স্বরাজ ধীরে ধীরে বেডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়ে চেষ্টা করল তার মুখ দেখতে। ভালো করে দেখা গেল না। তখন সে ঘুরে তার ফেরানো মুখের সমুখে এসে দাঁড়াল।

একটা পলক। কিস্‌সু দেখতে পেল না স্বরাজ। কিংবা দেখল পথে ঘাটে দেখা হাজার হাজার ধাঙড় ঝাড়ুদার ভিখিরিদের একটা মুখ। হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গেল তার। পরক্ষণে একপাল ঘোড়ার পদক্ষেপে বিচূর্ণ হতে থাকল তার সমস্ত অনুভূতি। সেই মুখ, চিবুকের নিচে সেই গভীর কাটা দাগ, গলায় সেই রূপোর মাদুলি! তার বাবা। তার ঝাড়ুদার বাবা, যে বাবাকে সে খুঁজে বেরিয়েছে পাঁচটি বছর। তিনি শুয়ে আছেন মর্ফিয়ার আচ্ছন্ন করা ঘুমে। কালো ত্বক বয়সের ভারে আরো কালো হয়েছে, কুঞ্চনে ভরে গেছে মুখ, চিবুকের হাড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আরো। পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলো পিতার দিকে সন্তান। যেন পঁচিশ বছরের অদর্শনের বিরাট ফাঁক কয়েক মুহূর্তের হাহাকার ভরা দৃষ্টিতে ভরে তুলেছে স্বরাজ। সে একবার হাত রাখতে গেল জ্ঞানহীন দশরথের শরীরে, ফিরিয়ে আনল, বিমূঢ়ের মতো তাকাল চারদিকে। কোনো রকমে ডাক্তারকে বলতে পারল, 'বাঁচবেন?'

'এখনো বলা যাচ্ছে না। কে লোকটা ?' ডাক্তার স্বরাজকে দেখে নিয়ে আবার শুধালো, 'আপনার বাড়িতে কাজটাজ করত নাকি ?'

শুনে তার ভীষণ ক্রোধ হলো। চমকে উঠলো সারাটা অন্তর। নিজেকে সংযত করে চোয়ালের হাড় দৃঢ় করে সে উচ্চারণ করল, 'আমার বাবা।'

'ও মাই গড।' অস্ফুট বিস্ময়-ধ্বনি বেরুলো ডাক্তারের কণ্ঠ থেকে। অবাক হয়ে সে একবার পিতার দিকে দেখল, একবার পুত্রের দিকে।

আধঘন্টার মধ্যে হোটেলে ফিরতে চেয়েছিল স্বরাজ। কিন্তু হোটেলের কথা তার আর মনে রইলো না। মনে পড়ল না রজনীর কথা। আজ দশটার সময় তার বিয়ে, রজনী তার জন্যে তৈরি হয়ে বসে থাকবে— এসব কিছুই যেন তার জীবনে ঘটবার কথা ছিল না। সে নিষ্পলক বসে রইলো দশরথের পাশে। ডাক্তার আসছে, যাচ্ছে, নার্স সেবা করছে, ওষুধ দিচ্ছে, ইনজেকশান হচ্ছে— ছবির মতো সব ঘটে যাচ্ছে তার চোখের সমুখে। একটা শব্দ তার কানে যাচ্ছে না। ওদের একটা কথার মানে সে বুঝতে পারছে না।

সারাটা দিন বসে রইলো সেখানে। নাওয়া-খাওয়া কিছুই হলো না। কেবল মনে হলো, সে উঠে গেলেই ফাঁকি দিয়ে তার বাবা স্বর্গে যাত্রা করবেন। যেন সে বসে আছে বলেই এখনো তার মৃত্যু সম্ভব হচ্ছে না।

বিকেলের দিকে একটু জ্ঞান হলো দশরথের। যেন একবার চোখও মেলল। উদগ্রীব হয়ে স্বরাজ ডাকল, 'বাবা।' চোখ বন্ধ করল দশরথ। সে শুনতেও পেল না। আবার সে ডাকল, 'বাবা।'

রাত ন'টার সময় পরিপূর্ণ চোখ মেলল দশরথ। দেখল, একটি অপরিচিত মুখ। কোমরের নিচ থেকে সব শূন্য লাগছে, কোথায় যেন যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝতে পারা যাচ্ছে না, মাথার মধ্যে চোখে দেখা সব কিছু টলছে, স্থির হয়ে আবার টলছে।

সে বলল, 'বাবা, আমি স্বরাজ।'

'কে ?'

দশরথের কাছে দূর থেকে চেনা মনে হলো নামটা। যেন বহুকাল আগে ভিড়ের মধ্যে কোথাও শুনেছিল। অজান্তে তার হাতটা উঠে এলো, কাঁপতে কাঁপতে স্পর্শ করল স্বরাজের চোখের কোল।

স্বরাজের চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু। সে অশ্রু দশরথের শিথিল আঙুলের ডগা সিক্ত করে দিল। আলোর প্রতিফলনে একখন্ড দীপ্তি হয়ে উঠলো সে অংশটুকু। হাতটা পড়ে গেল বিছানার 'পরে। লালা স্বরাজ সে হাত তার আকুল মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল, 'বাবা, বাবা, তুমি শুনছ, তুমি চিনতে পারছ না ? বাবা, আমি স্বরাজ। আমি স্বরাজ। আমি রাগ করে চলে গিয়েছিলাম। বাবা, আমি স্বরাজ।'

দশরথ তার কণ্ঠ শুনল কিনা বোঝা গেল না। কোন প্রতিক্রিয়া হলো না তার মুখে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কেবল এপাশ ওপাশ করবাব ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। আধ ঘণ্টা পরে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হলো।

তখন তাকে নিয়ে যাওয়া হলো অপারেশন কামরায়। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো স্বরাজ। অস্থির পদচারণা করতে করতে সে জেসাসের ছবি মনে করবার চেষ্টা করল। পাগলের মতো প্রার্থনা

করতে লাগল। দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ঈশ্বরের সিংহাসন টলিয়ে দশরথের জীবন ভিক্ষা সে চাইলো। মুহুর্মুহ উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। আবার সে প্রার্থনা করল।

আবার তাকে নিয়ে আসা হলো বেডে। দশরথ যেন পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাক্তারের দিকে চোখ তুলে স্বরাজ তাকাতেই সে বলল, 'এখনো বেঁচে আছেন। আমরা চেষ্টা করছি।'

আশান্বিত হয়ে সারারাত বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে জেগে রইলো স্বরাজ। আশা, কখন চোখ মেলে সে ছেলেকে চিনতে পারবে।

রাত চারটে ছাপ্পান্ন মিনিটে ঘুমের মধ্যে মারা গেল দশরথ। যন্ত্রের মতো বুকে ক্রশ করলো লালা স্বরাজ। তবু বিশ্বাস হলো না। তবু যেন আশা ফুরাতে চায় না। নার্স দেহটাকে যখন কম্বলে ঢেকে দিল তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রার্থনা করলো।

'আমার পিতাকে তুমি স্বর্গে নিও, যেমন তুমি সবাইকে তোমার অসীম ক্ষমার মধ্য দিয়ে স্বর্গে নেবে। আমরা যারা জীবিত, আমাদের যেন অহংকার না হয়। একমাত্র তোমার নিকটেই সান্ত্বনা। তোমারই এ রাজ্য, সর্বক্ষমতা, সর্বগৌরব। আমেন।'

আর রজনী ? সারাটা দিন সে প্রতীক্ষা করল স্বরাজের জন্যে। দশটা বেজে গেল তবু সে এলো না, তখন তার প্রসাধনে প্রস্তুত দেহ, অনুভবে সম্পন্ন হৃদয়, আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো। ভাবলো এই হয়ত সে এসে যাবে, রাজার মতো এসে দাঁড়াবে স্বরাজ তার দুয়ারে। লজ্জা করল, নিজে গিয়ে খবর নিতে। সে যে আজ বিয়ের কনে।

এগারোটা পেরিয়ে গেল তবু যখন স্বরাজ আসেনি, তখন সে কম্পিত চরণে নিচে নেমে দেখে ন'নম্বর কামরা বন্ধ। বুকের মধ্যে আগুনের মোহর পড়লো যেন তার। স্বরাজ যে কাগজে কাজ করে সেখানে টেলিফোন করে সন্ধান পাওয়া গেল না। তাড়াতাড়ি ওপরে এসে নিজের ঘরে বসে বুকের 'পরে হাত রেখে আত্মস্থ হবার চেষ্টা করল রজনী। স্বরাজ কি শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পালটে পালিয়ে গেল মহসিনের মতো ? নিজের পোড়া কপালটার কথা মনে করে পাগলের মতো হেসে উঠতে ইচ্ছে হলো তার। ইচ্ছেটা এত তীব্র, হৃদপিণ্ড ফেটে পড়বে যেন।

বুড়ো পাঠান এসে জানিয়ে গেল, সাহেব বাইরে গেছেন, বলে গেছেন একটু পরেই ফিরবেন। তার কথা কানেও গেল না রজনীর। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো সে। মলিন হতে লাগল তার মুখের রং। খসে পড়ল কপালের কুঙ্কুম। পাণ্ডুর হলো কবরীর মোতিয়া-মালা। বেলা গেল, তবু স্বরাজ এলো না।

কিস্‌সু ভাবতে পারল না মেয়েটা। ভাবনার উৎস যেন তার বিকল হয়ে গেছে। ইন্দ্রিয় হয়েছে পাথর। যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইলো। না অতীত, না বর্তমান, না ভবিষ্যৎ— কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারল না।

সন্ধ্যের ঠিক আগে যখন সমস্ত ঘরটা একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছিল অন্ধকারে, আর রজনীর মনে হচ্ছিল তার মৃত্যু হচ্ছে, ঠিক তখন দরোজায় টোকা পড়ল।

হৃদয় লাফিয়ে উঠলো দুরাশায়। দরোজা খুলে দেখল, মহসিন।

মহসিন। দুয়ার খুলে চেনা এই লোকটার মুখ একেবারে রজনীর চোখে দুর্বার তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়লো যেন।

এক মুহূর্তে কী হলো তার মনের মধ্যে, মহসিনের বুকের 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বেষ্টন করে তাকে দু'হাতে আঘাত করতে করতে অশ্রু জড়ানো বিকৃত কণ্ঠে সে বলতে লাগল, 'তুমি আমার শত্রু। আমাকে কেন ভালবাসলে ? কেন চলে গেলে ?'

বিহ্বল হয়ে গেল মহসিন। রিক্ত, সর্বস্বান্ত, বিপন্ন অস্তিত্ব এই লোকটা কিস্‌সু বুঝতে পারল না। রজনীর খোলা এলো চুল, বিস্ফারিত চোখ দেখে সে ভয় পেলো, অপরাধী বোধ করল নিজেকে। আজো সে টাকা নিতে এসেছিল রজনীর কাছ থেকে। রজনীর ওপর দিয়েই দুঃখের দিনগুলো পার হবে ভেবেছিল। কিন্তু তা তলিয়ে গেল কোথায়। সেদিন যে বিশ্রী কথাগুলো রজনীকে বলেছিল, সেটা তো ছিল তার পালিয়ে যাওয়ার পর প্রথম আবির্ভাবের সংকোচ আর অপরাধের বিরুদ্ধে একটা বর্ম। আজ সে বর্ম ভেঙ্গে গেল খানখান হয়ে। সে খোলা দরোজার মুখে রজনীকে বুকের ভেতর আঁকড়ে ধরে উচ্চারণ করল, 'রজনী, আমি বাসা করেছি, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। আমি আর কোথাও যাবো না, রজনী।

বাসার কথাটা অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে মহসিনের। তার বাসা কোথায় ? তার বাসা তো পথ। কিন্তু রজনীকে বুকের মধ্যে নিয়ে, তার কান্নার জন্যে মিথ্যে ছাড়া আর কিছুতে সান্ত্বনা দেয়ার কথা সে ভাবতে পারল না।

নিজেকে মুক্ত করে রজনী বলল, 'চলো, আমাকে এখুনি নিয়ে যাও।'

মহসিন হাত ধরলো তার। দৃপ্ত ভঙ্গিতে রজনী সিঁড়ির দিকে এগুলো। খোলা দরোজা পড়ে রইল খোলা। মহসিন তাকে নিরস্ত করবার মতো সাহস পেল না খুঁজে। কেবল বলল, 'তাই চলো।'

তখন যদি ওরা একবার পেছনে ফিরে তাকাতো, দেখতে পেতো, একেবারে দক্ষিণে বাতি নেভানো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ একটা মানুষ তাদের দেখছিল। সে লোকটা দেখেছে রজনী মহসিনের আলিঙ্গনে বাঁধা। দৃশ্যটা চোখে পড়তেই তার হৃদয়ে তীরবিদ্ধ হবার যন্ত্রণা হয়েছিল। মুমূর্ষু মানুষের মতো সে তাকিয়ে দেখেছে ওদের। তাকিয়ে দেখেছে রজনীকে। দেখেছে মহসিনের সঙ্গে তাকে চলে যেতে।

যেন তার জীবন থেকে অপসারিত হলো সূর্য।

রজনী চলে গেলে পীরজাদা তার ঘরে এসে দাঁড়াল। মাথা নত করে কী ভাবলো অনেকক্ষণ ধরে। এ ক'সপ্তাহ রজনীকে সে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে, আজ রজনী যখন নিজেই চলে গেল তখন হৃদয় ধাবিত হলো তারই দিকে। কিছুতেই ফেরানো যাচ্ছে না। অথচ রজনীকে অবাধে যেতে দিতে হয়েছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে মৃত একটা মানুষের মতো নিশ্চলতা নিয়ে সে দেখেছে তাদের দু'জনকে।

দ্রুত একটা চিঠি লিখল পীরজাদা। সেটা লালা স্বরাজের ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্যে বেয়ারার হাতে দিল। তারপর দরোজা বন্ধ করে আলমিরা খুলে দেখল চার বোতল হুইস্কি এখনো আছে। নামিয়ে আনলো বোতল চারটে। টেবিলের ওপর পাশাপাশি রেখে খুললো সব কটার মুখ। নিভিয়ে দিল বাতি। তখন বাইরের অস্পষ্ট আলো ঘরের মধ্যে বেলে জ্যোছনার মতো

ছড়িয়ে পড়ল লাফিয়ে। তখন উন্মত্তের মতো মাথা পেছনে ঠেলে হাঁ করে একটার পর একটা বোতল থেকে পান করতে লাগল ঢকঢক করে।

শবদাহ করে সকাল ন'টার সময় হোটেলে ফিরল লালা স্বরাজ। এসে সোজা গেল রজনীর ঘরে। দরোজা ঠেলে দেখল, তালা বন্ধ। নিচে নেমে এসে শুনলো, কাল সন্ধ্যের সময় সে চলে গেছে।

'কোথায় ?'

বলতে পারল না কেউ। ম্যানেজারেব কাছে জিগ্যেস করেও কোনো লাভ হলো না। কেবল এইটুকু শোনা গেল, মহসিনের সঙ্গে গেছে রজনী। নিজেকে তখন ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হলো তার। পৃথিবীতে এই একটা বন্ধন ছিল— তার বাবা। তাঁকে দাহ করে এসে নিঃসঙ্গতা ছাড়া আর কোনো অনুভূতি অবশিষ্ট নেই।

নিজের ঘরে এসে দেখল, মেঝেয় একটা চিঠি। হয়ত রজনীর চিঠি। হাতে নিয়ে পীরজাদার হাতের লেখা চোখে পড়ল তার।

'স্বরাজ, বন্ধুত্বের অনেক ঋণে তুমি আমাকে আবদ্ধ করেছ। আজ একটা অনুরোধ করব। আমি হয়ত মরতে যাচ্ছি, আমার দেহ তুমি গুজরানওয়ালায় পাঠিয়ে দাও। তোমার কল্যাণ হোক।'

বোকার মতো চিঠিটার দিকে তাকিয়ে রইলো স্বরাজ। দৌড়ে তেতলায় এসে পীরজাদার দরোজা ঠেলে দেখে ভেতর থেকে বন্ধ। উন্মত্তের মতো আঘাত করতে লাগল সে দরোজায়। ভেতর থেকে খুলে দিল না কেউ। আবার সে আঘাত করল, আবার. আবারও।

ম্যানেজারকে ডেকে এনে দরোজা খুলে লাশ বার করা হলো পীরজাদার। মেঝের 'পরে শূন্য চারটে বোতল। প্রাণহীন নিস্পন্দ দেহ লুটিয়ে ছিলো— পা সোফায়, মাথা মেঝেয়, চোখ বিস্ফারিত, মুখে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের একত্রিত এক অর্থহীন অসীম বিরক্তি। আর কিছু না।

লালা স্বরাজ একদিনে দেখল দু'টি মৃত্যু, আর একটি মানুষের হারিয়ে যাওয়া। বুকের 'পরে ক্রশ করতে ভুলে গেল সে এবার।

সেদিন রাতে সে অফিসে বসে সংবাদ লিখল তার টাইপরাইটারে— কাল রাতে ঘুমের মধ্যে হার্টফেল করে মারা গেছে পীরজাদা।

যে লোকটার জীবন ছিল বিড়ম্বিত, যে লোকটা ছিল তার বন্ধুদের অসীম করুণার পাত্র, সে আত্মহত্যা করেছে এ সংবাদ ছেপে তাকে আরো করুণার পাত্র করতে পারলো না লালা স্বরাজ। টাইপ শেষ করতে করতে দেখল, ভালো করে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আচমকা চোখে হাত দিয়ে দেখল, চোখ পানিতে ভরে আছে। সম্ভবত লালা স্বরাজ ছিল পীরজাদার একমাত্র বন্ধু।

করাচী, পাকিস্তান
১৯৬৩



# অনুপম দিন

প্রথমে দেখেছিল বীথি। দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল। লোকটা কী রক্তিম চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। যেন অন্তর পর্যন্ত তার দৃষ্টির কিরণ এসে বিঁধছে। তখন দুপুর বেলা। মাথার 'পরে খাড়া রোদ। শরীর খারাপ বলে আজ আর কলেজে যায় নি বীথি। অবশ্যি শরীরটা যে তার সত্যি সত্যি খারাপ ছিল, একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। কারণ, কলেজের গাড়ি আসার একটু আগেও তাকে দেখা গছে কলেজে যাবার উদ্যোগ করতে। তারপর হঠাৎ কী হলো কে জানে। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ঘরে এসে দেখেছিল, আবু তার খাতায় লিখে গেছে— আমার নাটক দেখতে তুই না এলি তো বয়েই গেল। আমি কি তোর জন্যে নাটক করছি ? যা কলেজে, গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাক বইয়ের ওপর।

আবু ইউনিভার্সিটিতে নাটক করছে। বীথিকে যেতে বলেছিল রিহার্সেলে। লজ্জা করেছে বীথির। মাথা নেড়ে বলেছিল, না। সেটা শুনে দুমদুম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে আবু। তারপর এই চিঠি। তাতেও কিছু হতো না। বই নিয়ে খোঁটা দেয়ায় ভীষণ অস্বস্তি হলো তার। চাচিমাকে গিয়ে বলল, গাড়ি এলে ফেরত পাঠিয়ে দিও। আজ যাবো না।

চাচিমার কাছে আজ আড়াই বছর আছে বীথি। এই আড়াইটে বছরে এই ছায়া-ছায়া, কম কথা বলা, মায়া পরানো মেয়েটাকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবেসে ফেলেছেন। হাতের রান্না ফেলে তিনি বললেন, কেন ?

তাঁর উদ্বিগ্ন স্বর শুনে সংকুচিত হলো বীথি। যেন কিছু না, তাই সাহস দেয়ার জন্যে হেসে উত্তর করল, ভালো লাগছে না।

কী রে ?

শরীরটা।

চাচিমা এক পলক তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। কী বুঝলেন, বললেন, তবে থাকগে, তোর কলেজে গিয়ে কাজ নেই।

তখন পরম স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বীথি গিয়ে ডুবেছে নিজের ঘরে।

খাতার যে পাতায় আবু লিখেছিল সেটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে তবে নিশ্চিন্ত হলো সে।

তারপর দুপুরে চাচিমার সংগে খেতে বসেছে বীথি। মরিয়মের কাছে তার মনের দরোজাটা ছিল ভীষণ রকমে খোলা। একবার ভেবেছিল, আবুর কথা বলবে। ঠিক তখন বাধা পড়ল। মরিয়ম বললেন, আচ্ছা বীথি, তুই যে রান্নাবান্না কিছু শিখলিনে, তোর বাবা আমাকে কী বলবে বলতো।

কেন ? কী আবার বলবে ?

বিয়ে হলে কী করবি ? রেঁধে খাওয়াতে হবে না ?

বীথি হঠাৎ তার পাতের দিকে মনোযোগ নাবিয়ে এনে প্রসঙ্গটা বদলাতে চায়। বলে, তুমি কিন্তু সব আমাকে দিয়ে দিচ্ছ, চাচি মা। এইটে নাও, এইটে নাও, আমি আর কিছু নিচ্ছি নে।

বীথি বাটি উপুড় করে ঢেলে দেয় মরিয়মকে। কিন্তু তাঁর যেন তখন ঘোর লেগেছে। বীথির দিকে মায়া চোখে তাকিয়ে তিনি বলে চললেন, ছুটির দিনে তুই আমার সংগে রান্না করবি। রান্না না করলে কাছে বসে থাকবি। নইলে তোর বাবার কাছে নালিশ করে দেব।

দিও, যতো পার দিও তুমি।

খাবার ঘরের বাইরে নিম গাছটায় তখন খুশির রোদে ঝিলিমিলি লেগেছে। বীথির মনোযোগ তখন সেদিকে।

এমনি ছিল দুপুরটা।

দুপরে শুয়ে শুয়ে বই পড়া চলছিল বীথির। পানির তেষ্টা পাওয়াতে নেবে এসেছিল রান্নাঘরে। সারাটা বাড়ি তখন কেমন ঘুম ঘুম করছে। চাচা গেছেন অফিসে। চাচিমা শুয়ে আছেন পাখা ছেড়ে দিয়ে। নিম গাছটা নিথর হয়ে আছে। রান্নাঘর থেকে কী মনে করে বসবার ঘরের বারান্দা দিয়ে ঘুরে আসতে গিয়েছিল বীথি। সেই তখন।

দেখে, একটা মানুষ, একমাথা রুখু চুল তার, চোখের কোলে কালিমা, কেমন চেনা চেনা— সোফার ওপর দু'পা তুলে নিবিষ্ট মনে কাগজ পড়ছে। বুকের ভেতরটা এক মুহূর্তে যেন পাথর হয়ে গেল বীথির। লোকটা তার পদশব্দে কাগজ সরিয়ে বীথির দিকে তাকিয়ে রইলো, যেন তাকে তন্ময় থেকে ফিরিয়ে এনে ভারী অন্যায় করেছে সে।

বিব্রত হয়ে চলে যাচ্ছিল কী যাবে, তখন লোকটা বুকের কাছে হাঁটুজোড়া আরো নিবিড় করে টেনে এনে বিড়বিড় করে বলল, আমাকে একটু পানি দিতে পারো?

যেন এক জীবনের বিনিময়ে পানি চাইছে লোকটা।

মরিয়ম আলুথালু বেশে ছুটে এসে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরলেন হাশেমকে। বললেন, বাবা, তুই এতদিন কোথায় ছিলি? এতদিন পর মায়ের কথা মনে পড়লো সোনা আমার?

তার পেছনে পানির গেলাশ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বীথি। পাঁচ বছর পর বাড়ির বড় ছেলে এমন করে ফিরে আসবে, আজ সকালেও তা কে ভেবেছিল? হাশেমকে অনেক ছোটকালে দেখেছিল বীথি। সে দেখার সংগে কোন মিল নেই লোকটার। যেন একটা রাস্তার মানুষ উটকো এসে হাজির হয়েছে। বীথির বুকের মধ্যে কেমন দুপদুপ করতে থাকে, খানিকটা ভয়ে, অনেকখানি আনন্দে।

হাশেম কিন্তু মায়ের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে এলোপাথারি হাত প ছুঁড়ছে। মুখে বলছে, আহা ছাড়ো। ছাড়ো না। কী শুরু করেছ?

তখন শান্ত হলেন মরিয়ম। তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, ছাড়বোই তো বাবা। ছেড়ে তো দিয়েই ছিলাম। আবার তবে জ্বালাতে এলি কেন?

মরিয়মের কণ্ঠে কান্না আসতে চাইছে। সেটাকে তিনি আঁচলের মধ্যে লুকোলেন।

হাশেম তখন খুব আস্তে উচ্চারণ করল, হাসল, তোমাকে জ্বালিয়ে সুখ আছে, মা। তুমি জ্বলবে, কিন্তু কিছু বলবে না। আর আমি? জ্বলে যাচ্ছি, চীৎকার করছি।

বলতে বলতে হাশেম ঝটকা মেরে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। যেন একটা দীর্ঘ সৌন্দর্য রেখার জন্ম হলো হঠাৎ। যেন পা থেকে মাথা অবধি একটা শেকল বাঁধা শক্তি মুক্তি পেয়ে ঋজু হয়ে দাঁড়াল। গাঢ় বেগুনি রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ময়লা পাজামা, স্যান্ডেল। তবু মনে হলো রাজার পোশাক পরে দরবারে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে হাশেম। দ্রুত বারকয়েক পায়চারি করল সে। মরিয়মকে উপেক্ষা করে, বীথির দিকে না তাকিয়ে, তাদের সমুখে থেকেও যেন অনেক দূরে দাঁড়িয়ে, খানিক হাঁটল হাশেম। একবার দাঁড়িয়ে পেছনে হাত বেঁধে মাটির দিকে চোখ রেখে কী ভাবল। তারপর আবার এক সর্বস্ব ধরে টান দেয়া অস্থিরতার তাড়ায় ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগল, তোমাকে

জ্বালিয়ে সুখ আছে, মা। পাঁচ বছর আগে একটা নেশার মতো পেয়ে বসেছিল— বুকের আগুন দিয়ে বিশ্বসংসারকে জ্বালিয়ে মারব। ঠিক এইখানটায়, দ্যাখো মা— মরিয়মের সামনে এসে হাত দিয়ে নিজের হৃদয়টাকে ইঙ্গিত করে হাশেম। বলে, সারাক্ষণ একটা আগুন জ্বলছিলো। মস্ত বড় আগুন। মনে করেছিলাম, সব কিছু পুড়িয়ে মারব এ আগুনে। কিন্তু পারলাম কই, মা ? হাজার হাজার মানুষ দেখলাম। তারা সবাই কী বলল, জানো ? বললো, সাধু বাবা, বুকের ভেতরে আগুন জ্বলছে, তাকে নিভিয়ে দিতে পারো ? হাজার হাজার মানুষ। আমার পা ধরে যখন কাঁদত, বলতাম— ভাগ, পালা এখান থেকে। তবু কি ছাড়ে ওরা ? ইস, একেকটা মানুষ ভেতরে ভেতরে, শরীরের চামড়া-মাংসের দেয়ালের ওপারে, দোজখ থেকে সব লকলকে আগুন নিয়ে এসেছে। আমি তার কী করব ? একজনকে পা টেনে লাথি মারতে গিছলাম, পা উঠলো না।

বীথি দেখছিল মরিয়মকে। পাঁচ বছর পর নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ছেলেকে ফিরে পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছেন তিনি। বোবা চোখ দিয়ে অসহায়ের মতো ছেলেকে অনুসবণ করে চলছেন। যাবার সময় লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, তবে কি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছে হাশেম ? হাশেম কথা বলতে বলতে চলতে চলতে কখন বীথির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সেটা টের পেয়ে বীথি চঞ্চল হয়ে উঠল। তার হাত থেকে গেলাশ নিয়ে সবটা পানি ঢকঢক করে খেয়ে শুধাল, এই মেয়েটি কে মা ?

ছেলের হাত থেকে শূন্য গেলাশ ফিরিয়ে নিয়ে মরিয়ম বললেন, বীথি— তোর ছোট চাচার বড় মেয়ে। তুই যাবার পর এখানে এসেছে।

তাই হবে। অনেক ছোট দেখেছিলাম।

বলতে বলতে হাশেম আবার গিয়ে বসল সোফায়। তার মুখ থেকে নিজের কথা শুনে বীথির কেমন সংকোচ হলো। চলে যাবার উদ্যোগ করল চাচিমার হাত থেকে গেলাশ নিয়ে, তখন পেছন থেকে ডাকল হাশেম।

এই শোনো।

বজ্রের মতো কণ্ঠস্বর বীথির পা জোড়া অবশ করে দিয়ে গেল যেন।

শোনো এদিকে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো বীথি এসে দাঁড়াল তার সমুখে। হাশেম হাত বাড়িয়ে তার সুদীর্ঘ বাম বাহু দিয়ে স্পর্শ করল ওর কাঁধ। সঞ্চারিত করল শক্তি। আস্তে আস্তে সে মেয়েটাকে বসিয়ে দিল মেঝের ওপর, পায়ের কাছে। বীথি অবাক চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে বিচলিত বোধ করলেন মরিয়ম। এগিয়ে এসে বললেন, কেন, বীথিকে চিনতে পারছিস না তুই ?

আমি ওর চোখ দেখছি, মা। আমি ওর চোখ দেখছি। আমি ওর চোখ দেখছি।

মন্ত্রের মতো বিড়বিড় করে বলতে থাকে হাশেম। তারপর হঠাৎ কাঁধ থেকে হাত টেনে নিয়ে আচমকা বলে, এত কষ্ট পাস কেন, বীথি ?

কী ছিলো তার কণ্ঠে, কথা শুনে বীথির চোখ সজল হয়ে উঠতে চাইলো। কিছু বলতে পারল না। তখন জোর করে মাথা নাড়ল। মাথা নাড়তে গিয়ে সারা গা কেঁপে উঠল থরথর করে, যেন তার সব আবরণ খসে খসে পড়ছে।

ভীত হলেন মরিয়ম। বললেন, ওকে ঘাবড়ে দিয়ে আনন্দ হচ্ছে তোর ?

তার ছেলে যে সত্যি পাগল হয়ে গেছে, এইটে মনে করে কান্না পেল তাঁর।

বীথির দিকে চোখ রেখেই হাশেম মাকে বলল, ঘাবড়ে দেব কেন মা ? যা সত্যি তাকে কবর দিয়ে রাখলে বিশ্রী একটা অসুখ হয়। সে অসুখ থেকে মুক্তি মৃত্যুর পরেও আসে না, জানো না তুমি ? কিরে বীথি, কী হয়েছে ? কষ্ট পাস কেন ?

বীথি মৃদুকণ্ঠে বলতে চায়, কই, নাতো।

কিন্তু শোনা যায় না।

হাশেম পা দু'টোকে আবার গুটিয়ে আনে বুকের কাছে। চেপে ধরে নিবিড় করে দু'হাতের বেষ্টনীতে। এই ক'বছরে এই মুদ্রাদোষটা দাঁড়িয়ে গেছে ওর। বলে, মানব জন্মের দোষই ওই, বুঝলি ? শুধু কষ্ট পাবে। বুঝতে পারবে, অথচ কিছু করতে পারবে না। শোন, ভাল-মন্দ বুঝতে পারিস ? কোনটা আলো আর কোনটা অন্ধকার ? নাহ, তোকে অনেক শেখাতে হবে, নইলে বেঁচে থাকবি কী করে ? বেঁচে থাকার জন্যে বই পড়, এঞ্জিন বানানো, দালান গড়াই যদি যথেষ্ট হতো তাহলে মানুষ কাঁদতেই জানত না। ভালোই হলো, এখানে এসে আমাকে আর বসে থাকতে হবে না। তোকে নিয়ে একটা কাজ পাওয়া গেল। যাঃ পালা শীগ্‌গীর।

বীথি উঠে দাঁড়ায়। এক মুহূর্তে কে যেন তাকে ভীষণ রকমে দুর্বল করে দিয়ে গেছে।

হাশেম বলল, হ্যাঁ শোন, আমাকে একটা কম্বল দিতে পারিস ? জ্বরটা খুব জেঁকে আসছে রে।

তিন ছেলে মরিয়ম আর মুরশেদ চৌধুরীর। একেবারে ছোট আবু, এবার এম এ পার্ট টু-তে পড়ছে। মেজ মাহবুব, চাকুরি করে, বিয়ে করে বউ নিয়ে থাকে গেণ্ডারিয়ায়। আর সবার বড় হাশেম পাঁচ বছর আগে এম এ পড়তে পড়তে পরীক্ষা দিল না।

তখন জিজ্ঞেস করলে খুব একটা অন্যমনস্ক গলায় উত্তর করত, পড়ে কী হবে ? পড়ে কিছু হয় ?

এটা উত্তর হলো না; কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু বলত না হাশেম। বাবা শাসন করলেন, মা কাঁদলেন, বড় চাচা এসে বোঝালেন একদিন। কিস্‌সু হলো না তাতে।

তখন ভীষণ চুপচাপ থাকত হাশেম। সারাটা দিন বসে বসে কী ভাবত তার হদিস কেউ পেতো না। একেকদিন দেখা যেত বারান্দায় পায়চারি করতে করতে দরাজ গলায় কবিতা আবৃত্তি করছে। কিংবা বাগানে একটা গাছ পছন্দ হয়ে গেছে, তার গোড়ায় পানি ঢালার অত্যাচারে সেটা যদ্দিন না মরছে, যেন নিস্তার নেই। মরে গেলে মুখ দিয়ে শুধু একটা অস্ফুট ধ্বনি বেরুতো, যাহ্।

হঠাৎ একদিন এ সব গেল থেমে। শুরু হলো বই পড়ার নেশা আর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে ছিঁড়ে ফেলা। সে লেখা দেখাতো না কাউকে। যক্ষের মতো কুটি কুটি কাগজ আগলে বসে থাকত, তারপর বাগানে বসে আগুন জ্বালিয়ে ছাই বানিয়ে শান্তি।

একদিন ভাঁটা পড়ল এতেও। তখন দু'তিন দিন এক নাগাড়ে খোঁজ পাওয়া যেত না হাশেমের। দু'দিন তিনদিন পরে যখন এসে হাজির হতো, তখন গা মাথা ধুলোয় ভর্তি, চোখ জবাফুলের মতো লাল। কাউকে কিছু না বলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ত। খেতে বললে সময়

মতো খেতে আসত না। দুপুরের রান্না বাসি হয়ে যেত, রাতের দুধ বেড়ালে খেতো। অনাহারে কাটত একদিন দু'দিন। আবার একেকদিন সাত রাজ্যের খিদে যেন পেয়ে বসত তাকে।

মরিয়ম একদিন রাতে তার খাটের ওপরে উঠে এসে কপালে হাত রেখে বললেন, বাবা, তুই কি সন্ন্যাসী হয়ে যাবি ?

কে ? মা ? আহ্ কাঁদছ কেন ?

তোর কী হয়েছে আমাকে বলতে পারিস না ?

তখন হাশেম চোখ বুঁজে অন্ধকারে মাকে, মা'র মুখ অস্থির আঙুলে অনুভব করতে করতে বলল, তুমি বুঝবে না, মা।

তারপর নিজের ওপরে নিজেই যেন চটে উঠল হাশেম। আধো উঠে বসে প্রায় চিৎকার করে বলল, ছাই আমি নিজেও কী বুঝতে পারছি ? মনে হয় আকাশ থেকে বজ্র এনে দিই সব ঠাণ্ডা করে। যাক— যাক— সাধের পৃথিবীটা চুলোয় যাক। আমার কী ?

মরিয়ম ছেলের কথা একবর্ণ বুঝতে পারেন না। বলেন, ও-কী বলছিস তুই হাশেম ? আমার বুকের ভেতরটা যে কেমন করছে।

তখন লাফ দিয়ে হাঁটুর ওপর উঠে বসেছে হাশেম।

আমাকে তুমি খুন করতে পারবে, মা ?

শুনে মরিয়ম পাথর হয়ে গেলেন। হাশেম বলে চলল, উহ্, পৃথিবীতে এত অসঙ্গতি একবার তুমি যদি জানতে পারতে, মা। একবার যদি জানতে পারতে, এক মুহূর্ত তোমার বাঁচতে ইচ্ছা করত না। গলায় দড়ি দিতে।

সে রাতেই মরিয়ম স্বামীকে বললেন, ওগো দ্যাখো না ছেলেটার কী হয়েছে। মনে মনে মুরশেদ চৌধুরীও কম ভুগছিলেন না। প্রসঙ্গ উত্থাপনে এতদিনকার জমানো ক্ষোভে ফেটে পড়লেন।

কী আবার হবে ? ঢের বাঁদর ছেলে দেখেছি আমি।

মরিয়ম কান্নাভরা গলায় বললেন, তুমি একটা নিষ্ঠুর, বুঝলে ? ছেলে আমার পাগল হয়ে যাচ্ছে, তুমি বাপ হয়ে চুপ করে আছো ?

পাগলই তো। নইলে অমন ব্রিলিয়ান্ট ছেলে হঠাৎ লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, শুনেছ কখনো ?

পরদিন সকালে উঠে হাশেমকে পাওয়া গেল না।

আড়াই বছর আগে বীথির বাবা যখন মেয়েকে মেজভাই মুরশেদের কাছে রেখে গেলেন ঢাকায় কলেজে পড়বে বলে, মরিয়ম ততদিনে শোকের বরফে পাথর হয়ে গেছেন। হঠাৎ করে যেন বুড়িয়ে গেছেন তিনি। আত্মযত্নের দিকে কোনো লক্ষ্য নেই, সংসারের ভালোমন্দে চিরউদাসীন। এমন করে দিন চলে না। মুরশেদ চৌধুরী কম বোঝান নি। বড় জা আমেনা এসে কম সান্ত্বনা দেন নি। কিন্তু মরিয়মের যেন মৃত্যু হয়ে গেছে।

চাচিমাকে দেখে চমকে উঠেছিল বীথি। এর আগেও কি সে তাঁকে দেখেনি ? দেখেছে। তখন কত উজ্জ্বল, মধুর হাসিতে মুখরিতা ছিলেন মরিয়ম। এখন সেই একই মানুষকে দেখে মনের মধ্যে বিষম একটা ধাক্কা পেয়েছিল বীথি। আর অন্যদিকে চাচা। সেই সদালাপী সদাহাস্য

চিরউদার মানুষটিও যেন হঠাৎ করে পাথরের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। বড় চাচা খোরশেদ চৌধুরী নিঃসন্তান মানুষ। ঢাকাতেই থাকেন। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, বীথি আমার কাছে থাক।

কিন্তু মরিয়মের জন্যে সেটা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেছিলেন, না, বীথি থাকবে তাঁর কাছে। বীথিরও মনের টান ছিল মরিয়মের জন্যে।

প্রথম দিনই কোলের কাছে বসিয়ে মরিয়ম বীথিকে বলেছিলেন, আমার কী ভাগ্য দেখ, মা। নিজের ছেলে হারিয়ে মেয়েকে কাছে পেলাম। হ্যাঁরে বীথি, তুইও পালাবি নাকি ?

বীথির তখন কতই বা বয়স। কিন্তু বুকের ব্যথা বোঝার মতো অন্তর ততদিনে তার তৈরি হয়ে গেছে। সে বলেছে, তুমি আমাকে পর মনে করো, চাচিমা ?

মরিয়ম বুঝতে পারেন কথাটা গিয়ে কোথায় লেগেছে। লজ্জিত হন। তার চিবুক নেড়ে বলেন, নারে না। আমার কথা ধরতে নেই। হাশেম চলে গেছে থেকে কী বলতে কী বলি। তুই পর হতে যাবি কেন ?

বীথি বলেছে, আমি কিছু মনে করিনি, চাচিমা। আমাকে নিয়ে তুমি ভেবো না। এতদিন তোমার দেখবার কেউ ছিল না, আজ থেকে আমি হলাম।

মরিয়ম বলেছেন, বোস ভালো করে। তোর চুল আঁচড়ে দি। একেবারে জট করে ফেলেছিস পাগলি।

ঘরে হাশেমের একটা বড় ছবি বাঁধানো ছিল। বীথির মন তখন কৌতূহলী হয়ে সেই ছবিটা দেখছে। যে লোকটা তার চাচিমার এত কষ্টের কারণ ছবির মধ্যে তার মন খুঁজে মরছে সেই কারণটা। বলেছে, আচ্ছা চাচিমা, হাশেম ভাই চলে গেলেন কেন ?

বড়ো সরাসরি শুধিয়ে ফেলেছিল বীথি। শুনে মরিয়ম তার মুখের দিকে পলকহীন তাকিয়ে রইলেন খানিক। পরে বললেন, কী জানিরে। বোধহয় ও আমার কোলে বনের পাখি ছিল। একদিন তাই কাঁদিয়ে যেতে এতটুকু বাধলো না।

পরে আস্তে আস্তে শুনেছে বীথি— কিছুটা আবুর কাছ থেকে, কিছুটা মাহবুব ভাইয়ের কাছ থেকে। কিন্তু তা থেকে কতটুকুইবা বোঝা যায় ? আর দেয়ালে ঝোলানো ওই ছবিটা। ছবির ভেতরে যেন সাংকেতিক ভাষায় সব কিছু লেখা আছে। দুরাশায় কত কতদিন বীথি তার ছবিটাকে গভীর চোখে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে দেখেছে।

একদিন কতগুলো চিঠি খুঁজে পেয়েছিল বীথি। হাশেমের ফেলে যাওয়া বাক্সের একেবারে তলায়, এককোণে পড়ে ছিল। ভেতরটা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে গিয়ে এই কাণ্ড। খামগুলোর ওপর মেয়েরি হাতে সুন্দর করে লেখা হাশেমের নাম লুকিয়ে চিঠিগুলো পড়েছিল বীথি। কাছে রাখতে সাহস হয়নি। আবার রেখে দিয়ে এসেছে নিরুদ্দিষ্ট মানুষটার বাক্সে।

হাশেমের একটা অজানা অধ্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সেদিন তার কাছে। কে এই মেয়েটা যার নাম বকুল ?— যে চিঠি লিখত হাশেমকে, যার চিঠি জমিয়ে রাখত হাশেম— যার জন্যে এত কষ্ট ?

প্রথম চিঠিটা ছিল এমনি—

হাশেম সাহেব,

অনেকদিন পরে যেন একজন পরিচ্ছন্ন মানুষ দেখলাম। বিচার, বিশ্লেষণ, মাপা জোঁকা, অনেক হলো। অনেক বাচাল মানুষের সাক্ষাৎ মিলল। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হলো,

আপনার অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও হৈচৈ করে, ঢোল বাজিয়ে তা রাষ্ট্র করতে রাজি নন।

আপনি যে পরিচ্ছন্ন, নির্মল, সেজন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। নির্মলতার পরিচ্ছন্নতার দু'একটি বিরল বিন্দুর দেখা না পেলে যে আত্মায় পচন ধরবে এতে আশ্চর্য কী! কিন্তু আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আত্মাকে আমি পচতে দেব না। আপনি মরে যান, তবু ভালো— আপনার মনের সৌন্দর্য যেন না মরে এই কামনা করি। এটা দেখবেন আমার হয়ে, যারা এ পর্যন্ত সৌন্দর্যের পূজো করেছে, মৃত ও জীবিত, তাদের হয়ে।

ইতি— বকুল

কথাগুলো ভালো করে বুঝতে পারে নি বীথি। কম্পিত হাতে আরেকটা চিঠি সে খুলেছে।

কে বলেছে আমার হৃদয় প্রদীপের মতো ? লোহা বলতে পারেন। আমাকে ডাকা মানে কষ্ট পাওয়া। আমার সান্নিধ্য খোঁজা মানে অভিশাপ ডেকে আনা। বন্ধুত্বের চেয়ে বড় কিছু চাইবার নেই পৃথিবীতে। কিন্তু সে পথেও যদি নিয়তি অমঙ্গল বিছিয়ে রাখে তো তা থেকেও বিমুখ হতে হবে।

চিঠি পড়ে বীথি বুঝতে পারে না, একটু একটু মনে হয়, বকুলকে কি নিজের হৃদয়ের কাছে ডেকেছিল হাশেম ভাই ? কিন্তু কেন বকুল পারছে না তার ডাকে সাড়া দিতে ? বকুল কেন ফিরিয়ে দিচ্ছে হাশেমকে, এ কথা কোনদিন জানবে না বীথি।

পরের চিঠিটা কিন্তু আবার অন্যরকম। একেবারে নতুন কণ্ঠ নিয়ে বকুল কথা বলছে এই চিঠিতে।

আপনার অস্থিরতার জন্যেই বোধ হয় আপনাকে চেনা মনে হলো। আমার আবেগ গিয়ে এখন আছে স্থিরতা; অভাবনীয়তা গিয়ে এখন আছে অত্যন্ত আটপৌরে এক মন। এটা ছিল অনিবার্য। আমার রক্তের ভেতরে যেন বৈরাগ্য বাসা করে নিয়েছে। মানুষের মিছিলে আমার প্রিয়জন গেছে হারিয়ে আর আমি সমানে এগিয়ে চলেছি. দূরত্ব বৃদ্ধি করার দুরাশায়। আমি অদ্ভুতভাবে বিজ্ঞ। একটা অস্তিত্ব খায় দায় কথা বলে, আরেকটি সারাক্ষণ উদাস চোখ মেলে বসে থাকে। আমাকে কি সহ্য হবে ?

কী হয়েছিল কে জানে, পরের চিঠিটায় বীথি দেখল, বকুল চটে গেছে। দুঃখ করেছে। দুঃখ পেয়েছে। নইলে অমন করে লিখতে যাবে কেন ?

বলেছি ডাকবেন না। তাকে ভুল বুঝলেন কেন ? মানুষকে যে অবিশ্বাস করে তার জন্যে নরকের দুয়ার সারাক্ষণ হাঁ করে আছে এই সত্য থেকে আমি মুক্তি খুঁজছিলাম। কিন্তু তার একমাত্র উপায় বোধ হয় মায়ার ভেতরে আশ্রয় নেয়া। অথচ কোনো মায়ার বন্ধনে পরাই এখন আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ভেতরের একাকীত্ব কি কেউ ঘোচাতে পারে কখনো ? আজ আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে, আমার জীবন আর ফিরে আসবে না। রক্তহীন আত্মা, মরা ঘাসের রং আর ধূসর গুমোট আকাশ ছাড়া আর কিছুরই নাগাল যেন আমি পাবো না। তাই আবার আপনাকে সাবধান করছি আমি— আমাকে ডাকবেন না, ডেকে পাবেন না।

এর পরের চিঠি লেখা অনেকদিন পরের তারিখে।

ঈশ্বরের আশীর্বাদে আজ কলম হাতে নিতে পেরেছি। এমন করে বিছানায় পড়ে গেছি. ভয় হয়। স্বাস্থ্যের জন্যে মনে মনে চিরটা কাল যুদ্ধ করেও যখন এই অবস্থা হয়, তখন মনের জোর হারিয়ে ফেলি।

তোমার চিঠি পড়ে নিজেকে অভিশাপ মনে হচ্ছে। অনেক মানুষকে ভুগিয়েছি না জেনে। কারো কারো কষ্ট পাবার তীব্রতা দেখে সমব্যথায় মন আর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ দুঃখ লাঘব করা সম্ভব হয়নি। জানো তো, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয় না। আমার নাক দিয়ে অসম্ভব রক্ত পড়ছে। চিন্তা করবার শক্তি নেই। শুধু এটুকু বলি আমার জন্যে যদি এতটুকু কষ্ট পাও তাহলে নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারবো না। যে হাত দিয়ে তুমি আমার শ্যাওলার দাগ মুছেছো তা সরিয়ে দিতে পারবো না সত্যি, কিন্তু দুনিয়ার নিয়মে আরও দুটো হাত এখন আমাকে তুলে নিতে উদগ্রীব। সে দুটোর দাবি না মানলে আমার রক্ত বিষ হয়ে যাবে যে। আর সে হাতের উপস্থিতিতে তোমার মনে তো কষ্ট হবেই। আমি আজ বুঝিয়ে গুছিয়ে কিছু বলতে পারছি না। ক্লোরোমাইটসিন বুদ্ধি লুটে নিয়েছে।

পড়তে পড়তে বীথির বুকের ভেতরটা মোচড় দিযে উঠেছিল। ঠিক যে চিঠিতে ওরা অন্তরংগ সুরে কথা কইছে, সেই একই চিঠিতে বিচ্ছেদের ইঙ্গিত।

বীথি বুঝতে পারে, বকুলের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হাশেম কেন পেল না তার মন ?

তারপর আরো দুটি চিঠি রয়েছে বকুলের। শেষের চিঠিগুলো পড়ে বীথির মনে হয়েছিল, বকুল ভালোবাসত হাশেমকে, কিন্তু সম্ভব হয়নি, বিচ্ছেদের জের টেনেও তাই মমতা যায়নি বকুলের।

অসুখের চিঠিটার পরদিনের তারিখেই লেখা—

এখন অনেকটা সুস্থ। কেমন আছো ? আজ আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে। খুব হাওয়া দিচ্ছে কিনা। তোমার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি এ ক'দিন।

ছোট্ট চিঠিটা, কিন্তু বীথির সারাটা মন যেন ভরে রইলো। পরের চিঠিটায় বকুলের আবার অসুখ করেছে।

তোমার চিঠি যখন পেলাম তখন আবার আমি বিছানায়। অসুখের জন্যে কেউ এত ব্যাকুল হবে, এতে আমার চোখ সজল হয়ে ওঠে। রাগ করেছি কে বলল ?

আমি কী পুণ্য করেছি যে, তুমি এমন করে আমার জন্যে প্রার্থনা করবে ? তোমার প্রার্থনায় আমার প্রয়োজন আছে। আজ এই অসুস্থ শরীরে ফল কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেলেছি। মানুষের জীবনে এমন একেকটা সময় আসে যখন একটার পর একটা বিপদ আসে। তবে কতটুকুই বা আমার ভয় ? আমাকে ঘিরে তুমি আছো, তোমার মতো আরো একজন আছেন।

আজ তোমার জন্যে আবার আমি প্রার্থনা করলাম। অজান্তে যে ভার তোমার আত্মায় চাপিয়ে দিয়েছি তা থেকে যেন মুক্তি পাও। তোমার জন্যে আজকে আমার কষ্ট হচ্ছে। আমাকে ঘেন্না করেও যদি বালিশের ওপর তোমার মুখ নিদ্রামগ্ন থাকতে পারে তবে সেও ভালো। তবু আমাকে বাসনা করে অনিদ্র থেকো না। ভাবো, চলতে চলতে আমি থেমে গেছি, তবু তোমাকে যেতে হবে। এতে আমারও কষ্ট, তোমারও কষ্ট। তবু তোমাকে যেতে হবে। এমনি করে ফেলে যাওয়া অনেক ভালো।

চিঠি পড়ে চেনার বদলে আরো যেন কুয়াশা হয়ে উঠেছিল বীথির কাছে। একেকদিন রাতে হাশেম ভাইয়ের জন্যে ভীষণ কান্না পেত বীথির। বকুলকে মনে হতো রাক্ষুসী। মনে মনে অভিশাপ দিত বকুলকে। বীথির যেন সহজ বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, বকুলের

জন্যেই ঘর ছেড়েছে হাশেম। চাচিমাকে কথাটা জিগ্যেস করতে সাহস হয়নি। আবুকে সে শুধিয়েছিল, বকুল কে, আবুভাই জানো?

বকুল?

অবাক হয়ে যায় আবু। এই মেয়েটা ও নাম জানল কী করে? পরে হেসে ফেলে ফিসফিস করে বলেছে, কাউকে বলবি না। হাশেম ভাই যে মেয়েটাকে ভালোবাসত তার নাম বকুল।

বিয়ে হলো না কেন?

কী জানি। তুই নাম জানলি কী করে? জানিস বীথি, তোর মতো আমিও একদিন চুরি করে চিঠিগুলো পড়েছিলাম।

হাশেম জ্বরে কাঁপছে হি হি করে। বীথি কম্বল এনে দিতেই সেটা গায়ে জড়িয়ে মরার মতো পড়ে রইলো।

মরিয়ম বললেন, তোর চাচাকে অফিসে একটা টেলিফোন কর, বীথি। আর তোর বড় চাচার বাসায় যাবি একবার?

পাশের বাড়িতে এসে চাচাকে টেলিফোন করল সে। মুরশেদ চৌধুরীর গলাটা কী অদ্ভুত শোনাল।

হাশেম ফিরেছে? কখন? রাস্কেলটা এতদিন ছিল কোথায় কিছু বলেছে? চাচার কথা বলার ধরনই ও রকম। পাছে মমতা চোখে পড়ে যায়, বাইরে তাই তম্বি। হাশেমের কাছে বীথি যে হঠাৎ নগ্ন হয়ে পড়েছিল সেই থেকে বুকের কাঁপুনিটা যাচ্ছে না; কাঁপা গলায় সে উত্তর করল, কিছু বলেনি। জ্বর এসেছে খুব।

আমি এক্ষুনি আসছি।

বীথি ফিরে এসে দেখে মায়ে ছেলের গলা সপ্তমে উঠেছে।

মরিয়ম বলছেন, এসেই পাগলামো শুরু করলি। এই জ্বর নিয়ে ঘরে যাবি না তো রাস্তায় পড়ে মরবি?

না, না, আমাকে কোথাও যেতে হবে না।

চল বাবা, ঘরে গিয়ে শুবি।

এখান থেকে আমি কোথাও নড়তে পারবো না।

মরিয়ম তার কম্বল ধরে টানলেন।

আহ ছাড়ো।

কম্বলটা প্রায় কেড়ে নিয়ে সোফায় কুণ্ডলি পাকিয়ে চোখ বুঁজে পড়ে রইল হাশেম।

একটু পর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, সবাই, সবাই এমনি করে। জড়িয়ে ধরে রাখতে চায়। কোথাও কি সুস্থির হয়ে থাকতে পেরেছি? যখন চলে যেতে চেয়েছি, দুঃখী সব মানুষগুলো এসে বলেছে— চলে যাবে? তাহলে আমরা বাঁচব কী করে? জানো মা, ওদের চোখের দিকে তাকালে মায়া লাগে। মনে হয়, ওদের বুকের শূন্যতা চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। আমার তো মায়া করলে চলে না। তাই পালিয়ে আসতে হয়েছে। দিনের পর দিন, এক গাঁ থেকে আরেক গাঁ।

প্রতিটি নিঃশ্বাসের পর জ্বরের দাপটে হাঁপাতে থাকে হাশেম, তবু থামে না। কথাগুলো তাই বেদনার মতো শোনায়। হাশেম, না মরিয়ম না বীথি কেউ তাকে থামাতে পারে না, বলে চলে, আমি সবাইকে বলি, হতভাগা আমি কে যে আমাকে এমন করে মূল্য দিস ? আমাকে অত ওপরে উঠিয়ে তোরা যে শেষে ঠকবি।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে হাশেম— কিন্তু তাকি কেউ বুঝতে চায় ?

জ্বরটা বোধ হয় ভালো করেই এসেছে। বারবার করে বলে আর জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাতে ব্যর্থ চেষ্টা করে।

তা কি কেউ বুঝতে চায়। তা কি কেউ বুঝতে চায়। আমি একা যদি বিশ্বটাকে বাঁচাতে পারতাম, তাহলে আকাশের সেই সাত রাজার রাজা ব্যাটা আমাকে অমর আয়ু দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাতেন রে। বীথি, তুই শুনছিস ? তাহলে আমার দৃষ্টি হতো দীপ্তি। কোন খানে এতটুকু অন্ধকার রাখতাম না। সব আলো করে দিতাম। সব আমি আলো করে দিতাম। এখানে ওখানে আমাকে সারা রাত জেগে থাকতে হতো না।

জ্ঞান বোধ হয় হারিয়ে যাচ্ছে হাশেমের। মরিয়ম গিয়ে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, মাথায় বুলিয়ে দিলেন মমতার হাত। হাশেম একটুও বাধা দিল না।

মরিয়ম বীথির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তুই যা, বীথি। পারিস তো আবুকেও ধরে আনিস।

বড় চাচাকে খবরটা দিয়ে বীথি এলো ইউনিভার্সিটিতে আবুর খোঁজে। আবু তো জানবে না, বীথি এসেছে হাশেমের সংবাদ নিয়ে। মনে করবে তার রিহার্সেল দেখতে এসেছে। মনে করে খুব খুশি হবে। আজ সকালে বড্ড বকেছিল আবু, সে যাবে না শুনে। বীথির ভয় করছিল, নাশতা কিছু না খেয়েই বুঝি বেরিয়ে যাবে তার ওপর রাগ করে। আশেপাশে ঘুরছিল তাই। যখন দেখেছে আবু খাবার টেবিলে বসে খাচ্ছে তখন স্বস্তি পেয়েছে। কী ভঙ্গি তার খাওয়ার— যেন এক সংগে গোটা প্লেট মুখে পুরতে পারলে শান্তি। দেখে হাসি পেয়েছিল, কিন্তু তার সামনে হাসে নি, পাছে অনর্থ ঘটে। তাহলে আবু আর খেতোই না।

ইউনিভার্সিটিতে গেট পেরিয়ে হাঁটতে থাকে বীথি। কোনদিন আসে নি এখানে। বড্ড জড়সড় লাগছে। মনে হচ্ছে বিশ্ব তাকিয়ে আছে তার দিকে। মাথার 'পরে দুপুর রোদে ঝলসে আছে আকাশ। চমকে ওঠে হঠাৎ, হাশেমের সেই কথাটা মনে করে চমকে ওঠে বীথি।

তুই এত কষ্ট পাস কেন ?

হাশেম কী করে জানল, বীথির এত কষ্ট ?— যে কষ্টর কথা কোনদিন সে কাউকে বলতে পারেনি, যে কষ্ট সইতে না পেরে নিজেকে শান্ত করবার জন্যে একেকদিন তাকে কঠিন প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে।

বুকের ভেতরে দুপ দুপ করতে থাকে বীথির।

কিন্তু কোথায় আবু ? কোথায় গিয়ে তার সন্ধান নেবে ? কার কাছে গিয়ে শুধোবে, আবুকে দেখেছেন ?

করিডরে বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বীথি। একটি মেয়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। তাকে অমন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে শুধালো, কাউকে খুঁজছেন ?

বীথি নাম বলল। বলল, সে তার বোন।

মেয়েটা ভাবল খানিক। পরে বলল, আসুন আমার সংগে।

বীথিকে সে নিয়ে এলো মেয়েদের কমনরুমে। সেখানে এককোণে গিয়ে বসলো সে। বেয়ারার হাতে একটা স্লিপ পাঠিয়ে মেয়েটা বলল, আপনি বসুন, লোক পাঠালাম খুঁজতে।

রিহার্সেল নেই?

আছে, সে তো ছ'টার দিকে। এই তো কিছুক্ষণ আগেও আমাদের সঙ্গে ছিল। কেন, বাসায় কিছু হয়েছে নাকি?

বীথি লজ্জা পেয়ে যায়। ভীরু চোখ তুলে বলে, না, না, এমনিতে দরকার।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল সে। দু'চোখ ভরে হেঁচে দেখল মেয়েদের। দেখতে দেখতে কখন যে এদের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল তা বীথি নিজেও বলতে পারবে না।

বেয়ারা এসে খবর দিল, আবুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

দূরে সোনালি জমিনে ছোট ছোট লাল ফুল তোলা শাড়ি পরা একজন পাউরুটি চিবোচ্ছিল। নামটা শুনে সে ওখান থেকেই বীথিকে যে মেয়েটি নিয়ে এসেছিল তাকে শুধালো, কাকে খুঁজছিস?

আবুকে। উনি ওর বোন।

মেয়েটি তখন হাতের পাউরুটি পিরিচে রেখে রাণীর মতো এগিয়ে এলো তার কাছে। বীথি মুগ্ধ হলো। এত ভালো লাগল, চোখ ভরা খুশি নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। মেয়েটি বলল, আবুকে বুঝি খুব দরকার। ওকে কি পাওয়া যাবে? ও আজ বিকেল চারটেয় আমাদের বাসায় আসবে।

বীথি চকিতে মুখ তুলে তাকালো খুব সরাসরি করে।

আমি ওকে বললে চলবে?

একটু ইতস্তত করে বীথি উত্তর করল, বলবেন হাশেম ভাই এসেছেন আজ। বেশি রাত যেন না করে।

বলে বেরিয়ে আসে বীথি। কেন যেন মনটা খুব ভার হয়ে গেছে। কারণ খুঁজে পায় না। তাড়া দেয় রিকশঅলাকে। হাশেমের কথা মনে পড়ে। আর বকুল। কেমন ছিল দেখতে?

হাশেম ভাই বুঝলো কী করে, মনে মনে তার এত কষ্ট— যে কষ্টের পরিমাপ করতে গিয়ে সে নির্বাক হয়ে গেছে?

সোনালি জমিনে ছোট ছোট লাল ফুল-তোলা শাড়ি। বকুলের কথা ভাবতে গিয়ে, বীথির চোখে এই মেয়েটির মুখ ভেসে উঠতে চায়।

আনমনে হাসলো সে। বকুলকে নিয়ে বড্ড বেশি ভাবছে না কি?

আজ সকাল থেকে আবুর দিনটা কেটেছে যেন নেশা লাগানো এক ঘূর্ণির ভেতর দিয়ে। বীথির সেই অমন মাথা নাড়া, কিছুতেই রিহার্সেলে আসতে রাজি না হওয়া, মনটাকে একেবারে মৃত করে রেখেছিল।

বাসা থেকে বেরিয়ে সোজা ইউনিভার্সিটি এসেছিল আবু। এত সকালে এসে কোন দরকার ছিল না, তবু। এসে গুম হয়ে বসে রইলো মধুর দোকানে। তারপর যখন দেখল বিলকিসকে, উঠে দাঁড়াল তার সংগে দেখা করবার জন্যে।

লাইব্রেরীতে যাবে বলে আজ একটু ভোরে ভোরে এসেছিল বিলকিস। প্রচুর দিন কিস্সু পড়াশোনা হয়নি, মেলা বই, মেলা টিউটোরিয়াল পড়ে আছে। সেগুলো সারতে হবে। আবুকে দেখে বিস্মিত হলো সে।

শুধালো, কী ব্যাপার ?

কিছু না। কিছু না।

চলে যাচ্ছিল আবু। বুঝল বিলকিস। বলল, কথা বলবেন ? বাসায় আসুন না। একদিনও তো আসেন নি। আজ চারটের দিকে ?

আচ্ছা।

চলি এখন। আজ আমি ভালো ছাত্রী।

বলে বিদ্যুত হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে চলে গেছে বিলকিস।

আজ বিকেলে এই প্রথম বিলকিস আবুকে ডেকেছে তার বাসায়। কিন্তু এ নিয়ে এত ভাববার, মন এত প্রস্তুত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবার কী কারণ থাকতে পারে, শাদা চোখে তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

যতই এগিয়ে এলো ঘড়ির কাঁটা বিকেল চারটের দিকে, ততই অস্থিরতা বেড়ে উঠলো আবুর। এমন হলো যে, বেলা বারোটা না পেরোতেই তাকে বেরিয়ে পড়তে হলো সবার সঙ্গ ছেড়ে, ইউনিভার্সিটি ছেড়ে, এমনকি একটা জরুরি টিউটোরিয়াল ক্লাশ পালিয়ে। দুপুরের রোদের মধ্যে খুব লম্বা করে হাঁটবার একটা প্রেরণা পেল। যেন এতকাল যার জন্যে প্রতীক্ষা তাকে হাতের কাছে পেয়ে পালাতে চায় আবু।

কিন্তু বিলকিস তো এমন কিছু রত্নমানিক আজ তাকে প্রতিজ্ঞা করেনি। ওই একটা দোষ আবুর। বিলকিসকে কিছুতেই সে যেন সহজ চোখে দেখতে পারে না।

বিলকিস হয়ত জিগ্যেস করল, কী কেমন আছেন ?

ভালো।

কথাটা বলেই তার ভারী সাধ হয় বিলকিসের কাঁধ আলতো হাতে স্পর্শ করে, চোখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করে, আর তুমি ?

কিন্তু বলা হয় না। বিলকিসের সামনে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে সে মনে মনে প্রশ্নোত্তরের সম্পূর্ণ একটা খসড়া দেখতে পায়। যেন শুনতে পায় বিলকিস বলছে, আমিও ভালো।

তারপর সে কল্পনা করে, বিলকিস একটা নীরব মুহূর্ত যেতে দিয়ে, ব্যথায় নীল হয়ে বলছে, ভালো আছি। কিন্তু শরীরের ভালো লাগা নিয়ে আমার গা জ্বালা করে, আবু। মন আমার ভরে উঠবে কবে বলতে পারো ?

এ সব কিছুই হয় না। একটু পর আবু সত্যি সত্যি যে প্রশ্নটা করতে পারে তা হচ্ছে, আপনি কেমন আছেন ?

প্রশ্নটা উচ্চারণ করতে গিয়ে কণ্ঠে বারোয়ারি সুর ছাড়া আর কিছুই আনা সম্ভব হয় না। অতি মাত্রায় পোষাকী, সযত্নে বাঁচিয়ে চলা একটা দূর উচ্চারণ।

এই দ্বিধা নিয়ে, এই কিছু বলতে না পারা নিয়ে নিজেকে একেকদিন যাচ্ছে তাই বলে গাল দিয়েছে আবু। সে তিরস্কারের এক ভগ্নাংশও অন্য কাউকে করা হলে রক্তপাত হতে পারত। একেকদিন আবুর ইচ্ছে হয়েছে, নিজের আঙুল দাঁত কামড়ে রক্ত বার করে ফেলে।

একদিন খুব জেদ হয়ে গিয়েছিল আবুর। আজ সে বিলকিসকে নিয়ে যা হোক একটা কিছু করে বসবেই। হাতের তাস সোজা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বলবে, আমি তোমাকে ভালবাসি। এখন তুমি কী করবে বলো?

দিনটা ছিল ছুটির দিন।

বাথরুমে গিয়ে বালতি বালতি পানি ঢেলে নেয়ে ওঠে আবু। হাতের আঙুল চুপসে শাদা হয়ে যায়। তখন বেরিয়ে আসে। অস্থির পায়ে হাঁটতে থাকে বারান্দায়। মাকে দেখা যায়। বীথি পাশ দিয়ে চলে যায়। তবু কারো দিকে দৃষ্টি পড়ে না তার। হাঁটতে থাকে। বাগানে এসে বসে। আবার ঘরে যায়। এমনি করে অবশেষে একসময়ে বেরিয়ে আসে। তক্ষুনি রিকশা পাওয়া যায় না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আবুকে। অনেকক্ষণ মানে দু'মিনিট। সেই দু'মিনিটে বিশ্বের রিকশাঅলা মনে মনে তার অভিসম্পাত কুড়িয়েছে।

কিন্তু রিকশা পেয়েও, অর্ধেকটা পথ এসেও, বিলকিসের কাছে যাওয়া হয়নি সেদিন।

একটা রেস্তোরাঁয় বসে খুব দামি ঠাণ্ডা পানীয়ের ফরমাস করেছে। মনে মনে বলেছে, না গিয়ে ভালোই করেছি। বিলকিস যদি চটে যেত, তাহলে চিরদিনের মতো আমার কাছে ওর দুয়ার বন্ধ হয়ে যেত। সেটা তো আরো মর্মান্তিক। তার চেয়ে এই ভালো।

রেস্তোরাঁ সোফায় গা এলিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, আরেকদিন যাবো। মেলে ধরবো আমার দু'হাত। বলব— দাও, আমাকে দাও।

কিন্তু এ প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করা হয়ে ওঠে না। মনের ভেতরে কেবলি সে ফুঁসতে থাকে অক্ষমতার জ্বালায়।

ইউনিভার্সিটির ভিড়ের ভেতরে চোখে পড়ে বিলকিসের মুখ। কিংবা দূর থেকে তার চলে যাওয়ার তরংগ। কিংবা হাসি, অন্য কারো জন্যে অন্য কোন মুহূর্তে। চকিত হতে হয় বিলকিসের কণ্ঠস্বরে। কোন দিন বাঁ হাত মুক্ত রেখে ডান হাতে বই খাতা কোলেব কাছে ধরে মাটির দিকে চিবুক নামিয়ে চলে যায় বিলকিস। বিলকিসের একটা শাড়ি শাদা, একটা ময়ূর নীল, একটা সমুদ্র-নীল, একটা আকাশ নীল, একটা শুধু নীলের আভাস, একটা সোনালি জমিনে ছোট ছোট লাল ফুল তোলা, আর একটা সবুজ-ছায়া-ছায়া পাতায় পাতায় আচ্ছন্ন। সিনেমা হলে একদিন অন্ধকারে সমুখের কাঁধ চেনা মনে হয়— আলো জ্বললে বুকে কাঁপন ওঠে— বিলকিস। নীলখেত ব্যারাকের রেলক্রসিং-এ মোটর বাঁধা পড়েছে; নীল রং কন্‌সালের জানালায় বিলকিসকে দেখা যায় বই ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে হাই তুলছে। ইউনিভার্সিটিতে সাহিত্য সভায় বিলকিস একটা সরল রেখার মতো দাঁড়িয়ে তুখোড় ইংরেজিতে বক্তৃতা করছে, সমালোচনার ছুরিতে কোণঠাসা করে ফেলছে কোনো আত্মতৃপ্ত, বানানো অনুভূতি সর্বস্ব, খ্যাতিমান তরুণ লেখককে।

একেকটা রূপ যেন বারুদের একেকটা কাঠি। আবুর প্রত্যক্ষ হলেই যেন তীব্র দীপ্তিতে জ্বলে ওঠে। সে আগুনে তখন আর বিলকিসকে দেখা যায় না। আগুনের ভেতর দিয়ে যে বিলকিসকে দেখা যায়, সে আবুর নিজস্ব পৃথিবীতে তারই চেতনার তুলিতে আঁকা।

আর কথা। বিলকিসেব কথাগুলোও যেন হৃদয়ের মধ্যে লাল আগুন ধরাতে জানে।

খুব সাধারণ একটা কথা। বিলকিস হয়ত একদিন বলেছে, আমাদের বাসায় কাল চোর এসেছিল। রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙলে আমার এমনিতেই ভয় করে। যা ভয় করছিল।

কল্পনার ফুল দল মেলতে থাকে। আবু ভাবে, বিলকিসের হঠাৎ ঘুম ভাঙলে ভয় করে। ভয় পেলে কেমন দেখায় বিলকিসকে ? তার যেন মনে হয়, কাল রাতে বিলকিসের সঙ্গে সে শুয়ে ছিলো। চোরের শব্দে ধরমড়িয়ে উঠে বসেছে সে, বিলকিস, আর আবু তাকে জড়িয়ে ধরে বলছে, ভয় কী, ভয় কী, এই তো আমি।

তখন বিলকিসের মুখ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে চুলে। তার ভেতর থেকে পৃথিবীর প্রতীকের মতো মুখটাকে আবিষ্কার করে সে তখন যেন চেপে ধরেছে নিজের মুখের সঙ্গে।

কিংবা হয়ত একদিন কথা হচ্ছিল গেটের কাছে বাড়ি যাবার আগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মাথার 'পরে দেখিয়ে বিলকিস বলল, দেখেছেন গাছগুলো ?

হ্যাঁ, কেন ?

ভারী সুন্দর, না ?

আবু তাকায় আকাশের দিকে। সেখানে সবুজ পাতায় সোনার মতো রোদ পড়ে আছে।

বিলকিস বলে, একেক সময় আমার কী মনে হয় জানেন ? মনে হয়, পাতায় ছাওয়া এই রাস্তাটা যদি কোন দিন না ফুরাতো। মনে করুন না, পৃথিবীর শেষ অবধি এমনি করে চলে গেছে গাছের পর গাছ। নিচে পীচের রাস্তা। না, না, লাল মাটির রাস্তা। লাল মাটিতে ডালের ছায়া পড়েছে। সেই ছায়ায় মানুষ পথ চলছে।

আকাশের দিকে, গাছের দিকে, ছায়ার দিকে তাকিয়ে বিলকিস কথাগুলো বলে। চোখ দিয়ে তাকে আর মন দিয়ে তার কল্পনাকে অনুসরণ করে আবু। মনের ভেতরে তার সাড়া ভাঙতে থাকে যেন।

অনেক অনেক আগে আবু যখন ছোট ছিল, তখন একেক দিন, কী জানি কেন অভিমান হলে মরে যেতে ইচ্ছে করত। কিন্তু মানুষ মরে যায় কী করে ? আট ন' বছরের ছেলেটার তা বোঝার কথা নয়। মনে আছে, তখন অভিমানটা বুকে পুষে আবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত পথে। পথের দু'ধারে ছিল এমনি গাছ আর গাছ। হাঁটতে হাঁটতে পাথরের পথ শেষ হতো। তারপর ধুলো ভাঙা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। ধুলোর ভেতর দিয়ে, গাছের কোল ঘেঁষে, কখনোবা দাঁড়িয়ে পড়ে গাছের গায়ে বেয়ে ওঠা একটা লাল পিঁপড়ে মেরে আবু চলে যেত সেই কোন্ দূরে।

একটু একটু করে আকাশটা মায়ের মুখের মতো হয়ে আসছে। মাথার ওপরে বিরাট আমগাছটায় পাখিদের কাকলি শুনে বাসার সমুখে ছেলেদের কোলাহল মনে পড়ে যাচ্ছে। তখন আবু একটা ছায়ায় দাঁড়িয়ে পা দিয়ে ধুলোয় চক্র আঁকতে থাকে। হয়ত হাটবার ছিল। হাটে যাচ্ছে পশারীর দল। তাদের পেছনে পেছনে শহরে ফিরে এসেছে আবু।

বড় হয়ে যখন মনে পড়েছে এই সব চলে যাওয়ার কথা, তখন আবুর মনে হয়েছে, যেখানে সে চলে যেত আসলে সে জায়গাটা আর এ পৃথিবীতে নেই। সেখানে এখন মৃত্যু ছাড়া আর কিছুতেই ফিরে যেতে পারবে না আবু।

সেই আট ন' বছর বয়সে এমনি করে কতবার মরে গেছে আবু। মরে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে।

বিলকিসের ওই একটা গুণ আবুকে মুগ্ধ করে রাখে। নিজের ভাবনাটাকে সম্পূর্ণ করে, বিশ্লেষণ করে না বলে থামতে জানে না বিলকিস। অন্য কোনো মানুষের ঠোঁটে যে কথাগুলো

শুনে মনে হতে পারত, বানিয়ে বলছে, সেই কথাগুলোই যখন বিলকিস বলে তখন তার পেছনে অন্তরকে অনুভব করা যায়।

বিলকিসের কথা শুনে আবু বলে, তা কি হয় ?

হয় না। হয় না বলেই তো দুঃখ হচ্ছে। যতটুকু হয় না মানুষ মন দিয়ে তা ভরে তুলতে চায় যে।

আবুর তখন ইচ্ছে করে অনেক কথা বলতে। কথা খুঁজে পায় না। চুপ করে থাকে। রিকশা পেলে চলে যায় বিলকিস।

সেদিন রাতে শুয়ে শুয়ে আবু ভাবতে থাকে, বিলকিসের কি কোনদিন অমন মরে যেতে ইচ্ছা করেছে ? হয়ত অনেকদিন আগে বিলকিসও অভিমান করে মরে যাবার জন্যে প্যায়ে পায়ে চলেছে— যে পথে দু'ধারে ছিল ঠাণ্ডা ছায়া মেলানো গাছ। আজ এই গাছগুলো দেখে তার মনেও কি ফিরে ফিরে আসতে চেয়েছিল সেই স্মৃতি ?

মনে মনে বিলকিসের ছোটবেলা সৃষ্টি করতে থাকে আবু। এত বিশদ করে ভাবতে থাকে। যে, এক সময়ে চোখের সমুখে প্রত্যক্ষ করতে পারে ছোট্ট মেয়েটিকে, যার নাম বিলকিস। এমন একদিন দু'দিন নয়, অনেকদিন মনে হয়েছে তার। এমন ক্ষমতা যদি থাকত, যার অলৌকিক বলে সে ফিরে যেতে পারত বিলকিসের শৈশবের পৃথিবীতে, মেলাতে পারত নিজেকে তার সংগে, তার সেই পরিবেশকে করে নিতে পারত নিজের পরিবেশ, তাহলে নতুন সুন্দর জীবন হতো তার। তাহলে ঘর থেকে পা বাড়ালেই দেখা হতো বিলকিসের সংগে। তখন বিলকিসের সংগে পাথরের পথ ভাংগা চলত, বেণি নিয়ে টানাটানি করা যেত, কোঁচড়ভরা বেতফলে ভাগ বসানো যেত তার।

তা হলে অনেক সহজ হয়ে যেত সব কিছু। সহজ হয়ে যত নিজেকে উন্মুক্ত করা। এমন করে দ্বিধায়, সংকোচে, অভিমানে তাকে জ্বলে পুড়ে মরতে হতো না। তাহলে বুক ভরা বিশ্বাস নিয়ে সে বলতে পারত, তোর কি চোখ নেই, বিলকিস ? আমার খোলা দরোজা দিয়ে আয়। তোর জন্যে খুলে রেখেছি যে।

একদিন, এমনি এক ভাবনার চূড়ান্ত চূড়োয় নিজের চোখে হাত রেখেছিল আবু। সেখানে অশ্রু টলটল করবে, উষ্ণ তরল বিকারহীন অশ্রু, এ যেন তার কতকালের জানা।

আজ হঠাৎ ওভাবে ইউনিভার্সিটি ছেড়ে তার বেরিয়ে পড়বার কারণ ছিল। মনের ভাবনাগুলো রীতিমত সশরীর হয়ে মাথার ভেতরে দুপদাপ লাগিয়েছে তখন থেকে।

বিকেল চারটেয় দেখা হবে বিলকিসের সংগে। এখনো অনেক দেরি তার। কিন্তু অলক্ষিতে কোথায় কোন এক ঘড়িতে যেন ইতিমধ্যেই বিকেল চারটে বেজে গেছে।

মাথার 'পরে এখনো খাড়া রোদ। পথ দিয়ে এলোপাথারি চলতে চলতে আবু যেন স্পষ্ট শুনতে পায় বিলকিস তাকে দেখে বলছে, এত দেরি করে এলেন ?

তখন ও উত্তর করছে, দেরি করে যাবো বলেই দেরি করে এলাম। যদি সত্যি দেরি হয়ে থাকে, ক্ষমা করে দিন।

তার কথা শুনে বিলকিস যেন হাসলো।

আবু ভাবতে থাকে, তখন সে বলবে, আপনাদের এখানে এই প্রথম এলাম। ভারী সুন্দর বাসা। আপনাদের নিজের ?

হ্যাঁ।

কিছু ফুলগাছ এনে বাগান করুন।

কে করবে ?

কেন, আপনি ?

আর আমি বাগান করেছি!

বলেই বিলকিস যেন খুব ক্লান্ত এমনি একটা ভঙ্গিতে হাত তুলেই নামিয়ে নেবে। কিন্তু তার চোখ আলোকিত থাকবে এক নামহীন খুশিতে। পরে শুধোবে, আপনার বুঝি বাগান করার শখ ?

বলতে পারবে না আবু। কেবল বলবে, কিছুটা।

কী ফুল করেছেন ? নিয়ে যাবেন একদিন দেখাতে ?

যাবেন ? সত্যি যাবেন ? কবে বলুন।

তাহলে কাল।

বেশ তো।

তারপর কাল বাগান দেখে ফেরার পথে আবু আচমকা বলবে বিলকিসকে, কখনো ভালোবেসেছেন ?

শুনে বিস্মিত হবে বিলকিস। বিস্মিত হয়ে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকবে তার দিকে। তারপর কম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করবে, লাজনম্রা হয়ে, অস্পষ্ট মাথা নেড়ে, না, না।

আমিও না।

তখন বিলকিসের শরীর স্পর্শ করে আবু বলবে, কী জানি কেন, সারাক্ষণ খুব একা মনে হয়। মনে হয়, কোথায় কে যেন ঐ দিগন্তটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে খুব চেনা চেনা লাগছে। অথচ চিনতে পারি না, কাছে যেতে পারি না। বলতে পারেন কেন এমন হয় ?

কী জানি।

তখন বিলকিস সুন্দর একটি স্বর হয়ে উঠবে।

আমি অনুভব করতে পারছি, চোখ ভরে দেখতে পাচ্ছি, আপনি তাকে চিনতে পারছেন না। আপনার মনে তখন খুব ঝড় দিয়েছে। তখন দু'হাত বাড়িয়ে সেই দিগন্তে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে কাছে করছেন। আমি আমার দু'চোখ ভরে দেখতে পাচ্ছি যে।

তার উত্তরে আবু তাকে দু'হাতে জড়িয়ে বলবে, এইতো আমি কাছে করেছি।

হঠাৎ হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে চারটে বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকি। বিলকিসদের বাসায় পৌঁছুতে লাগবে পনেরো মিনিট। চারটে পাঁচে গিয়ে পৌঁছুবে। সেটা হয়ত সময় রক্ষা হলেও শোভন হবে না মোটেই।

চারটে বলেছে বলে চারটেয় পৌঁছুতে হবে ? তাতে করে যেন তার আগ্রহটা ধরা পড়ে যাবে। তার চেয়ে এক রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলো আবু। কিন্তু কী দুর্ভাগ্যক্রমে সে ঢুকেছিল এই দোকানটায়। তার পুরনো বন্ধু কামাল বসে ছিল একগাদা ফাইল টাইল চায়ের ছড়ানো সরঞ্জাম আর সিগারেটের খোলা প্যাকেট নিয়ে। স্কুল ফাইন্যাল থেকে আই, এ, অবধি একসাথে পড়ে আবু এলো ইউনিভার্সিটিতে আর কামাল গিয়েছিল তার বাপের ব্যবসায়।

কামাল দু'হাত তুলে হৈচৈ একটা কাণ্ড বাধিয়ে বলল, আরে এসো এসো। কতকাল পরে দেখা।

তাকে দেখে, তার কথা শুনে, আবু খুশি হতে পারল না। একটা বিদ্‌ঘুটে পাথর এসে যেন তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। তবু চেষ্টা করে যতটা প্রীত হওয়া গেল সেটাই যথেষ্ট হলো কামালের জন্যে। কামাল খুশি হয়ে টেবিল চাপড়ে বলল, চা খাও।

ঘড়ির দিকে তাকাল আবু। তাকিয়ে একটু উসখুস করে উঠল।

আর কিছু ?

অন্যদিকে ইতস্তত দৃষ্টি করছিল আবু। এখন যেন মনে হচ্ছে, বিলকিসের কাছে তার পৌছুতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। চোখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, না, না।

খাও না কিছু।

কামাল তার হাতে ঠেলা দিয়ে কথাটা বলল; বড্ড ভালগার মনে হলো তখন তাকে। আবারো শুধালো, চপ ?

না।

কাটলেট ?

না।

তো কী খাবে ?

আবু যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। কিছু বুঝতে না পেরে কামালেরই খোলা প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ধরালো। সিগারেট সে বড় একটা খায় না। এখন মনে হচ্ছে এর চেয়ে ভালো কিছু নেই। এতে করে দুরন্ত আঙুলগুলো তবু ঠাণ্ডা থাকছে। কামাল আবার জিগ্যেস করল. কেক ? পেশট্রি ?

বললাম তো শুধু চা। তা নয়, তুমি একেবারে পুরো মেনু মুখস্ত বলতে লেগেছ।

তার কথা শুনে হা হা করে হাসল কামাল। হাসতে গিয়ে তাব রোগা মুখটার অনুপাতে অসম্ভব বড় একটা হাঁ সৃষ্টি হলো। বলল, না হয় বিজনেসে লসই খাচ্ছি, তাই বলে বন্ধু বান্ধবকে খুশি করবার মতো অবস্থা নেই ? এই দ্যাখোনা, জুন থেকে ডিসেম্বর, পাক্‌কা ছ'টি মাস—আবু বাধা দিল।

কামাল, এক্ষুনি যেতে হবে এক জায়গায়। একেবারে ভুলে গেছি। খুব দরকার।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল আবু। কামালকে এক লহমার সুযোগ দিল না। নইলে ঝাড়া দু'ঘন্টা তার বকবকানি শুনতে হতো।

একেবারে মনেই ছিল না। আরেকদিন তোমার চা পেশট্রি চপ কাটলেট যা আছে সব খাওয়া যাবে। চলি।

বাইরে বেরিয়ে আবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বেরিয়ে আসবার মুখে জোর করে হাসতেও হয়েছিল একবার। বাইরে এসে হঠাৎ সে অনুভব করে পেশীতে হাসিটা তখনো আঁকড়ে আছে।

বিরক্ত হয়ে মুহূর্তে সেটাকে নিশ্চিহ্ন করে আবু রিকশা নেয়।

বিলকিসদের বাসায় যখন পৌছুলো তখন প্রায় সাড়ে চারটে। মাত্র আধঘণ্টা। দেরিটা এখনো ভদ্রতার সীমারেখা পেরিয়ে যায়নি দেখে আবু মনে মনে খুশিই হলো।

একবার ইতস্তত করল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে। নীল বার্ণিশ করা কাঠের দরোজা। হঠাৎ মনের মধ্যে ভীষণ একটা টান অনুভব করল আবু। ফিরে যাবে? যেন দেখা না হলেই পরম একটা স্বস্তি পাওয়া যাবে, কিন্তু ফিরে যাওয়াও যায় না আর। কেউ দেখলে বলবে কী, লোকটা দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে না ডেকেই চলে যাচ্ছে। কত কী ভাবতে পারে ঐ তো মোড়ে দাঁড়ানো লোকটাই। কিংবা বিলকিস যদি দেখে ফেলে দোতলা থেকে?

প্রায় সংগে সংগে বছর দশেকের একটা মেয়ে দৌড়ে এসে দরোজা খুলে প্রজাপতির মতো জিগ্যেস করল, কাকে চান?

আন্দাজ করে আবু বলল, তোমার আপাকে।

মেয়েটি শরীর দুলিয়ে বলল, নেই তো। আপনার একটা চিঠি আছে। এখন চারটে বাজে না?

হ্যাঁ।

আবুর মাথার মধ্যে সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। বোকার মতো সে জিগ্যেস করল, নেই?

উহুঁ। বাইরে গেছে। দাঁড়ান, যাবেন না।

চিঠি এনে দিল মেয়েটি। সে চিঠিতে লেখা আছে—

আপনাদের বাসা থেকে কে একজন এসে ইউনিভার্সিটিতে খুঁজছিল আপনাকে। তক্ষুণি যেতে বলেছিল। বাসায় কে যেন এসেছেন বলল। নামটা মনে করতে পারছি না। বারবার বলে গেছে দেরি করবেন না যেন। ভালোই হলো, আমাকেও হঠাৎ একটা দরকারে বেরুতে হতো। তাতে না জমত আলাপ, মাঝ থেকে শুধু শুধু কষ্ট করতেন। কিছু মনে করবেন না। আরেক দিন আসবেন?

এক মুহূর্ত কি ভাবল আবু। চিঠিটার মর্ম ভালো করে বুঝলোও না। আগাগোড়াই যেন বিলকিসের ব্যঙ্গ—তাকে ডাকা, ডেকে না থাকা। হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠল সে। খাতা খুলে লিখল— আমি না এলে কারো কিছু এসে যাবে না আশা করি। আরেকটা তারিখ নাইবা নিলেন।

পাতাটা ছিঁড়ে ভাঁজ করে মেয়েটোকে দিয়ে বলল, তোমার আপাকে চিঠিটা দিও।

ডাক্তার এসে চলে গেছে। বাবা এসেছেন, বড় চাচা এসেছেন, আবু এসেছে সবাই এসেছে। মাহবুব জরুরি কাজে ব্যস্ত, পরে আসবে জানিয়েছে। যেন হাট লেগেছে আজ মরিয়মের বাড়িতে।

কিন্তু হাশেমকে কি সুস্থির রাখা যায়?

থেকে থেকেই বিছানা ছেড়ে দাঁড়াচ্ছে।। কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে রক্তচোখে লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করছে। তার রকম দেখে না কাছে আসা যায়, না কিছু বলা যায়।

বিছানায় কি সহজে আসতে চেয়েছিল? সেই বাইরের ঘরেই গোঁ ধরে বসে থাকবে। কেউ তাকে একচুল নড়াতে পারেনি। ইতিমধ্যে জ্বরের ঘোরে একবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, সেই তখন ধরাধরি করে নিয়ে আসা হয়েছিল ওপরের ঘরে।

জ্ঞান ফিরেছে মাত্র কিছুক্ষণ আগে। সাহস করে বড় চাচা খোরশেদ চৌধুরী স্মিত মুখে এগিয়ে আসেন। হাশেম তাঁর দিকে দৃষ্টিবাণ হানে, যেন এই লোকটাকে চিনতে খুব কষ্ট হচ্ছে তার।

কিছুতেই মনে পড়ছে না কোথায় দেখেছে। খোরশেদ চৌধুরী বললেন, তোমরা সবাই যাও তো এ ঘর থেকে। দেখি আমি ওকে বোঝাতে পারি কি না।

তারপর হাশেমের কাঁধে হাত রেখে ডাকলেন, এসো।

কী হলো হাশেমের, মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনুসরণ করল তাঁকে। গিয়ে সুবোধ ছেলের মতো বিছানায় শুয়ে পড়ল।

খুব কষ্ট হচ্ছে, বাবা ?

না। নাতো।

আমাকে চিনতে পারছিস ?

হ্যাঁ।

কে আমি বলতো ?

বড় চাচা।

ছেলেমানুষের মতো টান তুলে উচ্চারণ করে হাশেম। শুনে সবাই অবাক হয়ে যায়। যাকে কিছুতেই ধরে রাখা যাচ্ছিল না, সে হঠাৎ এত শান্ত হয়ে গেল কী করে ?

খোরশেদ চৌধুরী তখন হাশেমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, একটু চুপ করে থাকো। কেমন ? নইলে সেরে উঠবে কী করে ?

হাশেম তক্ষুনি চোখ বুঁজে তাঁর কথা পালন করলো।

খোরশেদ চৌধুরী মুখ ফিরিয়ে ভাইকে বললেন, দেখেছ মুরশেদ, এখনো আমার কথা ভোলেননি। পাগল হলে কী হবে, ঠিক মনে আছে।

তারপর হাশেমকে দেখিয়ে মরিয়মকে বললেন, ছোটবেলায় পুরো একটা বছর আমার কাছে ছিল যে। আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমোত। এই ছোট্ট এতটুকুন। শোধও ছিল না, বোধও ছিল না। তারপরে-না এলো মুরশেদ রেঙ্গুন থেকে।

হাশেম হবার পরপরই চাকুরি সূত্রে মুরশেদ চৌধুরী এক বছরের জন্যে রেঙ্গুন গিয়েছিলেন। এক বাসাতেই থাকতেন তখন তিন ভাই। খোরশেদ চৌধুরী তখন, এখনো নিঃসন্তান। হাশেমকে সেই একটা বছর বুকে করে রাখার স্মৃতি তিনি ভুলতে পারেন নি। খোরশেদ চৌধুরীর চোখ সজল হয়ে উঠতে চায় যেন। বিব্রত হয়ে শাদা চুলের ভেতরে হাত চালাতে থাকেন খামোকা। মরিয়মকে বলেন, তোমার ভাগ্য ভালো এমন ছেলে কোলে পেয়েছিলে। কে বলল ও পাগল হয়েছে ? আমি পাগল চিনি না ? যেমন ছেলে তেমনি আছে।

হঠাৎ হাশেম চোখ খুলে বলল, পানি।

তাড়াতাড়ি গেলাশ ভরে পানি এনে দেন মরিয়ম। হাশেম ঢকঢক করে পানিটুকু খেয়ে বিছানা থেকে আবার নেমে যেতে চায়।

খোরশেদ চৌধুরী বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

না, না, কী কচ্ছিস ?

আহ্।

যেন অসীম বিরক্ত হয়েছে হাশেম বাধা পেয়ে।

ছেড়ে দিন আমাকে। আজ আমার খুব অস্থির লাগছে যে। খালি হাঁটতে ইচ্ছে করছে। কথা বলতে ইচ্ছে করছে। বলুন, কথা বলুন।

বড় চাচার হাত ধরে বিষম ঝাঁকুনি দেয় হাশেম। তারপর উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে থাকে। বলে, ভয় হয়, এই বুঝি সব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু—

জানালার কাছে গিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হাশেম। মাথা নত করে কী যেন ভাবল। কিস্সু বুঝতে পারেন না মুরশেদ চৌধুরী। বাড়ির বড় ছেলে অমন করে চলে যাওয়াতে আঘাত তিনি কম পান নি। এবার ছেলেটাকে সুস্থ মানুষের মতো দাঁড়াতে দেখে গলা খাঁকারি দিয়ে শুধোলেন, এতকাল ছিলি কোথায়, হাশেম ?

স্বামীর প্রশ্নে মরিয়মও এগিয়ে আসেন। কাছে এসে তিনিও জিগ্যেস করেন, হ্যাঁরে, হঠাৎ চলে গেলি, একবার বাপ-মার কথা মনেও পড়ল না ? চলে গেলি কেন, হাশেম ? কী তোকে দিতে পারিনি, বলবি না ? তোর বাবার কান্না শুনে পথের মানুষ দাঁড়িয়ে পড়ত, আর তোর কানে গিয়ে পৌঁছোয় নি ?

খোরশেদ চৌধুরী ছোট্ট একটা ধমক দিয়ে ওঠেন, এ সব কথা এখন থাক।

হাশেম আবার পায়চারি করতে শুরু করল। তারপর ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে, বুকের কাছে দু'পা টেনে নিয়ে একটা বাঁধা কবুতরের মতো ম্লান হয়ে রইল। বলল, কম্বলটা দাও। কম্বলটা হাতে পেয়ে ভালো করে গায়ে জড়াতে জড়াতে অপরূপ পরিতৃপ্ত দেখালো তাকে। বলল, একবার এক গাঁয়ের মাঝ দিয়ে যাচ্ছিলাম। পথে দাঁড়িয়ে দেখলাম, বিরাট এক পুকুর। সেই এ মাথা থেকে ও মাথা। শান বাঁধানো ঘাট। ঘাটে দাঁড়িয়ে শত শত মানুষ পাগলের মতো পানি তুলে ফেলছে।

তার কথা শুনে ঘরের ভেতরে সবাই চুপ হয়ে গেছে। হাশেমের কণ্ঠ যেন কোন এক সুদূরের দেশ থেকে ভেসে আসছে। এই যে ছেলেটা, যাকে তাঁরা দেখেছেন জন্ম থেকে, তার ভেতরে আজ সম্পূর্ণ অজানা এক পৃথিবীর অস্তিত্ব টের পেয়ে বড় চাচা, মা, সবাই বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছেন। যেন তাঁদের নতুন চোখ খুলে যাচ্ছে। হাশেম বলে চলেছে, আমি দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলাম, হ্যাঁগো ভাল মানুষ, এখানে আজ কিসের উদ্যোগ ? একটা লোক, তামার মত তার গায়ের বরণ, খালি গা, মাথায় লাল গামছা বাঁধা। সে বলল, খাঁ সাহেবের হুকুম হয়েছে পুকুর থেকে তামাম পানি তুলে ফেলতে হবে। আমি শুধোলাম, কেন ? তখন আরেকটা লোক জবাব করলো, এ পুকুর যে ফি বছর মানুষ খায়। সাঁতার দিয়ে মাঝপুকুরে গেলে আর ফিরে আসে না, তাই এবার খাঁ সাহেবের হুকুম হয়েছে পুকুর থেকে পানি তুলে দেখবেন তলায় কী আছে ? হাশেম মৃদু হাসলো এইখানে থেমে। কাণ্ড দ্যাখো। মানুষটা কী ক্ষ্যাপা। বলে কী না, পুকুর শুকিয়ে দেখবে কোন রাক্ষস হাঁ মেলে আছে তার পাতালে। সেদিন সারাটা দিন দাঁড়িয়ে ছিলাম কাঠফাটা রোদ্দুরে। চারধারের ফেটে যাওয়া মাঠে নহর বইলো। তবু যদি এক আঙ্গুল পানি কমলো পুকুরের। যত তুলে ফেলছে, কল্ কল্ কল্ কল্ করে পানি তত বাড়ছেই। আমার মনে হচ্ছিল যেন আমার রক্ত ওরা নিঙড়ে নিঙড়ে ছেঁকে তুলছে।

বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে হাশেম। প্রথমে মনে হয়, চোখ বুঁজে ভাবছে, দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করছে। কিন্তু না, ঘুম এসেছে তার। একটানা কথা বলতে বলতে অবশ হয়ে গেছে স্নায়ু। তাকে তুলে এনে শুইয়ে দেয়া হলো বিছানায়। মরিয়ম গিয়ে বসলেন তার শিয়রে।

বারান্দায় এসে খোরশেদ চৌধুরী ভাইকে বললেন, হ্যাঁ ভালো কথা মুরশেদ, গেল কাল ছোটমিয়া চিঠি লিখেছে বীথির ব্যাপারে। তোমাকে একটা কথা বলা দরকার।

খোরশেদ চৌধুরীকে তখন বড় বিব্রত দেখাচ্ছিল। কাল চিঠি পেয়ে অবধি মনে স্বস্তি পাচ্ছেন না, বুঝতেও পারছেন না কী করে কথাটা পড়বেন। মুরশেদ চৌধুরী উদ্বিগ্ন হয়ে ভাইয়ের দিকে তাকালেন। বীথির নাম শুনে বুঝতেই পারলেন না তার আবার কি হতে পারে। বিহ্বল হয়ে বললেন, বীথি, বীথির কী ?

কিছু না।

খোরশেদ চৌধুরী ভাইকে ভরসা দেয়ার মত করে হাসেন। আমতা আমতা করে বলেন, ইয়ে, লিখেছে যে, আবুর সংগে বীথির মেলামেশাটা কেমন যেন দেখাচ্ছে। মানে, তুমি বীথিকে আমার ওখানে পাঠিয়ে দাও না ?

ভেতর থেকে কথাটা শুনতে পেয়েছিলেন মরিয়ম। মাথায় ঘোমটা তুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে চোখ নত কবলেন খোরশেদ চৌধুরী।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাগানে নির্মম হাতে ফুল ছিঁড়ছিল বীথি। বাসার বাঁ পাশে অনেকদিন থেকে অনেকটা খালি জায়গা পড়ে ছিল। আবু সেখানে বাগান করেছে। এক কোণে দুটো বুড়ো বাতাবি নেবুর গাছ। তারপরেই দেয়াল। ওপারে রাস্তা। বীথির পরনে ছিল তাঁতের গাঢ় সবুজ শাড়ি। অন্ধকারে দূর থেকে ভালো করে ঠাওর হয় না। থোকা থোকা অন্ধকারের ভেতর থেকে শাদা শাদা ফুল আর কিসের তন্দ্রা-সৌরভ যেন জ্যোতি হয় বেরুচ্ছে। চারদিকের ব্যস্ততা আর কোলাহল যেন দেয়ালের ওপারে ঠেকিয়ে রেখেছে এক মায়াবিনী হাত। আবু তাকে ওপরতলা নিচতলা খুঁজে খুঁজে হয়রান হলো।

মাকে জিগ্যেস করল, মা বীথি কই ?

মরিয়ম বিরক্ত হলেন।

এই সন্ধ্যেয় বীথি বীথি করে চ্যাঁচাস নে তো।

নামাজ পড়ে রান্না ঘরে যাচ্ছিলেন তিনি, তাঁর পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে আবু বলল, ছেলে ফিরে এসে দেখি তোমার মেজাজটাই বদলে গেছে।

আজ মায়ের অপ্রসন্ন মুখ দেখে আবুর বিস্ময় যেন বাঁধ মানছিল না। মরিয়ম বললেন, মাতামাতি করিস বলেই তো মেজাজ করতে হয়।

কেন ? আজ নতুন নাকি ?

নতুন না হলেও বীথি বড় হয়েছে।

কোনোদিন যে— ছেলের ওপর রাগ করেননি তাকে বকতে গিয়ে চোখে পানি এসে যায়। তার ওপর ভরসন্ধ্যে। বুক কাঁপতে থাকে মরিয়মের। কিছু না বলে অশ্রু চেপে চলে যান। বোকার মত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আবু।

অবশেষে বীথিকে পাওয়া গেল বাগানে। সে তখন বেলি গাছটার সর্বনাশ করেছে সবকটা ফুল ছিঁড়ে। একটা ডাল করুণ হয়ে কাঁপছে তার হাতের মুঠোয়। আবু তার পেছনে দাঁড়িয়ে চুপ করে রইলো খানিক। বীথিকে ডাকতে গিয়ে কেমন সংকোচ হচ্ছে তার এই প্রথম। আর বুঝতে পারছে না বীথির কাছে গাছটা কী অপরাধ করেছিল। ইতস্তত করে সে অস্ফুট কণ্ঠে ডাকল, শোন।

শুনল, বীথিমুখ ফেরাল না। তার শরীরে একটা অস্পষ্ট সাড়া জাগল শুধু। হাতের ডালটা ছাড়া পেয়ে লাফিয়ে ফিরে গেল। আবু জিগ্যেস করল, এখানে কী করছিস ?

বীথি জবাব দিল না।

পায়ের কাছে ফুলের শাদা শাদা অংশ ছড়িয়ে আছে। বেলি গাছটা আবুর খুব প্রিয়। কিন্তু আবু কণ্ঠ নামিয়ে মমতা করে বলল, অমন করে সব ছিঁড়লি কেন ? আমি তোকে সারাটা বাড়ি খুঁজে খুঁজে পাচ্ছি না। কিরে ?

হঠাৎ আবুর মনে হলো তার সামনে বীথির বদলে বিলকিস পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। বীথিকে খুঁজতে এসে যেন বিলকিসকে আবিষ্কার করে ফেলেছে সে তার বাগানে। বলল, বুঝতে পারছি আজ তোরও মেজাজ হয়েছে।

মোটেও না।

এই এতক্ষণ পর একটা কথা উচ্চারণ করল বীথি। তারপর সরে এসে সিঁড়ির একটা ধাপে বসে রইলো।

তখন আবু এসে তার নিচের ধাপে বসলো। তার দিকে তাকালো না। জিগ্যেস করল, হাশেম ভাইকে দেখলি ?

হ্যাঁ।

আমাকে দেখে বুঝলি, বীথি, আমার চোখের দিকে কেমন করে যেন তাকিয়ে রইলো।

বীথির দিকে তাকালো আবু। কেঁপে উঠলো বীথির বুক।

ও-কী, কথা বলছিস না যে ? কথা বলবি না তো মর।

তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে, যেন বীথিকে সে মোটেই উদ্দেশ করছে না, এমনি করে বলে, মা-ও খুব মেজাজ দেখালেন আজ। সারা বাড়িটার যে কী হয়েছে তোরাই বুঝিস। তুই আমার শত্রু, বুঝলি ?

বীথি চমকে চোখ ফিরিয়ে বলল, কেন, চাচিমা কী বলেছেন ?

কিছু না। তুই শুনে কী করবি ?

আবু আর বসে থাকতে পারল না। চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। আবার তক্ষুনি চলে না গিয়ে বলল, আচ্ছা, আমাকে সত্যি করে বলতো কী হয়েছে ?

বীথি বুঝতে পারে না, ভয় হয়, আবু বুঝি তার অন্তর পড়ে ফেলেছে। নিজেকে তাই পাথর করে রাখে সে। কী একটা বলতে গিয়ে বলতে পারে না। কোনোরকমে পায়ের কড়ে আঙুলে সিঁড়ির একটা ভাঙ্গা কোণ আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। আবু বলে, বুঝতে পেরেছি, আজ তুই আমাকে পড়তে দিবিনে, খেতে দিবিনে, এমনি করে জ্বালিয়ে মারবি তুই।

মানুষের একেক সময় কী হয়, শখের পুতুল নিজের হাতে আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলে। কণ্ঠে তিক্ততা এনে বীথি বলে, কেন, আমি তোমার কী করেছি ?

কী করিসনি বল ?

আবু আবার সিঁড়ির ধাপে বসে। বসে যোগ করে, তুই কি মনে করেছিস, অমন মেজাজ করে থাকলে আমি আজ খেতে পারব ? না, দু'দণ্ড বই খুলে বসতে পারবো ?

**বীথি হঠাৎ পরিপূর্ণ চোখ তুলে তাকাল আবুর দিকে। আত্মার ভেতরে চুর চুর হয়ে যেতে যেতে সে উচ্চারণ করল, আমাকে তুমি কেন জ্বালাতে আসো, আবু ভাই?**

বুকের ভেতরটা জ্বলতে থাকে বীথির। বাতি নিবিয়ে চুপচাপ অন্ধকারে শুয়ে থাকে। মনে মনে একা হয়ে যায় সবার কাছ থেকে। মাথার ভেতরে ফিরে আসে আবার সেই ভাবনা—হাশেম ভাই কী করে জানলেন, আমি কষ্ট পাই? যেন কষ্টটার কথা কেউ বলে দেয়াতেই কষ্টের মাত্রা গেছে বেড়ে। একদিন, অনেকদিন আগে আবু তাকে বলেছিল, বীথি, আমার সংগে বেরুবি?

বীথি থাকত চুপচাপ। বড় একটা কারো সামনে বেরুতো না, কোথাও যেত না। সে যে এ বাড়িরই একজন একেক সময় যেন টের পাওয়া যেত না তাও। আর আবুর সংগে তার কথা হতো একেবারেই কম। সেদিন আবুর এ প্রস্তাব শুনে সে থতমত খেয়ে যায়। পরক্ষণে আবছা খুশি লাগে। বেরিয়েছিল আবুর সংগে। আবুর যেন ঘোর লেগেছিল সেদিন। পকেটে যা পয়সা ছিল সব খরচ করেছে রিক্‌শয় রেস্তোরাঁয় বীথিকে নিয়ে। হাতে যা সময় ছিল সব উড়িয়ে দিয়েছে অস্থির হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে। কোনখানেই দু'দণ্ডের বেশি তার মন টেকেনি। বিকেল থেকে শুরু করে সন্ধ্যের সেই অনেক পর অবধি এই কাণ্ড। বীথির যে কী নামহীন আনন্দ হচ্ছিল সেদিন। কিন্তু বাইরে তার কোন জানান দেয়নি। লজ্জা করেছে। বুকের ভেতর তরংগ উঠেছে।

সন্ধ্যের পর আবু বলল, চল, কোথাও গিয়ে বসিগে।

না, না।

বীথির ভয় করে। আবু পরামর্শ দেয়, তাহলে হাঁটি কিছুক্ষণ?

হাঁটতে হাঁটতে রেসকোর্সের কাছে এসে পড়ে ওরা। পথ ছেড়ে পাড়ি দিতে থাকে বিশাল ময়দান। আবু বলে, তুই খুব একা, নারে বীথি? সারাদিন বই আর কলেজ। একেক সময় আমার খুব রাগ হয় তোর ওপর।

বারে, পড়াশোনা করব না?

করবি তো। তাই বলে অন্ধ হয়ে থাকবি?

বীথি বুঝতেই পারে না আবুর আজ কী হয়েছে। তাকে একেবারে অন্যমানুষ মনে হচ্ছে। অন্ধ হয়ে থাকার অর্থটাও কিছুতেই বোধগম্য হয় না। সেটা টের পেয়েই আবু যেন খেদ করে বলতে থাকে, মানুষ তো অন্ধই। অন্ধ নইলে তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয়? বলতে হয়, এইতো এখানে। কিরে, চুপ করে আছিস যে? তোর খারাপ লাগছে?

নাতো।

তবে?

আমি কী বলব?

আবু যেন আপন মনেই আবর্তের মতো ঘুরতে থাকে। প্রথমে একটু চটে যায়। বলে, তোকে কিছু বলতে বলেছি নাকি?

পরে মমতায় ভিজিয়ে আনে কণ্ঠ।

— হ্যাঁরে, এত যে বকছি, তুই রাগ করছিস না ? তোকে যেন মানাচ্ছে না মোটে। তুই আমাকে চটে উঠছিস না কেন ? আমার বিচ্ছিরি লাগছে।

বীথি মৃদু গলায় বলে, আমি রাগ করতে জানি না।

ঐটুকু বলতে গিয়েই যেন হাঁপ ধরে যায়। গা কেঁপে ওঠে। আবু ওর হাতটাকে অন্যমনস্কভাবে মুঠোর ভেতরে নিয়ে পথ চলতে শুরু করেছে। যেন খুব তন্ময় হয়ে কী ভাবছে।

অনেকক্ষণ পরে সে বলে, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অনেক কষ্ট, বীথি। তুই যা ভালো বুঝবি, করতে পারবি নে। বাইরে থেকে যে কেউ বাধা দেয়, তাও না। মনে হয়, মানুষগুলো সব নিজের শত্রু। জানিস বীথি, তোকে দেখে যেন বুঝতে পারি— আমি বেঁচে আছি।

বীথির মনে ছোটখাটো একটা ঝড় ওঠে। আবুর জন্যে কেমন বেপরোয়া টান পড়ে বুকের ভেতরে। বলে, বাসায় চলো।

তোর খারাপ লাগছে ?

বীথি উত্তর দেয় না। আবু হেসে বলে, জানি তুই রাগ করেছিস। তোকে এসব কথা বলতে গেলাম কেন ? কী জানি কেন বললাম। আমাকে খুব অমানুষ অভদ্র বলে মনে হচ্ছে তোর, না ?

বীথি বলতে চায়, নাতো। কিন্তু পারে না। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটবার পর আবু যেন হঠাৎ রুখে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে, তাহলে তুই আমার সামনে এসে দাঁড়ালি কেন, বীথি ? আমাকেও কি পাগল বানিয়ে ঘর ছাড়া করতে চাস ?

কী বলছ, আবু ভাই!

বীথি আর্তনাদ করে ওঠে।

ঠিকই বলছি। আমি তোর কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়েছি, না দাঁড়াব যে তুই অমন রানীর মতো মুখ বুঁজে থাকবি ?

তুমি ঘর ছাড়বে কেন ?

কী জানি! বড়চাচা বলেন, হাশেম ভাই সাধু হয়ে গেছে। আসল ব্যাপারটা তো জানি আমি।

বীথির কৌতূহল হয়। এসে অবধি সে হাশেমের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কথাই শুনছে। কেন গেছে, ভালো করে কেউ তাকে বলতে পারেনি। বীথি সব ভুলে গিয়ে শুধোয়, কী হয়েছিল ?

আবু মুখ ফিরিয়ে বলে, কাউকে বলিস না যেন। হাশেম ভাই ভালোবাসতো। ভালোবেসে ঘর ছেড়েছে। তোর বিশ্বাস হয় না ?

বুকের ভেতরটা বরফ হয়ে যায় বীথির। আবু বলে, এক একজন অমন করেই ভালবাসে, বীথি। কোন বাঁধ মানে না, যুক্তি বোঝে না। পাথরের সংগে আত্মাব বিয়ে দিয়ে দেয় ওরা। — নে, একটা রিকশ ডাকি। বাড়ি চল।

সেদিন বাড়ি ফিরে এসেই মরিয়মের সমুখে পড়ে গেল ওরা দু'জন। আবু চলে গেল ভেতরে। মরিয়ম জিগ্যেস করলেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বীথিকে, কোথায় গিছলি ?

একমুহূর্ত ভাবলো মেয়েটা। বলল, বড় চাচার বাসায়। সেখানে গিয়ে দেখি আবু ভাই। তার কথা শুনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অবাক হলো আবু।

আরেকটা দিনের কথা মনে করতে পারে বীথি।

আবু ইউনিভার্সিটি যাবার আগে গোসল করে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে তার দরোজায় দাঁড়িয়ে বলল, কী করছিস ?

কিছু না।

তোর চিরুণিটা দে, সিঁথি করি। ইস্, চুলগুলো যা বেয়াড়া লম্বা হয়েছে।

বীথি চিরুণি দিয়ে বলে, সেলুনে গেলেই পারো। ভীষণ আলসে আর নোংরা হয়েছ তুমি।

আবু সিঁথি করতে করতে উত্তর দেয়, তাই বুঝি রোজ আমার ঘর সাজিয়ে রাখিস তুই ?

রাখতো বীথি। কিন্তু মিথ্যে করে বলল, বয়ে গেছে। চাচিমা করেন।

আমার কি চোখ নেই ?

আবু হাসতে হাসতে বলেছিল কথাটা। কিন্তু কতখানি যে মোচড় তুলল বীথির বুকে তা যদি আবু জানতো!

আবু চিরুণি রেখে বলল, কাল বিকেলে মনে হলো তুই যেন আমার ঘরে এলি। আমি বার থেকে ফিরে এসে শুয়েছিলাম। তুই টের পেলি কী করে যে ঘুমোচ্ছি ? আমার মুখ দেখছিলি কেন ? কী চুরি করতে এসেছিলি ? আমি যদি তখন খপ্ করে তোর হাত ধরে ফেলতাম।

তোমার কি বুদ্ধি লোপ পেল, আবু ভাই ?

কী জানি।

ঘরে ফিরে এসে ঘুমোচ্ছিল আবু। বিকেল ছ'টা ঘুমোনোর সময় নয়। বীথি তাকে শুয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠেছিল। বুঝি অসুখ করেছে। পা টিপে ঘরে এসে আবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল অনেকক্ষণ। কিছু ঠাওর করতে না পেরে কপালে হাত রেখেছিল। আবু যদি তার তাকিয়ে থাকা টের পেয়ে থাকে তো কপালে হাত রাখার কথা বললো না কেন ?

আবু বলল, আমার ঘরে অমন করে আসিস না। শুধু শুধু কষ্ট পাবি। কষ্ট বাড়িয়ে লাভ কী ?

আবু চলে যায়। দোটানায় পড়ে বীথি আছাড় খেতে থাকে কেবলি। এই যদি বলবে তো আবু অমন করে তাকে নিয়ে কেন একেকদিন মেতে ওঠে ? বীথি বুঝতে পারে না। কান্না পেতে থাকে। আবুর ওপরে চটে যায়। তখন পেন্সিল আঙুলের মধ্যে বুনে ব্যথা সৃষ্টি করতে থাকে বীথি।

এর ক'দিন পরেই বীথিকে নিয়ে আবার বেরোনোর উদ্যোগ করে আবু। বীথি বাধা দেয়। বলে, আমার সময় নেই।

ইস্, আজকাল বড্ড সময়জ্ঞান হয়েছে তোর।

হবে না ?

বীথি তখন মনে মনে ভাবছে, শুধু শুধু কষ্ট এনে লাভ কী ? তার চেয়ে এই ভালো, এই ভেতরের মরে যাওয়া, জেদ করে বসে থাকা। আবুর দিকে তার মন লতিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তার শেকড় কেটে ফেলার পণ করে বীথি। কিন্তু কিছুতেই ফেরানো যায় না আবুকে। বেরুতেই হয়। অনিচ্ছার সংগে আপোষ করতে গিয়ে সে নিশ্চুপ হয়ে রইলো সারাক্ষণ।

আবু সারা রাস্তা ধরে কী বকতে থাকে তার একবর্ণ কানে যায় না বীথির। রিকশায় তার

পাশে চুপ করে বসে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে পিছিয়ে পড়ে। আবুকে বারবার থেমে ধরতে হয়। পার্কে বেঞ্চে পাশাপাশি বসেও মনে হয়, বীথি একাই বসে আছে, আবু আবু সমানে কথা বলে। এক আধটা হ্যাঁ না ছাড়া আর কিছু বলার উৎসাহ পায় না বীথি নিজেকে বড় একা আর নিঃস্ব মনে হয় তার।

আবু চটে গিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমি একটা ছোটলোক। বুঝলি, আমি একটা ছোটলোক। আমার সংগে বেরোস কেন ?

আসলে বীথির ব্যবহার দেখে যে রাগটা হচ্ছিল, সেটা নিজেকে বকে মেটায়। হন্ হন্ করে চলে যায় তাকে সত্যি সত্যি একলা ফেলে। বীথির তখন খুব খারাপ লাগে। নিজের জেদ দেখে নিজেকেই আর পছন্দ করতে পারে না। মনটা বলতে থাকে, দৌড়ে গিয়ে মানুষটাকে ডেকে আনতে। মনে হয় আবুর সামনে আছাড় খেয়ে পড়ে বলে, আমাকে নিয়ে তুমি যা খুশি করো। তোমার যাতে সুখ আমারো তাতে অন্তরের সায়।

কিন্তু আশেপাশে মানুষ রয়েছে যে, তারা বলবে কী ? মাথা হেঁট করে পার্ক থেকে বেরিয়ে আসে বীথি।

এমনি করে মাসের পর মাস ভুগতে থাকে বীথি। আবুর জন্যে থেকে থেকে অস্থির হয়ে ওঠে তার আত্মা। উন্মুখ, অসহনীয় মনে হয় শরীরের একেকটা স্নায়ু। কিন্তু কিছু করা যায় না যে। তার বদলে জোর করে বীথি পড়া নিয়ে, কলেজ নিয়ে ডুবে থাকতে চায় সারাক্ষণ। আর বাকি সময়টুকু নিজেকে ব্যস্ত রাখে রান্নাঘরে, সংসারের কাজে।

ভেতরটা তো জানা যাচ্ছে না, মরিয়ম চোখে যা দেখলেন বড্ড বিব্রত বোধ করলেন। পরের মেয়ে পড়তে এসেছে, কদিনইবা থাকবে, তাকে ঘরের কাজ রোজ রোজ করতে দেখলে লোকে বলবে কী ? একদিন তাঁকে বলতে শোনা গেল, বীথি, আবার তুই ঝাড়ু হাতে নিয়েছিস ? তোকে কতবার মানা করবো বলতো।

বীথি হেসে বলে, চাচিমা, তুমি রান্না করছ। ঘরটা আমি সামলালে কী হয় ? সারাদিন তুমি একা সব করবে, সে হবে না।

তাঁর জন্যে বীথির মমতা দেখে মনে মনে খুশি হন মরিয়ম। কিন্তু বাইরে জানান দেন না। কপট আহত কণ্ঠে বলেন, যা খুশি করগে বাপু।

রান্নাঘর থেকে সন্ধ্যের আগে তিনি বেরিয়ে দেখেন, বীথি যে শুধু ঘরটাই ঝাঁট দিয়ে রেখেছে তা নয়, তার জন্যে জায়নামাজটা পর্যন্ত বিছিয়ে রেখেছে। আর বারান্দায় পরিষ্কার করে মাজা এনামেলের বদনায় ওজুর পানি। মরিয়মের মন তখন ভীষণ প্রসন্ন হয়ে ওঠে। নামাজ পড়ে উঠে বীথির ঘরে এসে কথা বলার ছলে তার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দোয়া মাখিয়ে দেন। বীথি সেটা বুঝতে পারে। অনেকক্ষণ তার মন নির্মল হয়ে থাকে। মনে হতে থাকে, কই তার কষ্ট ?

হাশেমের কাছে লেখা বকুলের চিঠিগুলো পড়ে অবধি নিজেকে বোঝা যেন অনেক সহজ হয়ে যায় বীথির। মনের ভেতরে যা হয়, এতকাল তা যেন বোঝা যেত না, কথা দিয়ে ধরা যেত না। এখন ভাষা খুঁজে পাওয়া গেছে বকুলের চিঠি থেকে।

কষ্ট, আত্মা, সৌন্দর্য— এই কথাগুলোর অর্থ যে নতুন ব্যঞ্জনায় কত অপরূপ হয়ে উঠতে পারে, এই একেকটা ছোট্ট শব্দ যে কত বিরাট অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারে, তা জেনে

অবধি বীথির অন্তরটা মুখর হয়ে আছে। কথা বলতে ইচ্ছে করে আবুর সংগে। কিন্তু বলা হয় না। ভেতর থেকে কিসের সংকোচ বোবা করে রাখে তাকে। আবুকে সামনে পেলে মুখ অন্ধকার করে থাকা, তার কথার জবাব না দেয়া, জবাব দিলেও ইচ্ছে করে দুঃখ দেয়ার স্বভাবগুলো যেন তাকে পেয়ে বসেছে।

কিন্তু হৃদয়ের এই বিশাল তরংগকে সে ঠেকিয়ে রাখবে কী করে ? বেঁধে রাখতে গিয়ে তার দোলা আরো প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। তার দুর্বার ধাক্কায় একেকদিন বীথি এই বাস্তব পৃথিবীর কুল থেকে অন্য অজানায় আছাড় খেয়ে পড়ে চেতনার প্রদোষ-প্রতিম আলোয়।

একদিন হয়েছিল এমনি। সে রাতের কথা আজো স্পষ্ট মনে আছে বীথির। আবু এসে তার বারান্দায় পায়চারি করছিল। শুয়ে শুয়ে টের পায় বীথি। সমস্ত অনুভূতি আর ইন্দ্রিয় সুচীমুখ হয়ে ওঠে। মাথার ভেতরে যন্ত্রণা হতে থাকে। বাইরে অবিরাম শোনা যাচ্ছে তার পায়ে পায়ে চলার শব্দ। বীথির আত্মা যেন সমুদ্রের মতো আছড়ে উঠতে চায়। বলতে চায়, কেন তুমি এলে আবু ভাই ? আবু দরোজার কাছে মুখ রেখে বলে, বীথি, আয়।

না।

আয় নারে।

ডাকটায় কী ছিল, বীথি উঠে আসে তখন।

আবুর শাদা পাজামা অন্ধকারে একটা পতাকার মতো কাঁপতে থাকে বাতাসে। তার শরীরটাকে কী দীপ্তিময় মনে হয়। মনে হয়, আবু তার ভাবনা থেকে জন্ম নিয়ে আজ এই রাতে অশান্ত হয়ে বীথির দরোজায় এসে দাঁড়িয়েছে। আবুকে সে একটা সৌরভের মতো মেখে নিতে পারবে যেন, এত অবাস্তব অশরীর মনে হয় তার উপস্থিতি।

তার মতো আবুরও কি কষ্ট হচ্ছে আজ ?

আবু ওর হাত ধরে বলে, কেমন বাতাস দিয়েছে দেখেছিস, বীথি ? বাগানে গিয়ে বসবি একটু ? ভয় নেইরে, আমি তোকে আর জ্বালাবো না।

বীথি তাকে অনুসরণ করে।

বাগানের সিঁড়িতে হাত ধরে বীথিকে বসায় আবু। আর নিজে হাঁটতে থাকে অন্ধকারে। অন্ধকারে দাঁড়ানো গাছের ভেতর দিয়ে। ভেতর থেকে বেরিয়ে তারার অস্পষ্ট আলোর ভেতরে।

আবু আপন মনে বলে, তোকে কেন ডাকলাম, বীথি ?

আর্তনাদের মতো শোনায় যেন আবুর কণ্ঠস্বর। বীথির মায়া হয়। তোকে কেন ডাকলাম ? তোকে কি ডাকতে চেয়েছি ? আজ এই রাতটা আমাকে যেন জ্বালিয়ে মারছে। মনে হচ্ছে, আকাশ থেকে আগুন ঝরে আমাব একা অন্তরটাকে খাক করে দিচ্ছে। কী করি বলতো ? বড্ড ভয় করছে। এক মুহূর্তের জন্যে ভুল হলো, যেন তুই আমাকে শান্ত করতে পারবি। কিন্তু তা হচ্ছে কই ?

আবু এসে তার পাশে বসে। বলে, তোর হাতটা দে'।

বলে নিজেই বীথির হাতটা টেনে নেয়।

তোর ভয় করছে, বীথি ?

না।

তাহলে হাত কাঁপছে কেনরে ?

হাতটা ফেলে দেয় আবু। খেদ ভরা কণ্ঠে বলে, আমার হাতে সাহস নেই, বীথি। নইলে সবাই অমন দেয়াল তুলে রাখে, দেয়ালটা ভাঙতে চাই, পারি না। আমাকে দিয়ে কিস্‌সু হবে না, দেখিস তুই।

বীথি চুপ করে শোনে। বলে, তোমাকে দেখে আমার ভয় করে, আবু ভাই। হাশেম ভাইয়ের মতো তুমিও না একদিন ঘর ছেড়ে বেরোও।

আবু ওর চোখে চোখে তাকায়।

তোরও কি তাই মন হয়, বীথি ?

তুমি একটু ভালো থাকতে পারো না, আবু ভাই ? আমি যদি কিছু করতে পারি, বলো।

বীথির কণ্ঠ স্পর্শ করে আবুকে। এক মুহূর্তের জন্যে চমকে ওঠে। পরে বলে, আয় তাহলে।

বীথিকে বুকের ভেতরে চেপে ধরে আবু। চুলের ভেতরে মুখ রেখে বলে, আমার চোখ ঢেকে দে, বীথি। আমার যে কী হয়েছে, খালি অস্থির লাগছে।

বীথি চুপ করে পড়ে থাকে খানিকক্ষণ। তার কানের ভেতর দিয়ে আত্মায় এসে ঘা দিচ্ছে আবুর হৃদস্পন্দনের শব্দ। শব্দটা অলৌকিক মনে হয়। মনে হয়, আরেক পৃথিবী থেকে সাংকেতিক বার্তা আসছে।

অস্থির হয়ে ওঠে বীথি।

আবু তাকে ঠাস্‌ করে ছেড়ে দিয়ে বলে, তুইও পালালি। কী শূন্য হয়ে আছে এইখানটায়। থাকতে পারলি না তো।

বীথি দু'হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকে।

আবু উঠে দাঁড়ায়। বলে, বলেছি, তোকে জ্বালাবো না। জ্বলতে এলি কেন ? আমার মুখের ওপর দরোজাটা বন্ধ করে দিতে পারলি না ?

আবু অন্যমনস্কভাবে খুব করে হাঁটতে থাকে বাগানে। ফিরে এসে বলে, তুই আমাকে ছুঁয়ে যাবার স্পর্ধা করেছিস, বীথি। কিন্তু আমি তোকে নিয়ে খেলা করছি বুঝতে পারলি না কেন ? হ্যাঁ, সত্যি। আমার চোখের ভেতরে তুই নেই। তাকিয়ে দ্যাখ।

বীথি হাঁটুর ভেতরে মুখ লুকোয়।

আবু বলে চলে, আমি তো বুঝি, মানুষের এ কষ্টটা কী ভীষণ। মরে যাবি তুই। আমাকে কষ্ট জ্বালানোর কাজ দিস্‌নে' বীথি। তাতে আমার আরো কষ্ট। দেখছিস না, কিসের যে নেশা আমি নিজেই জানি না, তবু কষ্ট হয় শুধু। যদি লাফ দিয়ে মরতে পারতাম তো ভালো হতো। কিন্তু সে সাহসও নেই।

বীথিকে হাত ধরে তুলে আনে আবু।

তোর মুখ দেখে মায়া হয়। চল বাগানে একটু হাঁটবি।

কাটা কবুতরের মতো বিছানায় পড়ে ছটফট করতে থাকে বীথি। মাথার ভেতরে যেন এক-পাল যন্ত্রণা সোর বাঁধিয়েছে। না থামানো যায়, না সহ্য করা যায়।

অস্ফুট আর্তনাদ করতে থাকে মাথার দু'রগ টিপে। হারিয়ে যেতে চায় বালিশে ব্যর্থ মুখ

লুকিয়ে। ডান হাতটা কেবলি এপাশ ওপাশ করতে থাকে যেন এমনি করলে, যে ছবিগুলো মনের পর্দায় ফিরে আসছে, তারা মুছে যাবে।

মরিয়ম এসে ডাকলেন, ঘর অন্ধকার কেন, বীথি ? ঘুমোলি নাকি ? খাবিনে ?

হঠাৎ শুনতে পেলেন বীথির কাতর শব্দ। বুঝতে পারলেন না সেটা তাঁর মনেরই ভুল কিনা। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মেয়েটার মাথায় হাত রাখলেন। ইস্, কী ঘামছে।

বীথি, বীথি রে।

মা।

অস্ফুট ডাকটা শুনে বিহ্বল হয়ে গেলেন মরিয়ম। একেবারে খাটের ওপর উঠে বীথির মাথাটা কোলের ভেতরে তুলে নিয়ে বললেন, এই তো মা, এই যে আমি। কী হয়েছে, সোনা আমার ?

কিছু না, কিছু না। তুমি কেন এলে, চাচিমা ?

মরিয়মের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। বীথি কেন এমন করছে বুঝতে না পেরে. আকুলি বিকুলি করতে থাকেন। যেন নিজের মেয়েটা. যদি নিজের মেয়ে থাকত মরিয়মের, তাহলে আজ তার কোলে মাথা রেখে এমনি কাতরাতো।

আমাকে তুই বলবিনে কী হয়েছে ?

হঠাৎ ভয় পান মরিয়ম। আজ বিকেলে খোরশেদ চৌধুরী যে কথা আবুর বাপকে ডেকে বলেছেন, বীথির কানে তা যায় নি তো ?

যাবার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন, কথা যখন উঠেছে মোরশেদ, তখন সত্যি না হলেও মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিও না। ছোট মিয়া লিখেছে, বীথিকে হোস্টেলে দেবে। আমারও মনে হয়, কিছুদিনের জন্যে অন্তত বীথিকে দূরে সরিয়ে রাখা ভালো। এখন কিছু বলো না মেয়েটাকে। দিন দুই পরে আমার বাসায় দিয়ে এসো। তারপর ওর বাবা এসে যা হয় করবে। হাজার হোক মেয়ে তো ওর।

কথাটা শুনে অবধি পাথর হয়ে গিয়েছিলেন মরিয়ম। এই মেয়েটা যে তাকে ছাড়া আর কিছুই বুঝতো না, এই ব্যথাটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এমনকি এই সেদিনও এক মাস থাকবে বলে বাড়ি গিয়েছিল বীথি। কিন্তু মাত্র পনেরো দিন পরেই তার বাবা তাকে নিয়ে ফেরৎ এসেছেন।

তিনি এসে বলেছিলেন. আপনিই ওর মা হয়ে গেছেন. ভাবী। মেয়ের মন যেন টিকতেই চায় না আমাদের ওখানে।

সে কথা মনে করে মরিয়মের এখন ভীষণ কান্না পায়। বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরেন বীথিকে। বীথিও তাকে আঁকড়ে ধরে কাতরাতে থাকে, চাচিমা, চাচিমা গো।

ডাকে আর ঝরঝর করে কাঁদতে থাকে। কেন কাঁদছে তা সে নিজেই বুঝতে পারে না। কিন্তু মরিয়মকে জড়িয়ে ধরে বুক ভরে কেঁদে পরম এক নির্ভরতা ফিরে পায় বীথি। দু'জনের ভেতরে একটা বোঝাপড়া হয়ে যায় যেন অলক্ষিতে।

মরিয়ম তার কপালে, চুলের ভেতরে, বুকে হাত বুলিয়ে তার মুখের ওপর নিজের গাল চেপে ধরে কান্নাভেজা কণ্ঠে বলেন, বীথি, তুই আমার কাছেই থাকবি। তোকে কোথাও যেতে হবে না। সোনা আমার, চুপ কর. চুপ কর একটু।

ভোর রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় আবুর। আর একটু পরেই উঠবে আর একটি দিনের সূর্য। এখনো আকাশ থেকে আঁধার কাটেনি। এখনো ভালো করে ঠাওর করলে একটি দুটি তারা আবিষ্কার করা যাবে। আর বইছে কী নির্মল বাতাস। বিলকিসকে মনে হয় এই নিঝুম নিস্তরঙ্গ ভোরের মতো অস্পষ্ট, বিশাল, দৃষ্টির অতীত, রহস্যময়। তখন আকাশের মতো শুদ্ধ এবং গম্ভীর একটি বেদনা যেন বিলকিসের নাম হয়ে জন্ম নিল আবুর মনে।

অপূর্ণ, অক্ষম একটা পুঞ্জীভূত ইচ্ছার চাপে আবুর ভেতরটা ভারী হয়ে উঠেছে। যেন সে ভীষণভাবে পরাজিত হয়ে গেছে কাল বিলকিসের কাছে। যে স্রোতটা উৎস থেকে লাফিয়ে গড়িয়ে এতকাল চলছিল, হঠাৎ একটা পাথরের মুখে পড়ে তা স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন। মরে যাওয়াই তো ভালো। কী ক্ষতি হবে কার, এখন যদি মরে যায় আবু ? যাকে রক্ত দিয়ে ভালোবাসা গেল, সে যদি চিরকাল রইল দেয়ালের আড়ালে, তাহলে শুকিয়ে যাক রক্তের ধারা। কাল বিলকিসের সঙ্গে দেখা হলো না বিধাতার কোন্ অজ্ঞাত ইচ্ছায় ? স্তব্ধ হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে আবু। দূরে, ছড়ানোমেলানো শহরটা কী অপরূপ শান্তিতে শুয়ে আছে। বিলকিস কি কখনো জানতে পারবে, তার জন্য মরে যাচ্ছে আবু ? আস্তে আস্তে আকাশটায় লাগছে শাদা রং। বীথি বালিশ থেকে বিছানায় মাথা রেখে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে আছে। বালিশের ওপর মেলানো তার চুল। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় বীথির মুখ এক মুঠো মমতা হয়ে আছে। কাল রাতে মরিয়ম শুয়েছিলেন এ ঘরে। একটু আগে উঠে গেছেন ফজরের নামাজ আ'দা করবার জন্যে। ওপাশের বারান্দা থেকে শব্দ আসছে তাঁর ওজুর।

দরোজা ঠেলে খাটের পাশে এসে বসলো আবু। খোলা দরোজা দিয়ে এলো হাওয়া। হাওয়ার ঝলকে বীথির কোমল মুখখানা যেন অবগাহন করে উঠলো।

বিলকিসও এখন শুয়ে আছে এমনি করে। বালিশ থেকে হয়তো তার মাথাও ঘুমের ঘোরে নেমে এসেছে। শিয়র ভরে উঠেছে একরাশ খোলাচুলের ঐশ্বর্যে। বুকটা উঠছে নামছে।

আবু করতল দিয়ে সন্তর্পণে স্পর্শ করল বীথির গাল। মনে মনে বলল, ঘুমিয়ে থাক, ঘুমিয়ে থাক, আমাকে দেখতে দে।

বীথির মুখ দু'হাতে তুলে বালিশে রাখতে গেল আবু। বীথি চোখ মেলল। চোখ মেলবার আগে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল আবুকে।

আমি, বীথি।

একটু পরে সে বলল, কাল রাতে কী হয়েছিল রে ?

আবুর কণ্ঠ ভোরের মত আবছা আবছা, তেমনি সুদূর।

কী হয়েছিল তোর ? কাঁদছিলি কেন ?

বীথি পরিপূর্ণ চোখ মেলে তাকাল আবুর দিকে।

— আমার ঘরে শুয়ে থেকে শুনছিলাম তুই কাঁদছিস। মনে করলাম তোর কাছে উঠে আসি। কিন্তু তুই যে মেজাজ করেছিলি কাল। এলে কি আমাকে তাড়িয়ে দিতি ?

বীথি কথা বলে না। চুপ করে থাকে দু'জনে। আবু বীথিকে করতল দিয়ে স্পর্শ করে থাকে। কপালে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, আমাকে একবার ডাকলে কি আসতাম নারে ?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবু।

হঠাৎ বীথি মুখ ফিরিয়ে নেয়। আবুর করতল থেকে নিজেকে সরিয়ে বালিশের ওপর বলে, তোমাকে কি আমার সব কথা বলতে হবে ?

না তাকিয়েও বীথি অনুভব করতে পারে, আবু আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল।

বারান্দায় এসে হাশেমের মুখোমুখি পড়ে যায় আবু। দ্যাখে, দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাশেম। যেন আবুর জন্যেই অপেক্ষা করছে সে।

হাশেম ডাকল, আবু, শোন।

চোখ তুলে দেখল, থরথর করে কাঁপছে, দু'পায়ে দাঁড়াতে পারছে না হাশেম। দু'চোখ ফেটে যেন কিসের ব্যাকুলতা ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আবু হাত বাড়িয়ে ধরলো তাকে, নইলে বোধ হয় মুখ থুবড়ে পড়েই যেত মানুষটা।

একটা কাজ করতে পারবি ?

তার কথায় কান না দিয়ে আবু বলে, বিছানায় চলো। না কি একটা ইজিচেয়ার পেতে দেব ? জ্বর একটু কমেছে বলেই উঠতে হয় নাকি ?

ম্লান হাসিতে সূর্য হয়ে ওঠে হাশেমের মুখ। বলে, নারে না, আমার কিস্‌সু হয়নি। শরীরটা কেবল মনের ওপর শোধ নিচ্ছে। অনেক দিনের রাগ কিনা! তোরা তাও হতে দিবিনে ? আমার কিস্‌সু দরকার নেই।

মুখে যতই বলুক, দুর্বলতার ঘোরে স্পষ্ট টলতে থাকে হাশেম। আবুকে শক্ত করে ধরে শুধোয়, বকুলের খবর জানিস, আবু ? বকুল কোথায় আছে ?

হাশেমের মুখে বকুলের নাম শুনে চমকে ওঠে আবু। একমুহূর্ত কোন জবাব দিতে পারে না। বকুল— বকুলের সংবাদ সে জানবে কী করে ? বকুলকে সে দেখেও নি কোনোদিন। বকুল তার কাছে কেবল একটা নাম ছাড়া আর কিছুই না। শুনেছিল, বছর খানেক আগে তার বিয়ে হয়ে গেছে।

আবু বলল, ঢাকাতেই আছে শুনেছিলাম। সেগুনবাগানে না কোথায়।

আমাকে আজ ঠিকানাটা এনে দিতে পারবি ?

আবু অবাক হয়ে ভাবে, হাশেম ভাই কী জানেন বকুলের বিয়ে হয়ে গেছে ? কথাটা জানাতে গিয়েও সাহস হয় না হাশেমের চোখে সাত রাজ্যের আকুলতা দেখে। সে আশ্বাস দিয়ে বলে, আচ্ছা দেখব।

হাশেম তখন স্বস্তি পেয়ে আবুকে ছেড়ে দিয়ে ঘরের দিকে এগোতে চায়, কিন্তু পারে না। মাটিতে পড়ে যাবার আগেই আবু তাকে বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরে। বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দেয়। কী জানি কী হয়, বিছানায় শুয়ে ঘামে, অস্থিরতায়, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে হাশেম— যেন অনেক বড় একটা মাঠ পাড়ি দিয়ে এসেছে। বড় বড় চোখ মেলে আবুর দিকে তাকিয়ে থাকে। আবু আবার বলে, আচ্ছা, দেখব আজ।

দুপুরে মাহবুব এলো হাশেমকে দেখতে। তার আগে সকালেই মাহবুবের বউ ফাতেমা এসেছিল। আজ ওরা দু'জন এখানেই খাবে।

হাশেম মাহবুবকে দেখে বলল, কিরে, ভালো আছিস ?

ঐ এক রকম।

মাহবুব মাথা নিচু করে উত্তর দেয়। ওর ওটা একটা স্বভাব। কথা বলতে গিয়ে, সে যে হোক না কেন, যে কথাই হোক না কেন, কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়বে।

পুরনো স্বভাবটা এখনো যায় নি দেখে হাশেমের ভারী চেনা মনে হলো মাহবুবকে। ছোটবেলা থেকেই ছেলেটা অমন। হাশেমের মনে হলো ছোটবেলার মাহবুবকে এক অলৌকিক বলে সে ফিরে পেয়েছে। যেন আর একটু পরেই মাহবুব বেরিয়ে গিয়ে মাঠে দাঁড়িয়ে ও পাড়ার ছেলেদের ব্যাডমিন্টন খেলা দেখতে লেগে যাবে। ফিরে এসে বায়না ধরবে— আমাকেও র‍্যাকেট কিনে দাও, কর্ক কিনে দাও।

হাশেম বালিশটাকে পিঠের নিচে এনে মাথা উঁচু করে শুলো। মৃদু হেসে বলল, তোর বউ দেখলাম।

হাশেম চলে যাবার বছর তিনেক পরে বিয়ে করেছিল মাহবুব। কাজেই এই প্রথম দেখা।

— ভারী লক্ষ্মী বউ পেয়েছিস।

মাহবুব মুখ নিচু করে আঙ্গুল দিয়ে চাদর খুঁটতে খুঁটতে শুধালো, তুমি এতদিন ছিলে কোথায়?

হাশেম হাসলো। হাসলো নাতো যেন অন্ধকারে একরাশ ফ্লসৃষ্টির ভ্রম হলো।

— বাবা মা কাঁদতে কাঁদতে মরতে বসেছিলেন তোমার জন্যে।

মানুষ তো কাঁদতে জানে বলেই বেঁচে থাকে, মাহবুব। কান্নাটা হচ্ছে মানুষের একটা শক্তি। বুঝতে পারছিস?

মাহবুব নির্বাক হয়ে শোনে। হাশেম বলে, ব্যথা পেলেই কাঁদে। কান্না হচ্ছে ব্যথার রূপ। ব্যথাটাকে বুঝতে না পারলে কাঁদতে পারবি কেন? মানুষ তো এমনিতেই কাঁদে, কাঁদে না? হাত পা ছড়িয়ে আকুলি বিকুলি করে, বিচ্ছিরি সংস্কারের মতো। সংস্কারটাকে বাদ দিয়ে যে কান্না ওটাই শক্তি।

মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে মাহবুব। সত্যি সত্যি হাশেম যে পাগল হয়ে গিয়েছে এইটে অবিশ্বাস করবার আর কোনো কারণ সে দেখতে পায় না।

ঠিক এই কথা যখন সে ভাবছিল, তখন তাকে চমকে দিয়ে একেবারে সুস্থ মানুষের মতো হাশেম ঘরোয়া প্রসঙ্গ ওঠায়। বলে, কী করছিস আজকাল? মা চাকরির কথা বলছিলেন।

হ্যাঁ।

আজ আপিস যাসনি?

ট্রেনিং-এ আছি।

মাহবুব রান্নাঘরে এসে মরিয়মকে জানাল, মা, ভাই দেখছি বদ্ধ পাগল।

চটে গেলেন মরিয়ম। বললেন, হ্যাঁরে, তোদের মুখে কি আর কোন কথা নেই?

পাগলই তো! নইলে কী সব বকছে শুনে এসোগে।

মাহবুব আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল জোর দিয়ে, হঠাৎ চোখে পড়ল তার বউ ফাতেমা চোখ টিপে বারণ করছে।

আমার ছেলে পাগল আছে বেশ আছে।

বলতে বলতে মরিয়ম যেন আঁচল দিয়ে অশ্রুই মুছলেন।

বিলকিস সারা ইউনিভার্সিটিতে উৎসুক হয়ে খুঁজল আবুকে। কিন্তু কোথাও দেখা মিলল না তার। সে বাসায় না থাকাতে আবু চটে গেছে কাল। তার প্রমাণ ছোট্ট চিঠিটা। চিঠির সেই কথা—'আরেকটা তারিখ নাইবা নিলেন'। চিঠি পেয়ে বিলকিস যেমন বিস্মিত হয়েছে, তেমনি মনে মনে নিজের কাছে ছোট হয়ে গেছে সে। মনে হচ্ছে কাল কথা দিয়ে অমন করে না বেরুলেও পারত। কিন্তু সে তো বুঝিয়ে লিখে রেখে গিয়েছিল। কিছুতেই যেন বুঝতে পারছিল না বিলকিস, হঠাৎ করে মানুষটার গিয়ে লাগল কোথায় ? তবে সে কি যা আশঙ্কা করেছিল তা-ই সত্যি ? আবু তার হৃদয়কে বাসনা করছে ?

বিলকিস তখন নিজের নারীত্ব নিয়ে যেন বিষন্ন বিব্রত বোধ করল। তারপর সারাদিনে ক্লাশের চাপে আর কিছুই মনে রইল না তার। সারাটা দিন ক্লাশ করে, লাইব্রেরীতে পড়াশোনা করে বাইরে যখন বেরুল তখন মনে মনে বলল— আরেকটা দিন পার হয়ে গেল। বিকেলের রাঙ্গা রৌদ্রের দিকে তাকিয়ে নিজেকে মুগ্ধ হতে দিল বিলকিস। এই রৌদ্রটা শুধু এই সময়ের; আর কোন দিন তা ফিরে আসবে না। এক অপরূপ আনন্দ ও বেদনার আশ্রয়ে সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল আমগাছটার নিচে। আজ তার গাড়ি আসতে বড় দেরি হচ্ছে।

আরো কিছুক্ষণ দেখে বিলকিস রিকশা নিয়ে বাড়ি ফিরল। দ্যাখে, টেবিলের ওপর চিঠি। হাতের লেখা আর স্ট্যাম্প দেখে তক্ষুণি বুঝতে পারে ফ্লোরেন্স থেকে মন্টি চিঠি লিখেছে। ইস্, এর আগেও মন্টি আরেকটা চিঠি দিয়েছিল। তার উত্তর দেয়া হয়নি। নিজের আলসেমিকে মনে মন নিন্দা করল বিলকিস। চিঠিটা তক্ষুণি খুলল না। তুলে নিয়ে রেখে দিল হাতব্যাগে।

বাথরুমে এসে মুখ মার্জনা করল। তারপর আয়নায় শাদা তোয়ালে জড়ানো মুখটার দিকে তাকিয়ে রইল বিলকিস। যেন নিজের মৃতমুখ দেখছে, এমনি অপলক দৃষ্টি তার।

মন্টির মুখ অদ্ভুত রকমে রেখা ও কোণবহুল। আবছা আবছা মনে পড়ে বিলকিসের। আর রংটা গাঢ় তামাটে। দেখলে মনে হয়, একটা আবক্ষ মূর্তির দর্শন ঘটলো, বিশেষ করে মন্টি যখন চোখ বুঁজে থাকত। কথ বলতে বলতে অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে থাকা, চোখ বুঁজেই কথা বলা মন্টির একটা স্বভাব। বিলকিসের মনে হতো তখন, মন্টি যেন চোখ বুঁজে দেখে নিচ্ছে যা বলছে।

মন্টি বলত, পৃথিবীটার কোনো হারমনি নেই, বিলকিস। প্যাটার্ণ নেই, প্রাণ নেই। 'চান্স ইরেকটেড, চান্স ডাইরেকটেড।' দেখে দেখে আমার গা জ্বালা করে। তাই তো ছবি আঁকি। চারটা ফ্রেমের মধ্যে যে পৃথিবী সৃষ্টি করলাম, তার ভেতরে বস্তুর প্রাণের হারমনি আছে, এইটে বড় কথা।

বিলকিসের অনেক দিন মনে হয়েছে, মন্টির চোখ বুঁজে থাকার অভ্যেসটা এখান থেকেই পাওয়া। এ যেন বাইরের পৃথিবী থেকে চট্ করে সুইচ অফ করে তার নিজের পৃথিবীতে চলে যাওয়া।

বেরিয়ে এসে বিলকিস বারান্দায় মোড়া পেতে বসল। শিশু সন্ধ্যের আভাস লেগেছে আকাশে। চারদিক ভারী শান্ত। মোড়ায় বসেই চা খেলো।

তারপর হাঁটল খানিক নিচেয় ঘাসের ওপর। ফিরে এসে ছোট বোন পারিজাতের সঙ্গে আদর খেলা করল। ছোট ভাগ্নে দু'টো এসেছে কাল। টুকু আর টুবলু। তারা তখন ভাঙ্গা চক দিয়ে

মেঝেয় সোৎসাহে পাখি আঁকছে আর ছড়া কাটছে—

দ গেলো শ্বশুর বাড়ি

বসতে দিল কাঠের পিঁড়ি।

তাদের কোল সাপটা করে নিয়ে সোফার ওপর বসল বিলকিস। গাল টিপে দিয়ে বলল, লক্ষ্মীছাড়া হয়েছিস দুটো।

তখন খিলখিল করে হাসতে হাসতে টুকু নেমে এলে বিলকিসের পায়ের ওপর। সেখানে বসে সে দোল খাবার চেষ্টা করতে লাগল। আর টুবলুও কিছু কম যায় না। সে বাহুর ফাঁক দিয়ে একেবারে কাঁধের ওপর উঠে বাতাসে সাঁতার দিতে লাগল।

টুকু আর টুবলুকে নিয়ে কাটানো গেল অনেকক্ষণ। তারপর নিজের ঘরে এসে মন্টির চিঠিখানা খুলে পড়তে বসলো। প্রথমেই লম্বা এক অভিযোগ!

আগের চিঠিটার জবাব দাওনি কেন? তোমার চিঠির জন্যে তাকিয়ে থেকে থেকে ঘাড় ব্যথা করতে শুরু করে দিয়েছে। ডাকপিয়নটার কাছে পর্যন্ত লজ্জা পাচ্ছি। ওর সাইকেলটা মোড়ের মুখে দেখলেই এখন আমি পালাই।

বড্ড নিষ্ঠুর হয়েছ তুমি।

অথচ এদিকে তোমাকে নিয়ে কত কাণ্ড! আমার বন্ধু অগাস্টাস— সেই যে ছেলেটা, যার কথা এর আগে তোমার কাছে লিখেছিলাম, একটা সোলো একজিবিশন করে ক্রিটিকদের কাছে দারুণ বকা খেলো— সেই অগাস্টাস এক কাণ্ডই করে বসেছে। আমার কাছ থেকে ফোটো নিয়ে তোমার ছবি এঁকেছে। নাম দিয়েছে 'দ ব্লু ক্লাউড অ্যাণ্ড সেভেন্টি নাইন।' অদ্ভুত এই নামটার একটা মজার ব্যাখ্যা আছে।

এবার হাতে টাকা এলেই অগাস্টাস তোমার কাছে ছবিটা পাঠাবে। ওর ছবি কেউ কিনতেই চায় না! যা বিক্রি হয় তাতে ওর কালো রুটি, মদ আর বাড়িউলিকে ভাড়া দেয়ার পয়সা হয় কোনো রকমে। তাই ভাবছি, ছবিটা শেষ অবধি তোমার কাছে পৌঁছুবে কিনা। ওকে বললাম, ছবির অন্তত একটা ফোটো তুলে পাঠাই।

তাতে চটে গিয়ে বলল, আড়াই বাই চার ইঞ্চি এক চিলতে কাগজে শাদা কালোয় আমার ছবির কংকালটাই পাবে।

লুসিয়েন কিন্তু অগাস্টাসকে ভোগাচ্ছে খুব। মেয়েটা যেন ওকে মানুষ বলেই গনতে চায় না। অগাস্টাসের এই হাল দেখে একেক সময় লুসিয়েনের ওপর এত চটে যাই যে তখন হাত নিসপিস করতে থাকে। মনে হয়, কী হয় পৃথিবীর, এই মেয়ে জাতটা না থাকলে?

তুমি ভাবছ, আমার মানসিক অধঃপতন দেখা দিয়েছে। না, না। অগাস্টাসকে দেখলে রাস্তার ষ্ট্যাচুটার পর্যন্ত দুঃখ হতো, আর আমি তো জ্যান্ত মানুষ! অথচ ছেলেটা এমন, বাইরে কিছু বলবে না, ভেতরে ভেতরে যে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে সে ছাই সোনার পাত্র দিয়ে ঢেকে রাখবে। আমি বলি, লুসিয়েন একদিক থেকে ভালোই করছে অগাস্টাসের। নইলে ওর ছবি আঁকাই হতো না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেমন করে ছবি এঁকে চলে, দেখলে অবাক হতে হয়। শক্তি পায় কোত্থেকে? আমি বলি— লুসিয়েন।

দ্যাখো কী কাণ্ড! একটু আগে লুসিয়েনের সূত্র ধরে তামাম মেয়ে জাতটাকে মন্দ বলছিলাম। এখন আবার তারই সুখ্যাতি করছি।

*কলম তুলে ভাবলাম খানিক, কেন এমন হলো ?*

*মনে হচ্ছে, একবার ব্যক্তি হিসেবে একবার শিল্পী হিসেবে দু'রকম করে অগাস্টাসকে দেখছি বলেই এই গরমিল। কোনটাকে বড় করে দেখব ? কী জানো বিলকিস, শেষ অবধি হয়ত মানুষটাকে বড় করে দেখা উচিত। মানুষটাই যদি কষ্ট পেল তাহলে এত হৈচৈ আয়োজন* কার জন্যে ? নামের মোহ যাদের আছে তাদের আলাদা কথা। তারা পেলেও যা, না পেলেও সেই একই। কিন্তু নামের মোহ যাদের নেই ?

মানুষ বাঁচে বলেই তো পৃথিবীটা বাঁচে। যে মানুষ আজ মরে গেল, তার কাছে এ পৃথিবীর শিল্প সভ্যতা সুখ-দুঃখ সব কিছুই মরে গেল।

যতটুকু বেঁচে আছি, আনন্দ থাক। তাইতো বারবার তোমাকে বলি, আমাকে আর দূরে সরিয়ে রেখো না।

তোমার অন্তরটাকে আমার আপন করে নিতে দাও, যেন মৃত্যুর সময় আমাকে দুঃখ করতে না হয়।

কথায় কথায় কতদূর চলে এসেছি!

অগাস্টাস কাল ভোর রাতে আমাকে বেদম মার দিয়েছে। নাক দিয়ে রক্ত ছুটছিল।

কাল সন্ধ্যেয় লুসিয়েনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। ও এসেই বলল, আজ তোমার সঙ্গে আমার তারিখ।

আমি তোমার কথা মনে করে বললাম, আমার তারিখ তো হয়ে আছে, লুসিয়েন।

সে বলল, কুছ পরোয়া নেহী! তোমরা অমন একরোখা প্রেমিক কেন, মন্টি ? আজ আমি তোমার মেয়েটার কাছ থেকে একটা দিন ছিনিয়ে নিতে এসেছি। ঠিকানা দিও, তাকে না হয় ফুল পাঠিয়ে ভাব করে নেবো পরে।

কী ভাবছ বিলকিস ? ভাবছ, তোমার কথা দশখানা করে বলে বেড়িয়েছি সারা ফেলরেন্স ? ভরসা আছে, তা যদি বলেই থাকি তুমি চটে যাবে না। আর এক্ষেত্রে বলিইনি। লুসিয়েনের আন্দাজ ভালো।

গলায় লুসিয়েনের হাত। তোমার কাছে স্বীকার করতে সংকোচ নেই, তখন আমার একটু ঘোর লেগেছিল যেন। নইলে পরক্ষণেই লুসিয়েনকে নিয়ে হৈচৈ করে বেড়িয়ে পড়লাম কেন ?

দ্যাখো, অভিমান করতে যেও না যেন, লক্ষ্মী। আমি বলছি বলেই তো জানতে পারছ, নইলে জানতেও না। কথা দাও, আমাকে ভুল বুঝবে না। নইলে এই আমি কলম বন্ধ করলাম।

জানি, তোমার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। আমি তো জানিই, তোমার কাছে প্রশ্রয় আছে সব কিছুর।

তারপর রাতে ঘরে ফিরে লুসিয়েনের ছবি করতে বসেছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, এই ছবিটা আঁকতে না পারলে লুসিয়েন থেকে যেন আমার নিস্তার নেই। রাত তখন অনেক। লুসিয়েনের পোরট্রেট করছি। শাড়ি পরা লুসিয়েন। দূরে টুলের ওপর পরিতৃপ্ত পোষমানা বেড়ালের মত এতক্ষণ বসে ছিল লুসিয়েন।

ক্যানভাসে শাড়ির রেখা দেখে ও শুধালো, ওকী! কেন ?

আমি বললাম, মাথার ভেতরে অনেক কিছু ওভারল্যাপ করছে। তুমি কথা বোলো না। পোরট্রেটটা তুমি নও, ওটা আমার এক্সপ্রেশন বা ইম্প্রেশন যা বলো।

এত দ্রুত শেষ করেছিলাম ছবিটা যে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিজেরই অবাক লাগলো। লুসিয়েন কাঁধ ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আর সব পেইন্টারদের তুলনায় তুমি অনেক বেশি সহৃদয়। মোটেই সময় নাওনি।

আমি দাঁড়িয়ে নিরিখ করছিলাম সদ্য আঁকা ছবিটাকে। ছবিটার ডোমিন্যান্ট রং ছিল গ্রীন। গ্রীনটার স্বরূপ তোমাকে লিখে বোঝাতে পারব না।

লুসিয়েন তার বুক আমার পিঠে ঠেকিয়ে আদুরে মেয়ের মত কাঁধে মাথা রেখে ছবিটা দেখছিল। ঠিক এই সময় ভূতের মতো অগাস্টাস এসে হাজির। ভেবে দ্যাখো বিলকিস, একেবারে অপেরা থেকে কেটে আনা একটা দৃশ্য! অগাস্টাস কিছু বলল না। এক মুহূর্ত একবার আমাকে দেখল, একবার লুসিয়েনকে। আমি তো মনে করলাম, অগাস্টাস আমার ছবিখানা ইজেল শুদ্ধ তেতলা থেকে ছুঁড়ে মারবে। বদলে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। অগাস্টাসের হাতে রং লেগে ছিল। ছবি আঁকছিল বোধ হয়, ফেলে রেখে উঠে এসেছে। এ রকম অনেক দিন এসেছে ও আমার ঘরে দুপুর রাতে আধ মাইল পথ হাঁটতে হাঁটতে। ওর জন্যে আমাকে মদ কিনে রাখতে হতো। আজ ওরও দুর্ভাগ্য। আমারও। পড়ে পড়ে মার খেলাম পশুর মত। কিডনিতে একটা ঘুষি পড়েছিল বেকায়দায়, ব্যথাটা এখনো যায়নি। উলটে মারতে পারতাম, মারিনি। ভাবলাম, ও ওর পাত্র পান করুক প্রাণ ভরে।

অগাস্টাস চলে গেলে পর লুসিয়েন এসে আমার পাশে মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসল। আমার রক্ত দেখে অগাস্টাসের উদ্দেশে থুতু ছিটিয়ে বলল, ক্রাইস্ট। একটা পশু।

ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতে এসেছিল লুসিয়েন। তাকে ফিরিয়ে দিলাম। সে রাগ করে চলে গেল। সকালের দিকে জ্বর এসেছিল। এখন নেই। বিছানাতেই আছি। হঠাৎ দুপুর বেলায় অগাস্টাস এসে একটা কথা না বলে আমার শুশ্রূষা করছে আনাড়ির মতো। বেচারা লজ্জা ঢাকবার জন্যে তখন থেকে গম্ভীর। দেখে হাসি পাচ্ছে।

দেখলে বিলকিস, অগাস্টাসের কাণ্ডটা ?

এখন অনেকটা সুস্থ আছি।

আর কী লিখি ? ভালো কথা, অগাস্টাস তোমার যে ছবি এঁকেছিল তার নাম 'দি ব্লু ক্লাউড অ্যাণ্ড সেভেন্টি নাইন' কেন বলাই হলো না। ফেলরেন্সে এসে ও প্রথমে যে বাড়িটায় উঠেছিল তার নম্বর ছিল উনআশি। কবে ছেড়ে দিয়েছে বাড়িটা, কিন্তু এখনো নাকি হোমসিক হলে তার গাঁয়ের বাড়ির কথা মনে না হয়ে মনে পড়ে ফেলরেন্সের এই উনআশি নম্বর বাড়িটার কথা। অগাস্টাস বলে, এ হচ্ছে মনের এক অদ্ভুত খেলা। তা সেই থেকে প্রিয়তম যা কিছু তারই প্রতীক ওর কাছে 'উনআশি'। আর নীল মেঘ ? তার ব্যাখ্যা ছবিতে, ছবি না দেখলে শুধু লিখে বোঝানো যাবে না।

অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে চিঠিটা, তাই না ? তুমি এবারো যদি জবাব না দাও তাহলে সাংঘাতিক একটা কিছু করে বসবো। দাড়ি কামাতে গিয়ে গলায় ক্ষুর টেনে দিলে কেমন হয় ?

আর ন'দিন পর আমার জন্মদিন। তোমার হয়ত মনেও পড়ত না আমি না লিখলে।

ভালো থেকো কিন্তু। নইলে ভীষণ রাগ করবো। আর তোমার পরীক্ষাটা কবে নাগাদ

জানিও। তখন চিঠি লিখে জ্বালাতন করব না। কিন্তু ইতিমধ্যে চিঠি দিও।

তোমার চিঠি পাবার জন্যে নিজের ব্যাকুলতা দেখে হঠাৎ হাসি পাচ্ছে। গোটা মানুষটার জন্যেই যখন প্রতীক্ষা করছি, তখন একটা চিঠির জন্যেই এত! চিঠি না পাওয়াটাই এত অসহনীয়, তোমাকে না পেলে কী করব? এখান থেকে ভূমধ্যসাগর কিন্তু দূরে নয়। ডুবে মরা যাবে। অগাস্টাস তখন তোমার ছবির নাম বদলে হয়ত রাখবে 'দি ব্লু সি অ্যান্ড সেভেন্টি নাইন।'

ভালবাসা।

ইতি, তোমার মন্টি।

চিঠি শেষ করতেই আবুর কথা মনে পড়লো। চিঠি পড়তে পড়তে মন্টির মধ্যে তন্ময় হয়ে থাকার পর্দা ছিঁড়ে আবুর মুখ কেন ভেসে উঠল ভেবে পেল না বিলকিস। মনের মধ্যে মোচড় ওঠে, আবুর জন্যে কিছু করা দরকার। কিন্তু কতটুকুইবা তার ক্ষমতা?

কালকে চিরকুটে লেখা আবুর ওই কথাটা— 'আরেকটা তারিখ নাইবা নিলেন'— একেবারে মর্মে এসে নাড়া দিয়েছে তাকে। এতকাল যা ছিল আড়ালে তার স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসে বিব্রত করে দিয়ে গেছে বিলকিসকে। তা হাত পা বাঁধা। আবুর জন্যে মমতা হয়, কিন্তু হাত ওঠাতে গেলে যে টান পড়ে; মন্টি তার সর্বস্ব নিয়ে এত ভরসা করে আছে। বিলকিসের মনের ভেতরটা খুব অসুখী হয়ে থাকে। জগৎ জোড়া একী নির্মম পরিহাস! লুসিয়েন অগাস্টাস এদের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, লুসিয়েন তার বিরাগ দিয়ে শক্তি জোগাচ্ছে অগাস্টাসের। বিলকিস ভাবে তার বিরাগেও কি শক্তিমান হয়ে উঠতে পারে না আবু

আবুকে অনেক কিছু করতে হবে। অনেক বড় হতে হবে। অমন সংবেদী ছেলেটা ইচ্ছে করলে অনেক বড় হতে পারে। বিলকিসের মনে হয়, তার যদি কোন অলৌকিক শক্তি থাকত তাহলে এই মুহূর্তে আবুকে পৃথিবীর সবসেরা মানুষ করে দিত।

রাতে চিঠির জবাব লিখতে বসলো বিলকিস। লিখবার আগে আরো দু'বার পড়ল চিঠিটা; যেন যথেষ্ট করে অনুভব করে নিল মন্টিকে। বারোয়ারি কথায় ঠাসা জবাব। লুসিয়েনকে বকলো খানিক অগাস্টাসকে ভোগাবার জন্যে। অগাস্টাসের জন্যে দুঃখ করল তার ছবি বিক্রি হয় না বলে। লিখল, সেদিন ভোর রাতে অগাস্টাস মারপিট করে ভালই করেছে, নইলে নিজেরই ওপরে প্রতিশোধ নিত। সেটা হতো আরো ভীষণ। মন্টি তার ঝড় আগলে সুবুদ্ধির পরিচয়ই দিয়েছে।

লিখল, এখানে আবু নামে তার এক বন্ধুর কথা। লিখল, এমন একেকটা লোক থাকে যারা অচেনাও থাকে না, আবার যাদের চেনাও যায় না। তারা সর্বমানুষের অনাত্মীয় হয়ে থাকার জন্যেই যেন এ পৃথিবীতে জেদ করে বেঁচে আছে। পরে লিখল দেশের খবর আর আবহাওয়ার কথা।

এতক্ষণ চিঠি থেকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে এসেছে নিজের কথা। চিঠির সবশেষে ছোট্ট করে বিলকিস লিখল—

খুব যে ভয় দেখাচ্ছ আমাকে! তোমাকে এ রকম বিচলিত হতে দেখলে নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারিনে।

পারবে আমার মতো জেদি, স্পষ্ট, শাদা একটা মেয়েকে নিয়ে সারা জীবন কাটাতে ?
তোমার জন্মদিন আমার মনে ছিল। ওই দিনটা আমার কাটবে ছুটি নিয়ে; তোমার কথা মনে করে।

বকুলের ঠিকানা চেয়েছে হাশেম। কিন্তু আবু কোথায় খুঁজবে বকুলকে ? সেগুন বাগানের প্রতিটি বাড়ি ? রেস্তোরাঁয় দুপুরে অনেকক্ষণ ধরে একটা পথ আবিষ্কারের ভাবনা ভাবল। কিন্তু কোন ফল হলো না। আজ দু'দিন হলো আবু শুধু ভাবছেই। এতদিন পরে বকুলকে কী দরকার ? ভাবতে থাকে আবু। যাকে ভালবেসেছিল হাশেম, পাঁচ বছর আগেই তো তাকে কবর দিয়ে চলে গিয়েছিল। আজ ফিরে এসেছে কবর থেকে মৃতমুখ তুলে দেখবার জন্যে ? হাশেম ভাইয়ের ব্যাকুল মুখের কথা মনে করে আবু ভীষণ অস্থিরতায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে থাকে মুঠি বন্ধ করে। একটা কিছু করা দরকার। খামোকা একটা শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে জিনিস দেখতে থাকে আবু। দেখে না, চোখটাকে একটা কিছুতে স্থির রাখা চলে, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। হঠাৎ রেস্তোরাঁয় ফিরে এসে টেলিফোন করে বিলকিসকে।
বিলকিস ?
হ্যাঁ বলছি।
আমি আবু।
কী ব্যাপার ?
বিলকিসের বুকের ভেতরটা স্তব্ধ হয়ে যায়। এই ভরদুপুরে আবু হঠাৎ টেলিফোন করল কেন ? উদ্বেগ নিয়ে টেলিফোনের উপর ঝুঁকে পড়ে বিলকিস। কিন্তু অনেকক্ষণ কোন উত্তর আসে না। আবারো সে শুধোয়, হ্যালো, কী ব্যাপার ?
তখন আবু বলে, আমার একটা কাজ করে দিতে পারবেন ?
কী কাজ ?
প্রায় আর্তনাদের মত শোনায় বিলকিসের কণ্ঠ।
আবু বলে, কিছু না। একটা ঠিকানা দরকার, খুঁজে দিতে হবে।
ঠিকানা ?
হ্যাঁ, ঠিকানা। বকুল। প্রায় পাঁচ বছর আগে ইউনিভার্সিটিতে পড়ত। বিয়ে হয়েছে। সেগুন বাগানে না কোথায় আছে শুনেছিলাম। বড্ড দরকার। পারবেন ? আজ-কালের মধ্যেই দরকার।
আবুর কণ্ঠের ব্যাকুলতা টের পেয়ে বিলকিস যেন অবাক হয়, তেমনি তার জন্যে কিছু একটা করতে পারার সম্ভাবনায় আগ্রহে ভরে ওঠে। নিশ্বাস ফেলে বলে, হ্যালো, আমি নিশ্চয় দেখব।
কষ্ট দিলাম।
না, না। আপনি কাল একবার খোঁজ নেবেন। কেমন ?

আমেনা আবছা অবাক হলেন আবুকে দেখে। বীথিকে নিয়ে হঠাৎ আবার কিছু হলো নাকি ? বীথির বাবার চিঠিটা পাবার পর থেকে তিনি বড় চিন্তিত ও সন্ত্রস্ত আছেন। উদ্বিগ্ন গলায় শুধোলেন, এই ভরদুপুরে ? মুখটা যে একেবারে তেতে উঠেছে।

আবু ম্লান হেসে বলল, এইতো, এলাম।

বিলকিসের কাছে টেলিফোন করে ভাবছিল কোথায় যাওয়া যায়।

ইউনিভার্সিটি বন্ধ। বাসায় ফিরে যাবে, যেত, যদি বীথি ও রকম পাথরের মতো বসে না থাকত। বড় চাচিমার কাছে অনেকদিন আসা হয়নি, মনে মনে ভাবল আবু। ছেলেপুলে নেই। এলে কত খুশি হন। আমেনা শুধোলেন, হাশেম কেমন আছে ?

ওই রকমই। তুমি আর দেখতে গেলে না যে ?

যাবো কী, বাতের জ্বালায় অস্থির হয়ে আছি, বাবা। এক পা নড়বার যো নেই।

আমেনা নিরিখ করতে থাকেন আবুকে। ভাবেন বীথির বাবা যা লিখেছেন তা কী সত্যি ? কথাটা কি তিনি জিজ্ঞেস করবেন আবুকে ? কিন্তু মুখে বলেন, হাশেম কিছু বলে কোথায় ছিল ?

বলে, মানুষ দেখতে বেরিয়েছিলাম।

ওমা, সে কিরে ?

আবু হাসল। হাসতে হাসতে বলল, ও সব তুমি বুঝবে না। বাবা, মা, এমন কী বড় চাচা অবধি হাঁ হয়ে গেল হাশেম ভাইয়ের কথা শুনে।

আমেনা সংশয়ে দুলতে দুলতে বললেন, তাহলে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে।

প্রলাপ! একেবারে ভাল মানুষের মতো, চাচিমা। চলো, নিজে শুনে আসবে। তখন দেখব কার কথা ঠিক।

আবু একটা ছোট্ট ছেলের মতো করতে থাকে। বড় চাচিমা ভীষণ আদর করেন তাকে।

যাহ, তুই বাড়িয়ে বলছিস, হিংসুটে। কই তোর চাচাতো কিছু বললেন না।

বেশ। বলে নি তো বলে নি। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

ভাত খাবি ?

কী মাছ ?

ভালো মাছ নেইরে। একটা ডিম করে দি' ?

দাও।

খাবার সাজাতে সাজাতে আমেনা আবার বীথির বাবার চিঠিটা মনে করেন। বীথির বাবা লিখেছেন, 'বীথিকে আপনার কাছে এনে কিছুদিনের জন্যে রেখে দিন।'

প্রস্তাবটা পেয়ে একদিকে যেমন কষ্ট হয়েছে, তেমনি খুশি লেগেছে আমেনার। হোক না কয়েকদিনের জন্যে তবু তো বীথি থাকবে তার কাছে। তার নিজের মেয়ে হলে এতদিনে বীথির মতোই বড় হত। কিন্তু আবুর সাথে মেয়েটার যদি সত্যি সত্যি ভাব হয়ে থাকে তো আবু কষ্ট পাবে। আমেনার কষ্টটা সেইখানে।

পরে তিনি মনে মনে একটা সমঝোতায় এসেছেন। বীথি তো আর তেমন দূরে রইল না, পরের ঘরেও রইল না। আবু আসবে যখন খুশি। বরং আবু-বীথি, তখন দুজনকেই পাওয়া যাবে চোখের সমুখে।

ভাবলেন আবু হয়ত ইতিমধ্যেই শুনেছে বীথিকে নিয়ে আসা হচ্ছে এখানে, তাই আগে থেকে নিজেই পা বাড়িয়েছে তাঁর দুয়ারে। নইলে কোনদিন আসে না এ সময়ে, এই ভরদুপুরে আজ আসবে কেন ? এসেছে, পরে যেন সময়ে অসময়ে এলে অবাক না হন তিনি। ভাবতে ভাবতে আমেনার মুখে মধুর হাসি দেখা দিল।

আবু খেতে বসলে আমেনাও তার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। দেখলেন আবুর গোগ্রাসে খাওয়া। একটু মন্দা পরলে শুধোলেন, কী সব শুনি, আবু ?

আবু চোখ তুলে তাকাল। বুঝতে পারল না।

কী ?

বলতে গিয়ে অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন আমেনা। বড় জোর বলতে পারলেন, ঐ আর কী!

আবু এবারে অবাক হয়ে গেল। বড় চাচিমার কথায় সম্পূর্ণ একটা নতুন সুর বাজছে।

গ্লাসে পানি ভরে দিতে দিতে তিনি বললেন, হ্যাঁরে, তুই নাকি বীথিকে বিয়ে করবি ?

কাকে ?

আহা, বীথি। শুনছি, তাই জিজ্ঞেস করলাম।

আবু আমেনার দিকে একটুখন তাকিয়ে থেকে হাত ধুতে ধুতে বলল, ঠাট্টা করছ কিনা বুঝতে পারলাম না।

ওই তোর খাওয়া হলো ?

তোয়ালে দিয়ে হাত মুছে আবু তার চেয়ার আমেনার মুখোমুখি নিয়ে বসল। বলল, হয়েছে। তুমি ঠাট্টা করছ বলে খাওয়া নিয়ে আমিও ঠাট্টা করব নাকি ? আমার বেশ খিদে পেয়েছিল।

আমেনা রাগ করলেন শুনে।

তোর সাথে ঠাট্টা করবার আর কথা পেলাম না ?

আবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বুঝতে পারল। বলল, তোমাদের সব হয়েছে কী ? সেদিন সন্ধ্যায় মাকে জিজ্ঞেস করলাম, বীথি কোথায় ? আমাকে অবাক করে দিয়ে উত্তর দিলেন— ওকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন ? মাতামাতি কিসের, চাচিমা ? কেন, বীথির আমি কী করেছি ?

তবে কি ওরা এমনি বলে ?

কে কী বলে না বলে তা আমি জানব কী করে ?

বীথির সঙ্গে বেড়াতে যাস না তুই ?

যাই।

ওর ঘরে যাস ?

যাই।

যাবার একটা সময় আছে।

বীথির কাছে আমার আবার সময় বুঝে যেতে হবে নাকি ?

কথাটার অন্য মানে বুঝলেন আমেনা। বললেন, তবে যে বললি ওর সঙ্গে ভাব নেই!
বেশ তো বীথিকেই জিজ্ঞেস করে দেখো। ওর সঙ্গে কী আমার আর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না?
এটা একটা সম্পর্কের ছিরি হলো, আবু?
রাগ করে উঠে দাঁড়ায় আবু।
চললি?
যাবো নাতো কী!

দুপুর থেকে জ্বরটা নেই হাশেমের। মাথায় বালতি বালতি পানি ঢালার পর এই এতক্ষণে চোখের লালটা কমেছে। মরিয়ম ছেলের মাথা মুছিয়ে দিয়ে তোয়ালে নিঙড়ে রাখলেন।
হাশেম শুধাল, বীথি কই, মা?
এইতো এতক্ষণ ছিল তোর কাছেই, লক্ষ করিসনি। ওর শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না, ঘরে গেছে।
হাশেম উদ্বিগ্ন হলো।
কেন, কী হয়েছে?
কিছু না।
মরিয়মের বাঁ হাতে রয়েছে হাশেমের মুখ। তিনি সিঁথি করিয়ে দিচ্ছেন আস্তে আস্তে। মরিয়মের মন বীথি চলে যাবে শুনে অবধি খারাপ হয়ে আছে। তার ওপরে সে রাতে বীথির জড়িয়ে ধরে অমন কান্না তাঁকে আরো দুর্বল করে দিয়ে গেছে যেন। নিয়ে যাওয়ার কথা শুনলে বীথি কষ্ট পাবে, এটা তার চেয়ে আর কেউ ভালো জানে না।
মায়ের হাত থেকে সরে এসে হাশেম বালিশে মাথা রেখে চোখ বুঁজতে বুঁজতে বলে, ওকে একা থাকতে দিও না, মা। একা থাকলে ও মরে যাবে। তুমি ওর দিকে তাকিয়ে দেখতে পারো না?
দেখিরে দেখি।
জানো মা, ওই তোমাদের অসুবিধে। মানুষের অন্তরটা হচ্ছে একটা আলাদা পৃথিবী। *মানুষটার নিজস্ব পৃথিবী। তোমারই পেটে ধরা ছেলে,* অথচ তার বুকের ভেতরে কী আছে জানতে পারো? কেউ কি কারো কথা জানতে পারে? বার থেকে আবছা আবছা শুধু অনুভব করা যায়। বীথিকে জানবে কী করে? সেদিন প্রথম দেখলাম। দেখে যেন আমার নিজেরই ভয় করল।
দরোজায় দাঁড়িয়ে বীথি।
মরিয়ম বললেন, তুই আবার উঠে এলি?
হাশেম চোখ মেলে দেখে। হাত বাড়িয়ে দেয়।
আয়, বীথি। জ্বরটা তুই কমিয়েই দিলি।
মরিয়ম খুশি হয়ে ওঠেন।
এখন ভালো লাগছে, বাবা?

হ্যাঁ।

বলে হাশেম ম্লান হাসে। আবার সেই সুন্দর হাসিটা।

বীথি তখন তার শিয়রে বসে কপালে হাত রাখে। হাশেম বলে, এলি কেন? মা বলছিলেন তোর শরীর খারাপ। তুইও মরবি নাকি, বীথি?

সন্ধ্যের আগে দিয়ে হাশেমকে হাঁটতে দেখে সবাই অবাক হলো। এই দুপুরেও দাঁড়াতে পারছিল না। মরিয়ম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

উঠলি কেন, হাশেম?

হাশেমের যেন তা কানেই যায় না। লম্বা লম্বা পা ফেলে কেমন অদ্ভুতভাবে হাঁটতে থাকে বারান্দা দিয়ে।

মরিয়ম তখন একেবারে তার কাছ বরাবর উঠে আসেন। তিরস্কার করে বলেন, তুই আমাকে জ্বালাতেই এলি, হাশেম। পড়ে গিয়ে মাথা ফাটাবি নাকি?

হাশেম মায়ের কাঁধে হাত রেখে বলে, বড্ড ভীতু তুমি। বলেছি না, শরীরটা এতকাল চোখ বুঁজে থেকে এখন শোধ নিচ্ছে। শরীরটা যা খুশি করছে, আমি তাই বলে বসে থাকব নাকি? আমাকে হাঁটতে দাও, মা।

মরিয়ম তখন ঘরে এসে বীথিকে পাঠিয়ে দেন তার সঙ্গে থাকবার জন্যে।

হাশেম ততক্ষণে নেমে গেছে রাস্তায়।

রাস্তাটা বিকেলের আভায় শান্ত হয়ে আছে। দু'ধারের বাসাগুলো আড়াল পড়েছে সুন্দর করে ছাঁটা দেয়াল-গাছে। বাঁধানো নিকানো চত্বরের মতো ভ্রম সৃষ্টি করছে রাস্তায় পীচ।

বীথিকে দেখে হাশেম বলল, মা পাঠিয়ে দিলেন বুঝি? বেশ তো আয়, দু'জনে মিলে বেড়ানো যাক।

হাশেম বীথিকে পেয়ে আশ্বস্ত হলো। এই মুহূর্তে কথা বলার একটি লোক দরকার। মাথার মধ্যে কথারা তখন থেকে জোট পাকাচ্ছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ হাঁটবার পর বীথি হঠাৎ শুধোয়, তুমি অমন করো কেন, হাশেম ভাই?

হাশেম মুখ উজ্জ্বল করে হাসে।

কী করি রে?

বীথি এই ক'টা দিনে হাশেমকে নিজের এত কাছে মনে করতে পেরেছে যে, সেই কথা জিগ্যেস করতে আর কোন বাধা নেই। বকুলের কথা ভাবতে থাকে বীথি। মুখে বলে, আর কেউ হলে বিছানা থেকে উঠতে পারত না।

আচমকা উত্তর আসে হাশেমের কাছে থেকে, তুই নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারিস না?

কম্পিত কণ্ঠে বীথি বলে, না, কই?

পরে বলে, একটু একটু পারি।

*হাশেম তখন আবার হাসে। বীথির কাঁধে হাত রেখে সন্ধ্যের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলে, বীথি, এ হচ্ছে একটা বন্ধন। তোর মানব-জন্মের মাশুল। দ্যাখ, আমি ধর্ম মানিনে, আমি কেবল একটা জিনিসেরই দাম দিই— যাকে আলোকিত আত্মা বলি।*

বীথি শুধোয়, বুঝতে পারলাম না কিন্তু।

হাশেম তখন বিশদ করে বলতে চেষ্টা করে, ভাল থেকে মন্দটা চিনে নেবার ক্ষমতা অর্জন করা চাই, বীথি। এর কথাই বলছি, মানুষের জন্ম থেকে ঐ একটিই সাধনা। আর সব তো তার কাজ নয়, কাজের নামে ফাঁকি। বলেছি, ধর্ম মানিনে, তাহলে আমার বিশ্বাস কিসে? বিশ্বাস আমার তোর সবার অন্তরের পরে, বীথি। মনটাকে প্রথমে শিক্ষিত করে তুলতে হয়। একবার শিক্ষা শেষ হলে তার আর ভয় নেই। তখন মনের নির্দেশে সে যা কিছু করতে পারে, যা করবে সব ভাল।

বীথি বলে, দেশ শুদ্ধ মানুষকে কি এই বুঝিয়ে এলে, যে ওপরে কেউ নেই?

তা কেন? ঈশ্বর আছেন, নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে এতকাল যা শুনেছিস, সব মিথ্যে। তিনি আমার অপরাধের জন্যে দোজখে নেবেন না, পুণ্যের জন্যে বেহেশতের ডবল মালা গলায় পরিয়ে দেবেন না। আমরা সবাই তাঁর স্বর্গের আনন্দের অংশ। কিন্তু মানুষ তো? তাই পৃথিবীতে স্বর্গ সৃষ্টি করতে গিয়ে কেউ যদি অনাসৃষ্টি করে ব'সি তো তিনি ব্যথিত হন, শাস্তি দেন না, দিতে পারেনই না। সেইজন্যে তো বলি, বিশ্বাসকে বড় করে তোল। কী করে?

হাশেম এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল।

সবার মতো তুইও প্রশ্নটা করলি। ওইখানেই সবাই ভুল করে আমার কাছে হাত পেতে দাঁড়ায়। আমি নিজেই যে ভুগছি এইটে কেউ বুঝলো না, সাধু মনে করে সবাই পা জাড়িয়ে ধরলো। পাঁচটা বছর আমি স্থির থাকতে পারিনি রে।

বীথি মনে মনে হাশেমের কথাগুলো নিয়ে ভীষণ ভাবতে থাকে।

ভালোবাসতে শেখ, বীথি। খুব বড় করে ভালোবাসা। মানুষের সবচেয়ে বিচ্ছিরি, কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর বৃত্তি ওইটে। যে স্বর্গে যাবার জন্যে মানুষের মাথা কুটে মরা. সেতো এই ভালোবাসারই রূপসৃষ্টি। এর পেছনে পরিকল্পনাটা দেখেছিস ঈশ্বরের? মানুষকে তিনি হাড়-মাংসের ভেতরে এমন একা করে রেখেছেন যে, তাকে বেরুবার জন্যে সাধনা করতেই হবে। আত্মার এই বেরিয়ে আসা, এর নামই তো ভালোবাসা। কিন্তু এত যে বলছি, বোঝাতে পারব না তবু। নিজের রক্ত দিয়ে বুঝতে হয়।

বীথির কেমন ভয় করতে থাকে হাশেমের কথা শুনে। হাশেম কথা বলতে বলতে তাকে পেছনে ফেলে আপনমনেই হাঁটছে। নিজের মধ্যে আবার ডুবে গেছে লোকটা। বীথির দিকে যেন তার দৃষ্টিই নেই।

বীথি জোরে পা ফেলে তার সঙ্গ নিলে, হাশেম মুখ ফিরিয়ে বলে, ইস্, জীবনে এত অসংগতি, বীথি। মাহবুব এসেছিল না? ওর কথাই ধর। ইতিহাসে এম,এ, পড়ে ফার্স্ট ক্লাস পেল। কিন্তু কাজ নিল কী? কেরানির। যার সঙ্গে ইতিহাস জানার কোনো সম্পর্কই নেই। এখন আবার দাঁড়িয়েছে প্যারেডের মাঠে। একটার সঙ্গে আরেকটার এত গরমিল যে দিনভোর হো হো করে হাসলেও তোর হাসি ফুরোবে না। তবু কি মাহবুব বুঝতে পারে? আসলে যে কাজ ওর করার কথা তা হয়ত এ তিনটের একটাও না। অথচ বেশ আছে।

মাহবুবকে হঠাৎ নতুন আলোয় দেখতে পায় বীথি। বলে, হয়ত তাই।

হাশেম বলে, একী শুধু তার একার ? সবার। মানুষের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, সে নিজের সাফাই চমৎকার সৃষ্টি করতে পারে। বড় বিচ্ছিরি ক্ষমতা। তাই আসলে যেখানে মানুষ মরে আছে, সেখানে সে ভাবে বেঁচে আছে। বেঁচে ক'জন থাকতে পারে, বীথি ?

প্রশ্নটা করে নিজেই তার উত্তর ভাবতে থাকে হাশেম। পরে বলে, এত যে বকে চলেছি, রাস্তার মানুষ শুনলে মনে করবে, আমি পাগল। মনে করবে, পৃথিবীতে যুদ্ধ, খাদ্য বলে কোনো সমস্যাই নেই। তা কেন ? বরং বাইরে থেকে এগুলোই তো প্রবল। কিন্তু ভেতরে ? মানুষের আত্মার ভেতরে এত অরাজকতা, শূন্যতা চলছে যে তার একটা বিহিত না করলে কী হবে ভেবে দেখেছিস ? ভেতরের ফাঁকিটা ভরাবার জন্যে মানুষ নিজের সঙ্গে কেবলি ফাঁকি খেলছে এইটে বুঝতে পারিস না ?

বীথির মনে হয়, হাশেম ভাই বেঁচে আছে।

হঠাৎ হাশেম তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, মানুষের আয়ু কত, বীথি ?

বীথি ভাবতে ভাবতে উত্তর দেয়, চল্লিশ— পঞ্চাশ— ষাঠ আনকের আরো বেশি।

হাশেম বলল, এটা হচ্ছে মানুষের আরেকটা ফাঁকি। ধৃষ্টতাও বলতে পারিস।

শুনে বীথি অবাক চোখে তাকায়।

হাশেমের চোখে যেন মেঘের মতো ছায়া লেগেছে। সে বলে, মানুষের আয়ু আসলে একদিন দু'দিন তিনদিন, বড়জোর চার দিন। কোনো মানুষের আয়ু আবার একেবারেই নেই। মরবার সময় মানুষ এক মুহূর্তে পেছনের যে কটা দিনের কথা মনে করতে পারে, যে কটা দিনের জন্যে তার আবার জীবন শুরু করতে ইচ্ছে করে, সেই কটা দিনই তার আসল আয়ু। জীবনে এ রকম দিন দুটো তিনটের বেশি আসে না, বীথি।

বীথি তখন নিজের কথা ভাবতে থাকে। চোখ বুঁজে মনে করতে চেষ্টা করে, সে বেঁচে ছিল কটা দিন ? অবাক হয়ে যায়, যখন তার চোখে ভেসে ওঠে সেই রাতটার কথা যে রাতে আবু তাকে নিয়ে বাগানে অশ্রান্ত গায়চারি করছিল আর বলছিল, তোকে কেন ডাকলাম, বীথি ? বীথি বিব্রত হয়ে পড়ে। আর তো সে মনে করতে পারছে না। তাহলে এই কি সে পরম দিন যেদিন তার জীবন ছিল সত্য, পৃথিবী ছিল আনন্দ ?

হঠাৎ হাশেম বলে, বীথি, আমার আবার জ্বর আসছে নাকি দ্যাখতো ?

উদ্বিগ্ন হয়ে সে হাশেমের হাত ধরে জ্বরটা বুঝতে চেষ্টা করে। বলে, কই না তো।

আসছে রে আসছে। আমি বুঝতে পারছি না ? আজ আবার আমার খুব বকাবকি করতে ইচ্ছে করছে।

থাক, তোমাকে বকতে হবে না। ঘরে চলো।

হাশেমের সে কথা যেন কানেই যায় না। বলে, জীবনে বেঁচে থাকার দিন সৃষ্টি কর, বীথি। নইলে মানুষ হয়ে, অনুভূতির মত সাংঘাতিক সব বোমা বুকে নিয়ে জন্মালি কেন ?

দু'জনে বাসায় ফিরে আসে। হাশেমের জ্বর সত্যি আবার এসেছে।

বীথি, বীথি, শোন।

বাতাসের মতো অতিদূর, কোমল, প্রায় ফিসফিস কণ্ঠ কাঁপন তোলে। রাত এখন অনেক। বীথির বড় আশা হয়, এই বুঝি সে আবার বেঁচে উঠল ভ্রম হয়, যেমন করে দল মেলে পদ্ম

তেমনি করে কোথাও উন্মোচিত হচ্ছে তার জীবন। বীথি বাইরে এসে দেখে আবু তার জন্যে নতমুখে অপেক্ষা করছে। অন্যদিন হলে সে নিজেকে তার ডাকের মুখে পাথর করে রেখে বিছানায় পড়ে কাতরাতো; আজ যেন তার সম্মোহন লেগেছে।

তোর সঙ্গে কথা আছে, বীথি। বাগানে আসবি একবার ?

বাগানে সেই পুরনো সিঁড়ির ধাপে বসলো বীথি আর আবু।

ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্যে বীথি তার শাড়ির আঁচল ভালো করে গায়ে জড়িয়ে বেলি গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল। সেদিন তার কী ভূতে পেয়েছিল, গাছটার অমন সর্বনাশ করে রেখেছে। আজ অবধি একটা নতুন কলিও আসে নি। তবুও কোথা থেকে কিসের সৌরভ ফুটে বেরিয়েছে।

তুই আমাকে জ্বালাতেই এসেছিস, বীথি ?

বীথি অবাক হয়ে যায়। অবাক হয়ে আবার চোখ নামিয়ে নেয়। তার প্রস্তুত মন যেন আর্তনাদ করে খানখান হয়ে ভেঙে যায়। বেঁচে উঠবার বাসনা ছিল বীথির। আজ যদি আবু বলত, তাহলে সে সব দিতে পারত।

আবু তাকে চুপ দেখে বলে, জ্বালানো নয়তো কী ? আমি নাকি তোকে বিয়ে করবার জন্যে খেপে উঠেছি। শুনেছিস ?

বীথির তখন উঠে চলে যেতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু শরীরের কী হয়েছে, যেন এইখানে তার জন্ম, এইখানে মৃত্যু।

আবার আবু বলে, কিরে, সবাই বলছে, তোর কানে যায় না ?

বীথি কী উত্তর দেবে ? অভিমান হয় প্রচণ্ড। বুকটা ফুলতে থাকে কবুতরের মতো। আবু তো ঠাস্ করে তাকে একথা বলতেই পারে। আবুর কি ? তার কাছে সে তো কেবল অনুভূতি ঢালবার গেলাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। নইলে কোনদিন কী বীথির দিকে সে তাকিয়ে দেখেছে ? এইতো এখনো যে আবু তার সমুখে আছে, যেন সে আদৌ এখানে নেই।

কিরে, কথা বলছিস না।

বীথি তখন উত্তর করে, আমি শুনিনি।

শুনে আবু তরংগের মতো ধ্বনি সৃষ্টি করে তার হাসিতে। বলে, সবাই কী একচোখো, বীথি। তোর সঙ্গে যে আমার ভালবাসা নেই, আমি তোকে যে একটুও ভালোবাসি না, এইটে কারো চোখে পড়ল না। চোখে পড়ল কখন তোর কাছে আসি, কখন তুই বেরোস আমার সঙ্গে, এইসব।

বীথি শিউরে উঠে। আবু তার চারধারে এমন এক কঠিন বৃত্ত টেনে আত্মমগ্ন হয়ে আছে যে দেয়ালের ওপারে তাকাবার চোখ তার অন্ধ এখন।

শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে বীথি উচ্চারণ করল, কেন তুমি আমাকে টানো ? আর টেনো না। আমি এসব কিছু বুঝি না। তোমার হাতে কি আমাকে মরতে বলো।

এতগুলো কথা একসঙ্গে কোনদিন বীথি বলেছে বলে আবুর মনে পড়ে না। অবাক হয়ে শুধোয়, তোর আজ কী হয়েছে ?

কী হবে ? কিছু না।

তারপর একটু থেমে যোগ করে, এ কথা বলবার জন্যে আমাকে এভাবে ডেকে না আনলেও হতো।

আবু হাসে।

কেন ? কেউ দেখলে গুজবটা বিশ্বাস করবে। এই ভয়, না ? একে তুই ভয় করিস ?

ভয় করবো কেন ? আমি তোমাকে ভালোবাসিনি। ভয় কিসের ?

এই কথাটা বলতে গিয়ে তার যে কী কষ্ট হলো তা আবু জানতেও পারল না। বীথির সমস্ত স্নায়ু যেন টানটান হয়ে মোচড় খেতে লাগল। বীথি কাঠ হয়ে বসে রইল।

আবু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বীথি, তুই আর আমার কাছে আসিস না, আমিও আসবো না। সাধ করে ক্ষতি ডেকে এনে লাভ কী ?

বীথি ভাবে, এই যদি তার মৃত্যুর মুহূর্ত হয়, তাহলে পেছনে একটি মাত্র দিন শুধু রইল। আর কিছু না। একটা দিন কি একজন মানুষের অহংকারের জন্যে যথেষ্ট ? মরতে তার ভয় করতে লাগল, যেন এখুনি সত্যি সত্যি তার মরণ আসছে।

অশান্ত উঠে দাঁড়ায় আবু।

তবু তো তুই আমাকে বুঝতে পারতি। আজ থেকে সে পথটাও বন্ধ করে দিলাম রে। মরতে হয়, আমি নিজের ভেতরেই মরে যাব।

চমকে ওঠে বীথি। আবুও যে মৃত্যুর কথা ভাবছে।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আবু বলে, জানিস বীথি, আমি একটা পাথরকে ভালবেসেছি।

বলতে বলতে আবু যেন স্পষ্ট দেখতে পায় বিলকিসকে।

আমার ভাগ্যটা এমন কেন রে ? কী দেখলাম আমি ওর ? যেদিন প্রথম দেখলাম সেদিন মনে হলো, আমার জন্মের মুহূর্ত থেকে ও আমার এইখানটায় বাসা করে ছিল।

আবু হাত দিয়ে নিজের হৃদয় দেখায়। দেখিয়ে বিসদৃশ রকমে চুপ করে থাকে। এক সময়ে জেগে উঠে বলে, কোনদিন ভালবাসলে বুঝবি, এই অক্ষমতার বরফে পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকাটা কী।

বলে আবু ফিরে যায় বারান্দা দিয়ে। বারান্দা দিয়ে সিঁড়িতে, সিঁড়ি দিয়ে ওপর তলায় তার নিজের ঘরে। আবু যদি ফিরে আসত তাহলে দেখত, বীথির মাথার ভেতরে আবার সেই অবোধ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, বীথি নিঃশব্দে কাঁপছে হাঁটুর ওপর মুখ নামিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

পাখাটা ছেড়ে দিয়ে বিলকিস বলল, বসুন। আমি এখুনি আসছি।

রোদ্দুরে রোদ্দুরে বেশ তো হেঁটে বেড়ানো চলছিল আবুর, বিলকিস তাকে গাড়ি থামিয়ে তুলে নিয়ে এসেছে বাসায়। সেদিন সে তাকাতে পারেনি বলে আজ কি ষোলআনায় শোধ দেবার ইচ্ছে ?

ভেতর থেকে একটু পরে পারিজাতের হাতে এলো নেবুর এক গেলাশ ঠাণ্ডা শরবৎ। পারিজাত তাকে দেখে হাসল এবং গেলাশ নামিয়ে রেখেই দৌড়ে পালাল।

বড্ড রোদ, একেবারে আসমান শুদ্ধ তেতে উঠেছে, শরবতের গেলাশ হাতে নিয়ে ভাবলো আবু। সেটা ঠোঁটে ঠেকিয়েছে কী ঠেকায় নি, বিলকিস পর্দা ঠেলে এসে বসলো। মাথায় তার আধ ঘোমটা কাপড় তুলে দেয়া।

অপরূপ লাগল।

রোদ্দুরটা এড়াতে গিয়ে ও ঘর থেকে আসবার সময় হয়ত মাথায় কাপড় তুলে দিয়েছিল, এখনো নামিয়ে নেয়া হয়নি।

বাসায় এসে বিলকিস তার পরনের শাড়িটা বদলে নিয়েছে। এখন যেটা পরে তার সমুখে বসে আছে ঠিক তেমনটি যেন কতকাল আগে মা পরতেন, ভাবল আবু। পাড়ের মধ্যে নীল সুতোয় আঁকা ময়ুর, বাড়ি, গাছ, তারপর আবার ময়ুর বাড়ি, গাছ— পর পর আবার ময়ুর, বাড়ি, গাছ। তার পায়ের পাতা ঘিরে কোলের ওপর দিয়ে, বুক জড়িয়ে মাথার 'পরে গিয়ে পৌঁছেছে ময়ুর, বাড়ি, গাছ।

তন্ময় হয়ে দেখছিল আবু। মায়ের ট্রাঙ্ক খোলা ন্যাপথলিনের ঘুম পাড়ানো ঘ্রাণটা যেন ফিরে আসছে।

বিলকিস কোনরকম ভূমিকা না করে সোজা বলল, সেদিন কি আপনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ?

তার ছোট্ট চিঠিটার কথা বিলকিস আজো ভুলতে পারেনি। বিলকিস বলল, এমন করে চিঠি লিখে গেলেন, যে কেউ দেখলে একটা কিছু ভেবে বসত। কেন লিখতে গেলেন ও সব ? আমি তো কারো সঙ্গে রেখে ঢেকে মিশিনি।

শেষ কথাটার সঙ্গতি খুঁজে পেল না আবু। একটুপর উত্তর করল, কী জানি কেন লিখলাম। দেখুন না, আপনার থাকবার কথা ছিল, থাকলেন না, আগে থেকে নোটিশও দিলেন না।

অনেক দূর বয়ে এসেছিলেন, না পেয়ে রাগ হবারই কথা।

খুব বোদ্ধা মানুষের মতো ভান করে আবু; নিজেকেই নির্মমভাবে বিশ্লেষণ করতে থাকে সে। বলে চলে ক্ষমাহীন কণ্ঠে, মনটা বুঝতে চাইল না। কেন চাইল না ? কী জানি। ছেলে মানুষের মতো রাগ করে বসল। নইলে সত্যি তো কী করে সম্ভব হল ? অন্যায় হয়েছে।

থাক, খুব হয়েছে।

বিলকিস তাকে বাঁ হাতের করতল তুলে বাধা দেয়। বিলকিস যেন আবছা আবছা বুঝতে পারে আবু তার মনের একটা গোলমাল ঢাকতে গিয়ে অযথা নিজের প্রতি রূঢ় হচ্ছে। বিলকিসের যেন মন হয় তার চোখের ভেতরে দুর্বোধ্য কী একটা লিপি পড়তে পারছে। উল্‌টা দিকে আবু ভেতরে আচমকা পরম একটা আলস্য অনুভব করতে থাকে। সব কিছু নিরর্থক মনে হয়। খামোকা বলে, আপনার সঙ্গে অনেক গল্প করতে চেয়েছিলাম একদিন।

আমি তো ভালো গল্প বলতে জানি না।

বেশ তো, আমি না হয় বলবো, আপনি শুনবেন।

শোনার অভিনয় করতে পারবো হয়ত। তাতে খুশি হবেন ?

নিষ্ঠুর শোনায় কথাটা। আবু একটা কথাও বলতে পারে না। যেন এক ফুঁ এ কেউ বাতি নিবিয়ে দিয়েছে। চোখের সমুখে মিছিল করে চলতে শুরু করেছে ময়ুর বাড়ি গাছ, আবার ময়ুর বাড়ি গাছ, আবুর চোখ এসে তার রক্তিম পা ঘিরে পাড়ের ওপর স্থির হয়।

বিলকিসও বুঝতে পারে এমন করে কথাটা বলা ঠিক হয় নি। কিন্তু না বলেও তো উপায় ছিল না। মিছেমিছি লোকটা ভুগবে। সহজ করে দেয়ার জন্য বিলকিস জিগ্যেস করল, সেদিন কে এসেছিলেন ?

কোথায় ?

আপনাদের বাসায়।

আমার বড় ভাই।

বাইরে ছিলেন বুঝি ?

আবুর মাথায় ভেতরে হঠাৎ বাঘের মতো একটা উজ্জ্বল দীপ্তি লাফ দিয়ে পড়ে। ঝুঁকে পড়ে সে বলে, হাশেম ভাই বাড়ি পালিয়ে গিয়েছিলেন।

পালিয়ে ?

বিবাগী হয়ে।

সে আবার কী ?

আবু যেন খুব তুষ্ট হতে পারছিল না বিলকিসের মুখে 'পালিয়ে' শব্দটা শুনে। নিজের ওপরেও রাগ হলো, কেন সে শব্দটা ব্যবহার করতে গিয়েছিল! হাশেমকে যেন সে ভীষণ ছোট করে ফেলেছে। অনুতাপ হতে লাগল তার। বলল, একজনকে ভালবাসতেন হাশেম ভাই।

কী হলো তার ?

সে ভালবাসত না।

বিলকিসের কাছে কথাটা বলতে গিয়ে কেমন হাস্যকর শোনাচ্ছে আবুর নিজের কানেই। এ কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে সে বিব্রত বোধ করতে থাকে। অপেক্ষা করতে থাকে কখন বিলকিস সত্যি সত্যি হেসে ফেলবে, সে মনে মনে চটে যাবে কিন্তু কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু আশ্চর্য, বিলকিস হাসল না। বরং তার গভীরতম দেশে গিয়ে বাসা করে নিল আবুর কথাকটি। ছায়া হয়ে এল তার সারাটা মুখ। বলল, জানেন, মানুষের ভেতরটাকে এত আমি চিনেছি যে, আপনার ভাইয়ের ব্যথাটা যেন বুঝতে পারলাম।

আবুর তখন তীব্র ইচ্ছে করে নিজের আত্মার ওপর থেকে একটানে সমস্ত আবরণ ফেলে দিতে। মাথার ভেতরে এক অশান্ত নাচ হতে থাকে। মানুষের ক্ষমতা এত বাঁধা কেন ? তার মনের পৃথিবীকে কেন শুধু কথার ভেতর দিয়ে, কাজের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করতে হবে ? জানান না দিলে কেন কেউ বুঝতে পারবে না তার ভেতরে কী হচ্ছে ? এ শক্তি কেন মানুষ পেল না যে, সরাসরি আত্মা থেকে আত্মায় ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত তরংগ ?

একী ? আপনি বড্ড ঘামছেন।

আবুর চমক ভাঙ্গে।

পাখাটা বাড়িয়ে দেব ?

দিন।

পাখা হঠাৎ দুরন্ত গতি পেল। তার বাতাসে যেন ঝড় উঠল বিলকিসের শাড়িতে, চুলে। পাখার কেন্দ্র থেকে সরে আসতেই আবার শান্ত হয়ে গেল সব। বিলকিসকে হঠাৎ রক্তের মধ্যে আপন করে অনুভব করে আবু। মনে হয়, তার মাথার ভেতর থেকে একটা শক্তি ফেটে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাসিয়ে দেবে সব কিছু। মুখে বলে, আমাকে উঠতে হবে।

যাবেন ?

আবুর সত্যি সত্যি যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু বসে থাকাও অসম্ভব। জোর করে সে বলে, হ্যাঁ। দরকার আছে।

এলেন, বসলেন না। বলছিলেন গল্প করবেন।

আবু উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মুখ অন্য দিকে রেখে উচ্চারণ করে, কাল, না হয় পরশু আবার আসব।

তার কথা বলার ধরনটা অদ্ভুত লাগে বিলকিসের কাছে। হঠাৎ মনে পড়ে বকুলের ঠিকানার কথা। বলে, বকুলের ঠিকানাটা নিয়ে যান।

পেয়েছেন ? কী করে ?

জবাব না দিয়ে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে ঠিকানাটা লিখে দেয় বিলকিস। লিখতে লিখতে বলে, বকুলকে ভালোবাসত আপনার হাশেম ভাই, না ?

শুনে অবাক হয় সে। বিলকিস কী করে টের পেল ? বকুল তাকে বলেছে ? অসম্ভব, সে বলতেই পারে না। কিছুতেই যেন আবু ভাবতে পারে না, বকুল উচ্চারণ করবে এই অতীত। বিস্মিত আবু ঠিকানাটা হাত বাড়িয়ে নেয়। বিলকিস দরোজার পর্দা ঠেলে ধরে বলে, আসবেন কিন্তু।

আবু কোনো উত্তর না দিয়ে পথে নেবে আসে। সমস্ত শক্তি যেন তার অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তার চেতনা আচ্ছন্ন করে সঙ্গীতের মতো ফিরে ফিরে বাজতে থাকে— আসবেন কিন্তু আসবেন কিন্তু।

বিলকিস যেটা তাকে বলতে গিয়ে বলতে পারে নি— বকুল তার বড় বোন।

আগুন পথের দু'ধারে ফুলে ফুলে জ্বলছে একেকটা গাছের চূড়ায়। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। চোখ রাখা যায় না। প্রকৃতি যেন আজ ষড়যন্ত্র করে আবুর সঙ্গে চতুরালি করছে। কোনদিন যা চোখে পড়ল না, বিলকিসের বাসা থেকে বেরিয়েই দু'চোখের দুয়ার ঠেলে তা ভেঙে পড়ছে। চলতে চলতে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সে গাছের অজস্র শিখরের দিকে। কোথায় যেন মিলের আভাস।

তার মনটাও এখন এমনি অস্থির অথচ উদাস; এমনি মাতাল করা, লাফিয়ে পড়া, অথচ দূর। পথ দিয়ে চলছে. তবু মনে হচ্ছে এখনো বিলকিসের সমুখে বসে আছে। এখনো যেন স্পষ্ট তাকে দেখতে পাচ্ছে ঐ প্রখর উজ্জ্বল বর্ণের ভেতরে।

বিলকিসকে আজো কিছু বলা হলো না। মনের ভেতরে চাপা একটা আক্রোশ ফুঁসতে থাকে। কী হতো বললে ? হয়ত যা হতো, তা স্বর্গের চেয়েও সুন্দর। হয়ত, বিলকিস অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। পরে আবছা গলায় উচ্চারণ করত, আমি জানতাম।

আবুর দু'চোখ পুড়ে যেতে থাকে রক্তিম ফুলে।

অস্থির হয়ে বাম করতলে ডান হাত মুঠো করে সে আঘাত করতে থাকে। খুব হাঁটতে ইচ্ছে করছে। রোদে তেতে জ্বর জ্বর হতে ইচ্ছে করছে। তীক্ষ্ণ, দুর্বোধ্য, মানে হয় না উচ্চারণে মুখটা ব্যথা করে ফেলতে ইচ্ছে করছে, ঠিক যেমন ছোটবেলায় একেকদিন করত। অকারণে তখন হঠাৎ খেপে গিয়ে ধুলো পানি ঝড়ে একাকার হয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু সেই অনেক আগের দিনগুলোয় ছিল না বেদনার স্মৃতি। আর আজ কোথায় যেন বেদনার বীজ অংকুরিত হয়ে উঠবার জন্যে থরথর করে কাঁপছে।

এ আমার কী হলো ? এ আমার কী হলো ?

আবু মনে মনে বুক-ভাঙ্গা-মন্ত্রের মতো আওড়াতে থাকে। আবার চোখ মেলে ওপরের দিকে, সামনে ডানে বামে তাকায়। গাছ আর গাছ।

রঙের উৎসব লেগেছে ডালে ডালে।

যেন সে জানত বীথি বসে বসে বই পড়ছে এই ঝিমঝিম দুপুর বেলায়। তক্ষুনি বাসায় ফিরে সোজা বীথির ঘরে এলো।

বীথি সত্যি সত্যি বই পড়ছিল। সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে দাঁড়াল আবুর রোদে পোড়া লাল চেহারা দেখে। কোথায় ছিল ? কী করছিল ? বীথি বুঝতে পারল না, আসবে না বলে মাত্র কালরাতেই প্রতিজ্ঞা করবার পর আজ এমন কী অসাধারণ কারণ ঘটলো যে আসতে হলো ?

যে কোনো কারণই থাক, জোর করে পাথর হতে চেষ্টা করল বীথি। সে সব শুনেছে, সব টের পেয়েছে। তাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে এ বাসা থেকে বড় চাচার বাসায় নিয়ে যাবার জন্যে। যাবে না সে, কিছুতেই যাবে না।

আবু বলল, বীথি আছিস ?

যেন খুব নিশ্চিন্ত হলো তাকে ঘরে পেয়ে। হাত বাড়িয়ে বলল, আয়, আমার সঙ্গে।

আশ্চর্য হলো বীথি। প্রতিজ্ঞার কথা মানুষ মাত্র ষোল ঘণ্টার ব্যবধানে ভুলে যায় কী করে ? আবু আবার বলল, আয় না।

আস্তে আস্তে চেয়ারে গিয়ে আগের মতো বসলো বীথি। বইটাকে আঁকড়ে ধরল শক্ত হাতে। বুঝতে পারল আবুর সেই আবেগ উদ্দাম মুহূর্তগুলো আবার ফিরে এসেছে। সেই উদ্দামতার তাড়নায় কোন কিছুই আর টিকতে পারছে না।

আবু একটা চিত্রের মতো হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ তার আকুল হয়ে উঠেছে। ঠোঁটের 'পরে অনুপম হাসি আঁকা। হাসিটা যেন বলতে চায়, ভয় কী ? হাসিটা যেন পৃথিবীর সমস্ত অশুভের বিরুদ্ধে জয়ের প্রতীক চিহ্ন। বীথি বই ওলটাতে ওলটাতে জোর করে উচ্চারণ করল, না, না।

মাথা নাড়তে গিয়ে সামলে নিল নিজেকে। আরেকটু হলেই অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। চোখ একেবারে ভরে উঠেছে। মুছতে পারছে না, পাছে আবু দেখে ফেলে। নিজেকে সে জোর করে মগ্ন রাখতে চেষ্টা করে বইয়ের পাতায়। আবু তখন পেছনে এসে দু'হাত দিয়ে বীথির দু'কাঁধ শক্ত করে ধরে। মুখ নাবিয়ে বলে, রাগ করেছিস ? সেদিন আমার চিঠিটা পেয়ে সত্যি সত্যি রাগ করলি ?

বীথি বিস্মিত হয়ে যায়। চিঠিটার কথা বুঝতে পারে না। আবু তাকে তো কোনো চিঠি লেখে নি। বীথি বলে, কোন চিঠি ?

আবু যেন শুনতেই পায়নি। যেন বলাটাই তার একমাত্র কাজ। আবু কণ্ঠে মমতা তুলে বলে চলে, আমার চিঠিতে তুই ঝাঁজটুকুই দেখলি, আমাকে দেখলি না ? বেশ তো, যদি চাস আমি আসব না। তাহলে আসব না।

আবু তো বীথির মধ্যে বীথিকে দেখছে না। বীথি তখন আবুর চোখের দিকে তাকায়। ভয় করতে থাকে।

তোমার কী হয়েছে, আবু ভাই ?

আমার ? কিছু না তো।

আবু মনে মনে বুঝতে পারে, যার উদ্দেশে এই বলা সে বীথি নয়, কিন্তু তবু বীথিকেই তার বলতে হচ্ছে। এতে উপশম হচ্ছে, মনের ভেতরে মুক্তির স্রোতোধারা বয়ে যাচ্ছে। আবু তাকে দু'পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। বলে, চল, বীথি।

বীথির তখন কী হয়, তাকে অনুসরণ করতে থাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

বীথি আর আবুকে দেখা যায় হাইকোর্টের পাশ দিয়ে মগবাজারের দিকে হাঁটতে। রোদে তেতে উঠেছে ফুটপাথ। লম্বা রাস্তাটা সুম সুম করছে উত্তাপে। একটা গাছের ছায়ায় পানির কল। পানি জমেছে এক চিলতে। সেখান থেকে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে চকিত একটা কাক। আবু বলতে থাকে, আমাকে তোর কী মনে হয়, বীথি ?

বীথি কী জবাব দেবে বুঝতে পারে না। মনে মনে তোলপাড় করতে থাকে. এ প্রশ্নটাও কি তাকেই করা ? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। উত্তর করে, আমার কী মনে হয়, জেনে কী করবে ?

কী জানি কী করবো। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে যে। জানিস বীথি, আমার মাথার মধ্যে কিস্সু ঢুকছে না। খালি মনে হচ্ছে, আমার বুঝবার শোনবার সব শক্তি চলে যাচ্ছে। যে জিনিসটা একেবারে সামনে, তাকেও যেন কেউ দেখিয়ে না দিলে দেখতে পারব না— এমনি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি। আমার এ কী হলো, বীথি ?

তাড়াতাড়ি বীথি বলে, রোদে হাঁটতে বলেছে কে তোমাকে ?

কে আবার ? কি করবো তাহলে ?

অসুখ করবে যে।

তার কি বাকি আছে রে ?

বীথি ছায়া ঘেঁষে ঘেঁষে চলে। তার সঙ্গ নেয়ার জন্যে আবুকেও ছায়ার ভেতর দিয়ে চলতে হয়। আবু বলে, তোর ওপরে ভারী অবিচার করলাম।

বীথির বুকটা স্তব্ধ হয়ে যায়।

ক'দিন থেকে শরীর খারাপ তোর, তোকে এই রোদে বার করে আনলাম। মরে যাস যদি ?

বীথির তখন মমতা হয়। উওর করে, আমার কিছু হয়নি তো। তোমার কথা বলছিলাম। তুমি একটা অসুখ বাঁধিয়ে বসবে এই আমার ভয়। যাচ্ছ কোথায় ?

আবু তার দিকে তাকিয়ে আনমনে হাসে। বলে, হঠাৎ আজ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি কী অসম্ভব রক্ত রঙ ফুল ধরেছে। তখন বুঝলি বীথি, আমার মাথার ভেতরে সেই আগুন জ্বলে উঠল। থমকে দাঁড়ালাম। তোর হাসি পাচ্ছে ? তোকে ডাকতে হলো। তুই না এলে কী করতাম ?

আবু আস্তে আস্তে নিজের অস্তিত্ব আর সঙ্গতি ফিরে পাচ্ছে দেখে বীথি একটু আশ্বস্ত হলো।

যে উন্মত্ততা একটু আগে বাসায় দেখেছিল এখন তা পড়ে এসেছে। বীথি বুঝতে পারে, আবুর একটা ধাক্কা লেগেছে কোথাও। যেন হাশেম ভাইয়ের কথা বলার আভাস ফুটে বেরুচ্ছে তার কণ্ঠ থেকে। কেবল সেই ধাক্কাটা ভালো না মন্দের দিকে এইটে বীথি বুঝতে পারছে না।

দাঁড়াও, আবু ভাই।

কেন রে ?

বীথি যেন সব বুঝতে পারছে। বীথি চোখ মেলে দেখতে থাকে ফুলে ফুলে আকাশের নীলের ভেতরে লাল একটা রাজপথ। যেন আস্তে আস্তে ওদের দু'জনকে চারদিক থেকে এইসব আগুন ফুলগুলো জড়িয়ে ধরছে। ডুবিয়ে দিচ্ছে আশেপাশের সব কিছু।

আর আবু ভাবতে থাকে, বিলকিস এখন কী করছে ? সে অনুভব করতে পারে বিলকিসের আত্মা তার খুব কাছে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে নিরিখ করছে। আবু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বীথি মুখ ফিরিয়ে বলে,

যাই।

যাবি ? কেন ? না যেতে পারবি না।

কোন জবাব না দিয়ে বীথি একা একা হাঁটতে থাকে। আবু যখন বারবার তাকে ফেরাবার চেষ্টা করে তখন কঠিন হয়ে বলে, কাল রাতে কথা দিয়েছিলে না ?

দিয়েছিলাম। তাহলে এলি কেন ?

আবু কিছুতেই ছেড়ে দেবে না তাকে।

শোন, বীথি।

রাস্তায় একটা 'সিন' না করলেই না, আবু ভাই ?

তিরস্কারটা শুনে ফেটে পড়ে আবু।

আমি না হয় তোকে জ্বালাই, তাই বলে 'সিন' করতে পারব ভাবতে পারলি ? যা, যেখানে খুশি যা। তুই মরে যেতে পারলি না ?

যাবোই তো, মরেই যাবো।

বীথি একটা খালি রিকশা পেয়ে উঠে বসলো। বলল, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি ?

আবু কোনো জবাব না দিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে যায়।

রাস্তার মোড়ে কামালের সঙ্গে দেখা। আবুকে দেখে সে রিকশা থামায়, জিগ্যেস করে, ক্লাশ শেষ হলো বুঝি ?

উত্তর দিতে ইচ্ছে করছে না। কোন রকমে বলল, হ্যাঁ।

তাহলে আয় আমার সঙ্গে। মেলা খবর আছে।

বীথি চলে যাবার পর আবার আবুর মাথার মধ্যে প্রপাতের মতো ফিরে এসেছিল বিলকিস। বিলকিসের ওখানে যে কথাগুলো হয়েছিল সব একাকার হয়ে একটা সিম্‌ফনির মতো বাজছিল। বিলকিসের সমুখে এসে নিজের অক্ষমতা, নিজের বোবা হয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তিকে শাপ শাপান্ত করছিল সে। বিলকিসের কাছে আবার যেতে ইচ্ছে করছে। এখন গেলে কেমন

হয় ? না। দুপুরে দু'বার দেখা হলে কী ভাববে বিলকিস ? এ-কী টানাপোড়েন! যার কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয়ার আকাঙ্ক্ষা, সংকোচ তার কাছেই ? নিজেকে খুন করে ফেলতে পারলে যেন শান্তি পাওয়া যেত। আবু হঠাৎ নিজেকে চোখ বুঁজে ছুঁড়ে মারে কামালের দিকে। বলে, চল, কোথাও বসি। সেদিন খাওয়াতে চেয়েছিলি, আজ হোক।

রিকশায় উঠে বসে আবু শুধালো, কী খবর বল ? মেলা খবর শুনে মনে হচ্ছে ভাগ্যটা হঠাৎ ফিরিয়ে ফেলেছিস তুই ?

কামাল সুখী আত্মবিলাসী হাসি হাসল। তার হাসিটা অন্যসময়ে আবুর কাছে ভালগার মনে হতে পারত। কিন্তু এখন চোখেই পড়ল না। হাসির তোড় থামিয়ে কামাল বলল, হঠাৎ দু'টো লাইসেন্স পেয়েছি। সেদিন বলছিলাম না খুব লস হচ্ছে ?

আবু কামালের কথার ভেতরে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। যেন কামালের ব্যবসার ওঠা পড়ার সঙ্গে তার এবং সারা পৃথিবীর উত্থান পতন নির্ভর করছে।

মাগরেবের নামাজ পড়তে গিয়ে আজ কেমন খালি খালি লাগে মরিয়মের। মনে হয়, কী যেন নেই তাঁর সংসারে। কী যেন ছিল, হঠাৎ করে পালিয়ে গেছে। নামাজ পড়ে মুনাজাত করতে গিয়ে নিজের হাতের ভেতরে, সন্ধ্যার করুণ অন্ধকারের ভেতরে বীথির মুখ দেখতে পান মরিয়ম।

বীথিকে আজ বিকেলে খোরশেদ চৌধুরী এসে নিয়ে গেলেন। মেয়েটা কাঁদে নি, কোন কথা বলে নি। মরিয়ম যেন অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারছিলেন, বীথির হৃদয়টা ছিঁড়ে যাচ্ছে। ক'দিন থেকে ওকে নিয়ে যাবার কথা হচ্ছিল। মরিয়ম নিজে পারেন নি মেয়েটাকে বলতে। মুরশেদ চৌধুরী বলেছিলেন।

কথাটা শোনার পর থেকে বীথিকে লক্ষ্য করেছেন তিনি। আশ্চর্য হয়েছেন ওর সহ্য করবার ক্ষমতা দেখে। অতটুকু শরীরে এত বড় ব্যথাকে কবর দেয়ার শক্তি ও পেলো কোথায় ?

বীথি যে চলে যাচ্ছে, তাকে চলে যেতে হচ্ছে, এটাই যে তার শেষ যাওয়া এ বাড়ি থেকে— এইটে তিনি ভুলতে পারছিলেন না। তবু যদি মেয়েটা ভালোয় ভালোয় যেত তাহলে মরিয়ম কাঁদতে পারতেন— চলে যাওয়ার শোকটাকে মুক্তি দিতে পারতেন। কিন্তু যে অপবাদ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল তা মনে করে কাঁদতে সাহস পান না তিনি। বদলে কান্নাকে অনুমতি দিয়েছেন তাঁর অন্তরকে খাক্ করে দেওয়ার জন্য।

বিরাট নিমগাছটার দিকে তাকিয়ে অশান্ত পাতাগুলোর মতো মরিয়মের ভেতরটা হুহু করে ওঠে। বীথিকে নিয়ে যে তিনি কতখানি ভরে ছিলেন, আজ চলে যাবার পর তা ভীষণ রকমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নামাজ পড়ে ওপাশের বারান্দায় গেলেন মরিয়ম। সেখানে হাশেম একটা ইজিচেয়ারে চোখ বুঁজে পড়ে আছে। সন্ধ্যের একটু আগে ওকে শোয়া থেকে উঠিয়ে এনে বাইরে বসিয়ে দিয়েছেন। নইলে আল্লাহর লানৎ পড়বে।

এসে তার কপালে হাত রাখলেন মরিয়ম। জ্বরটা কমেছে একটু। এত ডাক্তার দেখালেন, ওষুধ আনালেন, কিন্তু তবু ছেলেটা ভালো হচ্ছে না দেখে মন তাঁর এমনিতেই খারাপ হয়ে আছে। আজ পাঁচ বছর পর হারানো ছেলে কি ফিরে এসেছে মায়ের কোলে মরবার জন্যে ?

সময়টা ভর সন্ধ্যে। মরিয়ম বুকে থুতু দিলেন, দরুদ পড়লেন। সন্ধ্যে বেলায় এমন অলুক্ষণে কথা মনে আনতে নেই। আল্লাহ তুমি মাফ কর।

হাশেমের পাশে মেঝেয় বসে ছেলের হাত ঘসে দিতে লাগলেন মরিয়ম। যেন তার করতল থেকে মৃত্যুর বিরুদ্ধে শক্তির ফৌজ পাঠিয়ে দিচ্ছেন ওর আত্মায়। হাশেম চোখ মেলে তাকাতেই মরিয়মের বুকটা ভেঙ্গে পড়ল। এই ছেলেটা কত ছোট ছিল একদিন। তাঁর কোল ভরে চাঁদের মত শুয়ে থাকত। ইচ্ছে করলে, হাশেমকে যেন এখনো তিনি কোলে করতে পারবেন।

বললেন, ঘরে যাবি, বাবা ?

হাশেম হাসল। কথা বলল না। কিন্তু ওতেই বোঝা গেল, ঘরে যাবে না। মরিয়ম চুপ করে তাকিয়ে থাকেন। হাশেম তবু এ কদিন বকাবকি করত, যা খুশি তাই বলত। আজ সকাল থেকে একেবারেই চুপচাপ। আশঙ্কা হয় তাঁর। হাশেম যে কথা বলছে না, এটা অশুভ চিহ্ন বলে মনে হয়। মনে হয়, হাশেম এখুনি উঠে পায়চারি করে বেড়াক, এলোপাথারি কথায় কান ঝালাপালা করে দিক— তিনি স্বস্তি পাবেন। তিনি তবু অনুভব করতে পারবেন— হাশেম বেঁচে আছে, হাশেম ভালো আছে।

মরিয়মের আকুতিটা যেন গিয়ে পৌঁছুলো হাশেমের অন্তরে। হাশেম বলে উঠল, তোমার ভয় করছে, মা ?

কেনরে ?

আমি মরে যাবো বলে।

বালাই ষাট, সোনা আমার।

মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিয়ে তুমিও কম কষ্ট পাচ্ছ না।

মরিয়ম অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকান। যেন ছেলের কাছে করুণ একটা অপরাধ করে ধরা পড়ে গেছেন তিনি। বললে, কষ্ট কী ? পরের মেয়ে, চিরদিন থাকবে বলে তো আসেনি।

চিরদিন থাকবে বলে তো কেউ আসে না। তবু কষ্ট হয়। কষ্ট না হলে তুমি আজ অমন করছ কেন ?

মরিয়ম কিছু বলেন না। হাশেমের কাছে ধরা পড়েও যেন ভাল লাগছে।

হাশেম বলল, নিমগাছটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, মা। পাখিগুলো ঘরে ফিরে এসেছে। সারাদিন কোথায় ছিল ওরা ? আকাশে বাতাসে মাঠে ঘাঠে সারাটা পৃথিবী ভরে উড়ে বেরিয়েছে। তারপর রাতের আশ্রয় যেখানে, যেখান থেকে ভোরবেলায় বেরিয়েছিল, সেখানে ফিরে এসেছে সবাই। আমার কী মনে হয় জানো মা ? এই ছবিটাকে যদি সহজ করে মানুষ বুঝত, তাহলে কোনো দুঃখই থাকত না। সহজ বলেই তো বুঝতে পারাটা এত কঠিন। প্রাণের টান যেখানে, সে যেখানেই যাক না ফিরে আসবে। আমি তো বলি, মানুষ মিথ্যেই কষ্ট পায়। আমরা বাইরের পাওয়া, বাইরের চেহারাটাকে এত দাম দিয়েছি যে অন্তরকে একেবারে পায়ে ঠেলে বসে আছি। কেউ বুঝলো না বলেই তো খ্যাপা লাগে আমার।

মরিয়ম শুনতে শুনতে ওর কপালে হাত রাখেন। মনে একটু আশার সঞ্চার হয়। হাশেম আবার বকতে শুরু করেছে, যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। তিনি আদর করে বলেন, সবাই বুঝবে কী ? সবাই তোর মতো পণ্ডিত হলে বুঝত।

পাণ্ডিত্যের কী আছে, মা ? ঐখানেই তো আরেকটা মস্তফাঁকি। পাণ্ডিত্য দিয়ে তর্ক করা যায়, ভয় দেখানো যায়; বোঝানো যায় না, ভালোবাসা যায় না। অন্তরকে বুঝতে হলে অন্তর দিয়ে বুঝতে হয়।

কথা শেষ করে মায়ের করতলের নিচে পড়ে থাকে হাশেম।

আবু সেই যে দুপুরে এক পলক এসেই বেরিয়ে গেছে, এখনো ফেরেনি। হাশেম ছিল বিছানায় শুয়ে। যাবার আগে বলে যেতে এসে বীথি তাকে ঘুমন্ত দেখেছিল। ইতস্তত করে ফিরে যাচ্ছিল। তখন হাশেম বলে উঠেছে, শোন। মনে করেছিলাম চোখ বুঁজে তোকে ফাঁকি দেব। কই, পারলাম না।

বীথি কাছে আসেনি। ঘরের মাঝখানেই অধোমুখে দাঁড়িয়েছিল। তাকে ওরকম দেখে হাশেম বলেছে, যা তুই। জেলখানায় না দ্বীপান্তরে যাচ্ছিস যে বিদায় নিতে হবে তোর। আসিস একবার, কেমন ?

শুনে খোরশেদ চৌধুরী হা হা করে হেসে উঠেছিলেন।

দ্বীপান্তরেই তো! কী বলিস, বীথী ? আসতে যেতে ছ'আনা লাগে রিকশায়, সোজা কথা ?

যাবার আগে মরিয়ম বীথিকে কোলের কাছে বসিয়ে অনেকক্ষণ আদর করেছিলেন। বলেছিলেন, শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখিস, মা। বড় চাচিকে বলিস, কদিন হলো ভালো নেই তুই। তোর চাচাকেও বলে দিলাম। কাল তোকে দেখতে আসব।

তন্ময় ছবিটা থেকে মরিয়ম চমকে ফিরে এলেন বর্তমানে। যাবার সময়ে বীথির চোখে পানি ছিল, এখন তাঁর চোখে। কোনো মতে আঁচল ঠেকিয়ে হাশেমকে বললেন, তুই এখানেই বসবি ? না, ভেতরে যাবি ?

এখানেই ভালো।

তাহলে বোস। আমি রান্নাঘরটা দেখে আসি।

মরিয়ম উঠে দাঁড়ালেন।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে বীথির খালি ঘরটা চোখে পড়ল। ভেজানো ছিল দরজাটা। বাতাসে কখন আধো খুলে গেছে। বীথি থাকতেও মাঝে মাঝে এমনি কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যেত না।

আবু সোজা এসে তার নিজের ঘরে ঢুকল। কামালের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় বসে যে বেপরোয়া আড্ডাই মেরেছে তা নয়, তার সঙ্গে প্রথম শো'র ছবিও দেখেছে। অর্থাৎ মনটাকে নিয়ে ঘণ্টা পাঁচেক কৌতুক করেছে আবু। এখন আবার সেই ভাবনাগুলো ফিরে এসেছে। চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠছে বিলকিসের শাড়ির পাড়ে আঁকা ময়ূর, বাড়ি, গাছ। মনে করেছিল, ক্লান্তি অবোধ করে রাখবে মনটাকে। কিন্তু তা হলো কই ? ক্লান্তি এসেছে ঠিকই, ভীষণ ক্লান্তি, কিন্তু মনটা আরো সূচীমুখ হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ ভুলে থাকার পর, বাড়ি ফেরার পথে, মাথার ভেতরে নাচ শুরু হয়েছিল আবার। এখনো সেটা থামে নি।

কাপড় বদলে নিচে নামল আবু। আজ তার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। এমন খিদে যদি সবদিন পেত, মায়ের আর কোনো অনুযোগ থাকত না। মাকে আজ তাক লাগিয়ে দেবে আবু।

বীথির দরজা বন্ধ দেখে ভাবলো, অন্ধকারে শুয়ে মেয়েটা হয়ত দুপুরের কথা ভাবছে। বড্ড অবিচার করা হয়েছে তার ওপর। ভাবল, ফিরে এসে ডাকবে। ডেকে বলবে, বীথি তুই আমার কথায় কিছু মনে করিস নে।

খেতে বসে দেখল, মা নেই। মা না থাকলে বীথি থাকে। মাকে গিয়ে ডাকল আবু। মরিয়ম বললেন, আমার শরীরটা ভালো নেই রে।

বলতে বলতে উঠে আসেন তিনি। আবু বলে, থাক।

বলেই সে নেমে আসে খাবার ঘরে। তন্ময় হয়ে খাচ্ছিল, মরিয়ম এসে পিছনে দাঁড়ালেন। বুঝতে পারলেন, আবু এখনো টের পায়নি। যদি জানতে পারে বীথি চলে গেছে, তাহলে কী হবে ?

মায়ের মন মরিয়মের। আবু সত্যি সত্যি বীথিকে ভালবাসত কিনা জানতে ইচ্ছে করল তাঁর। কথাটা বলে দেখলে কেমন হয় ? বীথির চলে যাওয়ার সংবাদে ওর মুখ চোখ তো তাঁকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তাঁর চোখে পড়বেই। আশায় তিনি সমুখে এসে দাঁড়ালেন।

প্রায় চমকে উঠেছিল আবু। মাকে দেখে রুষ্ট কণ্ঠে বলল, তোমাকে না বললাম এসো না ?

তুই কি একা বসে খেতে পারবি ?

আবু কোনদিন একা বসে খেতে পারে না। কেউ না কেউ থাকবে, কথা বলবে কী সঙ্গে খাবে, এই অভ্যেস। মরিয়ম হাসলেন। বললেন, তোর বড় চাচা এসেছিল।

আবু কথা বলল না। ভাবল, হাশেম ভাইকে দেখতে এসেছিল। মাথা নিচু করে খেয়ে চলল সে।

বীথিকে নিয়ে গেল।

চমকে মায়ের দিকে তাকাল আবু। দেখল, মা দুচোখ মেলে তাকে দেখছেন। অপ্রস্তুত হয়ে চোখ নামিয়ে নিল সে। কিছু একটা বলা দরকার। বলল, কখন ?

বিকেলে। বীথি এখন থেকে ওঁর কাছেই থাকবে।

আবুর থমথমে মুখ দৃষ্টি এড়াল না মরিয়মের। ছেলে তক্ষুনি হাত ধুয়ে উঠে দাঁড়াল। পীড়াপীড়ি করতে ভুলে গেলেন তাকে আরো খাওয়ার জন্যে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। যেন এই ছেলেটা পর হয়ে গেল তাঁর।

সিঁড়ির নিচে অন্ধকারে এক পলকের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আবু। বীথি চলে গেছে! দুপুরের ঘটনাটি মনে পড়ল তার।

বীথি কি জানতো যে আজই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে ?

বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল আবু। বীথির আজ দুপুরের চেহারা, কথা আর পথ থেকে হঠাৎ চলে যাওয়া, মনে পড়তে থাকে। চলে যাবে জানলে কাল রাতের প্রতিজ্ঞাটা কক্ষনো ভাঙ্গতো না সে। মনে মনে আবছা অনুতাপ হয় তার।

বীথি চলে গেছে বলে প্রথমে যেমন এখন আর অতটা খারাপ লাগছে না। থেকে থেকে কেবল মনে হচ্ছে, বীথি ছিল বলে একটা আশ্রয় ছিল তার।

আর কিছু না। গেছে যাক। আসলে বিলকিস আজ তাকে আচ্ছন্ন করে আছে। মাথার ভেতরে যে নাচ হচ্ছে তার উৎস বিলকিস।

উঠে এসে বারান্দা দিয়ে হাঁটতে থাকে আবু। তারপর নেবে এসে নিমগাছের নিচে। সেখান থেকে বাগানে। বাগানের সিঁড়িতে বসে ঠাণ্ডা বাতাসে প্রীত হতে থাকে আবু। মনে মনে আলোড়ন চলতে থাকে বিলকিসকে নিয়ে। নিজেকে যেন সারাদিন পর আবার সে ফিরে পাচ্ছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বিলকিসকে। তার সারাটা শরীর আর আত্মা থরথর করে কাঁপতে থাকে। নিজেকে শান্ত করবার জন্যে, ঘুম পাড়াবার জন্যে, ফিসফিস করে উচ্চারণ করতে থাকে সে বিলকিসের নাম। তখন একটা অলৌকিক মায়ার মতো সৃষ্টি হয় তার চারদিকে। বিলকিস হয়তো এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। না, ঘুমিয়ে পড়বে কেন ? তার পরীক্ষা; হয়ত রাত জেগে, বাম হাতে কপালের ভার নামিয়ে লেখাপড়া করছে। আলোর আভায় গড়ে উঠেছে তার মুখ ঘরের অন্ধকারের ভেতর থেকে। সব ঘুমিয়ে পড়েছে— মানুষ, দালান, বাড়ি, রাস্তা, দেয়ালের ওপরে থাবা বিছিয়ে শুয়ে থাকা বেড়ালটা। বিলকিসের শরীর থেকে কুয়াশার মতো এক দীপ্তি আর কোন স্মরণাতীত কাল থেকে উত্থিত চেনা অগুরুর ঘ্রাণ যেন তার ইন্দ্রিয়ের দুয়ারে এসে আঘাত করছে।

কোনদিন বলা হয়নি বিলকিসকে। ভয়, সে যদি প্রত্যাখ্যান করে।

কিন্তু আজ, এখন, নিজেকে এত নিঃশঙ্ক আর প্রস্তুত মনে হচ্ছে। আবু উঠে দাঁড়াল।

বারান্দায় তার পায়ের শব্দ পেয়ে হাশেম ডাকল, শোন।

কাছে আসতেই শুধালো, ঠিকানা পেলি ?

আবু লজ্জিত হয়। আরো আগেই জানানো উচিত ছিল তার। বলে, হ্যাঁ, পেয়েছি। এখুনি দেব, না, সকালে ?

সকালেই দিস।

হাশেম যেন আলস্যে চোখ বুঁজলো।

অনেক রাত অবধি আবু অনেকগুলো কাগজ ছিঁড়বার পর বিলকিসের কাছে এই চিঠিটা লিখতে পারে—

চিঠি পেয়ে অবাক হবেন না, অপ্রত্যাশিত হলেই যে তা অসঙ্গত হবে এমন কথা নেই।

কোনদিন কেউ আমাকে ডাকে নি। অমন একটা ডাকের জন্যে আমি বারবার মরে জন্ম নিতে পারি, সব তুচ্ছ করতে পারি। আপনাকে আমি এমন করে লিখতে পারছি, কারণ, অলক্ষ্যে আপনি আমার আপনতম হয়ে উঠেছেন। আমার যে কী আত্মমোহ ছিল! বাঁচতে চেয়েছিলাম আমি নিজেকে নিয়েই। একেকদিন একাকীত্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। তখন মনে হতো, বুকের ভেতরে কে যেন কাঁদছে। তখন অস্থির হয়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘুরে বেড়াতাম, ভিড়ের মধ্যে ডুবে গিয়ে নিজেকে ভোলাতাম— যেন শিশুকে খেলনা দিয়ে ভোলাচ্ছি।

একদিন ঈশ্বর হাসলেন। আমার চোখের সমুখে তুলে ধরলেন একজনকে। তাকে আর ভুলতে পারলাম না। আমার মোহ ভাংগল, চূর্ণ হলো আমার অহংকার। চলমান পৃথিবী তার সমস্ত সবুজ আর রৌদ্র দিয়ে আমার দিকে কৌতুক আঙ্গুল তুলে, সমস্ত হাওয়া দূর দূরান্ত থেকে করতালি দিতে দিতে যেন বলে গেল— একাকী থাকলে পারলে না।

এত কথা হলো, এতকাল ধরে ধরে এত বিনিময় করলাম, কিন্তু যে কথা বলব, তা আর বলা হলো না।

এত অনুভব করি, বলতে পারি না কেন ? এত চাই, কাছে আসতে পারি না কেন ?

একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। আমার বছর বারো বয়স, তখন একদিন জোর করে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের বুকের দুধ খেয়েছিলাম। যে দুধ খেয়ে আমার ছোটভাই বেঁচে আছে তার স্বাদ কেমন জানতে চয়েছিলাম।

ভাইটি মারা গেছে।

সেদিন দুধ মুখে দিয়ে থুতু করে দৌড়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। সে দুধ ছিল ক্ষীণ, নোনা আর পানসে।

জীবন কি আবার এমনি করে আমাকে তাড়িয়ে দেবে ? না, আপনাকে বিব্রত করব না কোন প্রশ্ন করে। তারে একটা টংকার পড়লে সুরটা কিছুক্ষণের মধ্যে অনন্তে যায় মিলিয়ে। কিন্তু রেশ থাকে অনেকক্ষণ।

আজ সারাটা দিন আমার এমনি।

আনন্দ-পুত্র হতে চেয়েছি পৃথিবীতে। চেয়েছি, আনন্দ যেন আমার জন্ম হয়, আনন্দ যেন আমার মৃত্যু হয়। আমার যে শূন্যতা আপনার স্পর্শে আনন্দ হয়ে উঠেছে, সে শূন্যতাকে বললাম— সার্থক তোমার প্রতীক্ষা। আর সত্তাকে বললাম— অন্য আর কিইবা বলতে পারতাম ?— তুমি অনন্তকালের জন্যে সঞ্চয় করে রাখো এই আনন্দের মহিমাকে।

সেই গল্পটা মনে করুন। একটা কক্ষ ভরে দিতে হাজার টাকার কার্পেট লাগে, আবার এক পয়সার মোম জ্বালিয়েও তা ভরে দেওয়া যায়। আপনার যতটুকু পেলাম তাই আমার আলো। শূন্য হাত বাড়িয়ে রইলাম আরো অনেক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। আমার ভয় কী ? আমার যে বিশ্বাস রয়েছে আপনি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। কাল আসবো।

ইতি, আবু।

পারিজাত বলল, ফিরে যাবেন না। আপা আপনাকে বসতে বলেছেন।

বিলকিসদের বসবার ঘরে এসে আবু গত তরশুর সেই সোফায় বসল। ঠিক আগের মতই দু'পা ক্রস করে, দু'হাত ছড়িয়ে; যেন তার অবচেতন মনে এটা একটা মায়ায় দাঁড়িয়ে গেছে। আশ্চর্য, বিলকিস কী করে জানলো বকুলকে ভালবাসত হাশেম ভাই ? হাশেমের জীবনের কতটুকু জানে এই মেয়েটা ? সেদিন অমন করে হঠাৎ উঠে আসতে না হলে সে জিজ্ঞেস করতে পারত। আজো জিজ্ঞেস করা যায়। কিন্তু— কিন্তু আজ সকালে বিলকিস তার চিঠি পেয়েছে। এখন যেন মনে হচ্ছে চিঠিটা না লিখলেই পারত। লিখলেও, না এলে হতো। বলতে কী, আবুর বুকের মধ্যে কাঁপন উঠেছে, বিলকিস যদি তাকে ফিরিয়ে দেয়! চিঠির কথা যতক্ষণ ভুলে থাকা যায়— ভালো। বিলকিস যতক্ষণ এ ঘরে না আসছে— ভালো।

অনেকক্ষণ পরে বিলকিস এলো। মুখে তার স্নিগ্ধ হাসি। আটপৌরে শাদা শাড়ি পরনে তার, চওড়া সবুজ পাড়। নেয়ে উঠেছিল। সুবাস পাওয়া যাচ্ছে। একটা স্নিগ্ধ শ্রী ঘিরে রেখেছে তার কান্তি। আবু তাকে দেখে মধুর হাসলো। যেন দু'জনের মধ্যে কিছুই হয়নি।

আবু বলল, হঠাৎ এসে পড়লাম।

কেন, চিঠিতে তো জানিয়েছিলেন।

কত সহজে চিঠির উল্লেখ করতে পারল বিলকিস। বিস্মিত হলো আবু। তার আশা হলো। কিন্তু অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারল না।

ওদিকে বিলকিসের মনটাও উদাস হয়ে উঠেছে থেকে থেকে। এ কথা তো বলা যায় না আবুকে। আজ যে মন্টির জন্মদিন। সকাল থেকে প্রস্তুত হয়েছিল যে মন, বাকবিতণ্ডা তুলে তাকে সে কিছুতেই নষ্ট করতে পারবে না।

চিঠিটা পেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল বিলকিস। সে জানত, একদিন না একদিন এমন একটা কাণ্ড করে বসবে আবু। কিন্তু সেটা মন্টির জন্মদিনেই ঘটবে তা কে জানতো ? ঠিক যেদিনটাতে সে একজনকে অনুভব করবে বলে জেগে উঠেছে সেই একই দিনে আরেকজনের কী ব্যাকুল আবির্ভাব। একেবারে ভোর সকালে সবার আগে ঘুম ভেঙ্গেছিল তার। গোসল করে এসে টেবিলে মাথা রেখে মন্টির জন্যে অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে কল্যাণ কামনা করেছে সে। ততক্ষণে ফুটে বেরিয়েছে দিনের আলো। সে আলোর বাঁধ ভাঙ্গা বন্যা এসে জাগিয়ে দিয়ে গেছে তাকে। পৃথিবীর আর কারো কথা মনে ছিল না তার।

ঠিক তখন, ন'টার ডাকে, আবুর চিঠি এসে হাজির। পড়ে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি সে। এ সব কী লিখেছে লোকটা ? আবার যখন পড়েছে তখন বুক কেঁপে উঠেছে। এ যে প্রার্থনা! এ যে আমন্ত্রণ!

হাশেমের ছোট ভাই আবু, এই কথাটা জানত না বিলকিস। তরশু দিন কথাটা জেনে অবধি আবুর মুখ বারবার ভেসে উঠেছিল তার চোখে। হাশেম, সেই ছেলেটা— বকুল আপা যাকে ভালবেসেও কাছে করতে পারেনি। কেন পারেনি, জানতো না বিলকিস। আজ যেন মনে হচ্ছে, তার নিজেকে দিয়ে মনে হচ্ছে, সেও পারবে না আবুকে কাছে করতে কিন্তু কেন পারবে না তা আবু কোনদিনও জানবে না।

শিউরে উঠেছিল বিলকিস।

না, তাকে স্পষ্ট হতে হবে, কঠিন হতে হবে। বকুল নিজেকে অস্পষ্টতার আড়ালে রেখে, বন্ধুত্বকে বাঁচিয়ে রেখে যে অন্যায় করেছে, আবুর বেলায় তা কিছুতেই হতে দেবে না বিলকিস।

আবুর সামনে বসে এতক্ষণ চুপ করে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। বিলকিস তাই শুধালো, কেমন আছেন, বলুন।

ভালো। আপনি ?

আমিও।

এই কথাগুলো বলতে চায়নি ওরা। তবু বলতে হচ্ছে। আবু হঠাৎ মরিয়া হয়ে বলল, ভালো আছি বললে মিথ্যে বলা হয়।

কেন ?

একা যে।

কেন একা থাকেন ?

কেন ? যদি জানতাম, কষ্ট থাকত না।

আবু খুব জেদ করে কথা বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু তাকে নির্বাপিত হতে হল যখন বিলকিস বলল, এ সব কথা আমি বুঝতে পারি না। যদি বুঝতে পারতাম তাহলে এমন করে সবাইকে ফিরে যেতে হতো না। তাছাড়া, আমি আর বুঝতে চাইও না।

আবুর তীব্র ইচ্ছে হলো চীৎকার করে বিলকিসকে জিজ্ঞেস করে, হাত গুটিয়ে রেখে কী আনন্দ হচ্ছে তার ? কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পাবে না। বদলে বিলকিসের কথাই শুনতে থাকে। তন্ময় হয়ে বিলকিস বলছে, আমার এখন পায়ে দড়ি। যাবার পথ নেই। দেবার উপায় নেই। বিশ্বাস করুন, কেউ ইচ্ছে করে ফিরিয়ে দেয় না। আপনি এখন তরুণ, কত বড় হতে হবে আপনাকে, আপনি কেন এমন আবর্তে পড়ে ভুগে ভুগে মরবেন ?

কক্ষনো না।

কথাগুলো আসলে তিরস্কার। কিন্তু সেই তিরস্কারের জন্যেই আবুর ভালোবাসা যেন আরো প্রবল হয়ে উঠলো। মনে করেছিল, বিলকিস তাকে ফিরিয়ে দিলে প্রলয়কাণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই হলো না। বাইরে রোদ আছে তেমনি। জানালা দিয়ে সকৌতুকে উঁকি দিচ্ছে ডালিম গাছ নিত্যকার মতো। বিদ্যুৎ ঘুরিয়ে চলেছে পাখা। তার হাত ঘড়িটাও চলছে। যতখানি কষ্ট হবে মনে হয়েছিল, তার এক কণাও নয়; এমন কি হৃদপিণ্ডটাও এতটুকু লাফিয়ে উঠল না। যেন প্রত্যাখ্যানের কথা তার আগে থেকেই জানা ছিল।

পায়ের পাতা দিয়ে মেঝের 'পরে নক্‌শা কাটতে লাগল আবু। বলল, মরব কেন ? জানেন, নিজেকে আমি সব কিছুর চেয়ে বেশি ভালবাসি। আমি কেন মরব ?

বিলকিস বুঝতে পারল, এতো আবুর শক্তি নয়, শক্তির মুখোশে কান্না। বলল, এ কী অলুক্ষণে কথা আপনার! যাকে ভালবেসেছেন, তাকে সাক্ষী রেখে নিজে কষ্ট পাবার কোনো মানে হয় না।

আবু নিজেকে নিয়ে নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে দেখে বিলকিস চুপ করে থাকে।

অবশেষে বলে, পাওয়াটাই কি সব ? যা আপন করে দেখেছেন, তার জন্য তুচ্ছ স্বার্থটাকে না বিলোতে পারলে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবেন যে।

হঠাৎ করে ফেটে পড়ে আবু। আর্তনাদের মতো বলে, তাহলে আমি কী করব ?

হুহু করে ওঠে বিলকিসের অন্তর। বকুল আর হাশেমের কথা মনে পড়ে। লুসিয়েন আর অগাস্টাস এসে সচকিত করে দেয়। পৃথিবী জুড়ে মানুষের একী বন্ধন! বকুল তো পারল না তাকে ফিরিয়ে দিয়ে সুখী হতে। ভেঙ্গে পড়েছে অগাস্টাস। আর মন্টি ? মন্টি পাগলের মতো গলায় ক্ষুর দিতে চায়। ভয় দেখিয়ে লেখে, ভূমধ্যসাগরে ডুবে মরবে। মন্টিকে আজ চিঠি লেখা দরকার। আবুর চোখে চোখ রেখে বিলকিস বলে, আমি জানি না। আমার অত থাকলে দুনিয়া শুদ্ধু  লোককে পথ বাতলে দিতাম। নিজেই পথ খুঁজে মরতাম না। যদি আপনার জন্যে মায়াই না থাকত, আজ দেখাও করতাম না।

আবু পাথর হয়ে বসে থাকে। এত সহজে সব কিছু এমন নির্ধারিত হয়ে যাবে কে জানত ?

বিলকিস বলল, জীবনে আঘাত পেলে কী ভাঙ্গতে আছে ? আঘাতই বা কেন ? যা পেলেন না তা আপনাকে শক্তি দিক, নইলে শান্তি পাবো না।

তখন বিলকিসের জন্যে মমতা হয় আবুর। না, সে কষ্ট পাবে না, দুঃখ করবে না, ভেঙ্গে পড়বে না। তাকে বড় হতে হবে। ইচ্ছে করে, কথাটা বলে।

কিন্তু সংকোচ হয়। বলতে পারে, আমাকে একটু পানি দেবেন ? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

পানি আনতে গেল বিলকিস। সারাটা ঘরে সে এখন একা। সারাটা জীবন যেন তাকে একা থাকতে হবে।

পানি দিয়ে বিলকিস বলল, কী সব আমরা বকছি বলুন তো! আসুন, তার চেয়ে গল্প করি। তার কণ্ঠের সঙ্গীত কী অন্তরঙ্গ সুন্দর। আবুর মনটা এক নিমেষে পাখির মতো হালকা হয়ে গেল। সে বলল, একটা কথা, কিছু মনে করবেন না তো ?

না, না।

আবু মহা উৎসাহে শুরু করল, অনেকদিন ধরে ভাবতাম আপনার কথা। আপনার গল্প বলুন না ? আমি শুনবো।

বিলকিস আশ্চর্য হয়। একটু লজ্জিতও হয় যেন। বলে, আমার আবার গল্প কী ?

আবু যেন বিরাট একটা আলোচনার সূত্র পেয়ে গেছে। বলে, সব মানুষেরই গল্প আছে, আপনি জানেন না বুঝি ? মানুষ কত কীভাবে, কত হাজার হাজার দিন পার হয়ে আসে— এর চেয়ে ভালো গল্প কেউ লেখে নি।

তখন বিলকিস খুব খুশি হয়ে উঠল। তার ভালো লাগল আবুর মুখোশহীন কথা বলার ঢং। বলল, আমার কথা কেন শুনতে চান ?

আপনাকে খুব কাছের মানুষ মনে হয় আমার। তাই শুনতে চাই।

আমি বললে আপনাকেও বলতে হবে।

আবু ইতস্তত করে একটু।

কী হলো ?

বেশ বলবো।

বিলকিস হঠাৎ দেখে, আবু ম্লান হয়ে গেছে। দেখে ভয় করে তার। জিগ্যেস করে, কী ভাবছেন ?

কিছু না।

বিলকিস তখন হাসল। বলল, আমাদের দু'জনের অবস্থা একই রকম। বেশ তো, এত তাড়াহুড়ো কী ? অন্য কোনদিন শোনা যাবে।

আচ্ছা।

আবু বুঝতে পারে না, তার ভেতরটা তবু এত অস্থির আর শূন্য লাগছে কেন! বিলকিস হঠাৎ জিগ্যেস করে, আপনার হাশেম ভাই কেমন আছেন ?

চমকে উঠল আবু। মনে মনে হাশেম ভাইয়ের কথাই ভাবছিল সে, অথচ নিজেই ঠাহর করতে পারছিল না। বিলকিসের কথা শুনে কুয়াশা ছিঁড়ে গেল।

সে বলল, ভালো। ঠিকানাটা উনিই চেয়েছিলেন। আমি কিস্‌সু বুঝতে পারছি না কেন ?

ঠিক তখন ভেতর থেকে ডাক পড়ল বিলকিসের। বিলকিস যদিও আবুকে বলল, আপনি একটু বসুন; আবু উঠে দাঁড়াল।

না, থাক। অনেকক্ষণ কষ্ট দিয়েছি আপনাকে।

যাবেন ? আচ্ছা।

বিলকিসের মুখ ছায়া হয়ে এলো।

আসুন। মাঝে মাঝে খবর নেবেন কেমন থাকি না থাকি।

আচ্ছা।

আবু বেরিয়ে আসে। হঠাৎ করে নিজেকে খালি খালি মনে হয়। আর যেন তার কোন কাজ নেই।

যেন তার জন্ম হয়নি, তার মৃত্যু হবে না; জীবন ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বে কিন্তু তাকে স্পর্শ করবে না আর।

বিলকিস ভেতরে এলে তার মা বললেন, তোর আক্কেলটা কী বলতো?

বিলকিসের মনটা যেন হোঁচট খায়। নিজেকেই অবাক করে দিয়ে সে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, কেন, কী হয়েছে?

কী আবার? টুকু আর টুবলুকে নিয়ে বকুলেব কাছে যাবি বলেছিলি। সেজেগুজে কাঁদছে। গল্পটা কমালে কী হয়?

বিলকিসের চিৎকার করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু নিজেকে শান্ত করে বলে, তার আমি কী করব? আমি পারব না।

দুপদাপ করে নিজের ঘরে আসে বিলকিস। কোথায় যেন কী হচ্ছে। বুঝতে পারা যাচ্ছে না। এ বই সে বই ওল্টাতে থাকে, চেয়ার বদলায়, জানালার পর্দাগুলো মুক্ত করে দেয়— কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি নেই তার।

টুকু আর টুবলু হাত পা ছড়িয়ে কাঁদছে। মায়ের কাছে আজ তারা ফিরে যাবে বলছিল। বেরিয়ে এসে তাদের ভীষণ আদর করতে থাকে সে। তারপর কান্না থামলে নিজের ঘরে এসে চিঠি লিখতে বসে। লেখে—

মন্টি, আজ তোমার জন্মদিন।

সকালে মনে হলো, শিয়রে দাঁড়িয়ে তুমি আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে।

আচ্ছা, তোমার যখন ঘুম ভাঙ্গল আজ, কার কথা মনে পড়েছিল? আমার গা, ছুঁয়ে বল।

মন্টি, আমার একী হয়েছে? নিজেকে আমি কিছুতেই ধরে রাখতে পারছি না। রাগ হচ্ছে, অভিমান হচ্ছে, চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে। আমি ভেঙ্গে পড়বার আগেই কী তুমি আসবে? নাকি এসে আমার মৃতদেহ দেখবে? তোমার অমন করে বাইরে না থাকলেই নয়? আজ রাতটা ইচ্ছে করছে তোমাকে যেন স্বপ্নে দেখি।

চিঠিটা শেষ হলে সুন্দর করে ঠিকানা লিখল। তারপর বন্ধ করবার আগে সমস্ত কাগজে মুখ বুলোল বিলকিস; যেন তার সমস্ত অনুভব, সমস্ত কথা, সম্পূর্ণ মনটা যা লেখা গেল না, এমনি করে রেখে দিল চিঠিটায়।

টুকু আর টুবলুকে নিয়ে বেরুলো সে। ওদের দিয়ে আসার পথে নিজে ডাকবাক্সে ফেলে আসবে চিঠিখানা। কিছু চিঠি থাকে, নিজের হাতে না পাঠালে মনের মধ্যে সারাক্ষণ কেমন কেমন করতে থাকে।

বেলা শেষে মেঘের মতো বীথি ঘুমিয়ে ছিল। হাশেম তার পাশে বসে গালে হাত রাখল। নিজের গায়েই এত জ্বর তবু বীথির উত্তাপটা ধরা পড়ছে। কাল রাত থেকে কিছু খায়নি বীথি। কদিন থেকে যে দুর্বলতা যাচ্ছিল আজ তা জ্বর হয়ে দেখা দিয়েছে।

তোকে দেখতে এসেছি রে।

বীথি শুনতে পেল না হয়ত। নাকি খুব কষ্ট হচ্ছে ? তার আঙ্গুলগুলো তুলে নিল হাশেম। ডাকল, বীথি, আমি।

হাশেমের গলা কাঁপছে থরথর করে। যেন ঝড়ের মধ্যে দৌড়ে এসে একটা মানুষ আর কথা বলতে পারছে না।

নিজের ওপর নিজে শোধ নিতে নিতে ক্লান্ত অসুস্থ হয়ে গেছে বীথি। সেই ক্লান্তির ভেতর থেকে যেন মনে হলো ডাক এসেছে। তখন ফিসফিস করে স্বপ্নের ভেতরে, স্বপ্ন থেকে জাগরণের দিকে যেতে যেতে বীথি উচ্চারণ করর, আবু ভাই এসেছ!

পাশেই ছিলেন আমেনা আর মরিয়ম। এ নাম শুনে তাঁরা দু'জনেই বিব্রত হয়ে গেলেন। চোখ ফিরিয়ে নিলেন বীথির দিক থেকে। এবার দু'জনে দু'জনের দিকে চোখ পড়তেই অপ্রস্তুত মরিয়ম ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হাশেম আরো শক্ত করে ধরে রাখে বীথির আঙ্গুল। চোখ মেলে তাকে দেখে সংকুচিত হয়ে যায় বীথি। এ কী করছিল সে ? বুকের ভেতর মোচড় ওঠে। হাশেমের হাতটা ধরে রাখে; উৎসুক চোখে সারা ঘর অনুসন্ধান করে কার জন্যে। পরে নিভে যায়।

তখন আমেনাও বেরিয়ে আসেন। তাঁকে দেখে মরিয়ম বলেন, হাশেমের কী আক্কেল আছে বুবু ? এত জ্বর নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছে কাউকে কিছু না বলে।

মরিয়ম যেন জোর করে চিন্তা থেকে বীথিকে দূরে ঠেলে রাখতে চান। তাই হাশেমকে নিয়েই কথা বলতে থাকেন বিরতিহীন। যেন উপসর্গটা এতেই কমে যাবে। বলে চলেন, ঘরে গিয়ে দেখলাম, হাশেম নেই। মনে করলাম, আছে কোথাও। তাও এলো না। একা বাসায় আমি। আমাকে ও শুধু জ্বালাতেই এসেছে। কান্না ফুটে বেরুতে থাকে মরিয়মের কণ্ঠে। বিকেলে ছেলেকে না পেয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটে এসেছিলেন এ বাসায়। মনে করেছিলেন, বীথির মায়ায় হাশেম বুঝি এখানে এসেছে। কিন্তু এখানেও ছিল না।

আমেনা তখন যেতে দেন নি মরিয়মকে। বলেছেন, ও এখানেই আসবে দেখিস। সত্যি সত্যি একটু আগে এখানে এসেছে হাশেম। আমেনা বললেন, তুই একটুতেই ঘাবড়াস মমো। বললাম, ছেলে যাবে কোথায় ? বীথি অসুখে, দেখলি তো এখানেই এলো ?

না বুবু, আমার বুকের ভেতর কেমন করছে।

আমেনা তখন মরিয়মকে মোড়া টেনে বসতে দেন। নিজেও সামনে বসেন। বলেন, আচ্ছা মমো, একটা কথা সত্যি করে বলতো।

মরিয়ম উদ্বিগ্ন হয়ে তাকান তাঁর দিকে।

— বীথিকে তোর বউ বলে পছন্দ হয় না ? আমি বোধ হয় ওকে এ বাসায় এনে ভুলই করলাম।

কার কথা বলছ ?

আহা, আবুর। তোর কী চোখ নেই, মমো ? আবুর জন্যে ওর পরান পড়ে আছে দেখতে পাস না ?

ওদিকে ঘরের মধ্যে হাশেম আর বীথি। বীথির আঙ্গুলগুলো তখনো তার হাতের মধ্যে। বীথিকে কী সুন্দর লাগছে তার। সে বলল, খুব কষ্ট হচ্ছে তোর ? ডেকে আনবো ওকে ?

বীথি মাথা নাড়ে— না, না।

আজ হাশেমেরও অসীম কষ্ট। তাকে মাথা নাড়তে দেখে ভীষণ চটে যায়। তার হাত ফেলে দিয়ে বলে, তুই এত বোকা কেন রে ? তুইও কি আমাকে শান্তিতে মরতে দিবিনে, বীথি ?

উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে অশান্ত পায়চারি করতে থাকে হাশেম। জানালাটা খুলে দেয় ভাল করে। রক্তিম আকাশ দেখা যায়। সেখান থেকে ফিরে এসে বীথির সমুখে স্থির হয়ে দাঁড়ায় সে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা এড়াবার জন্যে বীথি প্রশ্ন করে, অসুখ নিয়ে এলে কেন ?

হাশেম আবার তার পাশে বসে পড়ে। বলে, অসুখ কইরে ? আমি যে ভাল হয়ে গেছি। দ্যাখ না আমার গা ছুঁয়ে। দ্যাখ তুই।

বীথির হাতটা তুলে নিজের কপলে রাখে।

— কী দেখলি ?

অসম্ভব জ্বর হাশেমের। বীথি ম্লান হাসল উত্তরে। তখন হাশেম ঝটকা মেরে তার হাতটা ফেলে দেয়। বলে, ও। তুইও বিশ্বাস করলি না ?

আবার উঠে পায়চারি করতে থাকে। যেন মাঝে মাঝে কিসের টানে বাধা পড়ে যাচ্ছে, তাই বসতে হচ্ছে, নইলে এমনি করে হেঁটে হেঁটেই সে জীবনপাত করত।

ঘরের ভেতরে বাইরের রাঙ্গা আলো এসে পড়েছে। সেই অপূর্ব আলোর ভেতরে তন্ময় হয়ে চলতে চলতে ঠিক প্রথম দিনের মতো সমুখের শূন্যতাকে উদ্দেশ করে হাশেম বলতে থাকে, জানিস বীথি, পৃথিবী জুড়ে সবাই কষ্ট পাচ্ছে। মনে করলাম, বাইরে দাঁড়িয়ে সব মোহ ফেলে দিয়ে, সবার শান্তি দেখে বুক জুড়োবো। শুনতে পাচ্ছিস বীথি, আমি কী বোকা। আমার স্পর্ধা দেখেছিস তুই! — দূর, তুই কিস্‌সু বুঝতে পারছিস না। তোর কেন অসুখ হলো রে ? মরতে চাস বুঝি ? বড্ড কষ্ট বীথি তুই, মরিস না।

বিছানায় উঠে বসতে চায় বীথি। মৃত্যুতে এত কষ্ট, তবে তার সান্ত্বনা কোথায় ? আরো কী কষ্ট হয় মৃত্যুতে ? হাশেম এগিয়ে এসে দ্রুত দু'হাতে তাকে ভর দেয়, আস্তে আস্তে উঠিয়ে আনে বালিশ থেকে বিছানা থেকে। বলে, আমার সঙ্গে হাঁটবি ? তাহলে আমাকে ভাল করে ধর। দ্যাখ কী সুন্দর সন্ধ্যে হচ্ছে।

বীথি তার হাত ধরে বলে, তোমার গা কাঁপছে হাশেম ভাই।

আর্তনাদের মতো শোনায় হাশেমের উত্তরটা— তাই নাকি রে ? বেশ, আমাকে ছেড়ে দে।

কিন্তু বীথি তবু ওর হাত ধরে রাখে। মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার আজ কী হয়েছে?

নিজের অসুস্থতার কথা মনেও থাকে না বীথির। আবছা করে বুঝতে পারে এই মানুষটার মনের মধ্যে প্রচণ্ড এক ঘূর্ণি উঠেছে, যা আজ একেবারেই নতুন। চোখ বিস্ময়ে আকুল হয়ে ওঠে। বীথি হাশেমের হাত ধরে নাড়া দেয়। তখন হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাশেম বলে, তোকে দেখতে এলাম, আর তুই কী না আমাকে নিয়েই পড়লি। আমি জানি না বুঝি— তোর মরতে সাধ হয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে হাশেম জানালার কাছে চলে যায়।

মানুষের মনটা, জানিস বীথি, বিরাট এক বনের মতো। কুল নেই, দিক নেই, মাথার ওপরে আলো নেই— নিথর এক বন। আর তোর বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ওটা হচ্ছে বাঘ। সোনার মতো, রক্তের মতো সেই বাঘটা সেখানে রাজা হয়ে আছে। মানুষ তাকে আফিম খাইয়ে চিড়িয়াখানায় ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়। থাকবে কেন ? ও যে রাজা। একদিন শিকল ছিঁড়ে অরণ্যে গিয়ে তোলপাড় করে তুলবে না ?

হাশেমের চোখ কী অদ্ভুত রকমের শূন্য। ভূতগ্রস্তের মতো লাগছে তাকে। বীথির দেখে ভয় করতে থাকে। নিজের নিঃসঙ্গতা যেন আরো দশ গুণ হয়ে উঠতে চায়। হাশেম বলে চলে, হ্যাঁরে হাঁ। আমি কি মিথ্যে বলছি ? নইলে, সবাইকে ফাঁকি পর ফাঁকির দিয়ে জীবনটাকে ভরিয়ে তুলতে দেখে এত খ্যাপা হয়ে গেলাম কেন ? — দ্যাখ দিকি, তোর অসুখ আর আমি বকবক করে যাচ্ছি। আয় তোর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দি। আয়।

বীথিকে কাছে আসতে হয় না। হাশেমই এগিয়ে তার কপালে হাত রাখে। আস্তে আস্তে বুলিয়ে দেয়। বীথির যেন মনে হয়, হাশেম এমনি করে নিজেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছে। হাশেম বলে, ভয় পাসনে বীথি। ভয় করতে নেই। জীবন কখনো ভয়কে মেনে নেয় না। কী তুই! এত কষ্ট শুধু শুধু পাস।

হাশেম ওর কপাল ছেড়ে হাতটা তুলে নেয়। আলতো করে অপ্রত্যাশিত একটা চুমো দেয় হাতে। তারপর কিছু না বলে চলে যায়। যেন, হঠাৎ কোথাও তারপর কিছু না বলে চলে যায়। তার ছিঁড়ে গেছে। এক মুহূর্তে তাই সব স্তব্ধ হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে গেল বাইরের নেমে আসা সন্ধ্যের মতো। ঘর থেকে হনহন করে হাশেমকে বেরুতে দেখে আমেনা আর মরিয়ম দু'জনেই অবাক হয়ে যান। হাশেম ওঁদের পাশ কাটিয়ে চলে যায় মাতাল নৌকোর মতো। কিন্তু কী ভেবে আবার ফিরে আসে। এসে বলে, বীথিকে দেখো। আমি বাসায় যাই।

আবু বাসায় ফিরে দেখল একটাও বাতি জ্বলেনি। কেবল রান্না ঘরের খোলা দুয়ার দিয়ে নিম গাছের কোল অবধি এক ফালি আলো পড়েছে। সারাবাড়িতে কেউ নেই। যেন এমন একটা পরিবেশ তার জন্যে দরকার ছিল। বিলকিসের ওখান থেকে বেরিয়ে কোথায় গেছে, কী করেছে, কী ভেবেছে, কিছুই মনে পড়ছে না। মাথার ভেতর যন্ত্রণাও নেই, স্বস্তিও নেই। রাজ্যের অন্ধকারে তলিয়ে থাকা বাসায় ঢুকে তার মনে হল— হ্যাঁ, এইতো আমার বাসা। অন্ধকার বড় ভালো লাগল তার। স্নায়ুর ভেতরে উদ্বেগ ছমছম করছে, কিন্তু তবু ভালো। চাকরটার কাছে শুনল, মা বড় চাচিদের ওখানে। শুধালো, হাশেম ভাই ?

ওপরে আছেন।

তখন আবু উঠে এল ওপরে। এই মুহূর্তে বড় আপন মনে হচ্ছে তার মায়ের পেটের এই ভাইটাকে।

হাশেমের ঘরে বাতি জ্বেলে দিয়ে যায়নি কেউ। ভারী রাগ হলো তার চাকরটার ওপর। ভাইয়ের নাম ধরে ডাকল একবার। কোনো উত্তর এলো না। নিমের ডালে হঠাৎ দোলন লাগল বাতাসে, যেন ওটাই তার উত্তর। বাতি জ্বালল আবু। এতক্ষণ অন্ধকারের পর আলোটা চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল। চোখ সয়ে এলে দেখল, হাশেমের বিছানা শূন্য।

বারান্দাটাও তেমনি শূন্য, নিঃশব্দ।

তখন বাতি নিবিয়ে নিজের ঘরে এসে বাতি জ্বালল। দেখল, তার টেবিলের ওপর একটা চিঠি চাপা দেয়া। কাছে আসতে হলো না। দূর থেকেই লেখা দেখে বুঝল, কার চিঠি।

'চলে যাচ্ছি। না এলেই পারতাম। আমি তো মরেই গিয়েছিলাম, আবার মরতে এসেছিলাম কেন ? বকুলের সঙ্গে দেখা করে আজ আমার নতুন চোখ খুলেছে। দেখলাম, একজনের মৃত্যু আরেকজনের কাছে কত অর্থহীন। তাই আবার আমি বিরাট পৃথিবীর কাছে ফিরে যাচ্ছি।

তুই অন্ধ আবু। তুই অন্ধ, বীথি তোকে ডাকছে, তুই শুনছে পাচ্ছিস না ? এমন করে সব অপচয় করবি ?

মনের অসুখটা বীথির শরীরে গিয়ে পৌঁছেছে। আমি তো জানি, কী হবে এরপর। আমার অভিশাপই কুড়োবি, না হাত বাড়িয়ে ওকে নিবি ? ও তোকে এমন করে ডাকছে আজ, তুই শুনতে পাচ্ছিস না ? তুই ছিলি কোথায় ? আমার ভালোবাসা রইল।

ইতি, হাশেম।

চিঠি পড়ে প্রথমে আত্মায় কোন সাড়াই জাগে না। চিঠিটাকে ভাঁজ করে রেখে দেয় শূন্য ফুলদানির ভেতরে। এ ফুলদানিটা বীথি রোজ সাজিয়ে রাখত। বাতি নিবিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল আবু।

তখন ওই জানালার ওপারে অন্ধকার থেকে, অন্ধকারের ভেতর থেকে আস্তে আস্তে ভেসে উঠল হাশেমের মুখ। আর বকুল। বকুলের মুখটা কবরের মতো মনে হলো তার। হাশেম নেই, ছিলও না কোনদিন। চলে গেছে, এটা যেন কত সুন্দর একটা শেষ। বিলকিস যা বলেছে, তাও কত মহিমা জড়ানো শেষ। বীথিকে নিয়ে গেছে, বীথি জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে— এটাও একটা শেষ।

আমি কিছু ভাবতে পারছি না— আরো একটি শেষ, শেষের পর। আর এই অতল অন্ধকার সব কিছু কোলে করে রেখেছে তার অপরূপ অবোধ মমতা দিয়ে। নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইল আবু। যেন তার মৃত্যু হচ্ছে। প্রেমিক, কুটিল, মহৎ, নিষ্ঠুর মৃত্যু। যন্ত্রণাহীন মৃত্যু। মৃত্যু যে এত স্বস্তি, এত সুন্দর, তা কে জানত ? স্পষ্ট করে নিজের মৃত্যুকে দেখতে পায় আবু। এত স্পষ্ট, এত মায়া জড়ানো যে মনে হয় রাজার মুকুট মাথায় দিয়ে আছে সে। আহ, দীর্ঘ হোক মৃত্যুর এই মুহূর্ত। আসুক ধীরে ধীরে, নিয়ে যাক মেঘের ভেতর দিয়ে দূরে, আরো দূরে। চোখ বুঁজে তাকে কোথায় কোন রাজ্যে কে নিয়ে যাবে বলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দুয়ার খুলে অপেক্ষা করতে থাকে আবু। চোখ ভরে সে দেখতে পায়— তার ঘর আলো হয়ে উঠেছে, যে আলো দেখা যায় না, অনুভব করতে হয়। আর এক সুদূর সুরেলা কণ্ঠ ভরে তুলেছে সারাটা পৃথিবী, পৃথিবী ছাড়িয়ে আকাশ, আর আকাশের নিচে মায়ার মতো ঘরের পর ঘর, বাঁশবন, প্রাঙ্গণ, ঐ রাস্তা। স্পষ্ট সে শুনতে পায়, ছোটবেলায় যে হাফেজের কাছে কোরান পড়ত, তিনি কবেকার রাত দুপুরের মতো অন্তরের শিখা জ্বালিয়ে আবৃত্তি করছেন পাক্ কোরান। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। অনুভব করা যাচ্ছে, তিনি তার শিয়রে এসে হাঁটু মুড়ে বসেছেন। সারাটা ঘর ভরে উঠেছে গাঢ় লোবানের ঘ্রাণে। আর তার বিছানাটা হয়ে উঠেছে প্রাচীন, আবলুস কালো একটা খাট— যার পা বাঘের থাবার মতো। শাদা বালিশে মাথা

রেখে, শাদা চাদর বুক অবধি টেনে সে ডুবে আছে। আলো অন্ধকারে মৃত্যুর বাড়ানো হাত তুলে নিচ্ছে তাকে। পাশে দাঁড়িয়ে বাবা, মা, মাহবুব ভাই, হাশেম ভাই। সবাই তাকে দেখছেন, ঈর্ষা করছেন। আজ যে আমার মৃত্যু হচ্ছে। মা, তুমি ছোটবেলায় গল্প বলতে না ?—মানুষ মরে গেলে তাকে শাদা ঘোড়ায় পিঠে করে আকাশ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায় ?

আবু নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে। ঐতো বাইরে শোনা যাচ্ছে কোন অতীত থেকে ছেলেদের হুল্লোড়। ঐতো সেই পাথর বাঁধানো রাস্তাটা, যে রাস্তার দু'দিকে কেবল গাছ আর গাছ—গাছের চূড়া ছড়ানো নীল আকাশে— যে গাছের ছায়া ধরে হেঁটে অভিমান করে অনেক দূর চলে যাওয়া যেত।

বিছানায় শুয়ে থেকে, মৃত্যুর হাতের নিচে, আবু দেখে সেই রাস্তায় রোদ পড়েছে। রোদটা তাকে সোনা হয়ে ডাকছে। ছেলেরা উতল হয়ে উঠেছে। দূরে, কতদূরে, সেই নদীটা খলখল করে তাকে ডাকছে।

আবু বিছানা থেকে স্বপ্নের মতো উঠে দাঁড়ায়। সম্মোহিতের মতো বারান্দা পার হয়ে নামতে থাকে সিঁড়ি দিয়ে। বাগানের ভেতরে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট শুনতে পায় ছেলেদের কোলাহল। রোদের ভেতরে বেড়িয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। পা বাড়ায়। কিন্তু সামনে যে নদী। নদীর কী নাম ছিল যেন ? একেক দিন বাবার হাত ধরে এই নদীটার পাড়ে ঘুম থেকে উঠে আসা ভোরের মতো আজো যেন ডাক দিচ্ছে। যোজন কুয়াশার মতো বিছিয়ে আছে তার পাড়, তার স্রোত; তার স্পন্দন যেন বুকের স্পন্দন। বেলি গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে অন্ধের মতো আবু ব্যাকুল দু'হাত বাড়িয়ে কাকে যেন খুঁজতে থাকে।

খুঁজে পায় না। খুব কষ্ট হয়। অনেকদিন আগে মাহবুবকে বিছানা থেকে ফেলে দিয়েছিল আবু। পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত পড়ছিল তার। তারপর রাতে ভীষণ জ্বর এসেছিল। সেই কবে, সেদিন যেন ঠিক এমনি কষ্ট হচ্ছিল আবুর। বাবা তো তাকে কিছু বলেননি।

তবু রাতে ঘুমোতে গিয়ে, তন্দ্রার ভেতর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাবার বুকে। বলেছিল, ও মরবে জানলে আমি কক্ষনো ধাক্কা দিতাম না। সত্যি বলছি, সত্যি বলছি। সেদিন বাবা তার পিঠে হাত বুলিয়ে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, মরবে না রে। তুই দৌড়ে গিয়ে ওকে চুমো দিয়ে আয়। ভালো হয়ে যাবে।

আবু পাগলের মতো আবার হাত বাড়ায়। উন্মত্তের মতো সারাটা বাগানে খুঁজে ফেরে। নদীটা কুয়াশা। সেই কুয়াশার অন্তঃস্থলে অভিমানী দীপ্তির মতো কার অনুভব যেন লুকিয়ে থাকে। সহস্র অশ্রুতে বিকৃত কণ্ঠে হাহাকার করা ডাক দিয়ে উঠে আবু, বীথি, বী-থি-ই, বীথিরে। নামহীন কবেকার দেখা সেই নদীটার তীর থেকে তীরে ভোরের আলো কুয়াশার ভেতরে নৌকো থেকে নৌকোর দিকে ডাকের মতো ধ্বনিটা আছড়ে পড়ে আবুর চারদিকে। কুয়াশা যেন থরথর করে ফেটে ফেটে পড়তে চায়।

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা
১৯৬০